পারমিতা ও সুচরিতা
এবং তাদের মা শিবানীকে

এই লেখকের

উপন্যাস

সামনে লড়াই

[মালয়ালম ভাষায় অনূদিত]

রাতজাগার পালা

ছোটগল্প

নির্বাচিত গল্প

প্রবন্ধ ও গবেষণা-গ্রন্থ

সুকান্ত-অন্বেষা

উনিশশতকের নীল-আন্দোলন ও বাংলার সারস্বত-সমাজ [যন্ত্রস্থ]

লেখকের কথা

আমার প্রথম গল্প প্রকাশিত হয় রবিবারের যুগান্তরে ১৯৫৫ সালে ৪ঠা সেপ্টেম্বর। প্রথম গল্পগ্রন্থ প্রকাশিত হল '৮১ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর, গল্প ছাপা শুরুর ২৬ বছর পরে এবং' পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহৃদয় অর্থ-অনুদানে। প্রগতি-লেখকের পক্ষে এটা সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য প্রগতি-পাঠকেরা এ নিয়ে একটু ভাবনাচিন্তা করবেন!

কয়েকদিন আগে 'বুক মার্ক' ৮টি গল্প নিয়ে 'নির্বাচিত গল্প' প্রকাশ করেছেন। বর্তমান সংকলনে আছে ২০টি গল্প। গল্পগুলির অধিকাংশই ১০/১২ বছরের মধ্যে লেখা। শুধু 'উত্তাপ' ও 'নক্ষত্রের আলো' ২০ বছর পূর্বের। পুরনো লেখার প্রতি সব লেখকেরই কিছু অতিরিক্ত মমতা থাকে। তার টানেই ওরা সংকলনে উঠে এসেছে। গল্পগুলো কালানুক্রমে সাজানো হয় নি—বিষয়-বৈচিত্র্যের দিকে লক্ষ্য রেখে বিন্যস্ত করা হয়েছে। অধিকাংশ গল্প 'লেখা ও রেখা' 'সারস্বত' 'চতুষ্কোণ' 'নন্দন' 'উত্তরযুগ' 'সত্যযুগ' 'মাসিক বাংলাদেশ' ইত্যাদি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। গল্পের শেষে পত্রিকার নাম, সময় ও সংখ্যা নির্দেশ করা হয়েছে। রচনাকাল প্রকাশের সমসাময়িক। এই সুযোগে সংশ্লিষ্ট পত্রিকার সম্পাদকদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন জানাই।

'কালচেতনার গল্প' নামটি বিশিষ্ট লোকায়ণিক অরুণকুমার রায়ের দেওয়া। সাহিত্যজীবনে তিনি আমার শিক্ষক, বন্ধু ও পরামর্শদাতা। '৬২ সালের পর রাজনৈতিক ও পারিবারিক বিপর্যয়ে গল্পলেখা প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম। বিস্মৃতির অন্ধকার থেকে টেনে তুলে তিনিই 'চতুষ্কোণ'-পত্রিকার সম্পাদক-মণ্ডলীতে যুক্ত করেছিলেন। তাঁর ঋণশোধের চেষ্টামাত্র করি না।

নানা পত্রিকায় ছড়িয়ে-থাকা অনেক গল্পের মধ্যে থেকে ২০টি গল্প নির্বাচনে সাহায্য করেছেন ডঃ পল্লব সেনগুপ্ত, কবি অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়, ভাস্কর মুখোপাধ্যায়, শতদ্রু চাকী এবং সাধন চট্টোপাধ্যায়। শ্যামল মৈত্র এবং 'নবসাহিত্য প্রকাশনী'র পক্ষে বীরেন্দ্রনারায়ণ ঘোষ ও সমর ঘোষ গ্রন্থপ্রকাশের বিষয়ে আন্তরিক সহযোগিতা করেছেন। হারিয়ে-যাওয়া একটি গল্প উদ্ধার করে দিয়েছেন রঞ্জন ভৌমিক। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, অনুপ মাহিন্দার ও

ও মৃণালকান্তি বিশ্বাসও নানাভাবে সাহায্য করেছেন। এঁদের সকলের সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিগত সম্পর্ক এত নিবিড় যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ নেই।

সংকলনভুক্ত করার কালে শিল্পীর স্বাভাবিকধর্মে লেখাগুলির পরিমার্জন ও স্থানবিশেষে যৎসামান্য পরিবর্তন করা হয়েছে। 'সীতানাথের বাজার' ইতিপূর্বে 'চতুষ্কোণ শ্রেষ্ঠ গল্পসংগ্রহে'-এ এবং 'একটি মস্তানী গল্পের ভূমিকা' মিহির আচার্য সম্পাদিত 'পশ্চিমবঙ্গের গল্পসংগ্রহ'-এ স্থানলাভ করেছে। শেষোক্ত গল্পটি মালয়ালম ভাষায় অনূদিত হয়ে কেরালার প্রসিদ্ধ 'দেশাভিমানী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। অনুবাদ করেছেন এম. পি. কুমারুণ—যিনি লেখকের 'সামনে লড়াই' উপন্যাসটিরও মালয়ালম অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। 'একটি মস্তানী গল্পের ভূমিকা' নিয়ে নানাস্থানে আলোচনা হয়েছে। অনেকে ভুল বুঝে এটিকে 'মস্তানদের প্রতি লেখকের সহানুভূতির চিত্র' মনে করেছেন। কিন্তু গল্পের বিষয় বা দর্শন আদৌ তা নয়। সন্ত্রাস-কবলিত পশ্চিমবাংলার এক বিশেষ শ্বাস-রোধী অবস্থায় ১৯৭০ সালে লেখা এই গল্প আসলে গণতন্ত্রের মুখোশ ধরে টান দিতে চেয়েছে। এ বিষয়ে Frontier-পত্রিকায় লেখা হয়েছিল—'Ekti Mastani Galper Bhumika, even if slightly diffuse, is not only a humanistic document but also a moving record of the intensive violence and idiotic criminality of our law enforcement machinery which turns ordinary man into patriot. A teacher who avoided the so-called locality louts finally finds out that they are all innocent victims of an anonymous devil'. ['west Bengal : Agony and Ecstasy', by I. K, Shukla, vol. 5, No. 18, Aug 12, 1952]

এই সূত্রে আরো দু'একটি কথা বলা দরকার। '৭০ থেকে '৭১ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবাংলায় পরিপূর্ণ সন্ত্রাসের রাজত্ব বিরাজ করেছে। এইসময় শুধু রাজনৈতিক কর্মীরা নন, লেখকশিল্পীঅভিনেতারাও আক্রান্ত হয়েছেন। বর্তমান লেখকও তার আঁচ এড়াতে পারেন নি। '৭০ সালের শারদীয়-নন্দনে 'সামনে লড়াই' ছাপা হয় এবং '৭১ সালের জুলাই মাসে গ্রন্থাকারে বের হয়। আগস্ট মাসের এক গভীররাতে বাড়িতে পুলিশি-হামলা হয় ও পরের দিন লেখককে লর্ড সিংহ রোডে যেতে বাধ্য করা হয়। এসব ঘটনা স্বভাবতই স্নায়ুর উপর চাপ সৃষ্টি করে। সন্ত্রাসের পরিবেশে বামপন্থী পত্রপত্রিকাগুলিও অনেকে স্পষ্ট-প্রত্যক্ষ

'রাজনৈতিক গল্প' প্রকাশে দ্বিধাগ্রস্ত হ'ন। জরুরী অবস্থায় সেন্সরপ্রথার সঙ্গে আপোষ করতে না পেরে সাহসী সম্পাদক বন্ধুবর ভাস্কর মুখোপাধ্যায় 'লেখা ও রেখা'-পত্রিকা বন্ধ করে দেন। আমার লেখার জগৎ সঙ্কুচিত হয়ে পড়ে। ক্রমে অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে, স্বাধীনভাবে শিল্পীর আত্মপ্রকাশের আর বিশেষ কোনো সুযোগই থাকে না। এসব কারণেই '৭১ থেকে '৭৬ সালের মধ্যে লেখা রাজনৈতিক গল্পগুলিতে শিল্পিচিত্তের স্বাভাবিক বিকাশের পরিবর্তে একধরণের অন্তরালসৃষ্টির চেষ্টা অনিবার্য হয়ে ওঠে। এ সময় মনে যা আসত কলমে তা লেখার উপায়ই ছিল না। এতে শিল্পের অঙ্গহানি ঘটলেও লেখক হিসেবে সান্ত্বনা এই যে, সমগ্রদেশ যখন একদিকে ক্ষুধা ঘৃণা প্রতিবাদ ও ক্রোধের আগুনে দাউ দাউ জ্বলছিল, আর অন্যদিকে বুলেটেবেয়নেটে ছিন্নভিন্ন হয়ে পথে প্রান্তরে অরণ্যে বন্দীশালায় অবিরাম রক্ত ঝরাচ্ছিল—তখন নিরাপদে গৃহকোণে বসে বাঁশি বাজাই নি! সেই আতঙ্কপাণ্ডুর সন্ত্রাসের অবস্থার মধ্যেই আমরা লেখকশিল্পীরা একদিকে গড়ে তুলেছি 'গণতান্ত্রিক লেখকশিল্পী কলাকুশলী সম্মিলনী' (১৯৭২), অন্যদিকে রাজনৈতিক বিশ্বাস ও দর্শন-অনুযায়ী সাধ্যমত চেষ্টা করেছি প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের সাহিত্য-রচনার। বর্তমান লেখকের 'সামনে লড়াই' (১৯৭১) 'রাতজাগার পালা' (নন্দন শারদীয়, ১৯৭২) উপন্যাস এবং 'নির্বাচিত গল্প' ও 'কালচেতনার গল্প'-সংগ্রহের বহু গল্পই তার সাক্ষী। শিল্পসৃষ্টি হিসেবে এগুলো কতটা সার্থক হয়েছে তার বিচার সমালোচকেরা করবেন—কি দুঃসহ অবস্থায় এগুলো লিখিত হয়েছিল আমি শুধু তার কথাই বললাম।

'কালিকা জব প্রেসে'র কয়েকজন কম্পোজিটর আলোবাতাসহীন বদ্ধঘরে বিরামহীন লোডশেডিং-এর মধ্যে মোমবাতি জ্বালিয়ে যে গভীর আবেগ ও মমতা নিয়ে সমবেতভাবে গল্পগুলো পাঠ করেছেন ও সযত্ন দ্রুততায় কম্পোজ করেছেন—তার কথা কখনোই ভোলার নয়। এঁরা হলেন প্রকাশ আচার্য, বিজয় পাল, কানু সরকার দেবাশিস, মিত্থ্যা, তারাপদ মণ্ডল, কাইয়ুম আনসারি, মহাদেব ঘোষ, নারায়ণ পাল, শৈলেন দত্ত। 'কালচেতনার গল্প' তাঁদের কখনো ক্ষুব্ধ ও বিষণ্ণ কখনো আনন্দিত করেছে—এ গ্রন্থের এটাই শ্রেষ্ঠ পুরস্কার!

নিজে প্রুফ্ দেখা সত্বেও কিছু মুদ্রণপ্রমাদ থেকে গেল। এর মধ্যে 'প্রথম শ্রেণীর গল্প'টির প্রকাশকাল হবে নন্দন, মাঘ, ১৩৬৬। ভ্রমক্রমে ছাপা হয়েছে ১৩৬৬।

তপোবিজয় ঘোষ

ক্ষুৎকাতর

আজও রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল শচীকান্তর। তারপর গত তিনদিনের মতোই অনুভব করল তলপেটে ঠিক নাভির চারপাশটায় চিনচিনে ব্যথা। মুখটা শুকনো শুকনো, জিভটা বিস্বাদ, হাত-পায়ে অস্থিরতা। লক্ষণ মিলিয়ে তৎক্ষণাৎ বুঝল, তার খিদে পেয়ে গেছে। এখন রাতশেষের এই তরল মুহূর্তে সে কিনা ক্ষুধার্ত!

সামান্য কাৎ হয়ে একটা কোলবালিশে হাত রেখেছিল। হাতটা সরাতে চাইল কিন্তু ইচ্ছে করল না। মাথাটা বালিশ থেকে সামান্য ঝুঁকে পড়েছিল, ঠিক করতে চাইল, ভালো লাগল না। সারা শরীরে অবসাদ, ক্লান্তি। চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে। ঘরটা এখনও অন্ধকার। শচীকান্ত কিছু দেখতে পেল না।

কিছুক্ষণ চুপচাপ শুয়ে থাকল শচীকান্ত। শুয়ে থেকে ভাবতে চাইল, তিনদিন ধরে শেষরাতে এইভাবে আচমকা ঘুম ভেঙে যাওয়া, নাই-কুণ্ডলের চারধারে চিনচিনে ব্যথা, হাত-পায়ের এই অসার দুর্বলতার অনুভূতি—এ সব সত্যি সত্যি খিদে পাওয়ার লক্ষণ অথবা মনেরই কোন অসুখ। সে কিনা একটা পূর্ণবয়স্ক লোক, চল্লিশ ছুঁই-ছুঁই করছে, বিয়ে হয়েছে তেরো বছর, অফিসে চাকরি পনের বছর যার বড় ছেলের বয়সই এখন সাড়ে এগারো, উপরন্তু আরও দুটো মেয়ে আছে যথাক্রমে নয় ও সাতের এবং যে-কিনা রীতিমত দায়িত্ব নিয়ে এখন অফিসের কেরাণীকুলের একটা বিভাগ দেখাশুনা করে, রেশন তোলে, বাজার করে, পরিবার-পরিকল্পনার অফিসে ছোটাছুটি করে এবং বড় ছেলেটা স্কুলে টিফিন করার পয়সা চাইলে যে-কিনা অসম্ভব রেগে গিয়ে উপদেশ দেয়, 'দশটায় পেটপুরে খেয়ে যাচ্ছিস, ফিরে এসেই ত আবার রুটি গিলবি, পয়সা দিয়ে কি হবে শুনি, পয়সা কি এত সস্তা!' সেই শচীকান্তর এমন সময়ে-অসময়ে, বিশেষ করে

রাতের এই শেষপ্রহরে এমন কুচ্ছিত কদাকার একটি খিদে খিদে অনুভূতি হওয়া উচিত কিনা, হলে সে কি করবে, কি করণীয়, গত তিনদিন চুপচাপ শুয়ে যেমন ভেবেছিল, আজও তেমনি ভাবতে চাইল।

ঘুমের মধ্যেই এই সময় সরলা পাশ ফিরল। ওর একটা পা শচীকান্তর হাঁটুর কাছে চলে এল! যেন ভয় পেয়ে চোখ বুজে ফেলল শচীকান্ত। সরলার ডান হাতটা শচীকান্তর প্রায় নাকের কাছে, বাঁ হাতটা এখনও অল্প নড়ছে। টেনেটুনে শাড়ীর আঁচলটা সামান্য ঠিক করে নিচ্ছে মনে হচ্ছে। এবার শান্ত। থেমে থেমে লম্বা নিঃশ্বাস ফেলছে। ···আবার ঘুমিয়ে পড়ল। নিশ্চিন্ত হয়ে অন্ধকারে চোখ খুলল শচীকান্ত। আবার শব্দ করে শ্বাস টানতে শুরু করল। পায়ের আঙ্গুলগুলো নাড়ল, হাতটা বার কয়েক মুঠো করে ছড়িয়ে দিল। আর এই সময় ও অনুভব করল, সরলা যে-শাড়ীটা পরে শুয়েছে—নিশ্চয়ই ওটা পরেই বিকেলে রান্না করেছে। কেন না শাড়ীটা থেকে একপ্রকার হলুদ-হলুদ গন্ধ উঠছে। অথবা সরলার ডান হাতটা এখন শচীকান্তর নাকের কাছাকাছি বলে গন্ধটা এত তীব্র বোধ হচ্ছে। সরলা, যার বয়স এখন কিনা তেত্রিশের কোঠায়, ক্রমান্বয়ে তিনটি জীবিত ও একটি মৃত সন্তানের জন্ম দিয়ে যার চোয়ালের হাড় গলার কণ্ঠা এবং ঝুলন্ত দুই বুকের মধ্যবর্তী পাঁজরসমূহ অসম্ভব উঁচু কটকটে দৃশ্যমান, এখন সে আর যথেষ্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকার কোন অর্থ খুঁজে পায় না বলেই রাতের রান্না-বান্না সেরে শাড়ী পাল্টানো কি সাবান দিয়ে হাত মুখ ধোয়ার কথা চিন্তাও করে না। তার সর্বাঙ্গ জড়িয়ে এখন সংসারের অনেক গন্ধই উগ্র হয়ে থাকে, থাকাটাই স্বাভাবিক। ভাবতে ভাবতে শচীকান্ত আবার যেই নাক টানল অমনি বাটা-হলুদের গন্ধে নাভিবৃত্তে ক্ষুধা-বোধ যেন ইঁদুর-বাচ্চার মতো নড়ে চড়ে উঠল। রাতে আলুকুমড়োর তরকারি দিয়ে রুটি খেয়েছিল, সেই সঙ্গে ঝোলা গুড়, এক টুকরো বেগুন ভাজা—মনে পড়ে গেল! আর শুকনো জিভটায় তক্ষুনি জল এসে গেল।

কুণ্ডুবাবুর কুকুর, আমি এবং ভূতনাথ

ওই কুকুরটাকে আমি একদিন খুন করব।

কুণ্ডুবাবুদের ওই প্রকাণ্ড এ্যালসেসিয়ানটার কথাই বলছি। শালা এক নম্বরের হারামি, আমাকে কিনা সন্দেহ করে! এমনি চুপচাপ নিরীহ ভালমানুষটি, সিঁড়ির গোড়ায় চিৎ হয়ে শুয়ে দু'পা আকাশে উঁচিয়ে আছে। কখনো লেজ নাড়ছে, কখনো পা দিয়ে নাকের ডগার মাছি তাড়াচ্ছে। মেমসাহেবদের মতো কটা-চোখ আধবোজা, ঘন লোমে বাতাসের ঢেউ খেলছে। কুণ্ডুগিন্নীর ধাড়ি বেড়ালটা ওর সামনে দিয়ে গর্ গর্ করতে করতে চলে যাচ্ছে, ভজুয়া ঝাড়ন হাতে দরজা-জানালা সাফ করছে, কার্তিক জলের ঝাঁঝরি নিয়ে টবের গাছে জল দিচ্ছে, কাওকে কিছু বলছে না। রসকলি-কাটা সাহেব-বোষ্টমদের মতো মায়া-মাখানো মুখের ভাব করে এক আধবার মিট মিট করে তাকাচ্ছে, আবার জিভ ঝুলিয়ে চোখ বুজে ঘুমিয়ে পড়ছে।

কিন্তু যেই আমি রাস্তার ধারে বাগানের ছোট গ্রীলের দরজায় হাত রাখলাম, অমনি দেখ, শালা যেন রণমূর্তি! চকিতে দাঁড়িয়ে গেল উঠে, পাকিয়ে তুলল চোখ, সামনের দিকে ছড়িয়ে দিল থাবা, বর্শাফলকের মতো ঝলকে উঠল দাঁত, আর সমানে ঘেঁও-ঘেঁও-ঘাঁক্—।

প্রথম দিন আমি তো দারুণ ভয় পেয়েছিলাম!

এই মফঃস্বল শহরের স্কুলে সবে ঢুকেছি। একদিন সেক্রেটারি নিত্যানন্দ কুণ্ডু হেডমাস্টারের ঘরে ডেকে পাঠালেন। একথা সেকথার পর মেদবহুল ভারি শরীরটা সেগুন কাঠের ঈজিচেয়ারে সম্পূর্ণ এলিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে বললেন, 'শুধু স্কুলে পড়ালেই তো চলবে না মাস্টার। আমার ঘরেও যে একটি ছাত্র আছে—'

হেডমাস্টার তাড়াতাড়ি বললেন, 'সুবোধ। খুব ভাল ছেলে। আমাদের স্কুলেই টেন্ বি-তে পড়ে।'

সেক্রেটারি চুরুট ধরালেন, 'ইংরেজি-বাংলা কালিদাসবাবু দেখিয়ে দেন। আপনি একটু সায়েন্স সাবজেক্টগুলো—'

টীচার্স-রুমে ফিরে আমি কালিদাসবাবুর খোঁজ করলাম। এক কোণে বসে বাসি কাগজ পড়ছিলেন। মাথার চুল সমস্তই সাদা। লম্বা নাকে নিকেলের গোল চশমা। এই স্কুলের প্রবীণতম শিক্ষক। আমি কাছে গিয়ে বসতেই দন্তহীন মুখে নিঃশব্দ হাসলেন, 'কখন যেতে বললেন কুণ্ডুবাবু?'.

বললাম, 'সকালের দিকে। আপনি তো সন্ধ্যায় যান—'

'হুঁ'। টাকা পয়সার কথা কিছু বললেন?'

'না!'

'পাবেন না। ফ্রি সার্ভিস!'

'মানে?'

'মানে বেগার খাটুনি—'

'আপনিও?'

'হ্যাঁ!'

শুনে সেই গোড়ার দিকেই মনটা অপ্রসন্ন হ'ল। টাটকা পাশ করে বেরিয়েছি। শরীরের তাজা রক্ত কারণে অকারণে উষ্ণ হয়। একটু চড়াগলায় বলে ফেললাম, 'তাহলে যাব কেন বেগার খাটতে?' কালিদাসবাবু নীচু গলায় বললেন, 'না গেলে মুস্কিল আছে। তার চেয়ে যান, আখেরে লাভ হতে পারে।'

সেদিন বিকেলেই আবার হেডমাস্টার ডেকে পাঠালেন, 'নতুন হোস্টেল-বিল্ডিংটার কাজ শেষ হলে আপনি সুপারিনটেনডেণ্ট হবেন। কুণ্ডুবাবু বলে গেলেন।'

বুঝলাম, ফ্রি সার্ভিসটা একেবারে ফ্রি নয়। কালিদাসবাবুও আশা করে আছেন, আসছে বছর তাঁর রিটায়ারমেণ্ট হয়ে গেলে কুণ্ডুফার্মের কোথাও শ'খানেক টাকার একটা কাজ পেয়ে যাবেন। হোস্টেল-সুপার হলে বিনাভাড়ায় বাসস্থান জুটবে। উপরন্তু মাসিক ত্রিশটাকা ভাতা। চাকরিতে ঢুকতে না ঢুকতে এই বাড়তি সুবিধা, মন্দ কি!

তবু অস্বস্তি দূর হ'ল না। সমস্ত বাপারটা একটু যেন পিচ্ছিল

অপমানকর মনে হতে লাগল। সহকর্মীদের চোখে ঈর্ষার ফুলকি, ঠোঁটে চাপাহাসির বিদ্রূপ। ছুটির মুখে সীতেশ রায় তো বলেই ফেলল, 'এসেই সেক্রেটারির গুড্ বুকে উঠে গেলেন! আপনাদেরই কপাল মশাই—'। লজ্জিত আহত ভঙ্গিতে আমি চুপ করে রইলাম। আমার হয়ে কালিদাসবাবু বললেন, 'হবে না। কেমিস্ট্রির লোক যে। শক্ত করে না বাঁধলে দড়ি ছিঁড়তে কতক্ষণ—'

সীতেশ অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে বাঁকা করে হাসল, 'সত্যি কালিদাসদা! কি কুক্ষণে যে ইতিহাস পড়েছিলাম—'

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত আমি ঘুমাতে পারলাম না। প্রাণবন্ধু হোটেলের জীর্ণ তক্তাপোষে শুয়ে মশার গুনগুন, ট্রেনের শব্দ, নাইট-শো সিনেমা-ফেরৎ দর্শকদের উচ্চকণ্ঠ কোলাহল শুনতে শুনতে অধৈর্য ও বিরক্ত হয়ে বার দুই বাথরুমে গেলাম, জল খেলাম এবং শেষ কালে যথেষ্ট রাগত ভঙ্গিতে নিজের মনেই এক ধরণের যুক্তি খাঁড়া করে অর্থনৈতিক-তত্ত্বের সাহায্যে তার ব্যাখ্যা করলাম: আমি তো আসলে রসায়ণ শাস্ত্রের লোক, গাঁয়ের এই স্কুলগুলোতে আমার যথেষ্ট চাহিদা আছে কিন্তু সে অনুপাতে যোগান নেই। সুতরাং আমার বাজার দর যদি কিছু চড়া হয় এবং সে কারণে সুপারের পোস্টটা যদি অনেককে ডিঙিয়ে আমার ভাগেই পড়ে, তাহলে এর মধ্যে অন্যায় বা অযৌক্তিক কি আছে! এটা আসলে আমারই প্রাপ্য। তা ছাড়া, আমি নতুন ঢুকেছি কাজে। ওপরওয়ালাদের কোনো কারণে চটিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে এখনই উচিত না। সপ্তাহে মোটে তিনদিন তো যাচ্ছি পড়াতে। যখন ভাল লাগবে না তখন না গেলেই বা ক্ষতি কি! সে তো আমার ইচ্ছের মধ্যেই!

পরের দিন সকালে টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছিল। ছাতা হাতে কুণ্ডুমশাইয়ের বাড়ি চললাম। শহরের শেষ দিকে নতুন হাসপাতালের কাছে বাড়ি। এতবড় আর এমন হাল-ফ্যাসানের বাড়ী এই শহরে আর একটাও নেই। সামনে-পিছনে সুন্দর সুদৃশ্য বাগান বাগানের পেছনে জীপ-ট্রাক ইত্যাদির জন্য টিনের শেড দেওয়া মস্ত বড় চৌহদ্দি:

তার পাশে কুণ্ডু ফার্মের অফিস ও পেট্রোল পাম্প। এই শহরের পয়লা নম্বরের কনট্রাক্টর কুণ্ডুবাবু। বাসরুটগুলোও তাঁর দখলে। ত্রিশখানা বাসের সঙ্গে শ'খানেক রিকসাও আছে। নিত্যানন্দ কুণ্ডু নিজে কোন রাজনীতি করেন না। সে দপ্তরটা তাঁর দাদা সত্যানন্দ কুণ্ডুর ভাগে। সত্যানন্দ এ অঞ্চলের ডাকসাঁইটে বক্তা, ধুরন্ধর রাজনীতিবিদ্। ও'দের এই ভরাডুবির বাজারেও সত্যানন্দ ডুবে যান নি, দু'পাশের কচুরি পানা প্রবল দুই হাতে সরিয়ে মাথাটা ভাসিয়ে রেখেছেন। প্রাণবন্ধু হোটেলের মালিক নগেন চাটুজ্যে বলেছেন, ইলেকশনে সত্যানন্দ নাকি লাখ দুই টাকা খরচ করেছিলেন। সে টাকা এসেছে কুণ্ডু ফার্ম থেকে। ফলে, নতুন হাসপাতালের বাড়তি অংশ এবং স্কুলের হোস্টেল-বিল্ডিংটা নাকি শুধু বালিতেই গাঁথা হচ্ছে! নিত্যানন্দবাবু সেক্রেটারি-হেতু স্কুলের কাজকর্মের কণ্ট্রাক্ট কুণ্ডু ফার্ম নিতে পারে না। তার কণ্ট্রাক্ট নিয়ে থাকেন শ্রীযুক্তা স্নেহলতা কুণ্ডু। শ্রীযুক্ত সত্যানন্দ কুণ্ডুর প্রথম পক্ষের স্ত্রী।

অবশ্য এসব বানানো কথাও হতে পারে। আমি নতুন এসেছি, ঠিক জানি না। গতকাল হেডমাস্টার-মশাই তো বললেন, কুণ্ডু-বাবুদের মতো মহৎপ্রাণ লোক আর হয় না। সত্যানন্দ যদি শিব, তবে নিত্যানন্দ বিশ্বকর্মা! একজন আত্মভোলা দেশসেবী, অন্যজন বিষয়নিষ্ঠ কর্মযোগী। এই শহরে দানের অন্ত নেই ও'দের। এই যে এতবড়ো স্কুলটা দেখছেন, সবজমিই ও'দের। ও'দের মায়ের নামেই স্কুলের নাম 'ভবতারিণী বহুমুখী বিদ্যালয়।' আর তাই তো সত্যানন্দ কখনো ইলেকশনে হারেন না। দেশের লোক তো আর অন্ধ না, সোনাপেতল চেনে! যাচ্ছেন তো ও-বাড়িতে! কাছে থেকে দেখবেন কেমন মানুষ—

টিপটিপ বৃষ্টির জন্য দরজা-জানালাগুলো অধিকাংশ বন্ধ ছিল। আমি সেই তিনতলা বাড়ীটার সর্বত্র দৃষ্টি ফেলেও কাউকে দেখতে পেলাম না। নীচের হলঘরের দরজাটা শুধু খোলা। ওপরে ওঠার সিঁড়ি দেখা যাচ্ছে। আমি বাগানের কাছে দাঁড়িয়ে গ্রীলের দরজাটায় হাত রাখলাম। একটু বুঝি শব্দ হ'ল। আর তৎক্ষণাৎ—

হ্যাঁ, বাঘের মতো বিশালাকার পাটল বর্ণের সেই কুকুরটা!

সিঁড়ির আশেপাশেই কোথাও ছিল। এক লাফে মোরামের রাস্তাটুকু পার হয়ে একেবারে দরজার সামনে। কটা-চোখে উদ্যত সন্দেহ, বর্শাফলকের মতো তীক্ষ্ণ দাঁতে ধারালো হুঁসিয়ারি, ছুঁচলো থাবার নখে আক্রমণের পূর্বাভাষ! কিন্তু শব্দমাত্র নেই। অসম্ভব নিঃশব্দে ঝাঁপিয়ে এসে গ্রীলের দরজায় দুই পা তুলে আমার প্রতি দৃষ্টি স্থির করল। আমি সভয়ে দু' পা পিছনে হটলাম। ভাগ্যিস দরজাটা খুলিনি!

এখন কুকুরটা নিঃশব্দে আমাকে দেখছে। আমি নিঃশব্দে কুকুরটাকে দেখছি। দু'জনেই অদ্ভুত রকমের স্থির ও শান্ত। টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। বাতাস-বাহিত জলকণায় আমার প্যান্ট শার্ট ভিজে উঠছে। ঘন পশমের মতো নরম পাটলবর্ণ লোম কুকুরটার, বৃষ্টির ছাঁটে আরও যেন ফুলে-ফেঁপে উঠেছে।

এই কুকুরটা আমাকে কখনো দেখেনি। এত পরিপুষ্ট, টলটলে, দৈর্ঘ্য-প্রস্থে মিল-টানা এমন ক্ষিপ্র চতুর শিকারি কুকুর আমিও আর কখনো দেখিনি।

আমার বাপ দাদা মামা কাকারা এ্যালসেশিয়ান দূরে থাক, নেড়ি কুত্তাও কেউ পোষে না। আমাদের সংসারের যা আয় তাতে বাড়ীর বাচ্চাগুলো সবসময়ই একবাটি মুড়ি কি একখণ্ড রুটির জন্য কুকুর ও বেড়ালছানার মত মা-মাসীদের পায়ে পায়ে ঘুর ঘুর করে। আর আমরা যারা বয়সে তেমন না বেড়েও মনে মনে অসম্ভব বড় ও বুদ্ধিমান হয়ে উঠেছি, খিদেটাকে পরিপাটি ভাঁজ করে নাইকুণ্ডলের চক্রে শুইয়ে রেখে নানা কাজের ধান্দায় ব্যস্ত থাকি। বাড়তি কুকুর বেড়াল পোষার কথা আমাদের মনেই পড়ে না।

একবার উঠোনে ফাঁদ পেতে একটা টিয়ে ধরেছিলাম। মাকে খাঁচার কথা বলতেই বাবা তেড়ে এলেন, 'কোথায় রাখবি শুনি! বাইরে রাখলে শেয়াল কুকুরে খাবে। ঘরে রাখলে হেগে-মুতে একশা করবে, ছেড়ে দে এক্ষুনি।'

টিয়েটা দু'দিন পরেই দড়ি কেটে পালিয়েছিল। কিন্তু বাবার আপত্তির কারণটা আমি বুঝেছিলাম আরো পরে। একমুঠো ছোলা কি ভাত, ওর পেছনে যা-ই খরচ হোক না কেন সেটুকুর ভার বইবার মতো ক্ষমতাও আমাদের সংসারের ছিল না। নেহাৎ ঘরের কাছে কলেজ আর ভাল ছেলে হিসাবে বাড়তি কিছু সুযোগ-সুবিধা পেয়েছিলাম, তাই অনার্স-ডিগ্রীটা কেড়ে আনতে পেরেছিলাম বিশ্ব-বিদ্যালয়ের খপ্পর থেকে। তা না হলে আমার তো মদন সা'র মুদির দোকানে খাতা লেখার কথা—

মফঃস্বলের ছেলে হলেও এ্যালসেসিয়ান আমি দু একটা দেখেছি। আমার কলেজের বন্ধু রবিদের বাড়িতে গায়ে পিঠে হাত বুলিয়ে পর্যন্ত দেখেছি। এমন বড় ছিল না সেটা। প্রকৃতিতেও শান্ত ছিল। আমি বলতাম 'দো-আঁশলা', তাতে রবির প্রেষ্টিজে লাগত। মুখ গম্ভীর করে বলত, 'তুই ত ভারি চিনিস! খাঁটি বাঘের রক্ত আছে টমির গায়ে! বাবা নিউ-মার্কেট থেকে কিনেছে। সত্তর টাকা দাম!'

শুনে আমি অবাক হতাম। একটা কুকুর-ছানার দাম সত্তর টাকা। অনার্সের অর্ধেক বই যে কেনা হয়ে যেত ওই টাকায়। কোন্ সে নিউ মার্কেট! কেমন তার চেহারা! আমি যখন পাশ করে চাকরি করব তখন একবার কলকাতায় নিউ-মার্কেট দেখতে যাব। সত্তর টাকা কি সোজা কথা! আমার বাবা সারা মাস খেটে মাইনে পায় যে মোটে দেড়শ টাকা—

কুণ্ডুবাবুর কুকুর এই সময় অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে থাবা দিয়ে গ্রীলের দরজা আঁচড়াল। ঘাড় গলা ঝাঁকিয়ে বৃষ্টির জল ঝাড়ল। আমার দিকে একলক্ষ্যে তাকিয়ে মৃদু শব্দ করল, গরর্ গরর্…। চোখে সন্দেহ স্থির অকম্পিত বক্ররেখায় ঝুলে রইল।

তা থাকুক। আমি কিছু কুণ্ডুবাড়ির জামাই না যে এ-বাড়ির মেয়ের গন্ধ গায়ে লেগে আছে বলে সেই ঘ্রাণে ও আমাকে চিনে নেবে! বরং মনে মনে আমি ওর প্রভুভক্তির তারিফ করলাম।

কিন্তু এভাবে, মধ্যবর্তী-দরজার দুই প্রান্তে দুইজন, একজন মানুষ ও একটা কুকুর, কতক্ষণ নির্বাক দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। আশে পাশে তাকিয়ে কাউকে দেখতে পেলাম না। ছ'টা বেজে দশ। কুণ্ডুবাড়ি কি নতুন বর্ষার জল পেয়ে সেকেণ্ড রাউণ্ড ঘুম দিল! ছাত্রের নাম ধরে চিৎকার করাটা নিশ্চয়ই সৌজন্য-বিরোধী হবে, আর 'কুণ্ডুবাবু' বলে হাঁকলে চাকরি যাওয়া বিচিত্র নয়! আমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ অসহায় ভঙ্গিতে চারদিকে তাকালাম! এ বাড়ীর চাকর-দারোয়ানেরা গেল কোথায়!

আর তখুনি মনে হ'ল, এই কুকুরটা যদি জোরে চেঁচায় তাহলে কাজ হবে। সুতরাং সে চেষ্টাই করা যাক। দু'পা পিছিয়ে গিয়ে দরজা সহ সংলগ্ন পাঁচিলের উচ্চতা পরীক্ষা করলাম। লাফিয়ে আসার ভয় নেই দেখে মুখটা বিকৃত করে জিভ বের করলাম এবং ছাতাটা বাড়িয়ে ওর নাকের ডগায় বার কয়েক দুলিয়ে দিয়ে চোখ পাকিয়ে শব্দ করলাম, হোই হোই হুস্ হুস্……

সঙ্গে সঙ্গেই ফল ফলল। চোখ মুখ রক্তাভ হিংস্র করে কুকুরটা প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়ল, ঘেঁউ ঘেঁউ ঘেঁউ—ওর সারা শরীর টান টান সোজা হয়ে গেল। দু'পা দিয়ে গ্রীলের দরজা আঁচড়াতে লাগল, লাফিয়ে ওপরে উঠতে চাইল। মনে হ'ল, এই মুহূর্তে আমি যদি ওর নাগালের মধ্যে থাকতাম তাহলে ও নির্ঘাৎ আমার টুঁটি চেপে ধরে মাংস ছিঁড়ে নিত। কুণ্ডুবাড়িতে পা দিতে না দিতেই কি সাংঘাতিক অভ্যর্থনারে বাবা!

পরের ব্যাপারটাও হিসেবমতই ঘটল। টাইগারের বাড়ি-কাঁপানো চিৎকারে আকৃষ্ট হয়ে দোতলার পর্দা সরিয়ে একটি নারী-মুখ উঁকি দিয়ে অদৃশ্য হ'ল। তিনতলার ঝুল-বারান্দা থেকে ঝাড়ন হাতে একটা লোক গলা বাড়িয়ে ডাকল, 'টাইগার, এই টাইগার!' আর নীচের বাগান-অংশের কোনো অদৃশ্য স্থান থেকে একটা কালো ঢ্যাঙা লোক চকিতে বেরিয়ে হন হন করে এগিয়ে এল। টাইগার সমানে চিৎকার করতে লাগল। এই লোকটা এসেই টাইগারের

গলার বেল্ট শক্ত করে টেনে ধরে ধমকাল, 'এই শালো। চুপ যা, চুপ যা। এত চিঁচাইছিস কেনে। ঘরে কি ডাকাত ঢুইকল, এঁ্যা?'

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে, 'ভিতরে আসবেন বাবু? তবে টুকচি অপিখ্যে করুন। ইয়াকে বেঁধে আসি। ভারি হারামি কুকুর বাবু—'

সেই কার্তিক, এক হাতে গাছ কাটার প্রকাণ্ড কাঁচি, অন্য হাতে কুকুরটার বেল্ট ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল বারান্দায়। কুকুরটা যেতে যেতেও বার বার ঘুরে আমাকে দেখল আর চাপা রাগে শব্দ করল, গরর্ গরর্—ঘ্যাঁক। ওকে শেকলে বেঁধে কার্তিক দরজা খুলে দিল। ততক্ষণে আমার ছাত্রটিও দোতলার বারান্দায় উঁকি দিয়েছে। সে বলল, 'স্যরকে ওপরে নিয়ে আয় কার্তিক।'

সিঁড়িতে পা রাখার সময় কুকুরটা আবার চেঁচাল, মেঝে খামচাল এবং একলক্ষ্যে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল।

আমি চেয়ারে বসতে বসতে বললাম, 'কি সাংঘাতিক কুকুর তোমাদের!'

সুবোধ সরু করে হাসল। বেবিফুডের বিজ্ঞাপনে যে-সব টলটলে হৃষ্টপুষ্ট বাচ্চাদের ছবি দেখা যায়, তারই কিছু বড় সংস্করণ ও। হাসলে গালের মাংসে ভাঁজ পড়ে, চোখ দুটো ছোট হয়ে আসে। বলল, 'হ্যাঁ স্যর, খাঁটি আমেরিকান কুকুর যে!'

খাঁটি আমেরিকান কুকুর বলতে কি বোঝায় আমি বোকার মতো জানতে চাইলাম। পড়াশুনা সেদিন বিশেষ জমল না। সুবোধ খুব গম্ভীর ভাবে আমাকে কুকুর-বিষয়ে জ্ঞান দিল। বছর পাঁচেক আগে সত্যানন্দ কুণ্ডুর সঙ্গে যোগাযোগ করে কয়েকজন আমেরিকান সাহেব এসেছিলেন এই অঞ্চলে। কুণ্ডুবাড়ীতেই উঠেছিলেন ওঁরা। ডুমকার ঘন শালবনকে কেন্দ্র করে একটা কাঠের ব্যবসা শুরু করার ইচ্ছে ওঁদের। ওঁদের গাড়ীতেই ছিল টাইগারের মা ও বাবা। কোলকাতা হয়ে দিল্লীতে ফিরে যাবার কিছুদিন পর ভারতের খাস রাজধানীতে

টাইগারের জন্ম। লোকসভার মাননীয় সদস্য সত্যানন্দ কুণ্ডু প্লেন যোগে টাইগারকে কোলকাতায় আনেন। সেখান থেকে নিজস্ব গাড়ী যোগে এ বাড়িতে। টাইগারের অন্য ভাই-বোনেরা দিল্লীতেই রথী মহারথীদের ঘরে আশ্রয় পেয়েছে। সুবোধ দু'একটা নামও বলল। আলমারি খুলে একটা এ্যালবাম্ বের করে টাইগারের শৈশব থেকে সাম্প্রতিক অবস্থার ধারাবাহিক ছবি দেখাল। সব ওর নিজের ক্যামেরায় তোলা। ছবি তুলতে খুব ভালবাসে ও।

আমি একসময় শুকনো গলায় বললাম, 'ওকে বেঁধে রাখ না কেন?'

সুবোধ বলল, 'সারাদিন তো বাঁধাই থাকে স্যর। রাত্রে খুলে দিই, বাড়ি পাহারা দেয়।'

সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় আমি আবার টাইগারকে দেখলাম। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে বিশাল শরীরটা এলিয়ে রাজকীয় ভঙ্গিতে শুয়ে আছে। হ্যাঁ, নির্ভেজাল আমেরিকানই বটে! এ দেশের মাটিতে এমন চেহারা এমন তেজ হয় না। কুণ্ডুবাড়ীর বিপুল সম্পদ রাতভর জেগে পাহারা দেবার পক্ষে ও একাই যথেষ্ট। সুবোধ আসছিল সঙ্গে। বলল, 'ওর চোখ দেখেছেন স্যর, মেমসাহেবের মতো নীল। অন্ধকারে বাঘের মতো জ্বলে!'

আমার পায়ের শব্দে মুখ তুলে তাকাল টাইগার। আর সঙ্গে সঙ্গে ওর ঘাড়ের লোম ফুলে উঠল, কটাচোখ রাগে বড় হ'ল, থাবার নখে মেঝে আঁচড়ে চাপা ক্রুদ্ধগলায় চেঁচাল, ঘেউঁ ঘেউঁ ঘাঁ ক!

সুবোধ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ধমকাল, 'এই টা-ই-গা-র!'

আমি সন্তর্পণে লাফিয়ে বারান্দা পার হয়ে লনে নামলাম।

তারপর থেকে কি যে হ'ল, টাইগারের সঙ্গে আমার, কাগুজে ভাষায় যাকে বলে 'ঠাণ্ডা যুদ্ধ', তাই শুরু হয়ে গেল। অথচ এমনটি হওয়া উচিত ছিল না। কেননা শ্রীযুক্ত টাইগার কুণ্ডুবাড়ীর সম্পত্তি রক্ষক এবং খাঁটি আমেরিকান বংশসম্ভূত, আর আমি অখ্যাত গ্রাম-বাংলার এক কনিষ্ঠ করণিকের সন্তান এবং কুণ্ডুবাবুর স্কুলের জুনিয়র-

মোস্ট মাস্টার। আসলে সূক্ষ্ম বিচারে টাইগারের সঙ্গে আমার তো অনেকটা প্রভুভৃত্যের সম্পর্ক। সে হিসেবে আমি ওকে মান্য করব এবং ও আমাকে করুণাপূর্বক অবজ্ঞা করবে, এইরকম হওয়াই উচিত ছিল।

কিন্তু টাইগার আমাকে সহ্য করতে রাজী হ'ল না। আর আমিও ওকে তেমন মান্য করতে পারলাম না। সেই প্রথমদিন যেভাবে আমার প্রতি ঝাঁপিয়ে এসেছিল তাতে আমি হয়ত দারুণ ভয় পেয়েছিলাম সেই ভয় থেকে ক্রমে রাগ ও বিতৃষ্ণা জন্ম নিল। আর সেই প্রথম দিন আমি ওকে দাঁত-মুখ ভেংচে ছাতার ডগা দিয়ে উত্যক্ত করেছিলাম, সে কারণেই কিনা কে জানে, ও আমাকে দেখামাত্রই ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতে লাগল।

সকাল বেলায় বাগানের দরজার কাছে এসে দাঁড়ানো মাত্র ঠিক টের পেয়ে যায়। আর তৎক্ষণাৎ টান টান সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যায় টাইগার। মুখচোখের শান্তভাব মুহূর্তে ধারালো হিংস্র হয়ে ওঠে। সামনের দু'পা দিয়ে বারান্দার মেঝে আঁচড়ে চেঁচিয়ে ওঠে, ঘেঁউ ঘেঁউ ঘেঁউ উঁ—

সেই ভয়ঙ্কর গলা শুনে আমার বুকের ভেতরটা দুর দুর করে। রক্তের ভিতর এক ধরনের লাফালাফি শুরু হয়ে যায়। মাথার ভিতর ঝিম ঝিম করে। নিজেকে খুব আহত, অপমানিত বলে মনে হয়। কিন্তু একই সঙ্গে স্নায়ুগুলো সজাগ ও সতর্ক হয়ে ওঠে। চোখের দৃষ্টি প্রখর ও চোয়াল শক্ত হয়। ইচ্ছে করে, ছুটে গিয়ে কুকুরটার মুখ দু'হাতে চেপে ধরি, তারপর একটা আঙুল ছুরির মতো ঢুকিয়ে দিই ওর চোখে। ও কি ভাবে আমাকে!

মাঝে মাঝে টাইগার এত ছটফট করে যে আমার ভয় হয়, ও এক্ষুনি শেকলটা ছিঁড়ে ফেলবে। আমি ভয়ে ভয়ে ডাকি, 'কার্তিক, এই কার্তিক!'

বাগানের কাজ ফেলে ছুটে আসে কার্তিক। হাসতে থাকে, 'ডর

নাই মাস্টরবাবু। সিধা ওপরে চলে যান।' শেকলটা ও টেনে ধরে থাকে, আমি তাড়া-খাওয়া একটা খরগোশের মতো দ্রুত ওপরে উঠে যাই।

একদিন কার্তিক বলল, 'চেনা হয়ে গেলে টাইগার তো এমুন করে না বাবু। আপনাকে দেখলে এত কেনে ক্ষেপে যায়!'

আমি বলি, 'চোর ডাকাত ভাবে নিশ্চয়।'

'কি যে বলেন আজ্ঞে!' কার্তিক হাসে। ওর নীচের মাড়িতে অনেকগুলো দাঁত নেই। হাসলে আরো বুড়ো দেখায়।

সুবোধও বলল একদিন, 'টাইগারের সঙ্গে দেখছি আপনার এখনও ভাব হয়নি স্যর!'

আমি বললাম, 'হওয়া মুস্কিল! আমার মতো কালো চামড়ার মানুষ ওর বোধ হয় পছন্দ না!'

'তা কেন!' কুকুরের হয়ে সওয়াল করল সুবোধ, 'কার্তিক জগুয়ারা ত আরো কালো। ওদের সঙ্গে কেমন সুন্দর ব্যবহার করে!'

'কি জানি! তা হলে হয়ত অন্যকিছু ভাবে।'

একদিন সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় দেখলাম মস্ত বড় একটা গামলায় দুধ খেতে দেওয়া হয়েছে ওকে। সের দুই হবে। যুঁই ফুলের মতো সাদা ঘন টলটলে দুধ। সঙ্গে ক'টা রুটি, কার্তিক ছিঁড়ে ছিঁড়ে দিচ্ছে। আমাকে দেখে টাইগার যথারীতি ক্রুদ্ধ ভ্রূকুটি করল। জোরে চেঁচাল না। বোধ হয় সম্মুখে খাদ্য ও কার্তিক উপস্থিত বলে। একগামলা দুধ দেখে অবাক হয়ে বলে ফেললাম, 'বাবাঃ, এত দুধ!'

কার্তিক মুখ তুলে বলল, 'এত কুথায় গো মাস্টরবাবু! ই-শালো আরো খেতে পারে।'

'শুধু দুধ খায়? মাংস খায় না?'

সুবোধ রোজই খানিকটা নেমে আসে। ও বলল, 'এখন গরম পড়ে গেছে বলে রোজ মাংস দিই না স্যর। গায়ে পোকা হবে। লোম নষ্ট হয়ে যাবে।'

সারাটা পথ আমি যুঁই ফুলের মতো সাদা ঘন টলটলে এক গামলা দুধের কথা ভাবতে ভাবতে হোটেলে ফিরলাম। আমার ছোট ভাই বোনগুলোর কথা মনে পড়ল। আমার বুড়ী ঠাকুমার মুখটা চোখে ভাসল। ফাইন্যান্স পরীক্ষার সময় বেশীক্ষণ বই খুলে রাখলে আমার মাথা ধরত বলে একজন অধ্যাপক আমাকে এক গ্লাস দুধ কি হরলিকস খেতে বলেছিলেন। আমি লজ্জায় বাবাকে বলতে পারিনি—সে কথা মনে পড়ল। দু'বেলা চায়ের জন্য আধসের দুধ বরাদ্দ ছিল। ছোট বোন বিনি একদিন পায়েস খেতে চেয়েছিল বলে মা আরো আধ সের নিয়েছিল। বাবা শুনে বলল, 'এই মাসে পনেরো টাকা প্রিমিয়ম দিতে হবে, আর তুমি কিনা রাজ্যের বাড়তি খরচ জুটিয়ে বসে আছ! কবে যে বুদ্ধি হবে তোমার।' আমি সেদিন দেখেছি, আমার রোগা মায়ের হলুদ চোখে জল টলটল করছিল।

এই ঘটনার পর থেকে টাইগার আমার কাছে আরো অপ্রিয় ও অসহ্য হ'ল। অনেক চেষ্টা করেও আমি মনটাকে কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না যে, আসলে ও একটা কুকুর, আমি মানুষ। এই সামান্য দুধটুকু নিয়ে আমার উচিত না ওকে ঈর্ষা করা। ও সারারাত জেগে কুণ্ডুবাড়ীর বিপুল সম্পদ পাহারা দেয়। ওকে পরিমাণমত আহার-টুকু না দিলে চলবে কেন? এ-টুকু তো ওর ন্যায্য পাওনা। এ নিয়ে একটা ইতর প্রাণীকে ঈর্ষা করা আমার শোভা পায় না।

কিন্তু পরের দিন টাইগারের মুখের সামনে আবার যেই দুধের গামলা দেখলাম অমনি আমার রোগা মায়ের হলুদ চোখে জলের ধারা টলটলিয়ে উঠল। এরপর অভ্যাসমত কুকুরটা যখন আমার দিকে তাকিয়ে রাগে গর্‌গর্‌-গাঁক্ করল, আমিও তৎক্ষণাৎ থমকে দাঁড়িয়ে চাপা-গলায় ধমকে উঠলাম, 'এই-ও!' তাতে কুকুরটা আরো রেগে বাঁধা অবস্থাতেই ঘাঁ-ক করে এমন ঝাঁপ দিল যে আমি ভয়ে দেয়ালে সেঁটে গেলাম। খানিকটা দুধ উল্টে দিয়ে ভয়ঙ্কর মুখে ছটফট করে চেঁচাতে লাগল। কার্তিক ওর গলার বেল্ট ধরে টেনে রাখতে পারছে

না, এমন রাগ ! সুবোধ তাড়াতাড়ি নেমে এসে কান টেনে ধরে ওকে ঠাণ্ডা করার চেষ্টা করল।

এ নিয়ে কার্তিকের কাছে আমাকে কিছু অনুযোগ শুনতে হল। সুবোধও বলল পরের দিন, 'টাইগারকে কিছু বলবেন না স্যর। ভীষণ রেগে যায়।'

উত্তপ্ত হয়ে বললাম, 'আমি কিছু বলিনি।'

সুবোধ বলল, 'কেউ কড়া চোখে তাকালেও ও রাগ করে।'

আমি বললাম, 'টাইগার থাক। তুমি অঙ্ক কর।'

কিন্তু কুণ্ডুনন্দনের পড়াশুনায় তেমন মন নেই। আমিও ওর প্রতি তেমন যত্নবান নই। ফলে অঙ্ক করার ফাঁকে ফাঁকে ও যথা-রীতি টাইগারের কথা বলতে লাগল। আমি অপ্রসন্ন বিরস মুখে চেয়ারে গা এলিয়ে বসে রইলাম।

যেমন রাগ, তেমনি অসাধারণ বুদ্ধি ও স্মৃতিশক্তি। জ্যেঠু অর্থাৎ সত্যানন্দ কুণ্ডু নিজে ট্রেনিং দিয়ে সব শিখিয়েছেন টাইগারকে। তিনি চোখের ইশারা করলেই টাইগার সব বুঝতে পারে। একবার এই বাড়ীর এক ঝি ঝাঁ ঝাঁ দুপুরে কোঁচড়ে কিছু চাল বেঁধে সরে পড়ছিল। এ অঞ্চলে তখন চাল আক্রা। দর চারটাকা পর্যন্ত উঠেছে। ঝি-টা ভেবেছিল, কেউ টের পায় নি। কিন্তু ঠাকুর ঠিক দেখেছিল। সে এসে বললে ছোট জেঠিমণিকে। ছোট জেঠিমণি বলল বড়মাকে। বড়মা জ্যেঠুকে খবর দিলেন। জ্যেঠু কাউকে কিছু না বলে টাইগারকে ডেকে পাঠালেন।

তারপর টাইগার ছুটল। ঝি-টা তখন বাড়ির পেছন দিককার দরজা খুলে ফেলেছে। টাইগার নিঃশব্দে গিয়ে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। না, কামড়াল না। শুধু দাঁত আর নখ দিয়ে আঁচড়ে পরনের কাপড়টা কুটিকুটি করে ছিঁড়ে দিল। চালগুলো গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। ঝি-টা ডুকরে উঠে হাঁটু ভাঁজ করে মাটিতে বসে পড়ল। সঙ্গে ছিল ওর ছেলেটা। সে ভয়ে প্রাণপণে চেঁচাতে লাগল। জ্যেঠুরা না আসা পর্যন্ত টাইগার থাবা উঁচিয়ে ওকে পাহারা দিতে লাগল।

ছেলেটাকেও এক পা নড়তে দিল না। বাবা সব দেখে শুনে আর মারধোর করলেন না। শুধু কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিলেন। জাগুয়ার বৌ তাড়াতাড়ি একটা তেলচিটে বিছানার চাদর এনে দিল। সেইটে পরে তবে ও বাড়ি গেল।

'দাঁড়ান স্যর, আমি আপনাকে ছবি দেখাচ্ছি।'

খুব উদ্দীপ্ত ভঙ্গিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল সুবোধ। আলমারি খুলে একটা লম্বা খাম বের করল। তারপর ফিরে এসে বলল, 'এর মধ্যে আছে স্যর। আমি নিজে তুলেছি। এখনো এ্যালবামে সাজানো হয়নি—'

সবই প্রায় টাইগারের ছবি। নানা সময়ের, নানা ভঙ্গির। তার মধ্যে থেকে একটা তুলে আমাকে দেখতে দিল। দেখলাম, একটা কম বয়েসী মেয়েমানুষ দু'হাতে মুখ ঢেকে হাঁটু ভাঁজ করে বসে আছে। তার চারদিকে ছড়ানো চাল, ছেঁড়া কাপড়ের টুকরো, নানা মানুষের ভিড়। ঝি-টা একেবারে উলঙ্গ, দু'হাতের ফাঁক দিয়ে কালো স্তনের ড্যালা পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। টাইগার ওর ঘাড়ের বাঁ পাশে ছুঁচলো মুখটা ঠেকিয়ে চুপ করে বসে আছে। তার পাশেই ধূলোবালি মাখা একটা বাচ্চা ছেলে, ভয়ে আতঙ্কে কচি মুখটা নীল, মায়ের ঘাড়ের চুল শক্ত করে ধরে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। ডান দিকে সত্যানন্দ আঙুল উঁচিয়ে নিত্যানন্দ কুণ্ডুকে কি যেন বলছেন।

দেখতে দেখতে আমার মনে হ'ল এই ঝি-টাকে আমি চিনি। যেন কোথায় দেখেছি! তারপরই মনে পড়ল, হ্যাঁ, এর নাম বিমলি। এই ছেলেটার নাম ভূতনাথ। বিমলি আমাদের প্রাণবন্ধু হোটেলে বাসন মাজে। ভূতনাথ টেবিল সাফ করে। চায়ের গ্লাস ধোয়। এখান থেকে চাকরি যাওয়ায় প্রাণবন্ধু হোটেলে কাজ নিয়েছে ওরা। নগেন চাটুজ্জে একদিন যেন বলেছিল ওদের কথা।

এইসময় আরো একটা ছবি টেনে বার করল সুবোধ, 'এইটে দেখুন স্যর। পুলিসের কুকুরের মত টাইগার কেমন চোর খুঁজে বার করছে—'

দেখলাম ওপরের কোনো টানা-বারান্দায় লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ঠাকুর চাকরেরা এ পাশে কুণ্ডুবাবুরা দুই ভাই সহ ডজন খানেক অভিজাত মহিলা। টাইগার নীচু হয়ে একজনের পা শুঁকছে।

সুবোধের নাকি একটা পকেট-সাইজ ট্রানজিস্টার ছিল। 'সুখদাস গজানন রাইস মিলে'র মালিক নাথুরাম জন্মদিনে প্রেজেণ্ট করেছিল সুবোধকে। খাঁটি জাপানী জিনিস। চমৎকার সাউণ্ড। পাঁচশো টাকার ওপর দাম।

একদিন চুরি হয়ে গেল।

সারা বাড়ি তোলপাড় করেও খুঁজে পাওয়া গেল না যখন, তখন জ্যেঠুর পরামর্শে ঠাকুর চাকরদের লাইন করে দাঁড় করানো হ'ল। তারপর টাইগারকে ছেড়ে দিয়ে পুলিশি-কায়দায় হুকুম হ'ল, 'কে নিয়েছে বার কর!'

টাইগার প্রথমে কুঁই কুঁই করে নিত্যানন্দ কুণ্ডুর পা চাটল। ধমক খেয়ে গেল ছোট পিসীর কাছে। আবার ধমক দিতেই বাবুলালের কাছে এসে বার দুই ঘেঁউ ঘেঁউ করে পা শুঁকতে লাগল। বাবুলালের ছোকরা বয়স। পাজামা গেঞ্জিটা একটু ফর্সা রাখে এবং চুলে তেলটেল দেয় বলে ওকে একটু সৌখিন দেখায়। সত্যানন্দ কুণ্ডু হুংকার দিয়ে বললেন, 'তুই ঠিক ধরেছিস টাইগার। এই হারামজাদাই সরিয়েছে—'

তারপর বাবুলালের ঠোঁটের কস বেয়ে রক্ত গড়াল। বাঁ দিকের চোখটা ফুলে উঠল। নিত্যানন্দ কুণ্ডু এত জোরে হাতটা মুচড়ে ধরলেন যে সুবোধের বড়মা অর্থাৎ সত্যানন্দের প্রথমা স্ত্রী বলে উঠলেন, 'আহা, ঠাকুরপো ছেড়ে দাও। ভেঙ্গে যাবে যে!'

জ্যেঠু একসময় বন্দুকটা এনে বুকে ঠেকিয়ে বললেন, 'এবার বল রাস্কেল।'

বাবুলাল তখন প্রায় চেতনাহীন। তবু জ্বর বিকারের মত বিড়-বিড় করে বলল, 'বিশ্বাস করুন বাবু, আমি নিই নি।'

অগত্যা বাবুলালকে পুলিশেই দিতে হ'ল।

সুবোধ বলল, 'এখন ও ছাড়া পেয়েছে স্যর। রিক্সা চালায়। আমাদের বাড়ীর কাছ দিয়ে গেলে টাইগার এখনও চেঁচায়! কেমন মনে রাখে ও!'

আমার মাথা ঝিমঝিম করছিল। চোখের দৃষ্টি ঘোলাটে হয়ে আসছিল। ছবিগুলো আমি আর স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম না। মনে হচ্ছিল আমি কোনো হালকা গোলাপী রঙের ডিসটেম্পার-করা ঘরে বসে নেই, যেন একটা ঘন অরণ্যের মধ্যে ঢুকে পড়েছি। সেখানে সারিবদ্ধ নিষ্কম্পগাছের পত্রেপল্লবে অন্ধকার স্থির হয়ে আছে। আর একটা বিশালকায় হিংস্র প্রাণীর দুই নীলবর্ণ চক্ষু থেকে আগুনের ফুলকি ছিটকে পড়ছে। জন্তুটা একলক্ষ্যে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে!

আমি জড়ানো গলায় বললাম, 'টাইগার ত আমাকে দেখলেও ছটফট করে। চেঁচায়।'

মাংসল গালে দুশ্চিন্তার ভাঁজ ফেলে সুবোধ হাসল, 'হ্যাঁ, স্যর। কি করা যায় বলুন ত? আপনি আজ ওর গায়ে হাত বুলিয়ে একটু আদর করবেন—'

আমি ওকে খুন করব। হ্যাঁ, কুণ্ডুবাড়ীর সম্পত্তিরক্ষক ওই এ্যালসেসিয়ানটাকে। শালা কিনা আমাকে সন্দেহ করে! আমি কি একটা চোর-চোট্টা, না বদমাস? আমি কি ফর্সা জামাকাপড়ের আড়ালে ছোরা কি গুপ্তি লুকিয়ে এ-বাড়ীতে ঢুকি। অথবা বেরিয়ে আসার সময় সুবোধের সুদৃশ্য কলম হাতঘড়ি কি আঙুল থেকে খুলে-রাখা মুক্তাবসানো আংটিটা হাতিয়ে নিয়ে আসি। তবে আমাকে দেখে এমন মাটি খামচানো, মেঝে আঁচড়ানো, কুঁই কুঁই গাঁক গাঁক করা কেন! একদিন সুযোগ বুঝে এমন লাথি ঝাড়ব মুখে, চোয়াল ভেঙ্গে দুধ-খাওয়া জন্মের মত বন্ধ হয়ে যাবে!

এর পরের দিন টাইগার আবার যে-ই ঘেঁউ ঘেঁউ শুরু করল, আমি স্থির দৃষ্টিতে তাকালাম ওর চোখের দিকে।

ওর কটা-চোখ রাগে বড় বড় হ'ল। ঠোঁটের কালো-অংশ কাঁপতে লাগল। আমিও হাত মুষ্টিবদ্ধ ও চোয়াল শক্ত করলাম। লেজ নাড়িয়ে থাবাদুটো ও সামনের দিকে একটু বাড়িয়ে দিল। আমি টান টান সোজা হয়ে একটা বর্শা ফলকের মত দাঁড়ালাম। এ যেন উভয় পক্ষের আক্রমণ শুরু হওয়ার আগের স্তব্ধ শীতল মুহূর্ত !

কার্তিক অবাক হয়ে বলল, 'মাস্টারবাবু, ওপরে যান আজ্ঞে—'

দোতলা থেকে সুবোধ ডাকল, 'চলে আসুন স্যর। কার্তিক টাইগারকে ধরে রাখবে।'

আমি দেখলাম, টাইগারের চোখ ক্রমশ গণগণে আগুন হয়ে উঠছে। ওর পিঠের শিরদাঁড়া সামান্য বেঁকে গেছে। ঠোঁটের ফাঁকে ধারালো দাঁত। লেজটা প্রবল বেগে নড়ছে। গলায় অদ্ভুত এক-ধরনের গোঁ গোঁ গাঁক গাঁক শব্দ !

কার্তিক তাড়াতাড়ি এসে শেকল টেনে ধরল, 'টাইগার খুব রেগে গেছে বাবু। তাড়াতাড়ি উঠে যান।'

ততক্ষণে আমার সাহসও ফুরিয়েছে। হাত পা ঘামতে শুরু করেছে। বুকের ভিতর ভয়ের ধড়ফড়ানি। থাকলই বা শেকলে বাঁধা, ছিঁড়তে কতক্ষণ ! তাহলে একা কার্তিক কি ওকে সামলাতে পারবে ? তৎক্ষণাৎ মুখের ভাব নরম করে লাফিয়ে সিঁড়িতে উঠলাম। টাইগার হুঙ্কার দিয়ে উঠল, ঘেঁউ-ঘেঁউ-ঘাঁ-ক। আমি একসঙ্গে তিনটে সিঁড়ি ডিঙিয়ে গেলাম !

কার্তিক হেসে ফেলল। সুবোধও হাসল, 'না, কুকুরটাকে দেখছি সরিয়ে বাঁধতে হবে !'

ওদের হাসিতে আমার রক্তে জ্বালা ধরে গেল। আমাকে কি পেয়েছে টাইগার ! আমি কি একটা কাঠের বল, শালিক চড়ুই কি গঙ্গাফড়িং যে প্রতিদিন আমাকে নিয়ে ও খেলা শুরু করেছে ! আমার সায়েন্স ল্যাবরেটরিতে অনেক বিষ আছে—একদিন আমি ওকে খুন করব।

তারপর সেই ঘটনাটা ঘটল।

তখন শীতকাল। ছ'টা বাজলেও কুয়াশার চাদর ওঠে না। চারদিকে ঘোলাটে অন্ধকার ছড়িয়ে থাকে। কুণ্ডুবাড়ির কেউই ঘুম থেকে ওঠে না। আমি গিয়ে সুবোধকে বিছানা থেকে ডেকে তুলি। ও হাত মুখ ধুতে যায়। আমি দোতলার ঝুল-বারান্দায় দাঁড়িয়ে বাগানের কাজ দেখতে দেখতে ভাবি, আর না, পড়ানো আমি ছেড়ে দেব। আমি কি কুণ্ডু-বাড়ির চাকর নাকি যে, সুবোধকে বিছানা থেকে তুলে আমাকে পড়াতে হবে। এত অসভ্য, অভদ্র কেন ও। বিনে পয়সায় যে পড়ে, গরজটা তো তারই হওয়ার কথা।

কিন্তু ছাড়া হয় না। কেন না চাকরির নিরাপত্তা। কেন না হোস্টেলটা তৈরি হয়ে গেছে, এই মাসেই চালু হবে আমি বিরস বিরক্ত মুখে ওপর থেকে টাইগারকে লক্ষ্য করি। নীচে থেকে মুখ তুলে ও চেঁচায়। বাগানের মাটি খুঁড়তে খুঁড়তে কার্তিক ওকে ধমকায়।

একদিন এসে দেখি কুণ্ডুবাড়ির সবাই জেগে গেছে। তিনতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে সত্যানন্দ, তাঁর পাশে দুই স্ত্রী, এক গণ্ডা ছেলে মেয়ে। চারতলায় সস্ত্রীক নিত্যানন্দ। দোতলায় সুবোধ, সুবোধের এক পিসী, জামাইবাবু। ঠাকুর চাকরেরা নীচের বাগানে ভিড় করে আছে। দেয়াল ঘেঁষে জানলার কিছু ভাঙ্গা কাঁচ, কিছু ইটের টুকরো। কার্তিক এক গামলা জলে তুলো ডুবিয়ে টাইগারের থাবা, ঠোঁট ও দাঁত ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে দিচ্ছে। তুলোটা রক্তে লাল হয়ে উঠতে ফেলে দিয়ে অন্য তুলো নিচ্ছে। ডেটল জাতীয় একপ্রকার ওষুধের গন্ধ বেরুচ্ছে।

আমাকে দেখে টাইগার গাঁক গাঁক শুরু করতেই ওপর থেকে নিত্যানন্দ কুণ্ডু খুব জোরে এক ধমক দিলেন। তাতে ও চুপ করে গেল।

ভাবলাম, টাইগারের কোথাও কেটেকুটে গিয়েছে।

কিন্তু তা না। টাইগারই অন্যদের কেটেকুটে এসেছে।

পড়ার ঘরে সুবোধ বিস্তারিত রিপোর্ট দিল। কিছুদিন থেকে ছোটজাতের ক'টা দুরন্ত ছেলে ফুল চুরির চেষ্টায় আছে। প্রায়ই বাগানের আশে পাশে ঘুর ঘুর করে। কাঁটাতারের বেড়া সরিয়ে ঢুকতে চায়। কিন্তু টাইগারের জন্য সাহস পায় না। ওদের দেখলেই টাইগার চেঁচাতে থাকে। বেড়ার ধার পর্যন্ত ঝাঁপিয়ে যায়। সেই রাগে ওরা এখন রাস্তা থেকে পাথর ছুঁড়ে মারে। সেদিন একটা পাথর লেগে বারান্দার বাল্ব্‌টা ভেঙ্গে গেছে। আজ দুটো জানালার কাঁচ। বাবা খুব রেগে গিয়ে আজ বন্দুক নিয়ে তৈরী হয়েছিলেন। কিন্তু জ্যাঠু বন্দুকের ছররাগুলির পরিবর্তে কুকুর ব্যবহারের পরামর্শ দিয়েছেন। গুলিগোলার ঝামেলা অনেক। লোকেই বা কি বলবে! কুকুরে দোষ নেই। ও ত জন্তু জানোয়ার। কি করতে কি করে বসে তার আবার হিসেব কি!

গেট খুলে রেখে কুকুর নিয়ে বসেছিলেন দুই ভাই।

ছেলে ক'টা টের পায় নি। একটা পাথর ছুঁড়ে মারার সঙ্গে সঙ্গে টাইগারকে লেলিয়ে দিলেন সত্যানন্দ কুণ্ডু। নিত্যানন্দ কুণ্ডু বারান্দায় দাঁড়িয়ে উৎসাহ দিলেন।

ছেলেগুলো প্রাণের ভয়ে দৌড়ুচ্ছে। টাইগার পেছন পেছন। ছেলেগুলোর চিৎকারে আকাশ ফাটছে, কিন্তু টাইগার নিঃশব্দ। ক'হাত যেতে না যেতেই লাফ দিয়ে পড়ল একজনের ঘাড়ে। হাতের ডানা কামড়াল, ঘাড় ও পেটের মাংসে থাবা বসাল। শব্দ করে চাপা উল্লাসে গোঙাল।

সেই ছেলেটাই নাকি দলপতি! বাকি ক'টা পালিয়ে গেছে। ও জখম হয়েছে খুব। বাবা তখুনি ডেকে না নিলে ওকে মেরেই ফেলত! সে কি ভীষণ চেহারা তখন টাইগারের। আপনি যদি দেখতেন স্যর! আকাশে আলো ছিল না বলে আমি ছবি তুলতে পারলাম না—

সুবোধ বলছিল। উত্তেজনায় রোমাঞ্চে ওর চোখ জ্বল জ্বল করছিল। ওর মাংসল মুখের প্রতিটি ভাঁজে অদ্ভুত এক হিংস্রতা

খেলা করছিল। আর আমি দেখছিলাম—টাইগারের থাবায় রক্ত, দাঁতে রক্ত, ঠোঁটে রক্ত। আজ মানুষের রক্তের স্বাদ পেয়েছে টাইগার—

পড়াতে ভাল লাগল না। বললাম, 'আমার মাথা ধরেছে। হোটেলে ফিরে যাচ্ছি।'

নীচে নেমে টাইগারকে দেখতে পেলাম না। সত্যানন্দ কুণ্ডু তখন ওকে স্নান করানোর কথা বলেছিলেন। কার্তিক হয়ত নিয়ে গেছে। সবুজ ঘাসের ওপর এখনও রক্তমাখা তুলোগুলো পড়ে আছে।

হোটেলে ফিরে দেখি সেখানেও ভিড়। মফঃস্বলের ছোট রাস্তায় লোক উপচে পড়েছে। নগেন চাটুজ্যে সমানে চিৎকার করছেন, 'তুই ছাড়িস না বিমলি। ভূতোকে নিয়ে এক্ষুনি থানায় যা—'

আর সেই কমবয়েসী বিধবা বিমলি, একদা টাইগার যাকে নগ্ন করে পাহারায় ছিল, কাঁদতে কাঁদতে বলছে, 'কেন তুই মরতে ওই রাক্ষুসে বাড়ি গিয়েছিলি মুখপোড়া!'

একটা চেয়ারে আচ্ছন্নের মত বসে আছে ভূতনাথ। অতিশয় কালো ও রোগা, বছর তেরোর ছেলে। তার হাতে পেটে ঘাড়ে ব্যাণ্ডেজ। গালে গলায় আঁচড়ের রক্তাভ দাগ। রক্তমাখা একটা জামার পুঁটুলি মুঠিতে ধরা। ঠোঁট থর থর করে কাঁপছে। কিন্তু কালো ডাগর চোখ জ্বলন্ত অঙ্গারের মত ঝিকুচ্ছে। যেন চিতায় পুড়তে পুড়তে এই মাত্র আগুন থেকে উঠে এসেছে ভূতনাথ। চাপাগলায় ও মাকে শাসাচ্ছে, 'তুই চুপ থাক। আমি আবার যাব!'

শুনলাম, রিক্সা নিয়ে হীরালাল আসছিল ওই পথ দিয়ে। ভূতোকে চিনতে পেরে তুলে নিয়েছে। ওর তখন জ্ঞান ছিল না। তারপর জ্ঞান ফিরলে ও নাকি একটুও কাঁদে নি। শুধু বারকয়েক বিড়বিড় করে বলেছে, 'সেরে নিই। শালা একবার সেরে নিই।'

এই ছেলে ফুল চুরি করতে গিয়েছিল কুণ্ডুবাড়িতে? কি করবে ও ফুল দিয়ে? ওর কি এখন ফুল খেলার বয়স, না অবস্থা?

ভূতনাথের জ্বলন্ত চোখের দিকে তাকিয়ে সহসা মনে হ'ল, না ফুল

না। আসলে পাথর ছুঁড়তেই গিয়েছিল ও দল বেঁধে। ছুঁড়ে ছুঁড়ে হয়ত উপড়াতে চেয়েছিল টাইগারের দাঁত, ভাঙতে চেয়েছিল কুণ্ডু-বাড়ির জানালা-দরজা, ফাটল ধরাতে চেয়েছিল ঢালাই করা শক্ত ভিতে—

কেননা তেরো বছরের এই বালক তার এগার বছর বয়সে মায়ের অপমানিত নগ্ন মূর্তি চোখের সামনেই দেখেছিল যে!

আমি টাইগারকে কি খুন করতে পারব? আমার রক্তে মধ্য-বিত্তের ভীরুতা ও সুবিধাবাদ। আমার কি এত সাহস হবে! না পারি ক্ষতি নেই। আমি ওর প্রতি লক্ষ্য রাখব।

টাইগারসহ কুণ্ডুবাবুদের যারা খুন করবে সেই ভূতনাথেরা ঘরে ঘরে বড় হচ্ছে।

শারদীয় নন্দন

ঘ্রাণ

ছোটবেলায় কি-একটা অসুখ হয়েছিল মাধববাবুর, তারপর থেকে তাঁর ঘ্রাণশক্তি কমে যায়। অথচ চৌকো মুখে নাকখানা বেশ উঁচু, অগ্রভাগ ছুঁচলো, মাঝখানটা দিব্যি মোটাসোটা। এর ডগায় গোলাকার প্লাষ্টিকের চশমাটি যখন আলগাভাবে স্থাপিত হয় তখন কাঁচাপাকা একরাশ দাড়িসমেত কটকটে ভাসমান দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী নাসিকাটি ফুটিফাটা নৌকোর মাস্তুলের মত খাড়া হয়ে থাকে। এমন হৃষ্টপুষ্ট একটি নাসিকার অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও মাধববাবুর ঘ্রাণেন্দ্রিয় কেন অকেজো ও ভোঁতা, বাহির-জগতের বাতাসবাহিত গন্ধসকল কেন তাঁর মস্তিষ্কের কোষে কোনো সংবেদন সৃষ্টি করে না, ডাক্তারেরা তার কারণ বলতে পারেন। কিন্তু মাধবাবুর বয়স পঞ্চাশ পার হয়েছে, এই সামান্য ব্যাপারে তিনি কখনো ডাক্তারের পরামর্শ নেন নি বা চিন্তাক্লিষ্ট হয়ে মাথাও ঘামান নি। তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যা পরিবেষ্টিত ছয়জনের সংসারে এত সব গুরুত্বপূর্ণ আধিব্যাধি প্রায়ই আবির্ভূত হয় যে, তার ধাক্কা সামলাতেই মাধববাবুর নাভিশ্বাস ওঠে, ঋণের উপর ঋণের বোঝায় চোখে সর্ষেফুল দেখতে থাকেন। এমন অবস্থায় তাঁর নাক কেন কাজ করে না, ঠাণ্ডা জলে দাঁতের গোড়া কেন কনকন করে বা তারু জন্মানোর পর থেকে তারুর মা'র মাথার চুলগুলো উঠে গিয়ে কেন কুৎসিত একটা টাকের সৃষ্টি হচ্ছে—এসব ছোটোখাটো ব্যাপারে ডাক্তারের কাছে ছোটার প্রশ্নই ওঠে না। মাধববাবু ভেবে দেখেছেন, জীবনযাপন বা সংসারপরিচালনার ক্ষেত্রে এগুলো অত্যাবশ্যকীয় নয়। একবেলা ভাত কিংবা রুটি না জুটলে সংসারে যে গোলযোগ উপস্থিত হয়, তার তুলনায় তারুর মা'র মাথার চুলগুলো নিতান্ত তুচ্ছ এবং তাঁর নাকে গন্ধ ঢুকল বা না ঢুকল তাতে কিছুই আসে যায় না।

বরং মাধববাবুর ধারণা, পঞ্চেন্দ্রিয়ের একটি অসার হওয়ার ফলে নানাদিক থেকে তাঁর নানারকম সুবিধেই হচ্ছে। এখন এদেশে, তাঁর মতো গরীব স্কুল-মাস্টারের সব ইন্দ্রিয়গুলি সমান সজাগ ও সতর্ক থাকলে দুর্ভোগ বাড়ত বই কমত না। যার অনুভূতি যতো ভোঁতা এখন সে-ই ততো সুখী!

বাসস্থানের কথাই ধরা যাক। ট্যাংরা অঞ্চলে যে ঘর দু'খানা ভাড়া নিয়ে মাধববাবু বাস করেন তা একটি অতিকায় জীর্ণ-ভগ্ন-চতুর্তল বাড়ীর নীচুতলার অংশবিশেষ। তার ইঁট থেকে বহুকাল আগেই প্লেস্তরা খসে গেছে, ছাদটা ফুটোফাটা, দরজাজানালার কাঠ বল্মীক-ভক্ষিত, কোনোটার পাল্লা আছে, কোনোটার নেই, খোয়া-ওঠা মেঝের এখানে ওখানে ইঁদুরের গর্ত। এ বাড়িতে যারা থাকে তাদের আর্থিক অবস্থাও ওইরকম, নুন আনতে পান্তা ফুরোয় এবং তা নিয়ে ঘরে ঘরে অষ্টপ্রহর দাম্পত্য কলহের দামামা বাজে। মাসের শেষ দিকে অভাব যখন তীব্রতর হয়, তখন থালাবাসন ছুঁড়ে মারার ঝনঝন শব্দও কর্ণভেদী হয়।

নীচের তলায় একটিমাত্র বারোয়ারী ল্যাট্রিন। স্যানিটারী হলেও ব্যবহারের পর কেউ জল দেয় না। দ্বার রুদ্ধ দেখলে এবং আবেগ ঘন হলে বাচ্চারা একপাশে ড্রেনে বসে পড়ে। তাবৎ বাড়ির যত আবর্জনা উঠোনে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। তার উপর ফাটা কলের জল গড়ায়। স্তূপীকৃত আবর্জনা ভিজে গ্যাঁদগ্যাঁদে হয়ে মলমূত্রাদির সঙ্গে মিশে দিনরাত যে তীব্র ঝাঁঝালো গন্ধ সৃষ্টি করে তার আক্রমণটা নীচুতলার ঘরগুলোতেই বেশী মালুম হয়।

একসময় সহ্য করতে না পেরে তারুর মা কোমরে আঁচল জড়িয়ে উঠোনে এসে চেঁচাতে থাকে, 'লক্ষ্মীছাড়া, হারামজাদা, হাড়জ্বালানির দল সব! আমার দোরগোড়ায় কেন আসিস মরতে? বাইরের ড্রেনটায় গিয়ে বসলে বুঝি বাপ ঠাকুদ্দার অপমান হয়? ওঠ, ওঠে যা শীগগির...'

অথবা উপরের কোনো গৃহিণীর উদ্দেশ্যে, 'ও বটার মা, মাছের

এঁটোকাঁটাগুলো এমন ছড়িয়ে কেন ফেললে? আঁশটে গন্ধে ঘরে টেকা যাচ্ছে না। আক্কেলটা কি রকম? উপরে আছ বলে বুঝি ঠাহর পাও না! সবশুদ্ধু আবার ঝেঁটিয়ে দিয়ে আসব তুলে! বুঝবে মজাখানা!'

শুকনো খটখটে আকাশ থাকলে অবস্থা এই, আর বৃষ্টি হলে ত কথাই নেই। উঠোনে তখন আধ হাত জল জমে যায়। কাদা-গোলা জলেরউপর যাবতীয় জঞ্জালের সঙ্গে মৃত ইঁদুর, আরশুলা, ফুলে-ফেঁপে-ঢোল-হওয়া অতিকায় কোনো ছুঁচো নির্বিঘ্নে ভাসতে থাকে। জলের টানে কিছু কিছু নীচের ঘরগুলোতে ঢুকে যায়। তখন সারা বাড়ির বাতাস গলিতশবের আঁশটে গন্ধে থিক থিক করতে থাকে। তারুর মা জিনিসপত্র টানাটানি করতে করতে বলে, 'নরক, নরক! এর চেয়ে গাছতলা অনেক ভাল।' বড়ো ছেলেটা গজগজ করে, 'কতদিন বাবাকে বলছি বাসা পাল্টাতে—'

ছোট ছেলেটা জলকাদা মাড়িয়ে খেলতে চলে যায়।

বড়ো মেয়েটার স্বভাব একটু খুঁতখুঁতে। সারাদিন নাকমুখ কুঁচকে থাকে আর থু থু করে। কখনো বমিও করে ফেলে। দুর্গন্ধ দূর করার জন্য তারুর মা খুঁজে পেতে একগুলি নেপথলিন হাতে দিয়ে বলে, 'নাকের কাছে ধরে রাখ পারু, আরাম পাবি।'

কিন্তু কি গ্রীষ্ম কি বর্ষা, মাধববাবুর তেমন বিকার নেই। বগল-ছেঁড়া গেঞ্জি গায়ে, নড়বড়ে তক্তাপোষে বসে তিনি দিব্যি হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষার খাতা দেখে যাচ্ছেন। অথবা ছোট মেয়ে তারুকে 'লক্ষ্মী-সোনা' বলে বসিয়ে বাংলা পড়াচ্ছেন, 'জীবন আমার কর ফুলের মতন···।' তাঁর ঘরের মেঝেয় উঠোনের মলমূত্র-মিশ্রিত কালো জল ঝাপটা মারছে, দেয়ালে মরা আরশুলা আটকে থাকছে, পচা ইঁদুরের গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে উঠছে—মাধববাবু কাঁচাপাকা ভুরু কুঞ্চিত করে এ-সব দেখছেন কিন্তু গন্ধ পাচ্ছেন না বলে সারা শরীর ঘিন ঘিন করে উঠছে না। তাঁর ঘ্রাণশক্তি স্বাভাবিক থাকলে এই অবস্থায় নিশ্চিন্তে-আলস্যে বসে তিনি কি স্কুলের কাজ করতে পারতেন!

না আবেগ-আক্রান্ত শ্লেষ্মাবিজড়িত গলায় তারুর কাছে ফুলের মতো সুন্দর জীবনের সরলার্থ ব্যাখ্যা করতে পারতেন।

আহারাদির ক্ষেত্রেও এই ঘ্রাণপঙ্গুতা মাধববাবুকে বিশেষ সাহায্য করে। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই রেশনে এমন কদর্য চাল দেয় যে হাঁড়িতে ফোটানোর সঙ্গেসঙ্গে বাঁশপচা গন্ধে সারাবাড়ি তোলপাড় হয়ে ওঠে। ফ্যান গালতে গালতে তারুর মা তারস্বরে চেঁচায়, 'জ্বালিয়ে মারলে, আঁটকুড়ির বেটারা হাড়েমাসে জ্বালিয়ে মারলে! বলি এই রাজত্বে চাট্টি শুকনো ভাত খেয়েও কি সুখ নাই গো।'

ও-পাশ থেকে কম্পোজিটারের বৌ রোহিণী গলা মিলিয়ে বলে, 'দিদি, জ্বলুনি শুধু আমাদেরই। যাদের ট্যাঁকে পয়সা আছে তারা কি এসব গরুছাগলের দানা কিনে খায়—'

রোহিণীর কথায় তারুর মা আরো রেগে গিয়ে ভড়বড়িয়ে ওঠে, 'গরুছাগলেও খায়না এ বস্তু। ওইত উকীলবাবুর ঝি-টা বলছিল সেদিন, পেট খারাপ হবে বলে বাবুরা রেশনের চাল কুকুরটাকে পর্যন্ত খেতে দেয় না!'

গন্ধ ঢাকার জন্য নানারকম কায়দাকানুন করে তারুর মা। কখনো ফুটন্ত ভাতে তেজপাতা দেয়, কখনো পেঁয়াজ রসুন। ভাত নামিয়ে কোনোদিন একটু কর্পূরদানাও ছড়িয়ে দেয়। কিন্তু সরকারী-চালের মাহাত্ম্য বিশেষ হ্রাস পায় না। ছেলেরা খেতে বসে নাক সিঁটকায়। বড়ো মেয়েটা এমন মুখ করে যেন সত্যি সত্যি পোকা-গিজ-গিজ-করা একদলা গোবর ওকে খেতে দেওয়া হয়েছে। দু'চার গ্রাস মুখে দিয়েই উঠে যায়। হাতাখুন্তির প্রবল শব্দ তুলে তারুর মা গাল পাড়ে, 'মুখপুড়ী, মরণদশী! কোন্ নবাবের ঘরে যাবি লো? কত পোলাও মাংস খাবি লো? থাক সারাদিন শুঁটকি মেরে। খিদে পেয়েছে বললেই মুখে খুন্তিপোড়া।'

একমাত্র মাধববাবুর কোনো অসুবিধা হয় না। ভাতগুলো জিভে একটু বিস্বাদ ঠেকে বটে কিন্তু খাওয়ার ব্যাপারে স্বাদের চেয়ে গন্ধের গুরুত্ব বেশী এবং অনেকসময় গন্ধই স্বাদকে নিয়ন্ত্রিত করে বলে মাধব-

বাবু বেশ স্বাভাবিকভাবেই আহারাদি শেষ করে ছেঁড়া পাঞ্জাবি গায়ে স্কুলে চলে যান। বড়ো মেয়েটা একরকম অভুক্ত থাকছে—এই চিন্তা তাঁর মনকে মাঝে মাঝে পীড়িত করে, তখন বিষম উত্তেজিত হয়ে রেশনের দোকানসহ সমস্ত সরকারী ব্যবস্থার মুণ্ডুপাত করেন। স্বাধীনতার দুই যুগ পরেও আমাদের কপালে চারটি ঝরঝরে সাদা চালের ভাত জুটল না ভেবে একসময় যথেষ্ট বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হয়ে সিদ্ধান্ত করেন, এই সরকারটাও ওই গোবরপচা চালের মতো অস্বাস্থ্য ও অরুচিকর, যাকে আর একদিনও সহ্য করা উচিত না, অথচ বাধ্য হয়ে সহ্য করতে হয়!

বড়োরাস্তায় এসে মাধববাবু ট্রাম ধরেন। তার মান্থলি টিকিট আছে। বহু কষ্টে ঠেলেঠুলে একটুখানি জায়গা নিয়ে হ্যাণ্ডেল ধরে ঝুলে থাকেন। তাঁর চারপাশের মানুষগুলোর গা থেকে ঘামের গন্ধসহ রকমারি গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে। কেউ জামার হাতায় নাক চাপে, কেউ-বা উটের মতো মুখটাকে ছাদের দিকে তুলে রাখে। এ ক্ষেত্রেও মাধববাবুর কোনো কষ্ট নেই। তিনি তাঁর বিশাল নাসিকার ছিদ্রদুটি পুরোপুরি উন্মুক্ত রেখেই ট্রামেবাসে যাতায়াত করেন।

মাঝে মাঝে মাধববাবুর মনে হয়, তাঁর শ্রবণশক্তিও যদি খুব কম হ'ত, তাহলে আরো শান্তিতে থাকতে পারতেন। ঘরে তারুর মা'র চিৎকার, উঠোনে টেনিসবল নিয়ে বখাটে ছোঁড়াগুলোর তাণ্ডব, রাস্তায় ট্রামবাসের বিকট শব্দ এবং স্কুলে ছেলেছোকরাদের রকমারি আওয়াজ ও মন্তব্য তাঁর কানে ঢুকত না। তবে কানে কম শোনার একটু বিপদ আছে। 'ফিজিক্যালি আনফিট' বলে স্কুল থেকে তাঁর চাকরি যেতে পারে। রাস্তাঘাটে এ্যাকসিডেন্ট হতে পারে। কিন্তু নাকের ব্যাপারে কোনো রিস্ক নেই, লাভই ষোলো আনা।

অবশ্য ঝামেলা একটু আধটু হয়। যেমন একবার সেক্রেটারি নিমাই দত্তর ছেলের বিয়েতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলেন মাধববাবু। অন্য সহকর্মীরাও ছিল। বিশাল বাড়ির এক কোণে চুপচাপ বসে থেকে

গণ্যমান্য অতিথিদের আদর-আপ্যায়ন দেখে দেখে ঘুমে ঢুলতে ঢুলতে গভীর রাতের শেষ-খেপে জায়গা পেয়েছিলেন।

ঘাঁটাঘাঁটিতে তরিতরকারি মাছ মাংস তখন গেঁজে উঠেছে। টকটক গন্ধ বেরুচ্ছে। একজন সহকর্মী বিরস বিরক্ত মুখে লুচি ভাঙতে ভাঙতে নীচু গলায় বলল, 'এ তো এঁটোকাঁটা কুড়িয়ে খাওয়ার সামিল। আগে জানলে বাড়িতে চারটি ভাত রাঁধতে বলে আসতাম।'

'হ্যাঁ নগেনদা।' অন্য কেউ দই মিষ্টির আশায় বসে থেকে জবাব দিল, 'এমন নেমন্তন্ন না করলে কি হয়! আমরা তো কেউ মাথার দিব্যি দিই নি।'

হঠাৎ মাধববাবুর দিকে নজর পড়ল। গোগ্রাসে গিলে চলেছেন তিনি। শীর্ণ হাতের লম্বা লম্বা আঙুলে লুচি পোলাও কুমড়োর ঘ্যাট সহ মাছমাংসের ঝড়তিপড়তি টুকরোটাকরা মেখেচটকে মণ্ড করে এই বড়ো বড়ো দলা মুখে পুরেই কোঁৎ করে গিলে ফেলছেন! তার নাক বেয়ে টপ টপ করে জল ঝরছে, কপালে ঘামের ফোঁটা জমে উঠেছে, গর্তে ঢোকা চোখ দুটো বড়ো বড়ো দেখাচ্ছে।

তাঁর খাওয়া দেখে সমবয়স্ক বিনোদবাবু কোমরে খোঁচা মেরে বললেন, 'অত গপগপিয়ে কি খাচ্ছ হে চাটুজ্জে? সব যে টকে গেছে, গন্ধ পাচ্ছ না?'

মাধববাবু মাথা না তুলে বললেন, 'হুঁম্, একটু টকটক লাগছে বটে!' তারপর একদলা নাকের কাছে তুলে জোরে শ্বাস টানতে টানতে বললেন, 'না, গন্ধ টন্ধ নেই!'

বিনোদবাবু অবাক হলেন, 'নেই কি হে! কি বলছ চাটুজ্জে?'

এমন সময় স্বয়ং নিমাই দত্ত একপাক ঘুরতে এলেন এদিকে। সোনালী রঙের চশমার ফাঁকে চোখ উঁচিয়ে বললেন, 'কি হে চণ্ডী, কি বিনোদবাবু, পেট ভরে খাচ্ছেন তো সব?'

কেউ কিছু বলার আগে মাধববাবু বলে উঠলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, চমৎকার রান্না। দিব্যি খাচ্ছি।' বলে পূর্ববৎ বড়ো বড়ো দলা মুখে পুরে গিলতে লাগলেন। সেক্রেটারি কয়েক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে তাঁর খাওয়া দেখলেন।

তারপর ভারি গলায় হেঁকে বললেন, 'ওরে, এই ফট্‌কে, এদিকে একটু মাংস আন দেখি বাবা। দে, এই মাধববাবুকে দে।'

এই ব্যাপারটাই তিল থেকে তাল হয়ে দাঁড়াল। সহকর্মীদের মধ্যে চণ্ডী বসাক, বয়সে ছোকরা, হালে ঢুকেছে স্কুলে, রীতিমতো ব্যঙ্গ করে বলল, 'মাধববাবু শুধু পেটুক ন'ন, সেয়ানা পেটুক। সেদিন কেমন কায়দা করে দত্তমশাইকে খুশি করলেন! এ্যাসিসটেণ্ট হেডমাস্টারিটা এবার বাঁধা।'

মাধববাবু ঘোলাটে চোখ তুলে খুব আহত ভঙ্গিতে বললেন, 'কায়দাটা কি করলাম?'

চণ্ডী বসাক সরু করে হাসল, 'সে আপনি ঠিকই বুঝেছেন। শাক দিয়ে আর কেন মাছ ঢাকছেন!'

চণ্ডীর সমবয়সী বন্ধু বরুণ বলে উঠল, 'শুধু মাছ না, পচা মাছ বল!'

টীচার্স রুমের অনেকেই খিক খিক করে হাসল। কিন্তু বয়স্করা গম্ভীর হয়ে গেলেন। বিনোদবাবু প্রতিবাদ করে বললেন, 'কারো ব্যক্তিগত আচার আচরণ নিয়ে এভাবে কথা বলা ঠিক না।'

এ কথায় চণ্ডী বসাক ছাড়া সকলেই হাসিটাকে গুটিয়ে নিল। লজ্জায় অপমানে মাধববাবুর মুখখানা কালো হয়ে উঠল। অপরাধটা যে কি তিনি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারলেন না। নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে পেট পুরে খাওয়াটা কি অন্যায়? মাছমাংসগুলো ঘাঁটাঘাঁটিতে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল? তা সেটা যদি তিনি টের না পান, তাহলে অপরাধ কেন হবে? সকলের স্বাদ ঘ্রাণ গ্রহণের ক্ষমতা কি এক রকম! আর কিছু না বলে মাধববাবু ঢকঢক করে একগ্লাস জল খেলেন। তারপর চক-ডাস্টার নিয়ে ক্লাস করতে চলে গেলেন।

মাঝে মাঝে সংসারেও অশান্তি ঘটে।

মাধববাবু হয়ত একখানা বই পড়ছেন কিংবা ছেলেদের খাতা সংশোধন করছেন। উনুনে ডালের জল শুকিয়ে পোড়া লাগল। কটুগন্ধে সারাবাড়ি ভরে গেল। কলতলা থেকে তারুর মা পড়িমরি ছুটে এসে দুম করে কড়াইটা মাটিতে আছড়ে ফেলে এক ঘটি জল

ঢেলে চেঁচিয়ে উঠল, 'বলি, ঘরে কি একটা মানুষ বসে আছে? না ইট কাঠ পাথর?'

মাধববাবু খুব ভয় পেয়ে বললেন, 'কেন, কি করলাম আমি ?'

'কি আবার করবে! আমার পিণ্ডির ব্যবস্থা করেছ! এখন ছাই মুখে দিয়ে স্কুলে যাও!'

কাছাকোঁচা সামলে মাধববাবু অপরাধীর মতো রান্নার জায়গা-টুকুতে উঠে এলেন। ডালের অবস্থা দেখে তাঁরও দুশ্চিন্তা হ'ল, 'ই-স এতটা ডাল—'

তারুর মা কর্কশ গলায় ভেংচে উঠল, 'এ-ত-টা ডাল! যখন পুড়ছিল তখন কোথায় ছিলে? এসে একটু জল ঢালতে পারো নি?'

মাধববাবু বললেন, 'আমি তো উল্টোদিকে মুখ করে বসেছিলাম!'

'ছিলেই বা উল্টোদিকে!' কড়াই থেকে ঘষে ঘষে পোড়া ডাল তুলতে তুলতে তারুর মা বলল, 'গন্ধে বাড়ি ভরে গেল, সেটা নাকে ঢোকেনি ?'

'ও, গন্ধ!' এতক্ষণে মাধববাবু যেন আত্মরক্ষার পথ খুঁজে পেলেন, খুব করুণভাবে হাসবার চেষ্টা করে বললেন, 'জানই তো, ওসব গন্ধটন্ধ আমার নাকে তেমন ঢোকে না!'

'ঢোকে, ঢোকে!' তারুর মা ঝাঁঝিয়ে উঠে বলল, 'সময়মতো সবই ঢোকে! শুধু ঘরসংসারের বেলায় নাক কা[illegible] চোখ সব কানা হয়ে যায়। ওসব চালাকি আমি ধরে ফেলেছি!'

মাধববাবু আর কথা বাড়ালেন না, মুখখানা কালো করে আবার তক্তাপোষে এসে বসে পড়লেন। যে-ডালটুকু পুড়ল তার দামটা মনে মনে হিসাব করলেন। অভাবের সংসারে সামান্য ক্ষতিটুকুও অনেক। যতটুকু নষ্ট হয় ততটুকুতেই টান ধরে

একসময় তারুর মা'র উপরেও রাগ হয়। অনুচ্চ গলায় বিড়বিড় করে বলেন, 'তুমিই বা ডাল বসিয়ে কলতলায় এমন কি রাজকাজ সারতে গিয়েছিলে শুনি? আর গিয়েছিলে তো সময়মতো ফের নি কেন? একসঙ্গে সতেরোটা কাজ করা যায় না, একটা একটা করে

গুছিয়ে করতে হয়। এটা তো সাধারণবুদ্ধির কথা—' বিড়বিড় করেন আর তারুর মা'র মুখ দেখেন। না, শুনতে পায় নি। শুনলে এতক্ষণে ফণা তুলে ছুটে আসত। সংসার না তো, অরণ্য! কি সুখে যে মানুষ বিয়ে করে, ছেলেপুলের জন্ম দেয়—

মাধববাবু গন্ধ পান না কিন্তু তাঁর ছোট মেয়ে তারুর ঘ্রাণশক্তি অসম্ভব তীক্ষ্ণ। এই বিশাল জীর্ণবাড়িটার কোন্ ঘরে কি মুখরোচক খাবার তৈরী হচ্ছে নির্ভুল বলে দিতে পারে সে। মাধববাবু সকালের দিকে জোরজুলুম করে ওদের একটু পড়াতে বসান। একসময় পড়া থামিয়ে তারু জোরে জোরে শ্বাস টানতে থাকে। ওর ক্ষুদে ক্ষুদে চোখদুটো লোভে লালসায় জ্বলজ্বল করে। মাধববাবু বিরক্ত হয়ে তাকাতেই তারু তড়বড় করে বলে, 'কারা চিঁড়ের পোলাও করছে বাবা, ঘি গরম মশলা দিয়ে—'

ছোট ছেলে ভানুও নাক টেনে বলে, 'ঠিক ধরেছিস তো। নিশ্চয়ই তিনতলার সিন্ধ্রিরা—'

মাধববাবু ধমক দেন, 'হ্যাংলা কোথাকার! পড় দেখি মন দিয়ে!'

কিন্তু খাঁটি ঘিয়ের ভুরভুরে গন্ধটা তারুর মা'র নাকেও ঢোকে। সামনে এসে তারু-ভানুর মুখের দিকে অল্পকাল তাকিয়ে থেকে বলে, 'ও-বেলা চারটি চিঁড়ে এনো তো! ওদের ভেজে দেব।'

ভানু বলে, 'মা, ঘি দিয়ে?'

তারুর মা বলে, 'ঘি কোথায় পাব! এমনি ভেজে আদাকুঁচি পেঁয়াজ দিয়ে মেখে দেব। দেখবি, কি সুন্দর লাগবে। এখন পড়।'

মাধববাবু গুম্ হয়ে থাকেন। বাজারে এখন চিঁড়ের দর তিন সাড়ে তিন। আধকিলো আনলেও দেড়টাকার ধাক্কা। তিনি যথেষ্ট ক্রুদ্ধ হয়ে তিনতলার সিন্ধ্রিদের বাপান্ত করেন। কাকের বাসায় কোকিলের মতো ওই একঘর এসে জুটেছে তিনতলায়। বাজারে ফলমূলের দোকান করে। লবঙ্গ দারচিনির কিছু চোরাব্যবসাও নাকি আছে। মেয়ে বউগুলো অষ্টপ্রহর রেডিও খুলে গান শুনছে আর মাছমাংস ঘিয়ের গন্ধ ছড়াচ্ছে! কবে যে উঠে যাবে বজ্জাতেরা!

কোনোদিন তারুর মা-ও বিষম রেগে যায়। মোটা খসখসে গলায় ছেলেমেয়েগুলোকে গালমন্দ শুরু করে, 'হতচ্ছাড়ী, রাক্ষসী কোথাকার! ডিমভাজার গন্ধ পাচ্ছি মা! যা, বাপকে বল গা বাজার থেকে ডিম আনতে! কেমন আনে দেখি! হাড়হাভাতের ঘরে এসে জন্মেছিস, কুকুরের মতো গন্ধ শুঁকে শুঁকেই তোদের জীবন যাবে! দূর হ সামনে থেকে।'

কথাগুলো মাধববাবুর কানে এসে তীরের মতো বেঁধে। তিনি তো আর বয়ড়া ন'ন। সমস্ত মনটা রাগে দুঃখে বিষিয়ে ওঠে। বইখাতা বন্ধ করে ফুটিফাটা ছাদের দিকে অপলকে তাকিয়ে থাকেন। তাঁর সুদীর্ঘ বাইশবছরের 'জীবনসঙ্গিনী' তারুর মাকে কেমন শত্রুপক্ষ বলে মনে হয়। এখনও কুৎসিত কদর্য গলায় চিৎকার করে চলেছে সে। ছেলেমেয়েগুলোর সঙ্গে নিজের পোড়া-ভাগ্যকে শাপশাপান্ত করছে। মাধববাবু সবই শুনতে পাচ্ছেন। আজ তারুর মা'র কর্কশগলা চুলওঠা কপাল আর গালভাঙা মুখের দিকে তাকিয়ে কে বলবে, এই মেয়েটি একদিন ঘন নীল রঙের বেনারসী জড়িয়ে তাঁর ঘরে এসেছিল! তাঁর নাকেমুখে চুলের গোছা ঘষতে ঘষতে বলেছিল, 'দেখতো, তেলের গন্ধ পাচ্ছ কিনা? পাচ্ছ না? ও মা, সেকি গো! আচ্ছা এই হাতটা দেখ, বাটা জিরের গন্ধ। পাচ্ছ না? কি মুশকিল! এই মুখে দেখ, এলাচ দিয়ে পান খেয়ে এসেছি—'

সেই মেয়েটা কবেই মরে গেছে! নিরন্তর অভাব ও দারিদ্রের চাপে পিষ্ট করে মাধববাবুই হয়ত তাকে হত্যা করেছেন। অথবা তাঁর কি দোষ! সামান্য স্কুল শিক্ষক তিনি, ছানাপোনা নিয়ে এতবড় সংসার তাঁর, এখানে ইচ্ছে করলেই কার কোন্ সখটা তিনি পূরণ করতে পারেন?

তারু আর ভানুর মুখের দিকে তাকাতে অসম্ভব কষ্ট হয়। মা'র কাছে গলমন্দ খেয়ে শুকনো পাঁশুটে মুখে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। এই ঘরের বাতাসে হয়তো ডিমভাজার গন্ধ পাচ্ছে ওরা। ওদের নাকগুলোও কেন যে ভোঁতা হ'ল না! কেন যে হতভাগারা এতসব

গন্ধটন্ধ পায়। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে পড়লেন মাধববাবু। তাঁর স্কুলের বেলা হয়েছে।

কিন্তু মাধববাবুও একদিন গন্ধ পেলেন।

তীব্র তিক্ত কটুগন্ধ। সেই গন্ধে তাঁর মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। চোখ ফেটে জল এল। বুকের ভেতরটা ঝলসে গেল। চিরকালের সাদাসিধা নিরীহ মাধবমাস্টার কেমন রাগী হয়ে গেলেন।

নানারকম অর্থনৈতিক দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে স্কুলে স্কুলে সাত-দিনের লাগাতার ধর্মঘটের পালা চলছে তখন। একটা দলছুট দালাল-সংগঠন ধর্মঘট-ভাঙার কাজে ব্যস্ত। মাধববাবুর স্কুলে তার নেতৃত্ব করছে সেই চণ্ডী বসাক। দিনরাত সেক্রেটারির বাড়িতে যাতায়াত, টীচার্সরুমে শলাপরামর্শ। কিন্তু বরুণ সামন্ত ছাড়া আর কেউ জোটেনি দলে। মাধববাবুদের টীচার্স-কাউন্সিল সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ধর্মঘটের তাঁরা সামিল হবেন। মাধববাবুরও তাতে মত। চণ্ডী বসাকের কথা শোনেননি। ওর উপর তিনি রেগে ছিলেন। নিমন্ত্রণটার ব্যাপারে বড় হম্বিতম্বি করেছিল ছোকরা। এখন বুড়োহাড়েও তিনি দেখিয়ে দেবেন, সেক্রেটারির দালাল তিনি ন'ন —ওই চণ্ডী বসাকরাই। সেয়ানা দালাল! এদ্দিন বর্ণচোরা হয়ে ঘাপটি মেরে বসেছিল, বোঝা যায় নি! বাঁচার লড়াই শুরু হতে-না-হতে পালক খসে পড়ছে!

ধর্মঘটের আগের দিন আবার এসেছিল চণ্ডী, 'ভাল করে ভেবে দেখুন মাধববাবু—'

পুরনো রাগের বশে মুখখানা কঠিন করে মাধববাবু উত্তর দিয়েছিলেন, 'আমার নাকের গোলমাল আছে, পচা মাছ পচা মাংস তেমন ধরতে পারিনে। কিন্তু মাথার গোলমাল নেই চণ্ডীবাবু, খাঁটি মানুষ ভেজাল মানুষ দালাল মানুষ সব চিনতে পারি!'

চণ্ডী বসাক তবু বলল, 'ধর্মঘট ভেঙে গেলে আপনার চাকরি চলে যেতে পারে মাধববাবু।'

কালো স্যাংলাপড়া দাঁতে মাধববাবু হাসলেন, 'গেলে আপনি আর বরুণবাবু কি স্কুল চালাতে পারবেন? নতুন লোকতো নিতেই হবে। তখন না-হয় বুড়োবয়সে আবার একখানা দরখাস্ত করব।'

পরেরদিন সারা বাংলাদেশ জুড়ে শিক্ষক ধর্মঘট শুরু হয়ে গেল। এসপ্লানেডের পূর্বদিকে হাজার পাঁচেক শিক্ষক তাঁবু খাটিয়ে অবস্থান শুরু করলেন। জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে স্কুলের দরজায় তালা ঝুলল। এ-বি-টি-এ-র নেতারা গ্রামেগঞ্জে ঘুরতে লাগলেন।

ধর্মঘটের চতুর্থদিনে নিজের স্কুলের কাছে এসে দাঁড়িয়েছিলেন মাধববাবু। তিনি জানতেন না, ঐ দিনই সকালে একটি জেলায় ধর্মঘটী শিক্ষকদের উপর সিদ্ধার্থ-সরকারের পুলিশ গুলি চালিয়েছে। অনেক শিক্ষককে প্রকাশ্য রাস্তায় মারতে মারতে থানায় ধরে নিয়ে গেছে। তাঁর স্কুলের সামনে সি-আর-পি-র গাড়ী প্রথমদিন থেকেই দাঁড়িয়ে থাকছে, এ-ও জানতেন না। জানলে, তিনি যে-রকম ভীতু মানুষ, ঘর থেকে বেরুতেন না।

এসে পুলিশের গাড়ী দেখে থমকে গেলেন। এদিক ওদিক তাকিয়ে ছাতা মাথায় বিনোদবাবুকে দেখলেন। উঁচুক্লাসের কিছু ছাত্রকেও দেখলেন। বুকে সামান্য বল হ'ল। আরো ক'পা এগিয়ে এলেন। স্কুলের দরজা আধ-ভেজানো। ভেতরে ঘণ্টা পড়ার শব্দ শুনলেন। তাঁর মুখ শুকিয়ে গেল। ফিসফিস করে বললেন, 'ক্লাস চলছে নাকি গো মিত্তিরমশাই?'

বিনোদবাবু শিক্ষক-সংগঠনের পুরনো কর্মী। ভ্রূকুটি করে বললেন, 'মুণ্ডু চলছে! ওই চণ্ডী আর বরুণ-ছোঁড়া সেক্রেটারির বড়ছেলের সঙ্গে বসে বসে তাস পিটুচ্ছে—'

মাধববাবু স্বস্তি পেয়ে বললেন, 'তাহলে বল ওই ঘণ্টাই চলছে!'

বিনোদবাবু বললেন, 'এখানে দাঁড়িয়ে থেকে কি হবে! চল এসপ্লানেডে যাই—'

মাধববাবু কি ভেবে ঘাড় নাড়লেন, 'না, বাড়ি যাই। বড়ো মেয়েটার খুব জ্বর।'

বিনোদবাবু কি বলতে যাচ্ছিলেন এমনসময় সেই উঁচুক্লাসের ছেলেগুলো ঘন হয়ে শ্লোগান দিয়ে উঠল, 'শিক্ষার দাবী জাতীয় দাবী, জাতীয় দাবী মানতে হবে', 'শিক্ষকরা পথে কেন, সিদ্ধার্থ-সরকার জবাব দাও।'

বিনোদবাবু বললেন, 'ওদের ভারি উৎসাহ! সেই সকাল থেকে সমানে চেঁচাচ্ছে!'

মাধববাবু খুব ভয় পেয়ে বললেন, 'মিত্তিরমশাই, গাড়ী থেকে পুলিশ নামছে। চল—'

বিনোদবাবু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন। তাঁর মুখেও দুশ্চিন্তার ছায়া পড়ল। ছাতার আড়ালে হাত নেড়ে ছেলেদের চুপ করতে বললেন। ওরা শুনল না। মুষ্টিবদ্ধ কিশোর হাতগুলি আকাশে তুলে আরো জোরে চিৎকার করে উঠল, 'গুলি করে শিক্ষক হত্যার জবাব নয়, বদলা চাই!'

'গুলি করে শিক্ষক হত্যা' শুনে মাধববাবু চমকে উঠলেন! তাঁর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল। বিনোদবাবুর দিকে আরো সরে এসে কি বলতে চাইলেন। কিন্তু তার আগেই দুম্ করে একটা শব্দ হ'ল। ভারি সীসার মতো কি একটা বস্তু ছুটে এসে তাঁর কানের পাশে আছড়ে সশব্দে ফেটে গেল। মাধববাবুর মনে হ'ল তাঁর কানটা ছিঁড়ে খুঁড়ে ছিটকে গেল, নাকের অনেকখানি মাংস উড়ে গেল, চোয়ালের হাড় গুঁড়ো হয়ে গেল, মাথার ভেতর শিরাগুলো ঝনঝন করে বেজে উঠে কি-রকম-একটা উলটপালট হয়ে গেল। তারপরই তীব্র যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠে মাটিতে পড়ে গেলেন তিনি। জ্ঞান হারানোর আগে অস্পষ্ট এলোমেলো ভাবে ছেলেদের চিৎকারের সঙ্গে বিনোদবাবুর গলা শুনলেন। তারপর আরো কয়েকটা দুম্ দুম্ বিকট শব্দ শুনলেন। কারা যেন ছুটে এসে তাঁর শরীরটা তুলে ধরল। তিনি বুঝতে পারলেন না। কিন্তু এই প্রথম তীব্র যন্ত্রণায় জ্ঞান হারাতে হারাতে মাধববাবু একটা অদ্ভুত উগ্র ঝাঁঝালো গন্ধ পেলেন। গন্ধটা তাঁর মাংস-উড়ে-যাওয়া নাকের ভেতর দিয়ে বুকের মধ্যে ঢুকে ঘুরপাক

খেতে খেতে ফুসফুস ও পাকস্থলীতে জমাট বেঁধে গেল। অসম্ভব তিক্ত কটু বারুদের গন্ধ। তাঁর সমস্ত নাক মুখ বুকের গহ্বর যেন ঝলসে গিয়ে জ্বালা করতে শুরু করল। জলপিপাসায় শুষ্ক তালু নিয়ে তিনি জ্ঞান হারালেন।

এখন মাধববাবু সুস্থ হয়ে উঠেছেন। টীয়ার গ্যাসের শেল ফেটেছিল তাঁর মুখে। এখানে ওখানে থেঁৎলানো মাংস স্টিচ্ করে করে জোড়া দেওয়া হয়েছে। নাকের হাড় ভেঙ্গে গেছে। আঙ্গুল ঠেকালে ব্যথা লাগে। বড়ো করে হাঁ করলে কিংবা শক্ত কিছু চিবুতে গেলে গালের মাংসে টান ধরে। তাছাড়া আর কোনো কষ্ট নেই।

কিন্তু মাধববাবু আজকাল যেন গন্ধ পাচ্ছেন। অন্যসব গন্ধের সঙ্গে ট্রামেবাসে পথেঘাটে সর্বত্র, এমন কি ক্লাসরুমে সমবেত কচিকাঁচা ছাত্রদের মধ্যেও তিনি যেন একপ্রকার উগ্র ঝাঁঝালো বারুদের গন্ধ পাচ্ছেন। ফুসফুস ও পাকস্থলীর মধ্যে জমাট-বেঁধে-থাকা গন্ধটা কিছুতেই নামছে না।

আকাশে বাতাসে সর্বত্র ওই গন্ধ টানতে টানতে এখন মাধববাবু ক্রমশ রাগী হয়ে উঠছেন!

শারদীয় চতুষ্কোণ

টিকিট পাঞ্চ করতে গিয়ে মধ্যবয়সী চেকার রীতিমত অবাক হলেন, 'এ কি, আপনার দেখছি ফার্স্ট ক্লাসের টিকিট !'

বললাম, 'হ্যাঁ।'

'তা হলে আপনি এই গাড়িতে কেন?'

'এমনি।'

'এমনি! স্ট্রেঞ্জ!'

আমার আপাদমস্তক খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলেন তিনি। তারপর ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে টিকিটের নম্বর ও তারিখ দেখলেন। প্রথম শ্রেণীর যাত্রী তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করলে রেল কোম্পানীর আইনে কোনো বাধার সৃষ্টি হয় কিনা ভেবে স্থির করতে না পেরে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখে টিকিটটা ফেরৎ দিতে দিতে বললেন, 'ফার্স্ট ক্লাসে কি জায়গা পান নি?'

'অনেক জায়গা, শুয়ে যাওয়া যায়।'

'তা হলে?'

'বললাম তো, এমনি!'

সাদা কোটের গায়ে পেতলের একটা বোতাম আঙুলের ডগায় ঘষতে ঘষতে টাকমাথা চেকার ঘাড় নাড়লেন, 'সতেরো বছর আছি এই লাইনে। এমন অদ্ভুত প্যাসেঞ্জার আর দেখি নি!'

ট্রেনটা শব্দ করে একটি স্টেশনের নিকটবর্তী হ'ল। আমি কাঠের দেয়ালে ঠেস দিয়ে ব্রেক-কষার টাল সামলালাম। মাঝারি আকারের কামরাটায় তিল ধারণের স্থান নেই। ঠাসাঠাসি গাদাগাদি লোক। বাংক বোঝাই রকমারি জিনিসপত্র। নীচের গলিপথেও বাক্স-প্যাঁটরা, মাটির হাঁড়ি, জলের কুঁজো, তেলের টিন, চায়ের পেটি। যাত্রীরা অধিকাংশ অবাঙালি। একটা বাচ্চা বুঝি বমি করেছে! পাখাটা বিকট শব্দ করছে। গরম, ঘাম, দেহাতি মানুষের

গায়ের গন্ধ, বিড়ির গন্ধ, ফেরিওলার চিৎকার। কোণের দিকে এক বাঙালি গলার রগ ফুলিয়ে রাষ্ট্রভাষায় ঝগড়া করছে। অন্য সময় হলে আমি রীতিমত রেগে রেল-কোম্পানীকে খিস্তি করতাম। শালারা ফি-বছর ভাড়া বাড়ায় কিন্তু প্যাসেঞ্জারের দিকে ফিরেও তাকায় না। গাঁটের কড়ি গুণে গরু ছাগল ভেড়ার মত পথ চলা। জল নেই, পাখা নেই, বাতি নেই। অথচ দেখ, আজ বাইশ বছর আমরা স্বাধীন হয়েছি!—আর পশ্চিমের এই লোকগুলোও কি তেমনি! যে-গাড়ীতে উঠবে নরক বানিয়ে ফেলবে দেখতে দেখতে। সাত জন্মে কেউ স্নান করে কিনা সন্দেহ। জামা কাপড়ের গন্ধে ভূত পালায়। সঙ্গে আবার তামাক পাতা খৈনীর গন্ধ। বাতাস ঝাঁঝালো হয়ে ওঠে। চোখ জ্বালা করে। কবে যে এরা সভ্যভব্য নাগরিক হয়ে উঠবে—

কিন্তু আজ, এই মুহূর্তে, কারো উপর কোনোরকম রাগ হ'ল না। বরং আমার একপ্রকার আশ্চর্য ভাবান্তর ঘটল। পশ্চিমের এই খেটে খাওয়া মানুষগুলোর কালো ঘর্মাক্ত মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হ'ল অসম্ভব জীবন্ত! আর আমি বহুদিন প্রবাসে কাটিয়ে আজ যেন ঘরে ফিরলাম। এরা যেন আমার আত্মীয়। এদের ভাঙ্গাচোরা মুখের রেখা, এলোমেলো শরীর আর অনুজ্জ্বল চোখের দিকে তাকিয়ে আমার অসম্ভব মায়া, খুব সুখ হচ্ছে। এতক্ষণ একটা সন্দেহ ও বিদ্বেষের কঠিন ভূখণ্ডে আমি যেন নির্বাসিত ছিলাম, এবার নিজের ঘরের জীবনে পরিচিত পরিজনের মাঝখানে এসে বসেছি পা ছড়িয়ে। নিমগাছের ডালে কাক ডাকছে, সজনে গাছ বেয়ে উঠছে গিরগিটি, দোপাটি ফুলের রং পড়ন্ত রোদ্দুরে চিক চিক করছে, কপিকলে সুর তুলে কুয়ো থেকে জল তুলছে আমার বোন, কুয়োতলায় গাছগাছালির গোড়ায় জল ছিটিয়ে দিচ্ছে আমার মা—

এই সুন্দর শ্রমের জগৎ থেকে কে আমাকে তুলে নেবার ষড়যন্ত্র করেছিল!

আসলে সুব্রাহ্মনিয়ম সাহেবই যত নষ্টের মূল।

একটা হাফ-বিদেশী তেল-কোম্পানীর কলকাতা শাখার মেজকর্তা তিনি। আমি তাঁরই পার্সোন্যাল এ্যাসিস্ট্যান্ট। মাস গেলে তিনি মাইনে পান বত্রিশ শ' টাকা, আমি পাই সাতশ' দশ। শুনেছি এই বছর পার হলে তাঁর আরও পদোন্নতি হবে, কিন্তু আর মাস কয়েক পরে আমার চাকরি যাওয়া বিচিত্র নয়, কারণ বোম্বাইয়ে কোম্পানীর হেডঅফিসে অটোমেশন এসে গেছে। কলকাতার অফিসেও এল বলে। উঁচু মহলে খুব গোপনে ছাঁটাইয়ের একটা লিস্ট তৈরী হচ্ছে।

এই অবস্থায় সুব্রাহ্মনিয়ম সাহেব একদিন ডেকে বললেন, 'তোমাকে এক্ষুনি মাদ্রাজ মেইল ধরে একবার খড়গপুর যেতে হবে মিঃ দত্ত।'

আমি চুপ করে রইলাম। সুব্রাহ্মনিয়ম বললেন, 'কি, কোনো অসুবিধা আছে?'

হাজার অসুবিধা থাকলেও ঘাড় নাড়তে হ'ল, কেননা মাথার উপর অটোমেশনের লাল চোখ জ্বলছে।

সুব্রাহ্মনিয়ম খুসি হয়ে বললেন, 'দ্যাটস্ গুড্। আমি নিজেই যাব বলে তৈরী হয়ে বেরিয়েছিলুম, টিকিটও কাটা হয়ে গেছে। বাট্ নাউ ইট্ ইজ ড্রপড্! আমি তিনটের প্লেনে বোম্বে চলে যাচ্ছি।'

বোতাম টিপে সেকসন-ইনচার্জকে ডেকে বললেন, 'দত্ত যাবে। সব বুঝিয়ে দিন।'

খড়গপুরে আমাদের তিনটে 'ফিলিং স্টেশন' আছে। শুনলাম তার একটার কাজকর্মে নানা গলদ দেখা দিয়েছে। শুকলাল দাস নাকি কোম্পানীর জমিতে কয়েকটা দোকানঘর তুলেছে। রিপোর্টটা সত্য কিনা চাক্ষুষ পরীক্ষার দরকার। সেকসন ইনচার্জ একটা ম্যাপ দিলেন আমার হাতে। সঙ্গে দিলেন ক'টা দশটাকার নোট, একটা প্রথম শ্রেণীর টিকিট। বললেন, 'হাতে আর সময় নেই, অফিসের গাড়ী আপনাকে হাওড়া পৌঁছে দেবে—'

সেই আকাশীরঙের ছোট টিকিটটাই আমার কাল হ'ল।

টিকিট আর টাকাটা সন্তর্পণে প্যান্টের পকেটে গুঁজে একটা

ফাইল বগলদাবা করে লিফটের কাছে এসে দাঁড়ানো মাত্র আমার একপ্রকার বিচিত্র রূপান্তর ঘটল। নিজেকে খুব স্মার্ট ও দায়িত্বশীল উঁচুদরের মানুষ বলে মনে হ'ল। প্রায় সুব্রাহ্মনিয়মের কাছাকাছি একটা কিছু। আমার বুকের ভেতরটা গরম হয়ে উঠল, নিশ্বাসপতন ভারি হ'ল, চোখের দৃষ্টি অফিসারসুলভ বক্রতা পেল, চোয়ালের হাড় শক্ত হ'ল এবং প্যান্টের বাঁ পকেটে হাত ঢুকিয়ে দাঁড়ানোর ভঙ্গিটা এমন হ'ল যেন আমি একটা সরকারী তদন্ত-কমিশনের চেয়ারম্যান—অধস্তন কর্মচারিদের দুর্নীতির কৈফিয়ৎ নিতে যাচ্ছি!

লিফট থেকে নেমে অফিসের মস্তবড় স্টেশন-ওয়াগনটায় গা এলিয়ে বসে পড়লাম। যেন এই গাড়িতে এমনভাবে যাতায়াত করতেই আমি অভ্যস্ত! ড্রাইভার যন্ত্রপতি কিছু একটা বলল বোধ হয়। মনোযোগ দিয়ে না শুনেই হুঁ করলাম। গাড়ি স্ট্র্যাণ্ড রোড ধরে ছুটে চলল।

বাস্তবিক, এইসময় আমার মনেই পড়ছিল না যে, আমি আসলে একজন কনিষ্ঠ করণিক, সাকুল্যে মাইনে পাই সাতশ দশ, থাকি কোন্নগর রিফ্যুজি কলোনির দেড়হাতি একটা বাড়ীতে, ঘরে দু'বেলা গেলার মুখ সাতটা, বুড়ো বাপ বাতব্যাধি ও হাঁপানিতে শয্যাশায়ী, ছানি পড়ে মা'র চোখ হাফ্-অন্ধ, ভাইটা তিন বছর বি-এ পাশ করে চাকরির জন্য পাগলা-কুকুরের মত ঘুরে ঘুরে এই সেদিনও রেল-লাইনের ধারে গিয়ে বসেছিল! দেশভাগের আগে আমার বাবা হাঁটুর উপর কাপড় তুলে জমি চাষ করত। আমার মা ধান সেদ্ধ করে ঢেঁকিতে কুটে চাল তৈরী করত। আমার বোনেরা এখনও সেদ্ধ করা কাপড় নিয়ে কুয়োতলায় কাচতে বসে। মাসের শেষ দিকে আমার বিড়ি কেনারও পয়সা থাকে না এবং সরকারী বাসে উঠে টিকিট ফাঁকি দেওয়ার ধান্ধায় ভেতরের দিকে ক্রমশ সেঁধিয়ে যাই ...এই সবকিছুই যেন অনেকটা ইচ্ছে করেই ভুলে গেলাম। মাখনের মত নরম গদীতে বসে আমার কেমন তন্দ্রার মত বোধ হ'ল।

স্টেশনে গাড়ি এসে থামতে কোনোদিকে না তাকিয়ে আমি খুব

মেজাজে হেঁটে গেটের কাছে এসে দাঁড়ালাম। একজন অবাঙালি টিকিট-কালেক্টরকে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলাম, 'বলতে পারেন, মাদ্রাজ মেল কত নম্বরে আছে?'

সে বলল বিশুদ্ধ বাংলায়, 'দশ নম্বরে দাঁড়িয়ে আছে।'

এমনসময় স্টেশনের একজন কুলি রাজ্যের মালপত্র-মাথায় ছুটে যাবার সময় সামান্য ধাক্কা দেওয়ায় আমি অপ্রসন্ন বিরক্ত মুখে দাঁড়িয়ে পড়ে সাহেবী কায়দায় কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে উঠলাম, 'রাস্কেল! অন্ধে কী মাফিক কিউঁ যা রহে হো!'

গাড়ি ছাড়তে তখনো তিন মিনিট বাকি। থার্ড ক্লাস কামরাগুলো থেকে লোক উপচে পড়ছে। বন্ধ দরজায় ধাক্কাধাক্কি চলছে জানালা টপকে উঠে যাচ্ছে কেউ কেউ। ও-পাশে কারা যেন হাতাহাতি শুরু করেছে। এক বুড়ী, হাতে গোলাপফুল-আঁকা ছোট টিনের বাক্স, সকরুণ মিনতি করছে, 'একটু উঠতে দাও বাবারা, দাঁড়িয়ে যাব।'

অন্যদিন হলে আমি এই বৃদ্ধাকে সাহায্য করতাম। হয়ত গায়ের জোর খাটিয়ে বন্ধদরজা খুলে ওকে ভেতরে টেনে নিতাম। কিন্তু আজ আর সে প্রশ্ন ওঠে না। আজ আমি ফার্স্টক্লাসের যাত্রী। একটি ছোট আকাশী রঙের টিকিটের যাদুতে আমার শ্রেণীচরিত্রই পাল্টে গেছে!

আমি নির্বিকার মুখে, যেন ওসব অন্য জগতের কোনো ব্যাপার, দেখতে দেখতে অসহিষ্ণু ও মারমুখি মানুষগুলোকে করুণা করলাম! ইতিমধ্যে প্ল্যাটফর্মের কোলাহল ছাপিয়ে ট্রেনের হুইসল্ বেজে উঠল এবং দূরবর্তী সিগন্যালের লাল আলো হলুদ থেকে সবুজ হয়ে গেল।

আমি তৎপর হয়ে ফার্স্টক্লাসগুলোর খোঁজ করলাম। পর পর তিনটে ছোট কামরা। প্রথমটায় এক পাঞ্জাবী ভদ্রলোক সপরিবারে, দ্বিতীয়টায় জনা চারেক সিন্ধ্রি, তিন নম্বরে গোলগাল এক বাঙালি-সাহেব, সঙ্গে একজন মহিলা, একটি বছর পনেরোর মেয়ে, দুটি হৃষ্টপুষ্ট ছেলে। ভদ্রলোকের মসৃণ টাক, ভরাট মুখ মোটা লেন্সের চশমা দেখে উঁচুদরের একজন বলেই মালুম হ'ল।

ভদ্রমহিলাও রীতিমত আলোকপ্রাপ্তা, কেন না এই প্রৌঢ় বয়সেও তার শাড়ী-ব্লাউজ চোখ ধাঁধানো, বাহু বগল অনাবৃত, পিঠের শিরদাঁড়াসহ বুকের অনেকখানি অংশ স্পষ্টদৃশ্য। মেয়েটির গোলাপী ফ্রকটাও রীতিমত আঁটোসাঁটো, অভিজাত।

আমি এই কামরাটাই পছন্দ করলাম। দশটাকার নোট ভাঙ্গিয়ে প্রথমশ্রেণীর উপযুক্ত এক প্যাকেট সিগেরেট কিনলাম। একটা স্টেটসম্যান নিলাম এবং একটা ইংরেজি গোয়েন্দা বই কিনব কিনা চিন্তা করলাম। এমনসময় ট্রেনটা ফের হুইসল বাজিয়ে নড়ে উঠল।

আমি খুব স্মার্ট ভঙ্গিতে একটা সিগেরেট ধরিয়ে চলমান ট্রেনের কামরায় লাফিয়ে উঠলাম।

অভিজাত পরিবারটি উচ্চকণ্ঠে কিছু কথাবার্তা বলছিল। আমাকে উঠতে দেখে সবাই যেন চমকে গিয়ে চুপ করে গেল। দেখলাম, বাঙালি-সাহেবের হাস্য-স্ফীত মুখখানা গম্ভীর হ'ল, মহিলাটির মিহি কাজলটানা চোখে ভ্রূকুটি উদ্যত হ'ল, ছেলে দুটোও তাড়াতাড়ি অনেকখানি জায়গা নিয়ে পা ছড়িয়ে বসে গেল। আর সেই ধুমসী মেয়েটা একটা বড়ো আকারের সচিত্র পত্রিকা নিয়ে মনোযোগে ছবি দেখতে শুরু করল। মহিলাটি একটু পরেই বলে উঠল, 'নেলী, পা নামিয়ে বোসো। বাবলু, ওই বেতের ঝুড়িটা এদিকে নিয়ে আয়।'

ভদ্রলোকটিও যেন ব্যতিব্যস্ত হয়ে তার সুদৃশ্য ব্রিফ্‌কেসটা বাঙ্কের উপর থেকে নামিয়ে নিজের পাশে এনে রাখল। দেখেশুনে তৎক্ষণাৎ আমার মনে হ'ল, এই কামরায় আমার প্রবেশ ওদের মনঃপূত হয় নি। ওদের হাবভাব দেখে মনে হচ্ছে ওরা আমাকে সন্দেহ করছে। যেন ওদের পরিপাটি সাজানো সংসারে আমি এক হঠাৎ-উৎপাত, আমার পকেটে আসলে থার্ডক্লাসের টিকিট, বেআইনী আগন্তুক হিসেবে আমি যেন জোর করে ঢুকে পড়েছি!

শালা! কি আমার ভদ্দরনোকরে! আমি বিরক্ত হয়ে মনে মনে কেরাণীসুলভ খিস্তি করে ফেললাম। এ গাড়িটা তোদের বাবার নাকি! রিজার্ভ করে রেখেছিস! তোরও যা অধিকার, আমারও

তাই। অত কুঁতকুঁতে চোখে তাকানোর কিছু নেই বাবা। দেখবি টিকিট? হামভি বোনাফায়েড ফার্স্ট ক্লাস প্যাসেঞ্জার—

মেঝেতে সদর্প জুতোর শব্দ তুলে আমি অনভ্যস্ত উদ্ধত ভঙ্গিতে ডান দিকের সীটে বসে পড়লাম। ফাইলটা সরিয়ে রাখলাম পাশে। পকেট থেকে দামী সিগেরেটের বাক্সটা ইচ্ছে করেই টেনে বের করলাম। খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে সেটা ফাইলের উপর স্থান পেল। ইংরেজি কাগজটার ভাঁজ খুলতে খুলতে আমি আবার সহযাত্রীদের মুখ দেখলাম।

ভদ্রলোক এখনও একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমার প্রত্যেকটি গতিবিধি খুঁটিয়ে লক্ষ্য করছে। মহিলাটি একটা জলের শিশির মুখ খুলতে খুলতে আড়চোখে দেখছে। আমাকে দিব্যি গুছিয়ে বসতে দেখে দু'জনের মুখেই যেন দুশ্চিন্তার ছায়া পড়েছে।

আমি যথেষ্ট বিরক্ত হয়ে কাগজটা মুখের সামনে তুলে ধরলাম। ওদের সঙ্গে আলাপ করার শেষ ইচ্ছেটুকুও তখন উবে গেছে। মনের মধ্যে ক্ষোভ ও তিক্ততা। ওদের এমন অভদ্র ও অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিপাতের কারণ কিছুতেই বুঝতে পারলাম না। ওরা কি সত্যি আমাকে একজন চোর-চোট্টা কি স্মাগলার-গোছের কিছু ঠাউরেছে? আমার চেহারাটা অবশ্য অভিজাতশ্রেণীর নয়। অর্থাৎ গালেগলায় একটু মাংস, হাতপায়ের চামড়ায় একটু তেলচিকণভাব, এসব আমার নেই। বরং কালো ঢ্যাঙা চেহারাটা একটু রোগা বলে চোয়াড়ে ধরণেরই হয়ত মনে হয়, বিশেষ করে পুষ্টির অভাবে চোয়ালদুটো শক্ত ও খাড়া হয়ে ওঠায় মুখটাকে সম্ভবত খুবই বিশ্রী দেখায়…এ কারণেই কি এই অভিজাত শ্রেণীতে নিতান্ত বেমানান ঠেকছে! অথবা আমার পরণের পোষাকগুলোও কি এই শ্রেণীর সঙ্গে অসহ-যোগিতা করছে! প্যাণ্টটা টেরিকটনের হলে কি হবে, জামাটা স্রেফ সুতির। তাও তিনদিন আগে ভাঁজ ভেঙেছি। এখানে ওখানে কুঁচকে উঠেছে। পায়ের জুতোটাও পুরনো, ফাটা ধরণের। আগে

জানলে এসব পাল্টেপুল্টে ধোপ-দুরস্ত হয়ে আসা যেত। কিন্তু এখন আর কি করা যায়! দামী সিগেরেটের প্যাকেট আর ইংরেজি কাগজটাই যা ভরসা। আমি চোখেমুখে একধরণের ব্যক্তিত্ব আনার চেষ্টা করে গদীতে হেলান দিলাম।

শব্দ করে একটা স্টেশন পার হয়ে গাড়িটা খুব স্পীড নিল। আর কাগজ পড়া যাচ্ছে না। গাড়িটা ভীষণ দুলছে। ও পাশে ছেলে মেয়েরা আবার বকতে শুরু করেছে। মেয়েটির সোনালী রঙের চুলগুলো ছোট করে ছাঁটা, ঘাড়ের কাছে সামান্য উঁচু করে মোরগের মত ঝুঁটি বাঁধা হয়েছে। কথা বলার সময় অনাবৃত ফর্সা ঘাড়ের উপর ঝুঁটিটা কেমন নাচছে। আমি একপলক দেখেই চোখ ফিরিয়ে নিলাম, কেননা মহিলাটি এখনো আমাকে লক্ষ্য করছে।

এই কামরাটা কেমন সুন্দর ফাঁকা ফাঁকা। এতগুলো আসনে ক'জন মোটে প্রাণী। মাথার উপর দেখ এক, দুই...পাঁচটা পাখা, পাঁচটা লাইট। দেয়ালে আয়না, আসনের সঙ্গে এসট্রে, নরম পুরু গদী। বাইরে তৃতীয় শ্রেণীর কামরাগুলোতে এক ইঞ্চি জায়গার জন্য যখন প্রলয়কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে তখন এখানে তুমি উপরে-নীচে যেখানে খুশি দিব্যি হাত পা ছড়িয়ে শুয়ে যেতে পার। রেল কোম্পানী শুধুই ত আর চারগুণ পয়সা নেয় না! আরামে আলস্যে আমার কেমন যেন শুয়ে পড়তেই ইচ্ছে করছিল। মিথ্যে বলব না, এই আমার তেত্রিশ বছর বয়স হ'ল, এর আগে এত আরামে আমি কোনোদিন ট্রেন জার্ণি করিনি। কোন্নগর থেকে অফিস-টাইমে দু'একবার ফার্স্ট'ক্লাসে চেপে বসেছি বটে কিন্তু সে ত ধনীলোকের বাড়ির ভোজসভায় চুরি করে পাত পাতা। একবার ত এক ছোকরা চেকারের সঙ্গে হাতাহাতি হবারই উপক্রম, আমি যত বলি, 'থার্ডক্লাসের মান্থলি ত কি হয়েছে মশাই, জায়গা না থাকলে করি কি!' সে বলে, 'পরের ট্রেনে এলেন না কেন?' আমি বলি, 'অফিসে যে লেট্ হয়ে যায়।' সে ফস্ করে রসিদ বই বার করে, 'ওসব অজুহাত রাখুন। তিনটাকা তেত্রিশ লাগবে!' সঙ্গে ছিল শ্রীরামপুরের বৈকুণ্ঠ। সে চেকারের থুতনি

ধরে নেড়ে দিল, 'বাগানে টাকার গাছ পুতেছি স্যার, ফলুক— এনে দেব।'

তারপরই চিৎকার চেঁচামেচি। পরের স্টেশনে গাড়ি থামতেই চেকারসাহেব দৌড়ে খবর দিতে গেল। বৈকুণ্ঠ আমার জামা টেনে বলল, 'নিত্য, নেমে আয় শিগ্‌গির! শালা পুলিশ আনবে—'

এই কামরার নরম গদী-আঁটা আসনটায় আমি লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ব কিনা ভাবছিলাম। এমন সময় ট্রেনটা ঝাঁকুনি দিয়ে স্পীড্ কমিয়ে আনল। একটা বাচ্চা ছেলে চলন্ত গাড়ির জানালা-দরজা ধরে ঝালমুড়ি হাঁকতে হাঁকতে পার হয়ে গেল। আমার তখন মুড়ি খেতে ইচ্ছে করল। সেই কোন্ ন'টায় ভাত খেয়ে অফিসে এসেছিলাম। এখন বেলা গড়িয়ে প্রায় বিকেল। আমার খিদে পেয়েছে। তাছাড়া মুড়ি আমার খুব প্রিয়। ফেরার পথে রোজই লঙ্কা আদা পেঁয়াজ কুচি দিয়ে পনের পয়সার একঠোঙা মুড়ি খাই। আজ মুড়িওলাকে ডাকতে সাহস হ'ল না। বরং ছেলেটা যখন পার হয়ে যাচ্ছিল আমি এমনভাবে ওর দিকে তাকালাম যেন মুড়ি বস্তুটা আমার প্রায় অজানা, আর নিরিবিলি নির্জন প্রথম শ্রেণীর এই জানালায় ওর কর্কশ কণ্ঠের চিৎকার রীতিমত বেয়াদপি।

স্টেশনে গাড়ি থামতে আরো অনেক ফেরিওলার গলা পাওয়া গেল। কিন্তু এই কামরা-বরাবর বড় একটা কেউ এল না। একজন কমবয়েসী মেয়েমানুষ, দেখেশুনে গাঁয়ের চাষীদের বউ মনে হ'ল, একটা বছর পাঁচেকের বাচ্চার হাত ধরে এই কামরার সামনে এসে দাঁড়ানোমাত্র নেলী বলে উঠল, 'এই, এটায় ওঠো না, আগে যাও!' এত সুন্দর ছিমছাম মেয়ের গলা থেকে এমন কর্কশ স্বর উঠতে পারে আমার ধারণা ছিল না। আমি অবাক হয়ে ওর মুখ দেখলাম। আর তক্ষুনি ওর মা বলে উঠল, 'নেলী, ঘুরে ঠিক হয়ে বোসো, তোমার চুল নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।'

ট্রেনটা আবার ছেড়ে দিল। দেখলাম, বাচ্চার হাত ধরে সেই বউটা দৌড়ুচ্ছে। ভিড়ের জন্য কোথাও উঠতে পারে নি। কিন্তু

তাতে আমার মনে কোথাও কষ্ট হ'ল কি। আমি জানালা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি প্রসারিত করলাম। আশ্বিনের শুরু। মাঠে মাঠে ধানের চারা ঘন সবুজ হয়ে উঠেছে। গাছগাছালির মাথায় বিকেলের পড়ন্ত রোদ্দুর। এইমাত্র একটা খেলার মাঠ পার হয়ে গেল। ছেলেরা খালি গায়ে ফুটবল খেলছে। পাশের পুকুর ঘাটে গ্রামের মেয়েরা কাপড় কাচতে এসেছে।

এসব দেখতে দেখতে আমার আবার ধূমপানের ইচ্ছা দেখা দিতেই আমি ধীরে সুস্থে একটা সিগেরেট ধরালাম এবং বাতাসে ধোঁয়াটা সোজাসুজি ওই মহিলার নাকের কাছে উড়ে যাওয়ায় ওর ঈষৎ বক্র নাসারন্ধ্র ও চিবুক কুঞ্চিত হয়ে ওঠা সত্ত্বেও তেমন গ্রাহ্য না করে গদীর ওপর পা ছড়িয়ে দিলাম।

একটু পরেই মহিলাটির গলা শোনা গেল, 'বাবুল, তোর কি ঘুম পেয়েছে? বসে বসে ঢুলছিস কেন?'

ভদ্রলোকটি বলল, 'এদিকটায় শুয়ে পড় না।'

'না।' মহিলাটি যেন ধমকাল, 'এই অবেলায় শুয়ে কাজ নেই। হাত মুখ ধুয়ে আয় বাথরুম থেকে।'

নেলী বলল, 'এখন চা খাব মা?'

'চা ত নেই।' মহিলাটি বলল, 'ফ্লাস্কে কফি করে এনেছি। একটু পরে দেব। ওই ঝুড়ি থেকে ছুরিটা বার কর। বাবুল-টুটুলকে আপেল কেটে দিই।'

এমনসময় বাইরে 'চাই ডাব' বলতে বলতে একজন চলন্ত ট্রেনের দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। আমি কচিডাবের ছড়া দেখলাম। আমার আবার জল পিপাসা পেয়ে গেল।

লোকটা বলল, 'একটা দিই বাবু?'

অলস ভঙ্গিতে বললাম, 'দেবে? আচ্ছা কচি দেখে দাও একটা।'

'সবই কচি বাবু। মধুর মত মিষ্টি জল—'

'আর দক্ষিণা?' আমি ভুরু নাচিয়ে অল্প হাসলাম।

'এক টাকা বিক্রি বাবু। আপনি বারো আনা দেবেন।' লোকটাও খুব মিহি করে হাসল।

বুঝলাম, এই লোকটাও সঠিক শ্রেণী চেনে। তা না হলে আট আনার ডাব বারো আনা! খুব মনোযোগ দিয়ে ওর ডাব কাটা লক্ষ্য করলাম। মাঝবয়েসী রোগা বেঁটে লোকটা। দাঁ দিয়ে ডাব-কাটার সময় ওর লম্বাটে মুখটা ডানদিকে বেঁকে যাচ্ছিল, গলার রগ ফুলে উঠছিল, চোখ দুটো বড় বড় হয়ে সামনের দিকে ঠেলে আসছিল। মুখ কেটে ডাবটা আমার হাতে তুলে দিয়ে লোকটা ও-পাশে তাকাল, 'আপনাদের দিই বাবু?'

মহিলাটি বিরক্ত ভঙ্গিতে ঘাড় নাড়ল। লোকটা তবু বলল, 'একটা খেয়ে দেখুন মা, খুব ভাল, খুব মিষ্টি—'

'বললাম ত দরকার নেই!'

ভদ্রলোকটি নীচু গলায় বলল, 'বাবুল-নেলীরা খায় ত—'

'না! ট্রেনে আবার এসব আজেবাজে খাওয়া কি!' খুব উঁচু ঝাঁঝালো গলায় মহিলাটি যেন ধমকাল। যদিও বাচ্চাদের উদ্দেশ্য করেই বলা তবু মনে হ'ল আমার প্রতিও যেন কটাক্ষ করা হ'ল। ডাব ত খুব ভাল জিনিস, নির্মল নির্দোষ পানীয়। এবং অভিজাত। এতে আপত্তির কি থাকতে পারে! আসলে আমি এটায় হাত দিয়েছি বলেই কি জিনিসটার আভিজাত্য নষ্ট হয়ে গেল! আমি খুব আহত ক্রুদ্ধ ভঙ্গিতে মহিলাটির দিকে তাকালাম। মহিলাটি সামান্য ভ্রূকুটি করে বুকের আঁচল টানল।

ডাবওলা দাম বুঝে নিয়ে আবার জানালা ধরে অন্য গাড়িতে চলে যাওয়ার পর ট্রেনটা খুব জোরে হুইসল দিতে লাগল। বোধ হয় সিগ্‌ন্যাল ডাউন নেই। গতিও কমে আসতে লাগল। সামনে আর কোনো স্টেশনে এ গাড়ি থামার কথা নয়। কিন্তু লাইন ক্লিয়ার না পেলে মাঝ মাঠে দাঁড়িয়ে পড়তেই বা বাধা কি!

গাড়ির গতি আরো কমে আসতে ভদ্রলোক বলে উঠল, 'হোপলেস্! এর চেয়ে লোকাল ট্রেনে জার্নি অনেক ভাল।'

ধুমসি মেয়েটা জানালা দিয়ে গলা বাড়িয়ে বলল, 'কি হয়েছে বাপি, বল ত ?'

'কি করে বলি! কেউ চেন্ টেনেছে বোধ হয়।'

মহিলাটি বলল, 'এই নিয়ে তিনবার থামল! এখনও সারারাত বাকি—'

'আমি ত বলেছিলুম, কাল সকালের প্লেনে যাই চল—'

'আমার আপত্তি ছিল নাকি? প্লেনে চাপলে তোমারই ত প্রেসার বেড়ে যায়। নাও, কাপটা ধর, কফি দিচ্ছি—'

ট্রেনটা শেষবারের মত ঝাঁকুনি দিয়ে সত্যি সত্যি মাঝমাঠে দাঁড়িয়ে গেল! কি ব্যাপার জানার জন্য আমি জানালা দিয়ে মুখ বের করলাম। ডিসট্যান্ট সিগন্যাল দৃষ্টিগোচর হ'ল। লাল আলোর সঙ্কেত নিয়ে সোজা দাঁড়িয়ে আছে। লাইনের বাঁক ধরে যেন অনেক মানুষের একটা মিছিল যাচ্ছে। মিছিলের কালো মাথার ওপর লাল রঙের নিশান পড়ন্ত সূর্যের আলোতে দুলে দুলে জ্বলছে। আমি মিছিল দেখে অবাক হয়ে মাথাটা আরো একটু সামনের দিকে এগিয়ে দিতেই সবুজ ধান ক্ষেতের আল ধরে সারি সারি মানুষজন স্টেশনমুখো যেতে দেখলাম। কারো হাতে লাঠি, কারো কাঁধে ঝোলানো তীরধনুক, হাতে হাতে লাল ফ্ল্যাগ।

ট্রেনটা দাঁড়িয়ে পড়তেই দূর-অদূরের মিছিলের মানুষগুলো হাত নেড়ে, ফ্ল্যাগ নেড়ে শ্লোগান দিয়ে উঠল। দেখাদেখি ট্রেন থেকেও নেমে পড়ল অনেক মানুষ। নীচে দাঁড়িয়ে মিছিলগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে কি যেন বলতে লাগল। দু' একজন ছুটে গেল মিছিলের দিকে। ট্রেনের ড্রাইভার খালাসীরাও নেমে পড়ে ওদের কালিঝুলি মাখা রুমালগুলো আকাশে নাড়তে লাগল। সমস্ত ব্যাপার-টা একটা আলো ঝলোমলো উৎসবের মত মনে হ'ল।

আমার কামরার গোলগাল ভদ্রলোকটির মুখে উদ্বেগের ছায়া ঘনাল। স্ত্রীর দিকে তাকাল সে, 'হেনা, একটা গণ্ডগোল শোনা যাচ্ছে না?'

'হ্যাঁ। কিসের বল ত ?'

'ঠিক বুঝতে পারছি নে।' ভদ্রলোকও জানালা দিয়ে বাইরে মুখ গলাল।

আমি কাছাকাছি একজন মানুষকে আসতে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, 'এত মিছিল যাচ্ছে কেন ভাই ? মিটিঙফিটিঙ আছে নাকি ?'

'না, মিটিঙ নেই ত।' লোকটা একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে আমার মুখ দেখল, 'জমিদখল নিতে যাচ্ছে, ওই সামনেই, স্টেশনের লাগোয়া।'

'কি সর্বনাশ।' আমার সহযাত্রী শুনে আঁতকে উঠল। তাড়াতাড়ি মুখটা ভেতরে টেনে নিয়ে বলল, 'সাংঘাতিক কাণ্ড হেনা—'

'কেন ? কি হ'ল ?' মহিলাকণ্ঠ রীতিমত বিচলিত। ভদ্রলোকের গোলগাল মাংসল মুখ চুপসে কালো হয়ে উঠেছে। দ্রুত কাঁপাস্বরে বলল, 'গুণ্ডারা সব মিছিল করে স্টেশন লুঠ করতে যাচ্ছে।'

নেলী বলল, 'স্টেশন নয়ত বাপি, জমি ! ওই যে লোকটা বলল ?'

'তুই চুপ কর।' ভদ্রলোক খুব ব্যস্ত হয়ে আবার বাইরের দিকে তাকাল, 'হেনা, তুমি ওদিকটায় গিয়ে বোসো।'

'কেন ?'

'তোমার গলার হারটা······আমি জানালাটা বন্ধ করে দিই ?'

'বন্ধ করে দেবে ?'

'হ্যাঁ। বলা যায় না, যদি ওরা এদিকে চলে আসে ?'

'এদিকে ! কেন ? এদিকে আসবে কেন ?'

'আসতেও পারে ! দেশে আর আইন বলতে কি আছে ! নেলী, তোমার হাতের ঘড়িটা খুলে ফেল—'

ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি উঠে ভেতর থেকে দরজাটা লক্ করল। উত্তেজনায় তার মুখচোখ লাল হয়ে উঠেছে। জোরে জোরে শ্বাস পড়ছে। নেলী সত্যি সত্যি ওর কব্জির ছোট ঘড়িটা খুলতে শুরু করেছে। হেনা শাড়ির আঁচল জড়িয়ে গলার হারটা ঢেকে ফেলছে ! দেখেশুনে মনে হ'ল এই ট্রেনেরই কোনো কামরায় লুটপাট শুরু হয়ে গেছে।

অথচ গ্রামগ্রামান্তরের মানুষগুলো বেশ কিছুটা দূর দিয়ে মাঠের আল ধরে মিছিল করে যাচ্ছিল। অনেকগুলো ছোট মিছিল মিলে এখন একটা বড় হয়েছে। মিছিলের অগ্রভাগে সজ্জিত সেনাবাহিনীর মতো একটি দল, সমানতালে পা ফেলে এগিয়ে চলেছে। ধানের মাঠে এমন দৃশ্য আমি আর কখনো দেখি নি। দেখতে দেখতে রক্তের ভিতর কেমন যেন উত্তেজনা অনুভব করছিলাম। আমার মনে পড়ছিল অফিসে অটোমেশন আসছে। এলে আমরা ছাঁটাই হয়ে যাব। আমাদের অটোমেশন রুখতে হবে। মিছিল করে বেরুতে হবে রাজপথে। রাত জেগে পাহারা দিতে হবে অফিস। আমাদের ইউনিয়ন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। অটোমেশন আমরা রুখবই।

এমনসময় খট্ করে জানালা টেনে বন্ধ করল ভদ্রলোক। কুৎসিত মুখ করে বলে উঠল, 'তুমি বুঝছ না হেনা, কিছু না পারুক, ঢিল পাটকেল ওরা ছুঁড়বেই—'

আর তখুনি কি যে হ'ল আমার, ওই লোকটার গালে ঠাস করে একটা চড় মারতে ইচ্ছে করল। শুধু সন্দেহ আর অবিশ্বাস! ট্রেনের হাজার মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন শৌখিন আসবাবে মোড়া নির্জন এই কামরাটা কি শুধু মানুষের প্রতি সন্দেহ আর অপমান দিয়ে বানানো! এই কামরার মানুষ-ক'টার চোখে দেশশুদ্ধ্ সবাই কি শুধুই চোর-চোট্টা আর লুঠেরা ডাকাত!

এইসময় আমার মনে পড়ে গেল, আমি এই শ্রেণীর কেউ নই, কোনোদিন হতে পারি না। আমি আসলে একজন কেরাণী, আমার বাড়ি কোন্নগর রিফ্যুজি কলোনিতে, আমার বাবা একদিন হাঁটুর উপর কাপড় গুটিয়ে ওই মিছিলের মানুষগুলোর মতই জমি চাষ করত—

আমি একরকম হঠাৎ-ই উঠে দাঁড়ালাম। দরজা খুলতেই ভদ্রলোক হাঁস ফাঁস করে উঠল, 'না, না, খুলবেন না এখন, কেউ ঢুকে পড়বে!'

এতক্ষণ ওরা আমাকে করুণা করছিল, এবার আমি ওদের করুণা

করলাম। সামান্য হেসে বললাম, 'যারা ঢুকবার, ঢুকবেই। কতক্ষণ আর বন্ধ রাখবেন।'

নীচে তখন ট্রেনের মানুষে মিছিলের মানুষে যেন মেলা বসে গেছে। শব্দিত কোলাহলে আকাশ গম গমে।

আমি কামরা থেকে নেমে মানুষের ভিড়ে ঘাসের উপর পা রেখে দাঁড়ালাম। গোলাকার বাঙালি-সাহেব ত্রস্ত ভঙ্গিতে ঝাঁপিয়ে এসে দরজাটা আবার লক্ করে দিল।

আমি ফাইল আর সিগেরেটের প্যাকেটটা নিয়ে এসেছিলাম কিন্তু 'স্টেটসম্যান' কাগজটা প্রথমশ্রেণীতেই পড়ে রইল!

নন্দন

একটি মস্তানী গল্পের ভূমিকা

সম্পাদকমশাই, প্রতিশ্রুতি মতো গল্পটি এ মাসে পাঠাতে পারলাম না বলে দুঃখিত। সম্প্রতি আমি একটি গুরুতর ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েছি এবং মহান গণতন্ত্রের সাংঘাতিক শত্রু চিহ্নিত হয়ে জামিনে খালাস অবস্থায় মামলার তদ্বিরে ব্যস্ত আছি। সমস্ত শুনলে আমাকে নিশ্চয়ই মার্জনা করবেন।

কিছুদিন থেকে আমার ইচ্ছা, এ-কালের রকবাজ মস্তানদের নিয়ে জমাট একটা গল্প লিখব। হালের বাংলা সাহিত্যে এর খুব চল্ দেখছি। ছোট-বড়ো সবাই যে যার ক্ষমতা মতো এ তল্লাটে ঢুঁ মারছে আর রাতারাতি রামায়ণতুল্য বই নামিয়ে দু'হাতে পয়সা লুটছে। আমার নামডাক তেমন না থাকুক, তবু প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে থাকি কেন। আর এসব লেখা এমন কি আর কঠিন কাজ! বোমাপিস্তলমদমাগীনাচগানসহ দিব্যি বাঁধা একটা ছক আছে, সঙ্গে কিছু রাজনীতি, কিছু সমাজনীতি, কিছু হা-হুতাস, চোখের জল! ও টেকনিক আমি জানি। শুরু করতে পারলে শেষ করার ভাবনা নেই।

কিন্তু সম্পাদকমশাই, অত ফাঁকি দিয়ে আমি লিখতে চাইনি। ওদের হাবভাব ভাষাভঙ্গি চালচলন নিয়ে আমি একটু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে চেয়েছিলাম। ওদের ভাবনা-চিন্তার একটু ভেতরে ঢুকব বলে স্থির করেছিলাম। সংক্ষেপে, ওদের 'ক্যারেকটার স্টাডি' করতে গিয়েছিলাম। আর ওই হ'ল আমার কাল! এখন লেখাটেখা সব মাথায় উঠেছে, চাকরি নিয়ে টানাটানি। গণতন্ত্রের মহিমায় অধিকন্তু হাজতবাস না হয়ে যায়। বলি, শুনুন……

আমাদের গলির মুখে চায়ের দোকান। তার মুখোমুখি একটা পুরনো তিনতলা বাড়ির তেকোণা বারান্দা। সেখানে জনা সাতেক ছোকরা দিবারাত্র গুলতানি করে। ওরাই এ পাড়ার মস্তান। বয়স

আঠারো থেকে পঁচিশ। গড়পড়তা চেহারা, চোয়াল-ওঠা গালে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, রুক্ষ উড়ন্ত চুল, চোঙা প্যান্ট, হরেকরকম রঙের শার্ট, ঠোঁটে সিগ্রেট অষ্টপ্রহর ধূমায়িত। এ কালের মস্তান সমাজের অন্যসব গুণেও ওরা গুণান্বিত। অর্থাৎ চুরি-চামারিযোগে হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ বা পার্টওয়ান ফেল্, বেকারবাউণ্ডলে, চাকরির সন্ধানে মাঝেমাঝে ইতিউতি ঘোরে, মারামারির সময় সোডার বোতল বা লোহার রড নিয়ে দাপাদাপি করে, দাঙ্গার সময় দোকান লুঠের ধান্ধায় থাকে, শান্তিকালে চাঁদা তোলে, প্যাণ্ডেল বাঁধে, ফাংশন করে, ভোটপর্বে বড়বাবুর হয়ে পোস্টার লেখে, প্রচার করে, জিতলে প্রকাশ্যে মদ টেনে রাস্তায় টুইষ্ট নাচে এবং সবশেষে গলিমুখে বুকপিঠ-খোলা অথবা আখোলা বেপাড়ার কোনো তন্বী তরুণী দেখলেই সরব উচ্চকিত শিস ধ্বনিসহ 'আহ্, কলজেটা খুবলে নিয়ে গেল মাইরি' বলে আর্তনাদ করে ওঠে!

আমি যেতে আসতে ওদের দেখি। কখনো চাঁদা আদায়ে বাড়িতেও আসে। কথাবার্তা বড়ো একটা হয় না। সাধ্যমতো এড়িয়ে চলি। আপনি ত জানেন, আমি মানুষটা বড়ো নিরীহ, শান্তিপ্রিয়। কোনো ঝুট-ঝামেলা একেবারেই পছন্দ করি না। সেই বাল্যকাল থেকে শান্তশিষ্ট ছেলে হয়ে পড়াশুনা করেছি। এখন কোঁচানো ধুতির ওপর নিভাঁজ পাঞ্জাবি ঝুলিয়ে ছাতা মাথায় কলেজে পড়াতে যাই, একটা দুটো টিউশনি করি, ফাঁকেফুঁকে যৎসামান্য সাহিত্যচর্চা। ওইসব মস্তানেরা, প্রতিমাসেই পুলিশের কালোগাড়ী যাদের একবার করে সন্ধান করে, আমার কাছে ভয়ঙ্কর জীব। আমি সংক্রামক রোগের মতোই ওদের দূরে রাখি। কলেজের মাস্টার বলে ওরাও সম্ভবত আমাকে করুণাপূর্বক সামান্য সমীহ করে, কেননা চাঁদাপত্রের ব্যাপারে ওরা আমার ওপর খুব একটা চাপ সৃষ্টি করে না।

এখন গল্পের প্রয়োজনে আমি ওদের সঙ্গে একটু আলাপ করতে সচেষ্ট হলাম। ওদের দলনেতা ঢ্যাঙামতো একটা ছেলে। ভালো নাম জানিনে, সবাই ডাকে পটাশ বলে। আমি ভিড়বাট্টায় নাক

গলানোর ঝুঁকি না নিয়ে শুধু পটাশকেই হপ্তাখানেক 'স্টাডি' করব ঠিক করলাম।

সম্পাদকমশাই, তখন কি জানতাম, ওই পটাশের পেছনে ওৎ পেতে আছে যে কালোগাড়ী সে বাদবিচার করে না। নাগালের মধ্যে যাকে পায় টেনে তোলে! তারপর নিপুণ হাতে মামলা সাজিয়ে নির্ভুলভাবে প্রমাণ করতে চায় আমরা সবাই শত্রু, দেশের শত্রু, জাতির শত্রু। গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখছে একমাত্র বড়বাবুরাই!

এখন এসব থাক। ঘটনাটা বলি, শুনুন--

পটাশকে বাড়িতে ডেকে পাঠানোর জন্য মনে মনে তৈরি হচ্ছিলাম। এমনসময় এক রবিবারের সকালে দরজার কড়া সশব্দে বেজে উঠল। বেপরোয়া ভঙ্গি থেকে অনুমান করলাম ছাত্রটাত্র না, মস্তানরাই কেউ এসেছে। ওদের আবির্ভাব এমন সাড়ম্বরেই ঘোষিত হয়!

একটুপরেই মেয়ে নীলা এসে বলল, 'বাবা পটাশদা এসেছে।'

শুনে আমি নীলার মুখ দেখলাম। পটাশ কোন্‌দিন ওর 'পটাশদা' হয়ে গেছে টের পাইনি তো! ভাগ্য ভালো ওর বয়স এখনো তেরো পেরোয়নি। তাহলে আমাকে নতুন বাসা দেখতে হত!

বললাম, 'কেন? পটাশদা কেন? চাঁদা চাইছে বুঝি?'

'না। তোমার কাছে আসবে বলছে।'

'তাহলে পথ দেখিয়ে নিয়ে এস মা। আর দেরি করো না!'

আমার কথা বলার ধরণে নীলার মা মুখ টিপে হেসে অন্য ঘরে উঠে গেল। নীলা কি বুঝল কে জানে, বেশ গম্ভীর হয়ে পটাশদাকে আনতে গেল। আমি লাইব্রেরি ফ্রেমের চশমাখানা চোখে এঁটে অধ্যাপকসুলভ নিরীহ মহিমায় নিজেকে মণ্ডিত করলাম। এখন এ-পাড়ার স্বনামধন্য মস্তাননেতার সঙ্গে আমার মুখোমুখি সাক্ষাৎকার হবে। কে জানে, কি মতলবে এসেছে ও!

একটু পরে পটাশ ঢুকল। আমার আগামী গল্পের নায়ক। আমি দৃষ্টি তীক্ষ্ণতর করে ওর সর্বাঙ্গ খুঁটিয়ে দেখলাম। ওর বেশভূষা, চোখ-মুখ, হাতের চওড়া কব্জি, বোতাম-খোলা বুক, ডানগালের ছোট্ট একটি

আঁচিল······সবকিছু। দাঁড়ানোর সময় বাঁ দিকের হাতটা আধখানা প্যাণ্টের পকেটে ঢুকিয়ে ডানদিকে সামান্য ঝুঁকে থাকার ভঙ্গিটুকু পর্যন্ত দেখতে ভুল করলাম না। তাতে পটাশ বিশেষ বিরক্ত হয়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে উঠল, 'কি স্যার, চিনতে পারছেন না নাকি!'

আমি পরস্পরের সম্পর্ক সহজ করে তুলবার জন্য মৃদু হেসে বললাম, 'তোমাকে চেনে না কে? এ পাড়ায় আমরা ত তোমারই আশ্রিত।'

পটাশ ভুরু কুঁচকে, ডানগালের কালো আঁচিল নাচিয়ে, একটু খসখসে গলায় বলল, 'ঠাট্টা করছেন!'

আমি তৎক্ষণাৎ, 'আরে না না! আমার মেয়ে সবসময়ই বলে তোমার কথা···'

'কে? নীলু? ও স্যার একটা জিনিয়াস!' পটাশের সারামুখ মুহূর্তে দপদপিয়ে উঠল। এপাশে ওপাশে তাকিয়ে নীলাকে খুঁজতে খুঁজতে আরো দু'পা এগিয়ে এল। টেবিলের একটা কোণা খামচে ধরে উৎসাহে আবেগে দ্রুত বলে গেল, 'এই বয়সেই এমন গান গায় স্যার—একেবারে পাড়া মাৎ! আর দু'চার বছর গেলে আমাদের আর ফাংশনের জন্য বাইরের আর্টিস্ট আনতে হবে না! আপনি ওকে ঠিকমতো ট্রেনিং দিয়ে যান স্যার—'

আমি সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে মনে মনে ভাবলাম, পাড়ার ফাংশনে নীলার গান গাওয়া এবার বন্ধ করতে হবে। ও যথেষ্ট বড় হয়ে গেছে। এখন থেকে রাশ না টানলে পরে বানের জল ঘরে ঢোকার আশঙ্কা আছে। মুখে বললাম, 'তখন আমার চাঁদাটা একটু কম করে ধরবে তো?'

'কি যে বলেন স্যার, হেঃ···হেঃ···'

হাসবার সময় পটাশের একটা দাঁতও বের হ'ল না—গলায় এক রকম অদ্ভুত শব্দ হ'ল মাত্র, এটা খুব আশ্চর্য ঠেকল আমার কাছে। আমি মনে মনে নোট করলাম।

'তুমি বসো পটাশ।'

এই সাদর আমন্ত্রণে পটাশ খুব খুশি হয়েই চেয়ার টেনে বসে

পড়ল। টেবিলের ওপর থেকে কাঁচের পেপার ওয়েট্‌টা তুলে অকারণেই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। একটা বইয়ের মলাট উল্টাল, পিনকুশনটা থেকে একটা পিন তুলে আবার ঢোকাল। তারপর লাল পেন্সিলটায় হাত রাখল। এরা যে কত অস্থির, অসহিষ্ণু আমি নিঃশব্দে লক্ষ্য করলাম। রুচি ও সৌজন্যবোধের দিকটা অবশ্য আর ভাবলাম না। এই জেনারেশনের কাছে ওসব আশা করাই অন্যায়। ডাইরেক্ট ছাত্ররাই এখন নাকের ডগায় ধোঁয়া ছেড়ে সিগেরেট ফোঁকে, এরা ত তার তিনকাঠি ওপরে, পাড়া-কাঁপানো মস্তান! আমার সিগেরেটের বাক্সটা থেকে এতক্ষণে যে একটা তুলে নিচ্ছে না—এই টুকুই ত যথেষ্ট!

পেন্সিলের গোড়ার দিকটা কপালের মাঝখানে চেপে ধরে পটাশ বলল, 'এই গরীবের একটা উপকার করবেন স্যার?'

'কি?'

'আগে জবান্ দিন স্যার, করবেন?'

'জবান' শব্দটা কানে খট্ করে বাজল। মাথার ভেতরটা কেমন গরম হয়ে উঠল। মনে হ'ল শব্দটা মুখ ফসকে বেরিয়ে যাওয়ায় পটাশও যেন একটু বিব্রত। আমি রাগ করলাম না। শব্দটাকে প্রসন্নচিত্তে গ্রহণ করলাম। জানি, এই মস্তানদের একধরণের বিচিত্র ভাষা, বিচিত্র শব্দ, যাকে বলে নিজস্ব একটা 'কোড ল্যাংগুয়েজ' আছে। নানা জায়গা থেকে আমি তার কিছু সংগ্রহ করেছি। আমার গল্পে দরকার হবে। পটাশের কাছে আরো কিছু ক্রমে জেনে নিতে হবে। উচ্চারণভঙ্গি লক্ষ্য করতে হবে। অর্থ বুঝতে হবে। কাজেই এক 'জবান'-এই রাগ করলে চলবে কেন! শিল্পীকে নিরাসক্ত হতে হয়। না কি বলেন, সম্পাদকমশাই?

কিন্তু কি বলতে চাইছে ও? এ যে বিষম ভাবনার ব্যাপার! বাঘের গলা থেকে কাঁটা বের করার সামিল। শেষকালে হাতে দড়ি পড়বে না ত! শুনেছি দোকান-লুঠ-করা নানারকম চোরাইমাল ওদের হেফাজতে থাকে। অনেক দামী বিদেশী জিনিসের পাশাপাশি

নতুন শাড়ী জুতো চামড়ার স্যুটকেশ। পয়সায় টান ধরলে পাড়ারই চেনাজানা বাড়িতে ঢুকে একটু কমে-সমে বিক্রি করে দেয়। আমাকে কি কিছু কিনতে বলবে? মোটা টাকার কিছু? দিনকয়েক আগে হরতালের সময় বড়রাস্তার ঘড়ি-রেডিও-গ্রামোফোনের দোকানটা লুঠ হয়েছিল শুনেছি—

খুব নার্ভাস ভঙ্গিতে শুকনো গলায় বললাম, 'কি করতে হবে বল!'

পটাশ সেই লাল পেন্সিলের গোড়া দিয়ে গালের আঁচিলটায় সুড়সুড়ি দিতে দিতে বলল, 'আমার এক ভাই স্যার, এ বছর হায়ার সেকেণ্ডারী টপ্‌কে গেছে! আপনার কলেজে একটু ভর্তি করে দেবেন?'

শুনে শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হ'ল। চেয়ারে পিঠ এলিয়ে দিলাম।

'তোমার আপন ভাই?'

'হ্যাঁ।'

'তোমরা ক' ভাই বোন?'

'পুরো এক গণ্ডা!'

'তুমি বড়?'

'হ্যাঁ।'

দেখলাম, প্রশ্নের চাপে পটাশ বিরক্ত হয়ে উঠছে। ওর চোখের পাতা কুঁচকে গেছে। কপালে ভাঁজ পড়েছে। হাতের পেন্সিলটা গালের মাংসে গভীরভাবে চলেফিরে বেড়াচ্ছে। আমি একদিনে আর বেশী অগ্রসর হতে সাহস করলাম না। আস্তে আস্তে ওর পারিবারিক ইতিহাস আমাকে সমস্ত জানতে হবে। গল্পে আমি বাস্তবতার ছন্দ আনতে চাই। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ছাপ রাখতে চাই। আমি কাজের কথায় ফিরলাম, 'তোমার ভাই কোন্ ডিভিশনে পাশ করেছে?'

'দুই দাঁড়ি স্যার। তাইত কলেজে পড়ার জন্য তড়পাচ্ছে—'

'তা তোমাদের বছুবাবু ত শিয়ালদা কলেজের গভর্ণিং বডির প্রেসিডেন্ট। তাকে ধরলে না কেন?'

'শেয়ালদা কলেজ? ওটা ত একটা খাটাল। আর বহুবাবুর কথা বলবেন না স্যার—'

'কেন? কি হ'ল?'

'শ্লা এক নম্বর হারামি। ভোটে গাড্ডু মেরে আমাদের আর পাত্তা দেয় না!'

'হুঁ!'

এ বিষয়েও আমি আর প্রশ্ন বাড়ালাম না। শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ বসু এ তল্লাটের একজন ডাকসাঁইটে লোক। রাজ্যপাট এখন আর না থাকলেও ক্ষমতা কিছু আছে। ভালো না করুক আমার বিলক্ষণ ক্ষতি করতে পারে। ওই পটাশরা তার ডানহাত। একরকম তারই তালিমে তৈরি। কোনো কারণে এখন হয়ত একটু মন কষাকষি চলছে। কিন্তু সেটা দাম্পত্য কলহের মতোই, পরিণামে মিলনান্তক! মাঝখান থেকে বেফাঁস কিছু বলে আমি কেন বিপদে পড়ি।

বললাম, 'তোমার ভাইকে কাল আমার কলেজে যেতে বলো। কি করা যায় দেখব।'

পটাশ খুব খুসি হয়ে বলে উঠল, 'আপনি দেখলেই হয়ে যাবে স্যার! নিঘ্ঘাৎ!'

পটাশ চলে গেলে আমি এ বিষয়ে একটু ভাবিত হলাম। ওর ভাইকে কলেজে ভর্তি করে দেওয়া খুব কঠিন কাজ না, বিশেষ করে সেকেণ্ড ডিভিশনে যখন পাশ করেছে। কিন্তু পটাশের মতো একটা গুণ্ডা প্রকৃতির ছেলের কথা শুনে এই কাজটুকু আমি করব কিনা? ওর ভাইটা কি প্রকৃতির কে জানে! চুরি-চামারি করে পাশ করেছে কিনা তারই বা ঠিক কি। কলেজে ঢুকে যদি কিছু গণ্ডগোল বাধায় প্রিন্সিপ্যাল হয়ত ডেকে বলবেন, 'কেমন ছেলেকে রেকমেণ্ড করেছিলেন মশাই?' তখন রীতিমতো লজ্জার ব্যাপার হবে।

আবার ভর্তি না করার পক্ষেও কোনো যুক্তি নেই। এই পাড়ারই ছেলে। কাজেই একটা পাড়াগত কর্তব্য আছে! তার ওপর পটাশের ভাই—যে পটাশ কিনা আমার আগামী উপন্যাসের নায়ক! নায়কের

এই অনুরোধটুকু আমার রাখা উচিত। হয়ত এটুকু করলে ওর ভাইটা আর একটা পটাশ হওয়ার হাত থেকে সাময়িক রেহাই পাবে!

নম্বর কিছু কম ছিল তবু সায়েন্স গ্রুপেই ভর্তি করে দিলাম। দেখেশুনে মনে হ'ল পলাশ এখনও ততটা পেকে ওঠেনি। চালচলন কথাবার্তা বেশ মার্জিত। নাবালক মুখে নিম্নবিত্ত পরিবারের লাবণ্যহীন রুক্ষতা। জামা প্যাণ্টেও দারিদ্র্যের ছাপ। পটাশের সঙ্গে ওর মুখের মিল ছাড়া আর কোথাও বিশেষ মিল নেই।

ওকে ভর্তি করার পর পটাশ একদিন বলে গেল, 'খুব উপকার করলেন স্যার! ভুলব না।'

আমি বললাম, 'তোমাকে ক'টা কথা জিজ্ঞেস করি পটাশ—'

'বলুন, স্যার।'

'তোমার বাবা ত শুনলাম একটা ওষুধের দোকানে কাজ করেন। সামান্যই মাইনে পান। পলাশের পড়ার খরচ কে চালাবে?'

'কেন! বলেছি ত, আমি চালাব!'

'তুমি কোথায় পাবে?'

পটাশ একটুও না ভেবে বলল, 'সে আপনি ভাববেন না। পয়সা রোজগারের রাস্তা অনেক!'

'বতুবাবু দেবে?'

'বতুবাবু?' দপ্ করে যেন জ্বলে উঠল পটাশ, 'শালা বেইমানের পয়সায় আমি পেচ্ছাপ করি!'

'পেচ্ছাপ' শব্দটা তীরের মতো কানে এসে বিঁধল। আমি অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিলাম। পটাশ খুব উত্তেজিত। ওর কোনো ভাবান্তর ঘটল না। বতুবাবুর নামে অমার্জিত কর্কশ গলায় আরো কিছু গালাগালি দিয়ে চলে গেল সে। বুঝলাম, কলহটা এবার বাড়াবাড়ি রকমের। তারপর পটাশ চলে যাওয়ামাত্র আমি ডাইরী খুলে বসলাম। ওর ক্রুদ্ধ চেহারার ভঙ্গিটি বড় মনোরম—ছবির মতো এঁকে ফেলতে হবে। আর ওই গালাগালির শব্দগুলিও একটি একটি করে লিখে রাখতে হবে। আমার উপন্যাসের নায়ক হবে রক্তমাংসের

জীবন্তমানুষ। অন্তত তার বহিরঙ্গে কোথায়ও কোনো খুঁৎ রাখব না।

সম্পাদকমশাই, তারপর বেশ কিছুদিন পার হ'ল। পটাশের আর দেখা নেই। আমি লেখার কাজটা সবে শুরু করেছি। পটাশকে একবার দরকার। অথচ ত্রিতল বাড়ির বারান্দা ক'দিন থেকে ফাঁকা। ওর বন্ধুরাও কে কোথায় গা ঢাকা দিয়েছে। গলির মুখে একটা পুলিশের গাড়ি কদিন হ'ল আনাগোনা শুরু করেছে। ওদের অদৃশ্য হওয়ার সঙ্গে গাড়িটার কোনো যোগ আছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

শুধু শ্যামল রঙের সেই পাতলা মেয়েটি, যার মাথায় চুল বিস্তর, চোখদুটো ভাসাভাসা, মুখখানা টলটলে ও গভীর, সে প্রত্যহ একটা উদাস ভঙ্গি নিয়ে দক্ষিণের হলুদবাড়ির জানালায় রাস্তার পানে চেয়ে বসে থাকছে। তার সঙ্গে পটাশের প্রেম আছে বলে আমার বিশ্বাস। কারণ একদিন আমি মেয়েটাকে ওপর থেকে কমলালেবু ছুঁড়তে এবং নীচে থেকে পটাশকে কোমর দুলিয়ে তা লুফতে দেখেছি। এতে যদি প্রেম প্রমাণ না হয় তা হলে কাহিনীর প্রয়োজনে সেটুকু আমাকেই বানিয়ে তুলতে হবে। কারণ আমার লেখায় ওকেই নায়িকা করতে হবে। তারপর যথারীতি মানসিক ভাব ও শারীরিক তাপ বিনিময়ের—

কিন্তু পটাশসাহেব গেল কোথায়? পলাশকে জিজ্ঞেস করে কিছু জানা গেল না। নীলার কাছে খোঁজ করলাম। দেখলাম ও অনেকের বাড়িই চেনে! বলল, 'গণেশদাকে ডেকে আনব বাবা? ওই টিনের ঘরগুলোতে থাকে—'

বললাম, 'না মা, তোমার গিয়ে কাজ নেই, পাশের বাড়ির মধুকে দিয়ে একবার ডাকিয়ে দাও!'

মিনিট দশেক পরে গণেশের আবির্ভাব। একটি ক্ষুদে মস্তান। বয়স বোধ হয় সতেরো পার হয় নি। নাকের ডগায় গোঁফের রেখা অস্পষ্ট। কিন্তু সমস্ত মুখটা পাথরের মতো শক্ত ও জমাট। বিড়ি টেনে টেনে ঠোঁটে কড়া পড়ে গেছে। হাতের কব্জিতে আবার একটা

রুমাল বাঁধা! ও না-কি ভালো গীটার বাজায়, নীলা বলছিল। এইসব ছেলেদের সম্পর্কে নীলার এমন কৌতূহল গভীর দুশ্চিন্তার বিষয়। কিন্তু বাসা বদলানোর কথা ভেবে কি লাভ! কলকাতার কোন্ গলি আজ মস্তান-শূন্য!

হঠাৎ ডাক পাঠানোয় গণেশ বিস্মিত। প্যাট প্যাট করে তাকিয়ে আছে। আমি ওকেও একটু 'স্টাডি' করতে করতে বললাম, 'তোমাদের পটাশ কোথায়?'

'কেন? তাকে কি দরকার?'

'আছে। কোথায় সে?'

'আগে কি দরকার বলুন!'

ওরে বাস্! ছোটোখাটো হলে কি হয়, এ যে একেবারে জাত গোখ্‌রো! কথা বললেই ফোঁস করে ওঠে!......ঠিক আছে! নায়কের সঙ্গে সহনায়ক করা যাবে ওকে। কিংবা প্রতিনায়ক। আর মাঝখানে ওই ড্যাবড্যাবে-চোখ মেয়েটা!—চমৎকার ত্রিভুজ হবে!

আমি খুব খুঁটিয়ে ওর মুখ পরীক্ষা করতে করতে বললাম, 'পটাশকে পাড়ায় দেখতে পাচ্ছি না কেন?'

'এখন কিছুদিন আসবে না।'

'কেন বল দেখি?'

গণেশ অল্পকাল চুপ করে থেকে গম্ভীর গলায় বলে উঠল, 'আপনি, শালা বঙ্কু বোসের লোক নন ত?'

'আরে, না-না!'

'পটাশদাকে ধরিয়ে দেবার জন্য বঙ্কু-শালা পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছে।'

'সেকি! পটাশ ত শুনেছি বঙ্কুবাবুর দলেরই ছেলে।'

'কোন্ শালা বলে? আমরা কারো কেনা গোলাম নই! বাপের রোজগারে সংসার চলে না, দিনভর পেটে ছুঁচো ডন মারে। তাই পয়সা নিই, ভোটে খাটি, পোস্টার চিটাই—'

খুব দ্রুত বলে গেল গণেশ। যেন শেখানো বুলি মুখস্থ বলছে! স্বরগ্রামের বিশেষ কোনো ওঠা-নামা নেই। মুখটাও ঠাণ্ডা, রেখাবিহীন,

শক্ত। এ মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে শরীরের স্নায়ুকোষে কেমন যেন একটা শীতল শিরশিরানি জাগে। মনে হয়, এই ছেলেটা খুব ঠাণ্ডা মাথায় ধীরে-সুস্থে ছুরি চালিয়ে মানুষ খুন করতে পারে। এই সতেরো বছর বয়সেই !

গণেশের সঙ্গে কথা বলতে আমার মোটেই ভালো লাগছিল না। কেমন যেন রুচিতে বাঁধছিল, ভয়-ভয় করছিল। ওর মধ্যে সভ্যতা ভব্যতার লেশমাত্র নেই। ওর দাঁড়ানোর ভঙ্গি, কথা বলার ভঙ্গি, চোখের চাউনি, সমস্তই অতিশয় কদর্য। পটাশের পেটে কিছু কলেজের বিদ্যা আছে। এটা মনে হয় একেবারে গো-মূর্খ। ও কি করে গীটারে সুর তোলে !

বললাম, 'ঠিক আছে, তুমি যাও গণেশ।'

গণেশ যেতে যেতে ঘুরে দাঁড়াল। বলল, 'পটাশদার কোনো দোষ নেই। যত দোষ ওই বদে শালার। ও-ই পটাশদাকে ডেকে অপমান করেছে। বাপ তুলে খিস্তি দিয়েছে। আমি শুনেছি। পটাশদা তাই মাঝরাতে বড়খোকা ঝেড়ে দিয়েছে দু'খানা—'

'বড়খোকা কি ?'

'জানেন না ? ছ্যাছোও ! এই যে এই সাইজ—'

ডানহাতের পাঁচ আঙ্গুলের মুদ্রায় একটা গোলাকার বস্তুর রূপ ফুটিয়ে তুলল গণেশ। ঠোঁটে একটু হাসি ঝুলিয়ে রেখে বলল, 'আমিও ঝাড়ব একদিন শালার টাকে। শালা খচ্চর দি গ্রেট্ ! ভোটের আগে এবার পাকা কথা হ'ল—হারুক জিতুক ওর এলুমিনিয়ম কারখানায় আমাদের দু'জনের চাকরি দেবে। এখন বলে কিনা, কাজ কই, চাদ্দিকে ছাঁটাই চলছে, কারখানাই না উঠে যায় ! শালা চারশ বিশ। হালে বুকনি ঝাড়ছে, গদী গিয়ে আমার আয় কমে গেছে। বস্তির ঘরভাড়া বাড়াতে হবে। একলাফে শালা দুনো—'

বলতে বলতে হঠাৎ-ই থেমে পড়ল গণেশ। ওর শক্ত জমাট মুখ পূর্ববৎ নির্বিকার। হৃদপিণ্ডের উত্তেজনা শুধু চোখের মণিতে ঝিকুচ্ছে। কয়েক সেকেণ্ড চুপচাপ থেকে বলল, 'পটাশদা এলে আপনার কাছে

আসতে বলব। আপনি খুব ভালো লোক। ওর ভাইকে কলেজে ভর্তি করে দিয়েছেন। আমি এখন যাচ্ছি।'

গণেশ চলে গেল। আমি নিঃশব্দে ওর যাওয়া দেখলাম। ঘর খালি, তবু মনে হ'ল গণেশের নিরুত্তাপ শীতল উপস্থিতি প্রবলভাবে স্পন্দিত হচ্ছে। কি যেন একটা আছে ওর মধ্যে। সেটা জমাট বাঁধা হতাশা অথবা ঘনীভূত হিংস্রতা কিংবা দু'য়েরই মিশ্রণজাত একটা অদ্ভুত রোমাঞ্চকর কিছু—বুঝে উঠতে পারলাম না। সদ্য-কৈশোর-উত্তীর্ণ এই ছেলেটিকে ভীষণভাবে ঘৃণা করতে গিয়েও হঠাৎ মনে হ'ল পটাশের বদলে ওকেই যদি নায়ক করি, কেমন হয়? আমি মনে মনে প্লটটাকে আবার একটু নতুন করে সাজানোর কথা ভাবলাম।

না, সম্পাদকমশাই, ওদের প্রতি আমার কোনো সহানুভূতি নেই। সমর্থন ত নয়ই। আমি ওদের উৎস খুঁজতে চাই না, ছুঁতে চাই না হতাশার বেদনাকে, যেতে চাই না সমাজ-অর্থনীতির মূলে, শুধু ওপর থেকে চোখ বুলিয়ে দেখা, কিছু অনভ্যস্ত চালচলন ও ভাষা শিখে নেওয়া, আর তারই পটভূমিতে গড়ে তোলা একটি সুরম্য রচনা। যার নায়ক হবে পটাশ কিংবা গণেশ, নায়িকা দক্ষিণের ওই হলুদ-জানালা। সেই পুরনো প্রেম-প্রেম খেলা, মনের চকিতচপল উচ্ছ্বাস, শরীরের তাপউত্তাপ ছড়ানো! তার বেশী আর কিছু ইচ্ছে নেই আমার। ক্ষমতাও নেই, কেন না ওরা যা, আমি তা নই। ওদের সঙ্গে আমার পার্থক্য দুস্তর। আমি কি পারি, ওদের আঁতের কথা টেনে বার করতে? ওদের জন্ম-রহস্যের মূলে যেতে?

……গল্প লেখার কাজ শুরু হয়ে গেল। এগিয়েও চলল তরতর করে। এমনসময় একরাত্রে হঠাৎ পটাশ এসে হাজির। চুল এলোমেলো, মুখ শুকনো, ডানগালের কালো আঁচিলটা গভীর ক্ষতের মতো দগদগে। ঢুকেই আবার দরজা বন্ধ করে দিল ও। কোণের দিকে একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল। ওর বাঁ হাতের দুটো আঙুল জড়িয়ে বড়ো একটা ব্যাণ্ডেজ নজরে এল।

'হাতে কি হ'ল তোমার?' আমি কৌতূহলী হয়ে উঠলাম।

'ও কিছু না।' পটাশ স্বভাবমত কাঁধ ঝাঁকাল।

'কিছু না কি! অনেকটাই জখম হয়েছে মনে হচ্ছে?'

'সামান্য।'

'কি করে হ'ল?'

'ইয়ে মানে একটা বোমায় সুতো জড়াতে গিয়ে...'

'তুমি নিজের হাতে বোমা বানাও?'

'বানাই। একনম্বরী মাল হলে আমাকেই বাঁধতে হয়! আর কেউ পারে না।'

'গণেশ?'

'ও'ত ছেলেমানুষ! এখন পর্যন্ত মশলা মাখতেই শিখল না!'

'তুমি বদুবাবুর বাড়িতে বোমা ছুঁড়েছিলে?'

'আপনি জানলেন কোত্থেকে?'

'গণেশ বলেছে।'

'ছুঁড়েছিলাম। সেদিন ব'লি নি স্যার আপনাকে, শালা হাড়ে হাড়ে বেইমান! বস্তী থেকে এখন আমাদের উঠিয়ে দিতে চায়।'

'তোমরা উঠে যাবে?'

'এক শালাও না! ওইখানেই থাকব। ওই হারামির বুকের ওপর। হিম্মৎ থাকে উঠাক দেখি কাওকে—'

'তোমার বাবা বুড়োমানুষ, সামান্য চাকরি করেন...'

পটাশ ঠোঁট কামড়ে কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলে উঠল, 'আমি আছি কি করতে! সেদিন দুটো ঝেড়ে এসেছি, আবার ক'টা ঝাড়লেই বদুবাবুর সাতগুষ্টি বরফ বনে যাবে!'

আমি প্রসঙ্গ পাল্টে নিজের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রাখলাম, 'তোমরা বোমা কি দিয়ে বানাও? মালমশলা কোথায় পাও?'

পটাশ অবাক হয়ে গেল, 'আপনি জেনে কি করবেন?'

'কাজ আছে। বল না—'

পটাশ চুপ করে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। চোখে ক্রূর সন্দেহ। চোয়ালদুটো কঠিন। মনে হ'ল আমাকে পুলিশের

লোক ভাবছে ও। ইনৃফর্মার! অথচ ঠিক বিশ্বাসও করতে পারছে না। ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা বাঁ হাতটা তুলে আস্তে আস্তে গালে বুলোচ্ছে। যেন একটা ভারি ধাঁধায় পড়ে গেছে!

স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য আমাকে বলতেই হ'ল, 'একটা গল্প লিখছি, তাতে দরকার হবে।'

'আমাদের নিয়ে গপ্‌পো?'

'হ্যাঁ!'

'তাই বলুন!' খুশি হয়ে হেসে ফেলল এবার পটাশ, 'স্যার, সিনেমা হবে? 'আপনজনে'র মতো?'

'এখনই কি বলা যায়! আগে লিখি—'

'লিখুন স্যার! বেশ জম্পেস্ একটা গপ্পো লিখুন! বোমা তৈরির সবরকম ফর্মূলা আপনাকে আমি শিখিয়ে দিচ্ছি!'

'আস্তে বল, টুকে নিই......'

......মিনিট দশেক পার না হতেই বাইরে দ্রুত পদশব্দ। পরমুহূর্তে দরজায় অস্থির করাঘাতের সঙ্গে চাপাগলা, 'পটাশদা জল্‌দি কাট্ মারো। খটাসের বাচ্চারা গলিতে ঢুকেছে!'

শুনে মুখের হাসি-হাসি ভাবটা মিলিয়ে গেল পটাশের। চোখ মুখ কঠিন ধারালো হয়ে গেল। তড়াক করে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল ও, 'চলি স্যার, পুলিশ এসে গেছে!'

তারপর আমাকে কিছু বলার বা বোঝার সুযোগমাত্র না দিয়ে দরজা খুলে রাস্তায় নেমে পড়ল। যে ওকে ডাকতে এসেছিল, মনে হ'ল গণেশ। পলকের মধ্যে দু'জনেই দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমার তখুনি মনে পড়ল, পটাশ এখন ফেরারি আসামী, ওকে ধরার জন্য পুলিশ জাল পেতে রেখেছে। স্বয়ং বত্থবাবু রিপোর্ট করেছেন ওর নামে। রাষ্ট্রপতির শাসনে বত্থবাবুদের লুপ্ত ক্ষমতা আবার ফিরে এসেছে। পুলিশ আবার ওদের আজ্ঞাবাহী। তখনই আমার কেমন জানি ভয় হ'ল। জেনেশুনে শত্রুকে ঘরে ঢুকতে দিয়েছি, বত্থবাবু যদি টের পান, আমার ক্ষতি হবে। আমাদের

কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে ওঁর খুব বন্ধুত্ব আছে। আর না, যথেষ্ট হয়েছে বাংলাদেশের পাঠকের জন্য গল্প লিখতে হলে এর চেয়ে বেশী অভিজ্ঞতা বা স্টাডির দরকার হয় না। এটুকুই ব৷ ক'জনে করে! এ বাড়িতে আর ঢুকতে দেব না ওদের। আর কোনো কথাবার্তাও না। আগের মতোই ওরা ফিরে যাক ওদের জায়গায়। আমি উঠে আসি আমার স্বস্থানে,। মাঝখানে সেই পুরনো অবজ্ঞা ও উপেক্ষার প্রাচীর আবার উঁচু হয়ে দাঁড়িয়ে যাক।

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখে দরজা বন্ধ করার জন্য এগিয়ে গেলাম। আর তখুনি আমার ঘরের কাছেই কোথাও পরপর দুটো বোমা ফাটল। প্রচণ্ড শব্দে পাড়া কেঁপে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কিছু চিৎকার, হৈ-হল্লা, ছুটোছুটি, ভারি বুট জুতোর শব্দ। কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে আবার একটা বিস্ফোরণ! বুঝলাম, সামনের গলিতে গণেশ-পটাশদের সঙ্গে পুলিশের খণ্ডযুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে।

আমি সভয়ে দরজা বন্ধ করলাম। আমার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে নীলা আর নীলার মা। ওদের মুখেচোখেও আতঙ্কের ছাপ। আমি স্ত্রীকে রাস্তার দিকের জানালাটাও বন্ধ করতে বললাম।

আজ বোধ হয় পটাশ ধরা পড়ে যাবে। পুলিশ মনে হয় চারিদিক বেঁধে নেমেছে। কাঁদানে গ্যাসের সেল ছোঁড়ার শব্দ পাচ্ছি। বাতাসে ঝাঁঝালো গন্ধ আসছে।

না, পটাশের বুদ্ধির প্রশংসা করতে পারলাম না আমি। বঙ্কু-বাবুকে চটানো ওর উচিত হয়নি। যে ডালে বাসা সেই ডালে কি দা বসায় কেউ! এদ্দিন পুলিশের ঝুটঝামেলা থেকে বঙ্কুবাবুই ত বাঁচিয়ে এসেছেন ওদের। এখন ওরা আশ্রয়চ্যুত, কে বাঁচাবে?

অন্ধকার গলিঘুঁজিতে গা-ঢাকা দিয়ে ওরা কি-ভাবে পুলিশের আক্রমণ ঠেকায়—দেখতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু সে সাহস আমার নেই। পটকার শব্দে আমার বুক লাফায়। আমি বরং খেতে যাচ্ছি। নীলার মা ভাত বাড়তে চলে গেছে—

পটাশরা মরুক বাঁচুক, আমার কি এসে যায় তাতে! আমার কাছে

ওদের প্রয়োজন ফুরিয়েছে। অভিজ্ঞতায় যেটুকু ফাঁক আছে কল্পনায় পূরণ হবে। সাহিত্য ত বাস্তবের ফটোগ্রাফ নয়।

সম্পাদকমশাই, এতক্ষণ যা লিখলাম, ঘটনা যদি এখানে এসেই থেমে যেত, তাহলে আপনার কাছে সবিস্তারে কৈফিয়ৎ ফেঁদে গল্প না-দেওয়ার জন্য মার্জনা চাইতে হত না। বরং এরপর যা ঘটল তাকে বলা যেতে পারে অত্যাশ্চর্য, অকল্পনীয়। ঘটনার আকস্মিকতায় আমার সমস্ত বুদ্ধি লোপ পেল। এই সমাজ, রাষ্ট্র, রাষ্ট্রের আইন-কানুন সম্পর্কে সমস্ত ধারণা, সমস্ত মূল্যবোধ আমূল পাল্টে গেল। আমার শ্রেণী থেকে, স্পর্শকাতর অহমিকা থেকে, নির্বুদ্ধিতার স্বর্গ থেকে কে যেন চুলের ঝুঁটি ধরে সবলে এক হেঁচকা টানে সমতল-ভূমিতে নামিয়ে আনল। আমি আহত বিপর্যস্ত অবস্থায় দেখলাম, এখন এখানে, এই দেশে, পটাশ এবং আমি একই জায়গায় দাঁড়িয়ে, একই খাঁচার অধিবাসী! শুধু বৈদ্যনাথ বসুদের জাত আলাদা, গোত্র আলাদা—

হ্যাঁ, সম্পাদকমশাই, পুলিশ এল! আমারই ঘরে!

কৃষ্ণবর্ণ, নাতিদীর্ঘ, স্থূলোদর একজন—মনে হ'ল উচ্চপদের কেউ। তৎপশ্চাতে তিনজন মারমুখী সিপাই। অফিসারটি ঘরে পা দিয়েই কর্কশ গলায় হেঁকে বলল, 'আপনার ঘরে পটাশ ওরফে পূর্ণেন্দু এসেছিল। কোথায় সে?'

পুলিশ দেখেই আমি তখন ঘামতে শুরু করেছি। গলা শুনে রক্ত হিম হয়ে এল। কোনোগতিকে বললাম, 'সে ত চলে গেছে। অনেকক্ষণ—'

'কোথায় গেছে?'

'জানি না।'

'কোথায় থাকে সে এখন?'

'জানি না।'

'ইউ লায়ার—'

প্রচণ্ড শব্দে গর্জে উঠল অফিসার। সিপাইগুলো ঘরের এদিক-

ওদিক তাকাতে লাগল। আমার হিমশীতল রক্তে চনমনে জ্বালা দেখা দিল। 'লায়ার' শব্দটা প্রচণ্ড একটা হাতুড়ির মতো আমার হৃদপিণ্ডে ধাক্কা মারল। আমি সোজাসুজি তাকাতেই অফিসারটির জান্তব মুখ, কোমরের বেল্টে লম্বমান রিভলবার দেখলাম। দরজার ও-পাশে ভয়ার্ত নির্বাক নীলার মাকে দেখলাম, পাশে নীলাকে।

'আপনি সব জানেন! কিছুদিন থেকে এখানেই ওদের আড্ডা।'

'না, মিথ্যে কথা।' আমি ক্ষীণকণ্ঠে প্রতিবাদ করলাম, 'কে বলেছে এসব?'

'আমরা জানি!'

আরো ক'পা এগিয়ে এল লোকটা। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক জরিপ করল। তারপর সামান্য ঝুঁকে টেবিলের বই-খাতা দেখতে দেখতে হঠাৎ খোলা ডাইরীটা হাতে তুলে নিয়েই, যেন ফাঁদে বাঘ ধরার আনন্দে চেঁচিয়ে উঠল, 'মাই গড্! এসব কি? পটাশিয়াম, এক ধরণের গুঁড়োপদার্থ, রঙ হলুদ। নাইট্রিক এসিড, রঙ সাদাটে। কড়াই ভাঙ্গা, কাঁচের টুকরো, পেরেক, পাথরকুচি, পিকরিক এসিড……এ সব ত বোমা তৈরির ফর্মূলা!'

'হ্যাঁ!'

'কি সাংঘাতিক! শালা কুত্তার বাচ্চা! চলো থানায়। এই ভকৎ সিং…'

সম্পাদকমশাই, তারপরের ঘটনা আমি বিস্তারিত বলতে পারব না। আর তার দরকারই বা কি! সব শুনলে আপনি নিশ্চয়ই কষ্ট পাবেন। আপনার মনকে আমি অযথা পীড়িত করতে চাই না। খুব সংক্ষেপে শুধু দু'একটা ঘটনার উল্লেখ করি।

ওরা একরকম জামার কলার ধরে টানতে টানতে আমায় গাড়ীতে তুলেছিল। সেখানে আরো একজন ছিল। সে গণেশ। তার জ্ঞান ছিল না। মাথা দিয়ে রক্তের ধারা চোখে মুখে নেমে আসছিল।

একটা ভারি বুটজুতো ওর বুকের উপর চেপে বসেছিল। আমি গণেশের মুখের দিকে তাকাতে পারছিলাম না। গাড়ী চলতে শুরু করল। গণেশের সঙ্গে একই অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে আমি থানায় এলাম। আমার একটা কথাও কেউ শুনল না।

না, আমার ওপর তেমন মারধোর হ'ল না! সম্ভবত অধ্যাপক বলে খাতির করল! সেই অফিসারটি তলপেটে শুধু একটুখানি গুঁতো দিয়ে বলল, 'এখন তোমরা শালা তিলেখচ্চর বনে গেছ! কলেজগুলোতে বোমা তৈরির কারখানা বানাচ্ছ! পেঁদিয়ে সব লাশ করে দেব!'

একজন সিপাই হঠাৎ ঘরে ঢুকে, 'আরে এ চোট্টা ত বহুত বাবু হ্যায়' বলে গোঁফের ফাঁকে মুচকি হেসে মাথায় একটু লাঠির খোঁচা মেরে গেল।

তার রসিকতায় খুশি হয়ে অফিসারটি হাসতে হাসতে বলল, 'ধানাইপানাই ছেড়ে এখন লক্ষ্মীছেলের মতো বল ত, এসব বোমা তৈরির ফর্মূলা ডাইরীতে কেন লিখে রেখেছ? এ ত পটাশ-গণেশের ব্যাপার মনে হচ্ছে না, আরো গভীর জলের কাণ্ড! কোন্ মাঠে খেলছ, খোলসা করে বল দেখি ওস্তাদ!'

অনেকক্ষণ পরে গণেশের যখন পুরোপুরি জ্ঞান ফিরল, থানার মেঝেয় উঠে বসল ও। আমাকে দেখতে পেয়ে মুখ কালো করে বলে উঠল, 'আপনি এখানে কেন? ওই শুয়োরের বাচ্চারা আপনাকেও ধরে এনেছে?'

সঙ্গে সঙ্গে একটা লাথি পড়ল ওর মুখে। গণেশ আবার গড়িয়ে পড়ল।

সম্পাদকমশাই, গণেশের মতো একটা রুচিহীন, মূর্খ মস্তানের জন্য এই প্রথম আমার বুকের ভেতরটা টনটন করে উঠল। এই থানার চার দেয়ালের কদর্য বাতাসের মধ্যে ওকে আমার আপনজন বলে বোধ হ'ল। ওর জন্য আমার চোখের পাতা ভারি হয়ে এল।

শিয়ালদা'র ফার্স্টক্লাস ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে কোর্ট-ইন্সপেক্টর সদর্পে তেজীয়ান গলায় বলে গেল, 'ইওর অনার, এই লোকটি পেশায় অধ্যাপক হলে কি হবে, স্বভাবে একজন সাংঘাতিক হিংস্র লোক। পাড়ার সমস্ত এ্যান্টিসোস্যাল এলিমেন্টের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। তার প্রমাণ ওর নিজের ডাইরী থেকেই পাওয়া যায়। ওখানে পটাশ ও গণেশের নাম আছে। ওরা দু'জনেই পাড়ার নামকরা গুণ্ডা, দাগী আসামী। ইওর অনার, আমার নিশ্চিত বিশ্বাস, গত ১৮ই এপ্রিল, রাত্রি একটায়, পাড়ার বিখ্যাত সমাজসেবী, আইনসভার প্রাক্তন সদস্য, ক্যালকাটা এলুমিনিয়ম কোম্পানীর মালিক শ্রীযুক্ত বৈদ্যনাথ বসুর গৃহে তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে অতি মারাত্মক ধরণের যে দু'টি বোমা পটাশ ওরফে পূর্ণেন্দু কর্তৃক নিক্ষিপ্ত হয়েছিল—সেই জঘন্য চক্রান্তের সঙ্গে এই লোকটিও জড়িত!'

ম্যাজিস্ট্রেট বললেন, 'এ ব্যাপারে ওঁর কি স্বার্থ আছে?'

কোর্ট ইন্সপেক্টর বলল, 'এখনও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তদন্ত চলছে। তবে আমার দৃঢ় ধারণা, এই লোকটিই পাড়ার ছেলেদের বোমা তৈরি করতে শেখায়। কলেজ ল্যাবরেটরি থেকে বোমার মালমশলা সংগ্রহ করে আনে। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে এর যোগাযোগ থাকতে পারে। কারণ এর পড়ার টেবিলে ম্যাক্সিম গর্কির দু'খানা উপন্যাস, একটা চীনা গল্পসংকলন পাওয়া গেছে। ম্যাক্সিম গর্কি একজন কমিউনিস্ট লেখক ছিলেন। লেনিনের সঙ্গে তাঁর বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল।...সুতরাং এটাও ভাবা যেতে পারে যে, এই লোকটি হয়ত তার পার্টির গোপন নির্দেশে বিরোধীদলভুক্ত বৈদ্যনাথ বসুকে চিরতরে সরিয়ে দেবার জন্য সাময়িক কৌশল হিসেবে পটাশ-গণেশদের ব্যবহার করতে চেয়েছে। অথবা আরো হিংস্র কমিউনিস্ট পার্টি—নকশালপন্থীদের সঙ্গে লোকটার যোগাযোগ থাকাও অসম্ভব নয়......ওর ভিজে বেড়ালের মতো চেহারাটাই ওকে গভীর জলের মাছ বলে প্রমাণ করছে...'

ম্যাজিস্ট্রেট আবার বাধা দিলেন, 'ওঁর বাড়ীতে কি বোমা তৈরির মালমশলা পাওয়া গেছে?'

ইন্সপেক্টর ঘাড় নাড়ল, 'না ইওর অনার। ওঁর বাড়ী সার্চ করা হয়নি। তবে সাংঘাতিক ধরণের এই ছুরিটা ঘটনার দিন ওঁর টেবিলেই পাওয়া গেছে—'

একটি কাগজ-কাটা ছুরি এক্সজিবিট নং ২ হিসাবে ম্যাজিস্ট্রেটের টেবিলে রাখা হ'ল। আকারে ছুরিটা কিছু বড়ই। বহু ব্যবহারে মলিন ও ভোঁতা হয়ে আসায় কিছুদিন হ'ল শান দেওয়া হয়েছে। এখন ওটা চকচক করছে। ম্যাজিস্ট্রেট খুব গম্ভীর মুখে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে ছুরিটা পরীক্ষা করতে লাগলেন। কোর্ট-ইন্সপেক্টর বলে চলল, 'এই আসামীর জামিনের আবেদন না-মঞ্জুর করা হোক, ইওর অনার! কারণ শিক্ষা-দীক্ষা ও ভদ্রপোষাকের অন্তরালে এরা আসলে সাংঘাতিক জীব। সমাজের শত্রু, রাষ্ট্রের শত্রু, গণতন্ত্রের শত্রু...'

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ছুরিটা ফেরৎ দিয়ে গম্ভীরভাবে মাথা নাড়লেন। তার কি অর্থ বোঝা গেল না। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে থেকে আমার তখন আর ভয় করছিল না, এমন কি লজ্জা না অপমান না, এতটুকু সঙ্কোচও না। আমার শুধু প্রবল অট্টহাস্যে ফেটে পড়তে ইচ্ছে করছিল। কিন্তু আদালত-অবমাননার ভয়ে আমি হাসতে সাহস পাচ্ছিলাম না।

আরো তদন্ত সাপেক্ষে মামলা বিচারাধীন থাকল। জামিন মঞ্জুর হ'ল আমার। বাসায় ফিরে এলাম। তার একটু পরেই পটাশের ভাই পলাশ এল।

'স্যার।'

'বল।'

'আপনাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার ঘণ্টাখানেক পরেই দাদা বাড়ি এসেছিল।'

'কে পটাশ?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর ?'

'দাদা বলেছে, ওর জন্যে আপনার যেন কোনো ঝামেলা না হয়। দরকার হলে ও থানায় সারেণ্ডার করবে…'

থানার কথা বলতেই আমার অন্তরাত্মা শিউড়ে উঠল। সেই অফিসারটির কথা মনে পড়ল। গণেশের রক্তাক্ত মুখ চোখে ভাসল। আহত মুখের ওপর সেই অমানুষিক লাথিটার কথাও মনে পড়ল। তারপর আদালত, ম্যাজিস্ট্রেট, কোর্ট-ইন্সপেক্টর, এক্সজিবিট নাম্বার টু, রাষ্ট্রের শত্রু, গণতন্ত্রের শত্রু……পটাশ কি এসব জানে না ? নিশ্চয়ই জানে। জেনেশুনেও শুধু আমারই জন্য সারেণ্ডার করবে থানায় ? আশ্চর্য ! কাল রাত্রেই না আমি ওদের আমার অস্তিত্ব ও নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক ভেবেছিলাম ?

বললাম, 'না ! কখনোই যেন ও থানায় না যায়। আমার ঝামেলা আমিই কাটিয়ে উঠতে পারব। পটাশ গা ঢাকা দিয়ে থাকুক—'

হ্যাঁ, সম্পাদকমশাই, আমিই এই বুদ্ধি দিলাম ! গণতন্ত্র রক্ষা বড় কঠিন কাজ ! সমাজহিতৈষী বৈদ্যনাথবাবুদের আক্রমণ বড় ভয়ানক। তাদের স্বার্থরক্ষার জন্য পুলিশ চতুর্দিকে জাল পেতে রেখেছে। ধরতে পারলেই গণেশের মতো টেনে তুলবে হাজতে। ওরা ত জন্ম থেকেই পীড়িত, সাধ করে আর পীড়ন ডেকে আনার দরকার কি। তার চেয়ে আত্মরক্ষার জন্য যা করণীয় তা-ই করুক। অভিজ্ঞতায় চৈতন্য হলে বৈদ্যনাথদের ঠেকানোর জন্য আরো বোমা বানাক, আরো বোমা ছুঁড়ুক !

সম্পাদকমশাই, মস্তানদের নিয়ে যে লেখা শুরু করেছিলাম, তা ছিঁড়ে ফেলেছি। মামলা-টামলা মিটে গেলে আবার লিখব। তবে শুরুতে যেমন ভেবেছিলাম তেমন না। সে সব গল্প বাজারের ভাড়াটে লেখকেরা লিখুক। আমার পরগত অভিজ্ঞতা আত্মগত উপলব্ধিতে পৌঁছেছে। নিজের হাতে বোমা হয়তো কোনোদিন বানাতে পারব না, কিন্তু মানুষের গল্পের মধ্যে বোমার আগুন এখন থেকে আমি ভরে দেব।

উত্তরের জানালা

আমার খুব ভূতের ভয় ছিল বলে উত্তরের জানালাটা কিছুতেই খুলতাম না।

আমাদের বাড়ীর পাশেই ধানমাঠ। তিনটে মাঝারি মাঠ পার হলে একটা বড় পুকুর। পুকুরপাড়ে বাবলা গাছের ঝোপ, ফণীমনসার ঝাড়। দক্ষিণে অনেকদিনের পুরনো একটা নিমগাছ। ওই গাছের নীচু ডালে কে-একজন গলায় দড়ি দিয়েছিল। মা বলত, 'ন'পাড়ার ভুবন মণ্ডল, তোর মামাদের ভাই হয় সম্পর্কে।' মা ও বাবা দেখতে গিয়েছিল। আমি তখন আরো ছোট ছিলাম বলে আমাকে কেউ নিয়ে যায়নি। আমি আর দিদি ঠাকুমার ঘরে বসে ভূতের গল্প শুনেছিলাম। মা পুকুরে ডুব দিয়ে বাড়ি এসেছিল। বাবা এসেছিল অনেকক্ষণ পরে। আমি তখন খিদে পেয়েছে বলে কাঁদছিলাম।

মা বলত, ভুবনকে নাকি দেখেছি। চাষের সময় একহাঁটু কাদা নিয়ে মাঠ থেকে উঠে আসত। কুয়োতলায় ইঁট পেতে বসে গল্প করত। ঠাকুমার কাছে বিড়ির আগুন নিয়ে মাকে বলত, 'একবাটি চা কর সাবি, বড় চা খেতে ইচ্ছে করছে।' আমাকে নাকি কোলে নিত। মুখে চুমো খেয়ে বলত, 'ভারি দুষ্টু হয়েছে তোর খোকা। বড় হলে আমি জামাই করব।'......আমার কিছুই মনে নেই।

দুপুরের দিকে আমাদের বাড়িতে পুলিশ এসেছিল। বড়তলা থানার ছোট দারোগা বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'তোমার বাড়ি থেকে ওই নিমগাছটা ত দেখা যায়?'

বাবা ভয় পেয়ে বলেছিল, 'হ্যাঁ, দারোগাবাবু।'

'তা, কাল রাত্রে তুমি কিছু গোলমাল শুনেছ?'

মা দরজার ও-পাশ থেকে বলে উঠেছিল, 'আমি শুনেছি—'

বাবা খুব রেগে মাকে ধমকে উঠেছিল, 'তোমাকে কে বাহাদুরি

করতে ডেকেছে ? তুমি চুপ করে থাক !' ছোট দারোগাকে হাতজোড় করে বলেছিল, 'মেয়েমানুষের কথা কানে নেবেন না বড়বাবু, আমরা কেউ কিছু শুনিনি।'

নোট নিতে নিতে দারোগা নাকি হেসে বলেছিল, 'তুমি দেখছি খুব বুদ্ধিমান !'

আমি একটু বড় হয়ে দিদির কাছে এ-সব শুনেছি। মা দিদিকে বলেছিল, 'ভুবনকে কেউ মেরে রেখে গেছে। নইলে যোয়ান মানুষটা শুধু শুধু মরবে কেন !'

দিদি জিজ্ঞেস করেছিল, 'কারা মা ?'

মা বলেছিল, 'আমি জানি না। তোর বাবা জানে—'

বাবা আমাদের কিছু বলেনি। ঠাকুমা একদিন বাবাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'হ্যাঁরে তিনু, ভুবনকে নাকি কারা খুন করেছে ?'

বাবা চিৎকার করে উঠেছিল, 'তোমরা সবাই মিলে দেখছি আমাকেই খুন করবে!' মা ও ঠাকুমা ভয়ে চুপ করে গিয়েছিল। আর কেউ কোনোদিন ও-কথা তোলেনি।

সেই থেকে পুকুরপাড়ের নিমগাছটা আমাদের ভয়ের ছিল। আমাদের পাড়ার কেউ ওর কচিপাতা পাড়ত না, দাঁতনের জন্য ডাল ভাঙত না, বিয়ের সময় ওই পুকুরে কেউ জল ভরতেও যেত না। শুধু মুসলমানদের একটা ছেলে মাঝে মাঝে তরতরিয়ে উঠে যেত গাছে। পুকুরপাড়ে গরু চরতে দিয়ে একটা মোটা ডালে নিম-পাতার ছায়ায় সুন্দর ঠেস দিয়ে বসে থাকত। ওকে কেন ভুবন কিছু করে না, আমি মাকে জিজ্ঞাসা করতাম। মা বলত, 'ও যে মুসলমান, হিন্দুদের ভূত মুসলমানকে কিছু করে না।' আমি অস্পষ্টভাবে বুঝতাম, ভূতেদেরও একটা জাতবিচার আছে !

আমি একটু বড় হয়ে দিদির সঙ্গে ওই পুকুরে স্নান করতে যেতাম। সুন্দর টলটলে জল পুকুরটার। আমাদের পাড়ার অনেকেই স্নান করতে কাপড় কাচতে আসত। চাষের সময় ডুনী দিয়ে জল ওঠানো হত আর সেই জল নালা দিয়ে বয়ে যেত মাঠে। ন'পাড়ার সরকারবাবুদের

লোক ছাড়া আর কেউ তুনী লাগাতে পারত না। একবার কারা নাকি জল চুরি করেছিল। সরকারবাবুদের লোক মাঠ থেকে তাদের বীজধান কেটে নিয়েছিল। তারপর বড়তলার কোর্টে মামলা হ'ল। বাবা ফর্সা জামাকাপড় পরে সরকারবাবুদের হয়ে সাক্ষী দিতে গিয়েছিল। ফেরার সময় একঝুড়ি আম এনেছিল। আমি একসঙ্গে এত আম আর কখনো দেখিনি।

দুপুরবেলায় পুকুরঘাট ফাঁকা থাকত। দিদি আমার কোমর ধরে জলে শুইয়ে দিয়ে বলত, 'এবার হাত পা ছোঁড়, বুক ভাসিয়ে রাখ। এই ত··· হ্যাঁ, ঠিক হচ্ছে। তুই আর ক'দিনেই সাঁতার শিখে যাবি খোকন!'

দিদি সাঁতরে মাঝপুকুরে চলে যেত। আমি হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে ডাকতাম, 'আর যাস না দিদি। ডুবে যাবি। মা বকবে।'

দিদির জলে-ভেজা নরম মুখে দুপুরের রোদ পরে চিকচিক করত। খুব ফর্সা মনে হত তখন দিদিকে। অথচ দিদি বেশ কালো ছিল।

পুকুরের জলে দিদি পা দাপিয়ে খেলা করত। মুখে জল নিয়ে সূর্যের দিকে ছুঁড়ে দিত। দিদির মুখে রামধনুর রং জমত। ভর-দুপুরে বাতাস বইত হু-হু করে। মস্ত বড় নিমগাছের পাতা সর-সর করত। ডালে ডালে বাড়ি লেগে শব্দ উঠত কট-কট। কাকেরা ডানা ঝাপটে চিৎকার করত। আর ফণীমনসার ঝোপ থেকে কখনো একটা ঢাউস ব্যাঙ লাফিয়ে পড়ত জলে।

আমি ভয় পেয়ে ডেকে উঠতাম, 'দিদি, এই দিদি—'

দিদি শব্দ করে হাতেপায়ে জল কেটে তাড়াতাড়ি ফিরে আসত আর হাঁফাতে হাঁফাতে চোখ বড় বড় করে নিমগাছ দেখত। তারপর আমার হাত ধরে টেনে বলত, 'চল, বাড়ি যাই খোকন।'

মাঠের আল ধরে হাঁটতে হাঁটতে দিদি আবার ঘুরে নিমগাছ দেখত, 'তুই ভয় পেয়েছিস খোকন?'

আমি বলতাম, 'হ্যাঁ।'

দিদি বলত, 'খবর্দার! মাকে কিছু বলবি না।'

'না।'

আবার একটু হেঁটে বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে দিদি বলত, 'ওই গাছটায় ভূত আছে, জানিস?'

'জানি।'

'নিরু জ্যাঠা দেখেছে! সেদিন মাধবের ঝুনী ধরে নাকি টানছিল।'

'কেমন দেখতে রে!'

'কে জানে! নিরু জ্যাঠাকে জিজ্ঞেস করিস।'

মাছ না হলে আমি ভাত খেতে চাইতাম না। রাগারাগি করতাম। ঠাকুমা বলত, 'আমার সঙ্গে খাবি আয় খোকা। কেমন সুন্দর কচু সেদ্ধ মেখেছি—'

ঠাকুমা নিজের ছোট উনুনে আতপ চাল রাঁধত। সঙ্গে আলু কুমড়ো কি একটু মুগডাল সেদ্ধ। ভারি পাথরের থালাটা তোলানামা করতে পারত না বলে কলাপাতায় খেত। ঠাকুমার মাখা ভাত থেকে কেমন সুন্দর প্রসাদ-প্রসাদ গন্ধ উঠত। কিন্তু রেগে গেলে আমি তা-ও খেতে চাইতাম না।

মা বলত, 'আজ বিষ্যুৎবারে কি মাছ আনতে আছে রে খোকা!'

দিদি বলত, 'আজ ত মঙ্গলবার মা।'

মা বলত, 'ওই মঙ্গল-বিষ্যুৎ একই কথা। মাছ খেতে হয় শুধু রবিবারে।'

আমি বলতাম, 'কেন, আজ খেলে কি হয়!'

মা বলত, 'মাছের আঁশটে গন্ধ ভালো না। ভূতের দৃষ্টি পড়ে!'

দিদি বলে উঠত, 'ছাই! আসলে আমাদের পয়সা নেই—'

মা ঝাঁঝাল গলায় দিদিকে বকত, 'তুই চুপ কর দেখি, সুনু।'

আমি বলতাম, 'মা জান, নিবারণ জ্যাঠা ভূত দেখেছে!'

মা আমার হাত ধরে টেনে পিঁড়িতে বসিয়ে ভাত মেখে মুখে তুলে দিত, 'তুই খা দেখি এখন। নইলে সন্ধ্যে হলে ওই পুকুরপাড়ে রেখে আসব—'

মাঝে মাঝে বাবা মাকে খুব বকত, 'তুমি উঠতে বসতে ওকে কেন ভয় দেখাও !'

মা রেগে যেত, 'নইলে ছেলে তোমার কি কিছু শোনে ! সারাদিন গিলে খায় আমাকে—'

বাবা বলত, 'উঁহু, এ ভাবে ভয় দেখানো ভালো না।'

'ভালোমন্দ আমি খুব বুঝি !' উঠোন ঝাঁট দিতে দিতে মা ঝগড়া শুরু করে দিত, 'তোমার আর মোড়লিতে কাজ নেই। নিজের ধান্দায় যাও দেখি !'

ঠাকুমা বলত, 'না বাছা, আমি ভয় পাই না। রাম নাম করলে কি আর ভূত থাকে ! '

ঠাকুমা আমাকে একটা মন্ত্র শিখিয়ে দিয়েছিল। তাতে ভূতকে পূত এবং পেত্নীকে ঝি বলা ছিল ! এই অংশটা আমার ভালো লাগেনি। কিন্তু শেষের 'করবে আমার কি' খুব জোরে দম নিয়ে বুক ফুলিয়ে দ্রুত উচ্চারণ করতাম। তাতে নিজেকে খুব সাহসী মনে হত বলে আমার ভালো লাগত। এই মন্ত্র আমি ও দিদি দু'জনেই মুখস্থ করেছিলাম।

একদিন, যেদিন আমি নিরু জ্যাঠার বাড়ি গিয়েছিলাম, খুব ভয় পেয়েছিলাম। ভরদুপুরে দাওয়ায় বসে মাটির দেয়ালে পিঠ রেখে আফিঙের নেশায় ঝিমুচ্ছিল নিরু জ্যাঠা। আমার কথা শুনে মাড়ি বের করে হাসল। চোখ বড় বড় করে বলল, 'বললে পেত্যয় যাবি না খোকা ! আমি নিজের চোখে দেখেছি, এই লম্বা লিকলিকে বাঁশের মতন শরীর, চুণের মতো সাদা খুলি, চোখের কালো গর্তে কয়লার উনুন যেন খাঁ-খাঁ করে জ্বলছে ! সাঁঝবেলায় আমি পায়খানা ফিরতে গিয়েছি—'

আমি বললাম, 'তুমি নাকি জাল নিয়ে মাছ চুরি করতে গিয়েছিলে ?'

'মাছ চুরি ! কে বললে ! কোন শালা—'

খুব রেগে হাত-পা ছুঁড়তে লাগল নিরু জ্যাঠা। আমি বাড়ি

ফিরে আসছিলাম। যমুনা মাসীদের ঘর পার হলে একটুখানি খোলা জায়গা। তারপর ভাঙ্গাচোরা একটা নীলকুঠি। তার সবগুলো দেয়াল ধ্বসে শুধু একটা দাঁড়িয়ে আছে। তাতে মস্ত বড় তিনটে ফাটল। চারপাশে ইঁটের গাদা। আমরা সাপের ভয়ে কখনও কাছে যাই না। ভরদুপুরে সেই খোলা জায়গাটুকুতে এসে দাঁড়াতেই সহসা কি ঘটল। ঠিক আমার সামনেই শোঁ-শোঁ শব্দে খানিকটা বাতাস পাক দিয়ে ওপরে উঠে গেল। বাতাসে ছেঁড়া কাগজ, গাছের পাতা, চকচকে রাংতার মতো যেন কি, বনবনিয়ে ঘুরতে লাগল। তারপর গুমগুম শব্দে বাতাসটা তিনটে ফাটলে ঢুকে গেল। আমি দমবন্ধ করে শক্ত কাঠের মতো দাঁড়িয়ে থাকলাম। আমার বুকে তখন হাতুড়ির ঘা পড়ছিল।

সেই দিনই আমার জ্বর এল।

দিদি মাকে বলল, 'খোকন নিরু জ্যাঠার কাছে গিয়েছিল মা। ভয় পেয়ে এসেছে।' মা মুখ কালো করে আমার কপালে হাত রাখল, 'বলিস কি রে সুনু! ভয়ের জ্বর যে ভারি খারাপ রে।' বাবা শুনে মাকে আবার বকল। ঠাকুমাকে দিদিকে বকল। তারপর নিমু কোবরেজের বাড়ি থেকে ওষুধ এনে দিল। তিনদিন পার হয়ে গেল, আমার জ্বর সারল না।

ঠাকুমা কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'এ জ্বর ওষুধে সারবে না তিনু। তুই মজিলপুরের মধু ভট্‌চাযকে একবার খবর দে।' মা'ও বলল, 'তোমার দুটি পায়ে পড়ি, তাই নিয়ে এস একবার।'

বাবা লোক পাঠিয়ে মজিলপুরের মধু ভট্‌চাযকে বাড়ি আনাল। লম্বা দড়ি-দড়ি চেহারা মধুর। চোয়ালদুটো গরুর শিঙের মতো উঁচু। রক্ত-জবার মতো লাল চোখ। একটা চোখের মণি কেমন গলা-গলা। কালো শরীরে ধবধবে ফর্সা পৈতে।

সব শুনে খুব গম্ভীর হয়ে মাথা ঝাঁকাল মধু, 'হুম, ঠিকই ধরেছ তোমরা। ওই নিমগাছ থেকেই হয়েছে। অপঘাত মৃত্যু ত। আত্মা মুক্তি পায়নি। অতৃপ্ত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে—'

মা গলায় আঁচল জড়িয়ে বলল, 'কি হবে ঠাকুরমশাই—'

মধু বলল, 'গয়ার বিষ্ণুপদে পিণ্ডদানের ব্যবস্থা করতে হবে!'

বাবা বলল, 'কে যাবে পিণ্ডি দিতে? ভুবনের ত ছেলে নেই। সব মেয়ে। ছোট ছোট—'

মধু গলা-চোখ নাচিয়ে হাসল, 'তার ভাবনা কি! তোমরা পাঁচ জনে কিছু টাকা তুলে দাও আমাকে। আমিই না হয় আশ্বিনে যাব কষ্ট করে।'

মা চোখের জল মুছতে মুছতে বলল, 'খোকাকে আপনি সারিয়ে দিন ঠাকুরমশাই। পিণ্ডির ব্যবস্থা আমরা পরে করব!'

মধু বলল, 'তা দিচ্ছি! সে ক্ষমতা আমার আছে! কিন্তু পাঁচসিকে লাগবে মা লক্ষ্মী। একখানা নতুন গামছা আর পাঁচপো আতপ চাল, পাঁচটা কলা, পাঁচটা পান, পাঁচটা সুপুরি।' মা রাজি হতেই উঠে দাঁড়াল মধু। কাঁধের গামছাটা শক্ত করে কোমরে বাঁধল। পৈতেটা টেনেটুনে ঠিক করল। তারপর গলা চড়িয়ে মন্ত্র পড়তে পড়তে তুলসীতলা থেকে সামান্য মাটি তুলে আনল। মাকে বলল, 'একখানা হাত-পাখা দিন মা লক্ষ্মী।' তারপর আমার গায়ের জামা চাদর সরিয়ে উপুড় করে শুইয়ে দিল। মাটিটুকু পিঠের শিরদাঁড়ায় রেখে জোরে জোরে বাতাস করতে করতে মন্ত্র পড়তে লাগল। শীতে আমার সারা শরীর ঠকঠক করে কাঁপছিল। আমার হাত পা বুক ঠাণ্ডা হয়ে আসছিল। তেষ্টায় ছাতি ফেটে যাচ্ছিল। আমি ছটফট করে বললাম, 'মা, একটু জল।' মধু ভট্‌চায বিকট গলায় ধমকে উঠল, 'জল না, মুত খেতে দেব তোকে! হারামির বাচ্চা, শীগ্‌গির পালা!'

সেই রাত্রে আমার জ্বর আরো বেড়ে উঠতে বাবা ভোর-ভোর উঠে শহর থেকে শরদীশ ডাক্তারকে নিয়ে এল। আরো তিনদিন পরে আমি ভালো হয়ে গেলাম। বাবা হাট থেকে ছোট ছোট মাগুর মাছ আনল। মা হাঁড়িতে জল ঢেলে মাছ জিইয়ে রাখল। আমি হাতের ডানায় সূঁচ-ফোটানোর ব্যথা নিয়ে কতদিন পরে ভাত

খেলাম। তারপর থেকে মা, ঠাকুমা কি দিদি কেউ আমাকে ভূতের কথা বলত না। বাবা বলত, 'তুই খুব মন দিয়ে লেখা-পড়া কর খোকা। দেখবি সব ভয় কেটে যাবে।' মা বলত, 'তোদের নিরু জ্যাঠা ত পয়লা নম্বরের আফিঙ্‌খেকো রে! সন্ধ্যে হলে ওর কি কোনো জ্ঞান থাকে!'

আমাদের গাঁয়ের স্কুলে একজন অঙ্কের মাস্টার ছিল। দিনরাত চাষিপাড়া ডোমপাড়ায় ঘুরে দল বাঁধত। সরকারবাবুরা টের পেয়ে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। সেই মাস্টারমশাই বলত, 'তোর নাকি খুব ভূতের ভয় খোকন! সত্যি বুঝি!' তারপর কাছে এসে মাথায় হাত রাখত, 'তোদের এত ভীতু হলে কি চলে রে! হাতেপায়ে জোর কর। অনেক যে লড়তে হবে।' ন'পাড়া থেকে ছোটমামা এসে বলত, 'আর দু'দিন সবুর কর খোকন! তারপর ভূত-তৈরির সব কল-কারখানা আমরা ভেঙ্গে ফেলব।'

তবু উত্তরের জানালাটা আমি কিছুতেই খুলতাম না।

আমাদের বাড়িটা অনেকদিনের পুরনো মাটির দোতলা। এক-তলার একটা ঘরে ঘর-সংসারের জিনিষপত্র থাকে। আরেকটায় ঠাকুমা। ওপরের ঘরে চাটাই বিছিয়ে মোটাকাঁথা পেতে আমরা শুই। খড়ের চালা থেকে টিকটিকি লাফিয়ে নামে। চামচিকে বাসা বাঁধে। খুব ঝড় হলে দু'দিকের খড় উল্টে যায়। বৃষ্টি পড়ে। বাবা দিন সাতেক পর কাতু ঘরামিকে ডেকে খড়গুলো গুছিয়ে নেয়।

এই ঘরে আলকাতরা লেপা তিনটে জানালা। একটা উত্তর দিকে, বাকি দুটো পশ্চিমে। গরাদগুলো কাঠের, পাল্লাগুলো পুরনো, উইয়ে খাওয়া। অনেক কষ্টে টেনেটুনে লাগাতে হয়। হাতে কাঠের হলুদগুঁড়ি ছড়িয়ে পড়ে। আমি উত্তরের জানালাটা খুলতে চাইতাম না, কেন না তাহলে সোজাসুজি পুকুরপাড়ের ওই নিমগাছটা দেখা যেত। দিনের বেলা যেমন তেমন, সন্ধ্যে হলেই ওপরে উঠে জানালাটা বন্ধ করে দিতাম। তারপর হ্যারিকেনের আলো যথাসাধ্য উজ্জ্বল করে পড়তে বসতাম। দিদি স্কুলে যেত না। আমার সঙ্গে

বই নিয়ে বসে কখনো পড়ত, কখনো সেলাই করত। মা নীচের ঘরে রান্না করত। আমি ও দিদি খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়ার পর বাবা বাড়ি ফিরত।

খুব গরম পড়লে মা বলত, 'জানালাটা খুলে বো'স খোকন। সুন্দর বাতাস আসবে।'

আমি বলতাম, 'আমার যে ঠাণ্ডা লেগেছে!'

দিদি ঠোঁট টিপে হাসত, 'মিথ্যুক কোথাকার!'

আমি রাগ করে বলতাম, 'তোর ত ভারি সাহস। যা দেখি একা পুকুরঘাটে!'

দিদি বন্ধ জানালায় চোখ রেখে গম্ভীর হয়ে বলত, 'পারিনা না কি? খুব পারি!'

কিন্তু আমি জানতাম, দিদি পারে না। আমিও পারি না। এখন এই নিঝুম নিরিবিলি অন্ধকারে পুকুরপাড়ে ব্যাঙ ডাকছে। মাছেরা জলে ডানা ঝাপটাচ্ছে। বাবলার ঝোপে জোনাকিরা জ্বলছে। ধানমাঠে সাপেরা খাবার খুঁজছে। আর ওই কতদিনের পুরনো নিমগাছটা বিশাল ঝাঁকড়া শরীর নিয়ে বাতাসে দোল খাচ্ছে। তার কোটরে কাক শালিক চড়ুইরা বাসা বেঁধে আছে। তার সঙ্গে বাসা বেঁধেছে আর কেউ! বাঁশের মতো সরু লম্বা শরীর, চুণের মতো সাদা মাথার খুলি, চোখ যেন গণগণে পোড়া কয়লা, সে এখন গাছের মগডালে বসে শিস দিচ্ছে। এই জানালাটা খুললেই তাকে দেখা যাবে!

একদিন খুব জল-ঝড় হচ্ছিল। জানালার ছিটকিনিটা আলগা মতো ছিল। দড়াম করে খুলে গেল। আমি জেগে উঠে আকাশে বিদ্যুৎ চমকাতে দেখলাম। ভয়ে আমার সারা শরীরে কাঁটা দিল, আমি মাকে জড়িয়ে ধরলাম। মা জেগে উঠে বাবাকে ডাকল। বাবা সব জানালা বন্ধ করে বিড়ি ধরিয়ে বলল, 'খুব বিষ্টি হচ্ছে গো। কাল মাঠে লাঙ্গল নামবে।'

মা আবার শুয়ে পড়ে বলল, 'তাতে তোমার কি! তোমার ত আর জমি নেই।'

বাবা বলল, 'এককালে ত ছিল খোকার মা। বাবাকে ঠকিয়ে সরকারবাবুরা সব গিলে নিল।'

মা বলল, 'রাখতে না জানলে ওমনি হয়। কই নিক দেখি আমার ভাইদের জমি।'

বাবা মাটিতে ঘষে বিড়ি নিবিয়ে বলল, 'তুমি দেখ ত, দক্ষিণ কোণে যেন জল পড়ছে।'

মা উঠল না। শুয়ে শুয়েই রাগ করল, 'জলের আর দোষ কি। এই নিয়ে তিন সন তুমি খড় বদলাওনি।'

হাত বাড়িয়ে লণ্ঠনটা নিবিয়ে দিচ্ছিল। আমি বললাম, 'আলো থাক মা। আমার ভয় করবে।'

মা শুনল না। ঘর অন্ধকার করে আমাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলল, 'অত কেরোসিন কোথায় পাব খোকন!'

বাবা চাপাগলায় ধমকে উঠল, 'বারো বছর বয়স হয়ে গেল, এখনো ভয়! দেখগে তোর মতো ছেলেরা রাতভোর থেকে মাঠে ধান বুনছে। মুখ্যু কোথাকার!'

অন্ধকারে দিদি হেসে উঠল। আমি চুপ করে শুয়ে থেকে পুকুর পাড়ে বাজ পড়ার শব্দ শুনতে লাগলাম।

এইসময় একদিন ঠাকুমা মারা গেল।

গাঁয়ের লোক উঠোনে বসে বাঁশ কেটে মাচা বানাতে লাগল। মা তুলসীপাতা চন্দনে ডুবিয়ে ঠাকুমার চোখের পাতা বুঁজিয়ে দিল। বাবা একটা নতুন কাপড় দিয়ে সাড়া শরীর ঢেকে দিল। আমি মা দিদি কাঁদতে লাগলাম। বাবা ঠাকুমার দিকে চেয়ে একপাশে দাঁড়িয়ে চোখের জল মুছতে লাগল।

খবর পেয়ে ন'গাঁ থেকে আমার মামারা এসে গেল। বাঁধা-ছাঁদা হয়ে গেলে ছোটমামা বলল, 'তুই শ্মশানে যাবি নাকি খোকা?'

মা বলল, 'না নগেন, ওর গিয়ে কাজ নেই।'

ছোটমামা বলল, 'কেন? কি হবে গেলে!'

মা বলল, 'ওর মাদুলি আছে। শ্মশানে যাওয়া বারণ।'

ছোটমামার বয়স বেশী না। কালো শক্ত শরীর। নিজের হাতে হাল ধরে জমি চাষ করে। আমার হাতের মাদুলিতে আঙুল রেখে বলল, 'এটা কিসের জন্যে দিদি?'

মা বলল, 'জ্বরজারি, ভয়ডর—'

দিদি কাঁদছিল। কাঁদতে কাঁদতেই বলে উঠল, 'ভূতের মাদুলি ছোটমামা। ওই যে নিমগাছটায়—'

'কোন নিমগাছটায়' বলে ছোটমামা ঘাড় গলা উঁচু করে উত্তরের দিকে তাকাল। আর আমি দেখলাম, ছোটমামার চোখ তৎক্ষণাৎ অন্ধকারে বেড়ালের মতো জ্বলে উঠল, চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। নাকের পাটা ফুলে উঠল। হাত মুঠো করে ছোটমামা বলে উঠল, 'শালা! ভূত! ভূতের বাপের শ্রাদ্ধ করব আমরা।'

আমি কাঁদতে ভুলে গিয়ে ছোটমামার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে ভাবলাম, হঠাৎ কেন এত রেগে গেল!

একটু পরে ঠাকুমাকে কাঁধে তুলে 'হরিবোল' বলতে বলতে ওরা চলে গেল। তিনকোশ পথ হাঁটলে নদী। নদীর ধারে শ্মশানঘাট। সেখানে ঠাকুমাকে পোড়ান হবে। আমি কখনো শ্মশান দেখিনি।

পড়ন্ত বেলায় আমি মা দিদি পুকুরে ডুব দিয়ে এলাম। আমার শীত শীত করছিল। মা একটা শাড়ি ভাঁজ করে গায়ে দিতে বলল। দিদি শাড়ি এনে দিল। তারপর সন্ধ্যা হয়ে আসতেই মা একটা প্রদীপ জ্বেলে ঠাকুমার ঘরে রেখে এল। অন্ধকারে আমার গা ছমছম করছিল। বার বার ঠাকুমার কথা মনে পড়ছিল। ঠাকুমা বলত, মানুষ মরলে তারা হয়। আমি আকাশে তারা দেখছিলাম। পুব দিকে একটা তারা খুব জ্বলজ্বল করছিল। ওটা আমার ঠাকুমা কিনা আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম। মা বলেছিল, 'তুই একটু সরে যা দেখি। পায়ে পায়ে এমন ঘুরলে আমি কাজ করব কি করে!'

দিদি বলেছিল, 'আয় আমরা ওপরে যাই খোকন।'

তখন আমার মনে পড়েছিল আজ উত্তরের জানালাটা বন্ধ করা হয়নি। আমি দিদিকে বললাম, 'তুই আগে জানালাটা বন্ধ করে আয়।'

দিদি বলল, 'বেশ, বাবা বেশ। কি হ্যাকা হয়েছিস তুই!'

রাত্রে ঠাকুমাকে স্বপ্নে দেখে আমি কেঁদে উঠলাম। মা তিন দিন পরে মধু ভট্চাযের বাড়ি থেকে আরো একটা মাদুলি নিয়ে এল। মোম দিয়ে মুখ বন্ধ করে আমার কোমরে ঝুলিয়ে দিল।

তারপর থেকে আমি যেন আরও ভীতু হয়ে গেলাম। সন্ধ্যে হতে না হতে একটা অদ্ভুত ছম-ছমে ভয় মোটাসোটা ঘনকালো বেড়ালের মতো রোঁয়া ফুলিয়ে আমার পায়েপায়ে ঘুরঘুর করে। আমি তাকে তাড়াতে চাইলে হাল্কা পায়ে লাফিয়ে ঠাকুমার ঘরে ঢুকে যায়। সে ঘরে বাতি নিয়ে গেলে একলাফে উঠে আসে উঠোনে। তারপর লেজ তুলিয়ে চাপাগলায় গর গর করতে করতে পাঁচিল ডিঙিয়ে দৌড়ে যায় ধানমাঠে। সেখান থেকে তরতরিয়ে নিমগাছ বেয়ে একেবারে মগডালে উঠে যায়। তখন তার বাঁশের মতো লিকলিকে শরীর, চুণের মতো সাদা মাথার খুলি, চোখের কালো গর্তে লাল আগুনের শাসানি। আমি ভয়ে চোখের পাতা বন্ধ করতে পারি না!

আমাদের বাড়িটা এখন আরো পুরনো, ভাঙাচোরা। চালের খড় পচে গেছে। দেয়ালের মাটি ক্ষয়ে গেছে। উঠোন ঘিরে সেই কবে কোনকালে মাটির পাঁচিল তোলা হয়েছিল, জলেঝড়ে এখন অনেকটা ধ্বসে গেছে। বড় বড় গর্ত দিয়ে কুকুর বেড়ালেরা ঢুকে পড়ে। সন্ধ্যা হলে গোটা বাড়ি কয়লার মতো কালো অন্ধকারে ডুবে যায়। কুয়োর পাড়ে ব্যাঙ ডাকতে শুরু করে। ইঁদুরেরা লাফায়। চাষের সময় মাঠ থেকে হেলে-সাপ উঠোনে চলে আসে। ঠাকুমার ঘরে চামচিকেগুলো ডানা ঝাপটায়। কান পাতলে ভাঙা নীলকুঠি থেকে তক্ষকের ডাক শোনা যায়। সেই ডাক শুনে গোলা-পায়রাগুলো অন্ধকারে ডানা ফরফর করে।

একদিন রাতে ভাত খেয়ে আমি আর দিদি কুয়োতলায় আঁচাতে

গেছি। মুখ ধুয়ে দিদির জন্য জল তুলছি এমনসময় কালো কি একটা, কলাগাছের পাশ দিয়ে শুকনো পাতা মচমচিয়ে, আমার পা ছুঁয়ে দৌড়ে গেল ! তার চোখ জ্বলছিল। আমি ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম। বালতিটা জলে পড়ে গেল। দিদির গায়ে ধাক্কা দিতে দিদিও ভয় পেয়ে গেল।

মা রান্নাঘর থেকে চেঁচাল, 'কি হ'ল, এই খোকা, এই সুনু—'

আমার কথা বলার শক্তি ছিল না। আমি ঠকঠক করে কাঁপছিলাম।

দিদি বলল, 'কি যেন একটা খোকনের গায়ে এসে পড়েছিল—'

মা মুখ বাড়িয়ে বলল, 'লণ্ঠনটা নেবালি কি করে। দাঁড়িয়ে থাক, আমি দেখছি—' মা খুব তাড়াতাড়ি একটা বড় কাগজ পাকিয়ে উনুনে জ্বালিয়ে নিল। তারপর সেটা মশালের মতো উঁচিয়ে বাইরে এসে চারদিক ভালো করে দেখে বলল, 'ওই ত, ওই শেয়ালটা বসে ছিল। দেখ, এদিকে এসে দেখে যা খোকা—'

মা শেয়ালটাকে তাড়া করল। শেয়ালটা একলাফে ধানমাঠে নেমে গেল। আমি দেখলাম, ওইটুকু আগুনেই সারা উঠোন সুন্দর আলো হয়ে উঠেছে। মা'র রোগামতো ফর্সা মুখটা লালচে দেখাচ্ছে ! কলাগাছের লম্বা পাতার সবুজ রং চিকচিক করছে। আমি মা'র পেছনে পেছনে অল্প দৌড়ে গেলাম। তারপর কাগজটা নিভে সারা উঠোন আবার অন্ধকারে ডুবে যেতেই আমি মা'র হাত ধরে ঘরে উঠে এলাম।

দিদির হাত থেকে পড়ে লণ্ঠনের কাঁচটা ভেঙে গিয়েছিল। ওই একটা ছাড়া আর ছিল না আমাদের। মা দিদিকে বকতে বকতে এক সময় খুব রেগে হাত ধরে মুচড়ে দিল। অথচ দিদির তেমন দোষ ছিল না। দিদির জন্য আমার কান্না পাচ্ছিল।

একদিন সন্ধ্যেবেলায় যত রাজ্যের শুকনো ডালপালা ছেঁড়াফাটা কাগজ জড়ো করে আমি উঠোনে আগুন ধরিয়ে দিলাম। একসময় দপ করে জ্বলে উঠে সারা বাড়ি আলো করে দিল। আমি রক্তে এক

ধরণের অদ্ভুত উত্তেজনা অনুভব করতে করতে কোমরে হাত রেখে আগুনের আঁচে দাঁড়িয়ে থাকলাম। এইসময় আমার মুখেচোখে এক রকমের ক্রুদ্ধভাব ফুটে উঠেছিল এবং আমি ঘাড়গলা শক্ত করে উত্তরের দিকে তাকিয়ে ছিলাম।

মা চেঁচিয়ে বলল, 'শীগ্‌গির নিবিয়ে ফেল খোকা। এখুনি বাতাসে ফুলকি উড়ে খড়ের বাড়িতে লঙ্কাকাণ্ড হয়ে যাবে—'

দিদি জল নিয়ে ছুটে এল। আমি বালতি শুদ্ধু হাত চেপে ধরে বললাম, 'দিদি, আর একটু।'

মা আরো রেগে বলল, 'আসুক তোর বাবা।'

দিদি হাত ছাড়িয়ে জল ঢেলে আগুন নিবিয়ে দিল। আমি খুব রেগে দিদির চুল ধরে টেনে দিলাম।

বাবা একদিন আমাকে মারল। মা বাবাকে নালিশ করেছিল। আমি না-কি আগুন নিয়ে খেলা শুরু করেছি। রোজ রোজ রান্নার কাঠ সরাই, কেরোসিন চুরি করি। আমার জ্বালায় ঘরে একটুকরো কাগজ বলতে নেই। কাল বাতাসে উড়ে আগুনের ফুলকি চালায় পড়েছিল। আর একটু হলেই—

বাবা ঠাস করে গালে একটা চড় মারল, 'হারামজাদা, শুয়োর! কাঠ কেরোসিন কি মাগনা আসে!'

মা বলল, 'এক চড়ে কিছু হবে না! আরো ক'ঘা দাও তুমি!'

আমি দরজার কাঠে মুখ রেখে ফুলে ফুলে কাঁদতে লাগলাম। বাবা একটা ঘষা আয়না নিয়ে দাড়ি কাটতে বসল। দিদি আমার হাত ধরে টানল। আমি এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে নিলাম। মা বলল, 'ইস্, আবার তেজ দেখানো হচ্ছে! এদিকে সন্ধ্যে হলেই ত শেয়ালের ডাকে পেচ্ছাপ করিস—'

বাবা বলল, 'এই সংসারে এক পয়সারও যে কি দাম, তুই কি বুঝবি হতভাগা! ফের যদি কোনো জিনিস নষ্ট করিস—'

দিদি আবার হাত ধরে টানল। আমি শক্ত হয়ে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকলাম।

আরো ক'মাস পরে দিদির বিয়ে হয়ে গেল। বড়মামা ছেলে খুঁজে এনেছিল। মাকে বুঝিয়ে বলল, 'যোয়ান ছেলে ; বাপ-কাকার সঙ্গে ভাগে জমি চাষ করে। মোটা ভাতকাপড়ে টান পড়বে না।'

মা বলল, 'ও যে এখনো ছোট গো দাদা।'

বাবা বলল, 'হোক ছোট। এই মাঘেই বিয়ে—'

বড়মামা বলল, 'আমাদের একটাই ভাগ্নী। ঘর ভালো না হলে কি বলতাম তোকে।'

বিয়েতে মামারা আমাকে নতুন জামা-প্যাণ্ট দিল। সেইটে পরে আমি দিদিদের সঙ্গে পারুলডাঙ্গা গেলাম। তিন দিন পরে বাবা আমাকে আনতে গেল। দিদি দরজায় দাঁড়িয়ে খুব কাঁদছিল। বাবা বলল, 'কাজকম্ম সব গুছিয়ে করিস মা। হপ্তা দুই পরে আবার এসে তোকে নিয়ে যাব।' আমি তখন বাবাকেও কাঁদতে দেখলাম।

দিদির বিয়ের পর সমস্ত বাড়িটা আমার কাছে কেমন নিঃশব্দ নিঝুম হয়ে গেল। খাঁচা থেকে পাখি উড়ে গেলে খাঁচাটা যেমন হয়। ঘর বাড়ি উঠোন ফাঁকা, বিস্বাদ। বুকের ভাঁজে একটা কষ্ট। দুপুরে স্কুল না থাকলে বাড়িতে আমার মন ছটফট করে। ছেঁড়া কাপড়, কাঁথা সেলাই করতে করতে মা কখন ঘুমিয়ে যায়। তখন কুয়োতলায় সজনের ডালে বসে কাক ডাকলে আমার মন হুর-হুর করে। মাটির দেয়াল বেয়ে ঝুলন্ত ঢাউস গিরগিটিটাকে আমার কি জানি কি-একটা মনে হয়! আমি মাকে ঠেলে তুলতে পারি না। মা ভীষণ বকে।

সন্ধ্যাবেলায় ওপরের ঘরে একলা পড়তে বসে আমি কেবল জানালা দেখি। বাইরের আকাশে তারারা জ্বল জ্বল করে। ধান মাঠে ঢেউ দিয়ে বাতাস উঠে আসে। দূরে শহরের বিজলিবাতি মিট মিট করে। কাছেই কোথাও শেয়াল ডাকে। কুকুরেরা চিৎকার করে। আমার শরীর ক্রমশ শক্ত হয়ে উঠতে থাকে।

মা এসে বলে, 'তুই পড়ছিস কই খোকা? গলা পাচ্ছি না ত।'

আমি বলি, 'ঠাকুমার ঘরে কে যেন হাঁটছে মা।'

মা বলে, 'ইঁদুর লাফাচ্ছে। ন্যাকামি না করে পড় দেখি।'

আমি বলি, 'কি অন্ধকার! আজ অমাবস্যা, না মা?'

মা বলে, 'তোর মুণ্ডু। এই শনিবারে ত পুর্ণিমে। আর একটু পরেই দেখবি চাঁদ উঠবে।'

আমি বাইরের দিকে তাকিয়ে চাঁদ দেখতে চাই। আমার পিছনে উত্তরের বন্ধ জানালায় বাতাসের শব্দ হয়। যেন একটা বেড়াল থাবা দিয়ে পাল্লা আঁচড়াচ্ছে। আমি বলি, 'দিদি কবে আসবে মা? আমার একা একা একটুও ভালো লাগে না।'

মা হঠাৎ খুব রেগে চেঁচিয়ে ওঠে, 'হ্যারিকেনের পলতেটা অত উসকেছিস কেন! এখুনি কাঁচটা ফেটে যাবে। নামা বলছি শীগ্‌গির!'

আমার তখন কান্না পায়। নির্জন নিরিবিলি ঘরে থোকা থোকা অন্ধকারের মধ্যে কালিলেপা লণ্ঠনের একটুখানি আলো জোনাকির মতো টিমটিম করে। সেই আলোটুকুর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে একপ্রকার কষ্ট চাপতে চাপতে ধানমাঠে বাতাসে বৃষ্টির শব্দ শুনি। আমার দিদির জন্য মন কেমন করে।

একদিন মাঝরাতে আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। তখন অঘ্রাণ মাসের শুরু। অল্প শীত পড়েছে। মাঠের ধারে বাড়ি বলে হু-হু করে বাতাস আসে। রাতে এখন সব জানালাই বন্ধ থাকে। ঘুম ভাঙতেই আমি মা'র গলা শুনলাম। মনে হ'ল, মা বাবাকে ঠেলে তুলছে, 'শীগ্‌গির ওঠ, বাইরে কি যেন হয়েছে—'

বাবা ধড়ফড় করে উঠে বসল, 'কি, কি হয়েছে?'

মা বলল, 'ওই শোন—'

আচমকা জেগে ওঠায় আমি খুব ভয় পেয়েছিলাম। মা-বাবার কথা শুনে আস্তে আস্তে আমার ভয় কেটে গেল। আমি কাছেই কোথাও অনেক মানুষজনের কোলাহল শুনতে পেলাম। কান্না যেন সুর করে চেঁচাচ্ছে। বন্ধঘরের দরজাজানালা দিয়ে অনেকগুলো সোনালী আলোর রেখা ঘরে এসে পড়েছে। খড়ের চালা, মাটির দেয়াল সামান্য গোলাপী দেখাচ্ছে। আমার মনে হ'ল, বাইরে সূর্য উঠেছে।

বাবা বলল, 'আগুন লেগেছে খোকার মা!'

মা বলল, 'আগুন না। ধানমাঠে কিছু হচ্ছে।'

'ধানমাঠে কি হবে?' বলতে বলতে বাবা গিয়ে উত্তরের জানালাটা খুলে ফেলল। আর তৎক্ষণাৎ বাইরের টকটকে লাল সূর্যটা যেন লাফিয়ে ঢুকল ঘরে। আমাদের সমস্ত ঘর দিনের আলোর মতো স্বচ্ছ, পরিষ্কার হয়ে উঠল। আমিও ছুটে গিয়ে উত্তরের জানালায় মুখ রাখলাম। আর তখন আমার সারা শরীর কেঁপে উঠল। সারা বুক দুলে উঠল। চোখ বড় বড় করে আমি উল্লাসে আবেগে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'আহা, মা দেখ, দেখ—'

সারা মাঠ জুড়ে মশালের আগুন দাউদাউ জ্বলছে। আমি অপলকে দেখলাম, আগুন, আহা কি আগুন! অপরূপ নীল হলুদ রক্ত বর্ণ, কখনো সিংহের মতো কেশর ফুলিয়ে, কখনো ময়ূরের মতো পেখম দুলিয়ে, কখনো বা লালরং মোরগের মত ঝুঁটি ছড়িয়ে সরু লম্বা মোচাকৃতি হয়ে ঝলকে উঠছে। সাপের ফণার মতো তার লকলকে শিখা বাতাসের বাড়ি খেয়ে নাচছে, দুলছে, ফুঁসছে। আর আগুনে আকাশমাটি লাল হয়ে উঠেছে, হেমন্তের পাকা ধান সোনার মতো ঝলমল করছে। আমাদের ঘর দুয়োর উঠোন, হাত পা চুল সমেত গোটা শরীর আলোতে ভাসছে। আগুনের তাপে কাক চড়ুইরা উড়ে পালাচ্ছে। শেয়াল ছুটে যাচ্ছে। আর সেই বুড়ো নিমগাছটা যেন ঝলসে যাচ্ছে!

মা কাঁপাগলায় বলল, 'ওরা কে গো?'

খুশিতে ছটফটে গলায় বাবা বলে উঠল, 'ভয় নেই খোকার মা। ওরা ন'গাঁয়ের ভাগচাষী বর্গাদারেরা।'

মা বলল, 'এখানে কেন?'

বাবা বলল, 'ফসল তুলতে এসেছে!'

মা বলল, 'কার ফসল?'

বাবা বলল, 'ওই যারা ভুবনকে মেরেছিল! সরকারবাবুদের—'

আমি একসময় চেঁচিয়ে উঠলাম, 'মা, ওই দেখ ছোটমামা! ওই যে নিমগাছটার ধারে!'

বাবা সহসা আমার হাত ধরে টেনে বলল, 'মাঠে যাবি খোকা! চল দেখি গে—'

তখন সারা মাঠ জুড়ে আগুন আরো ছড়িয়ে পড়েছে। যত আগুন তত মানুষ। সারা মাঠে যেন আগুনের মেলা বসে গেছে। কোলাহল কলরবে আকাশ গমগম করছে। হাতে হাতে আগুন দোল খাচ্ছে। হাতে হাতে ধারালো কাস্তে গলানো রূপার মতো ঝকমক করছে। হেমন্তের পাকাধান হাজার মানুষের চিৎকারে আগুনবরণ পাখা মেলে আকাশে উড়তে চাইছে। আমি আর বাবা দৌড়ে মাঠের ধারে এসে দাঁড়ালাম। ছোটমামা আমাদের দেখতে পেয়ে হাত নেড়ে কি যেন বলল। আনন্দে উত্তেজনায় বাবাও চিৎকার করে উঠল! আমি ভালো করে কারো কথাই শুনতে পেলাম না।

উত্তরের জানালা খুলতে আমার আর ভয় করে না। এখন আমি মাঠময় শুধু আগুন দেখি, আগুনে ঝলোমলো হাজার মানুষের গলা শুনি। নিজেকে আর একলা মনে হয় না।

এখন বাবাও নির্ভয়ে সকলকে ডেকে ডেকে বলে, ভুবনকে কারা খুন করে গাছে ঝুলিয়ে দিয়েছিল।

মূল্যবৃদ্ধি ও তার প্রতিকার

কমার্সের বাংলা ক্লাসে একটি রচনা লেখাচ্ছিলেন অধ্যাপক সনাতন বসু। বিষয় 'দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি ও তার প্রতিকার'। এ নিয়ে চারদিকেই এখন খুব হৈ চৈ হচ্ছে। কাগজেপত্রে লেখালেখি, মাঠে ময়দানে বক্তৃতা, কলে-কারখানায় অফিসে-আদালতে মিছিল-ধর্মঘট, বিধানসভায়-পার্লামেন্টে তর্কবিতর্ক, বাদপ্রতিবাদ। সুতরাং বিষয়টি খুবই জীবন্ত ও জ্বলন্ত। ঘরে ঘরে সকলেই অনুভব করছে এর উত্তাপ। এড়িয়ে যাওয়ার উপায় নেই কারো। সনাতনবাবু দীর্ঘ শিক্ষকজীবনের অভিজ্ঞতায় দেখেছেন, সাম্প্রতিক উত্তপ্ত বিষয়গুলি প্রায়ই প্রশ্নকর্তার মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে—ফলে প্রশ্নপত্রে সেগুলো এসে যায়। যেমন গতবছর তিনি লিখিয়েছিলেন—'তৈল সংকট'। তখন আরব-ইস্রায়েল যুদ্ধের পটভূমিতে সারা ভারতে জ্বালানি তেলের হাহাকার। পেট্রোল নেই, ডিজেল নেই, কেরোসিন নেই! গাড়িঘোড়া অচল হবার উপক্রম। তিনি স্পেশাল ক্লাস নিয়ে রচনাটা লিখিয়েছিলেন। এসেও গিয়েছিল ঠিক, হুবহু এক ভাষায়। পরীক্ষার হলে ছেলেরা আনন্দে বেঞ্চি চাপড়েছিল, অদ্ভুত সব শব্দ করেছিল নাকমুখ দিয়ে, কেউ কেউ সিটিও বাজিয়েছিল—

এ সব উপেক্ষা করেই সনাতনবাবু চেঁচিয়ে বলেছিলেন, 'আর কি, ত্রিশ নম্বর কমন পেয়ে গেলে! ভাল করে লেখো সব।' বস্তুত তাঁর নিজেরও খুব আনন্দ হয়েছিল। অনেক সহকর্মীকে ডেকে বলেছিলেন, 'প্রশ্ন খুব সুন্দর হয়েছে। যা লিখিয়েছি ছেলেদের, হুবহু তাই এসে গেছে।'

সনাতনবাবুর খুব আশা এ বছর 'দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি' আসবেই। তাই বিশেষ যত্নে এটা তিনি লিখিয়ে দিচ্ছেন।

শিক্ষক হিসেবে তাঁর সুনাম আছে। যত্ন করে পড়ান, নিয়মিত

বোর্ডওয়ার্ক করেন, পরিশ্রম করে নোট্ দেন। এই ডামাডোলের বাজারেও বেশ কিছু ছেলে তাঁর ক্লাসে উপস্থিত থাকে।

রচনাটা শুরু করার আগে উপস্থিত পঞ্চাশ ষাট জন ছাত্রের কাছে সংক্ষেপে একটু ভূমিকা করে নিলেন সনাতনবাবু, 'তোমরা জান গত-বার আমি 'তৈল সংকট' লিখিয়েছিলাম, পরীক্ষায় সেটা এসেছিল। আজ তোমাদের যে বিষয়টা লেখাচ্ছি সেটাও খুব ইমপর্টেণ্ট ! দ্রব্য-মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা আজকের একটা বার্ণিং কোশ্চেন। তুমি আমি, আমরা প্রায় সকলেই এর দ্বারা আক্রান্ত। পরীক্ষায় যিনি প্রশ্ন করবেন তিনিও অল্পবিস্তর আক্রান্ত হয়ে থাকবেন। সুতরাং আশা করা যায় এ বছর রচনাটা তোমরা 'কমন' পাবে—'

বলতে বলতে সনাতনবাবু লক্ষ্য করলেন ছেলেদের মুখচোখ উজ্জ্বল হয়েছে। দু'চারজন, যারা গল্পগুজব করছিল, থেমে গিয়ে খাতা কলম বের করছে। সকলেই লিখবার জন্য প্রস্তুত। ক্লাসে চমৎকার একটা নিস্তব্ধতা নেমে এসেছে, স্কুল কলেজে যার অস্তিত্ব এখন কিনা প্রায় দুর্লভই !

সনাতনবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর গায়ে হ্যাণ্ডলুমের পাঞ্জাবি, পরণে মোটা খয়েরিপাড় ধুতি। দুটোই যথেষ্ট ময়লা হয়েছে। ট্রামেবাসে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে আসতে হয় বলে স্থানে স্থানে বিশ্রীভাবে কুঁচকে গেছে। আসার সময় বড় মেয়ে বলেছিল, 'বাবা, জামাকাপড়টা পালটে যাও।' সনাতনবাবু আমল দেন নি। আজ কলেজ করলে দু'দিন ছুটি, কাজেই নতুন একপ্রস্থ বের করে লাভ কি ! বাড়ির ধোপা এখন চারটের বদলে টাকায় তিনটে কাপড় কাচছে। সাবান সোডা কয়লার দাম বেড়েছে বলে তার রেটও বেড়ে গেছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সনাতনবাবুকেও একটু বেশী হিসেবী হতে হয়েছে। আজকাল এক প্রস্থে তিনচারদিন চালিয়ে দেন তিনি।

উঁচু প্ল্যাটফর্মের উপর দাঁড়িয়ে এখন তিনি অবশ্য জামাকাপড়ের মলিনত্বের কথা ভাবছিলেন না। এমন কি গ্রামের বাড়ি থেকে লেখা তাঁর বিধবা বোন শৈলবালার চিঠিখানার কথাও না। বরং মনে মনে

বিষয় ও বাক্যগুলোকে সুন্দর করে সাজিয়ে নিচ্ছিলেন। ছেলেরা উসখুস করছে, এখুনি শুরু করতে হবে। অন্যথা এই চমৎকার নিস্তব্ধতা গুন্‌গুন্ গুঞ্জনে মুখর হয়ে উঠবে।

প্রথমে ভূমিকা অংশ।

এই অংশের জন্য একটা বাঁধাধরা ছক আছে। নতুন কিছু ভাবতে বা বলতে হয় না। মুখস্থ বলার মতো সেই ছকটা আবৃত্তি করলেন সনাতনবাবু: 'ভারত একটি সমস্যা সঙ্কুল দেশ। এই দেশে কত যে সমস্যা তাহার কোনো সীমাপরিসীমা নাই। খাদ্যসমস্যা, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যা, বৈদেশিক মুদ্রার সমস্যা—এই রকম হাজারো সমস্যা এই দেশ ও জাতিকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়াইয়া রাখিয়াছে। সম্প্রতি ইহার সহিত যুক্ত হইয়াছে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর মূল্যবৃদ্ধির সমস্যা। এই সমস্যা কিছু নূতন নহে কিন্তু বর্তমানের ন্যায় এমন তীব্র, এমন ভয়াবহ আকারে আর কখনো ইহা দেখা দেয় নাই—'

বলতে বলতে থামলেন সনাতনবাবু। পেছনের দরজা দিয়ে জুতোর শব্দ তুলে কে যেন ক্লাসে ঢুকল। ছেলেরা ঘুরে তাকাল তার দিকে! সে নির্বিকার ভঙ্গিতে একটা বেঞ্চি টেনে বসে পড়ে বেশ চেঁচিয়েই জিজ্ঞেস করল, 'কি লেখাচ্ছেন স্যার?'

ভ্রূকুঞ্চিত করে সনাতনবাবু তাকিয়েছিলেন। সামান্য রুষ্ট হয়ে বললেন, 'এতক্ষণ কোথায় ছিলে?'

ছেলেটা তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, 'লাইনে বাস বন্ধ, ট্রেনে আসতে দেরি হয়ে গেল স্যার।'

সনাতনবাবু চুপ করে গেলেন। ট্রাম-বাস বন্ধ হলে দেরি তো হবেই। ও যে তবু কষ্ট করে এসেছে এই তো যথেষ্ট। যানবাহনের গোলমালে তিনি নিজেই কতদিন কলেজে আসতে পারেন না। তবে ক্লাসে ঢোকার আগে অনুমতি নেবার প্রয়োজন ছিল—পুরনো অভ্যাসবশে ভাবলেন সনাতনবাবু। ভেবে নিজের মনেই করুণভাবে হাসলেন! ওসব এখন আর কে নেয়! ওসব পাট কবেই চুকে গেছে। এখন স্কুল-কলেজে ডিসিপ্লিন বলতে আর কি

অবশিষ্ট আছে! যার যখন খুশি আসে যায়, গোলমাল করে, দরজা বন্ধ করে পরীক্ষার হলে নকল করে, বাধা দিলে মারমুখী হয়, আছড়ে আছড়ে চেয়ার বেঞ্চি ভাঙ্গে, পাখার ব্লেড্ দুমড়ে মুচড়ে দেয়, বাল্বগুলো চূর্ণবিচূর্ণ করে। এখন কলেজ মানেই গোলমাল, অশান্তি, বিশৃঙ্খলা—

সনাতনবাবু বেশ শান্ত গলাতেই বললেন, 'মূল্যবৃদ্ধি লেখাচ্ছি। লেখো তুমি—'

কিন্তু ছেলেটা লিখল না। বসে বসে আবার কথা বলতে লাগল। সনাতনবাবু বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আবার কি হ'ল তোমার?'

'কলম স্যার, একটা কলম!'

'কলম আনো নি তুমি? কলম ছাড়াই ক্লাস করতে এসেছ?'

ছেলেটা বিন্দুমাত্র লজ্জিত হ'ল না। বেশ পরিষ্কার গলায় বলল, 'গত মাসে বারো আনা দিয়ে একটা কিনেছিলাম স্যার, ভেঙে গেছে। সেদিন আট আনা দিয়ে আরো একটা কিনেছিলাম, ঝুলতে ঝুলতে বাসে আসার সময় কোথায় পড়ে গেছে। এখন আর কেনার পয়সা নেই স্যার—'

সাফসুফ জবাব শুনে সনাতনবাবু কি বলবেন ভেবে পেলেন না। হঠাৎ খুব রাগ করতে গিয়েও সামলে নিলেন নিজেকে। মনে পড়ল, তার পকেটেও আজ কলম নেই। পুরনো আমলের দামী কলমটা হঠাৎ অকেজো হয়েছে। সারাতে দিয়েছেন তিনি। সস্তার একটা কলম আছে। সেটা আনতে ভুলে গেছেন! আজ অন্যের কলম চেয়ে খাতায় পার্সেন্টিজ দিতে হবে। তিনি একজন শিক্ষক, তাঁর পকেটেই কলম নেই, ছেলেটার উপর রাগ করেন কি করে! গম্ভীর গলায় বললেন, 'কারো একটা চেয়ে নাও। ওহে তোমরা একটা কলম দাও ওকে—'

কেউ দিল না, কেননা কারো কাছে বাড়তি ছিল না। ছেলেটা মিনিটখানেক অপেক্ষা করে আবার বেঞ্চি টেনে সরিয়ে মাঝখানের ফাঁকা জায়গাটুকুতে চলে এল, 'থাকগে স্যার, পরে লিখে নেব। এখন বাইরে যাচ্ছি!'

বলে খস খস জুতোর শব্দ তুলে বাইরে চলে গেল। ওর কথা বলার ধরণ ও যাওয়ার ভঙ্গিতে কিছু ছেলে হেসে উঠল। কিন্তু কি করবেন তিনি? কি করার ক্ষমতা আছে তাঁর? এই ছেলেটার অপরাধ তো সামান্য। গত পরীক্ষার মরসুমে নকল ধরেছিলেন বলে তাঁর এক সহকর্মীকে প্রায় ঠেলে ঘর থেকে বের করে দিল ক'টা ছেলে। অধ্যক্ষমশাই দাঁড়িয়ে দেখলেন। কিন্তু প্রতিকার কিছু হ'ল কি? ওদের নামে গোপনে একটা রিপোর্ট করার কথা বলেছিলেন কেউ কেউ। অধ্যক্ষমশাই নিজেই বারণ করলেন, 'গোপন রিপোর্ট গোপন থাকবে না। এখন সব সরষের মধ্যেই ভূত ঢুকে আছে। জানাজানি হলে আপনারা বিপদে পড়বেন। তার চেয়ে নিজেরাই একটু সামলেসুমলে চলুন।'

তারপর পরীক্ষার হলে আর কেউ ঢোকেন নি তাঁরা। টানা তিন ঘণ্টা স্টাফরুমে বসেছিলেন। পরীক্ষা অতিশয় নির্বিঘ্নে ও শান্তিতে সম্পূর্ণ হয়েছিল!

এই ক'বছরের অভিজ্ঞতায় সনাতনবাবু বুঝেছেন, কলেজ আর কলেজ নেই। এখন এর সর্বাঙ্গে ঘূণ ধরেছে। পোকায় কেটে ঝাঁঝরা করেছে সবকিছু। এখন এডুকেশন মানেই চমৎকার একটা প্রহসন। কে কাকে শাসন করে! কে কার ডিসিপ্লিন রাখে! এখন শুধু আত্মসম্মান বাঁচিয়ে চাকরি করে যাওয়া—

এই যে এখন তিনি এত পরিশ্রম করে, এত যত্ন করে রচনাটি লেখাচ্ছেন, তিনি জানেন, এইসব ছেলেরা, বলতে গেলে প্রায় বারো আনা, পরীক্ষায় এসে গেলে সবটুকু নকল করবে। এখন বিনীত বাধ্য ছেলে সেজে চুপচাপ লিখে যাচ্ছে সবাই, কিন্তু পরীক্ষার হলে এদের অনেকেরই রূপ পাল্টে যাবে। নকলে একটু বাধা দিলেই, উগ্র উদ্ধত হয়ে উঠবে। মেজাজ দেখিয়ে বলবে, 'আপনারা বাইরে যান স্যার, আমাদের সময় নষ্ট হচ্ছে, শীগ্‌গির বাইরে যান—'

তবু সনাতনবাবুকে লেখাতে হবে, বোর্ডওয়ার্ক করতে হবে, প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে লেকচার দিতে হবে। কেননা এটা তাঁর চাকরি, তাঁর

জীবিকা। এরই উপর নির্ভর করে আছে তাঁর সমস্ত সংসার। তাঁর ছেলের ভবিষ্যৎ, মেয়ের বিয়ে, স্ত্রীর রক্তাল্পতার ধারাবাহিক চিকিৎসা—

ছেলেটা বেরিয়ে যাবার পর অন্যরা উসখুস করতে শুরু করেছে। তার অপেক্ষা করলে ক্লাসে গোলমাল শুরু হবে। 'শুরু করুন স্যর, স্টার্ট!' কে যেন বলেই ফেলল! মোটা খসখসে চাপাগলা শুনলেন, কিন্তু ছেলেটাকে সনাক্ত করতে পারলেন না। খুব ক্ষুব্ধ অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতে সনাতনবাবু বললেন, 'ইয়েস প্লিজ্, রাইট ডাউন—'

আবার বলতে শুরু করলেন তিনি, 'আজ কোনো সাধারণ ক্রেতা বাজারে ঢুকিলে তাহার এইরূপ ধারণা হয়, যেন বা আগুন লাগিয়াছে। চাল-ডালে আগুন, তেল-নুনে আগুন, মাছমাংসশাকসব্জী কাপড়-জামায় আগুন। কোনো কিছুতে হাত দিবার উপায় নাই। মূল্যবৃদ্ধির দাউদাউ অগ্নিশিখায় সর্বাঙ্গ ঝলসাইয়া যায়, চোখেমুখে অন্ধকার ঘনাইয়া আসে, মাথায় রক্ত চড়িবার উপক্রম হয়। সর্বস্তরে সব জিনিসের এমন অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি কেহ কখনো দেখে নাই, কেহ কখনো কল্পনাও করে নাই। একদিকে টাকার দাম কমিতে কমিতে সিকি পরিমাণ হইয়াছে, অপরদিকে জিনিসের দাম চড়িতে চড়িতে আকাশ ছুঁইয়াছে। সরকারী পরিসংখ্যান হইতেই দেখা যায় সাম্প্রতিককালে প্রায় সব জিনিসেরই দাম শতকরা ষাট হইতে একশত ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কোথাও বা এই হার আরো বেশী। গতবছর যে-ডালের দাম ছিল কেজি প্রতি আড়াই টাকা, এখন তাহা সাড়ে চার টাকা হইয়াছে, এক কেজি সরিষার তেল বারো টাকা, মোটা সুতির একজোড়া ধুতি বত্রিশ টাকা, একখণ্ড সাবান দেড় টাকা, একটা দেশলাই কিনিতে গেলেও এখন পনেরো পয়সা। এমন কি ছেলে-মেয়েরা যে পড়াশুনা করিবে তাহার কাগজ কালি বই খাতা পর্যন্ত দুর্মূল্য হইয়া উঠিয়াছে।'......

বলতে বলতে বিষয়ের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলেন সনাতনবাবু। যেন রচনা লেখাচ্ছেন না, নিজের জীবনের অভাব-অভিযোগ দুঃখ-ক্ষোভের কথা বলছেন। গলার স্বরে আবেগ ফুটে উঠতে লাগল।

কখনো বা উত্তেজনায় জ্বল জ্বল করতে লাগল চোখ, কখনো হতাশায় ম্রিয়মাণ আচ্ছন্ন হ'ল মুখের রেখা। ওষুধপত্রের মূল্যবৃদ্ধির কথাও বাদ দিলেন না। স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য প্রায়ই তাঁকে ডাক্তারখানায় ছুটতে হয়। ওষুধের দামও হু হু করে বাড়ছে। এ মাসে রক্তাল্পতার প্রতিষেধক টনিকটা এখনও তিনি কিনে উঠতে পারেন নি……

'এখন মানুষের ক্রয়ক্ষমতা শূন্যের কোঠায় পৌছিয়াছে। ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধির চাপে তাহার অস্তিত্ব বিপন্ন হইয়া উঠিতেছে। গ্রামেশহরে সাধারণমানুষের জীবনে অবর্ণনীয় দুর্দশা নামিয়া আসিয়াছে। তাহাদের পরণে কাপড় নাই, পেটে ভাত নাই, সারা দেশ জুড়িয়া দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি। মানুষ গাছের পাতা খাইয়া, বুনো ঘাস খাইয়া প্রাণ বাঁচাইতেছে। ক্ষুধার জ্বালায় গ্রামের হা-অন্ন মানুষ দলে দলে শহরে আসিয়া ভিড় করিতেছে। পিতা নিজের কন্যাকে বিক্রয় করিয়া দিতেছে, দুই মুষ্টি অন্নের অভাবে মাতা আপন সন্তানের গলা টিপিয়া ধরিতেছে। শহরের কঠিন ফুটপাতে পড়িয়া কত মানুষ অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছে। স্বাধীনতার পঁচিশ বছর পরেও এই সব ভয়ানক দৃশ্য—'

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন সনাতনবাবু। যেন কেউ আচমকা তাঁর মুখে হাত চাপা দিল। থেমে গিয়ে কেমন বিব্রত অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে তাকালেন ক্লাসরুমের দিকে। খুব সতর্ক সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে জরিপ করলেন ছেলেদের হাবভাব। একটা অদৃশ্য আশঙ্কায় তাঁর চিন্তাসূত্র কেমন এলোমেলো হয়ে গেল।

ঝোঁকের মাথায়, আবেগের বশে অনেককথা বলে ফেলেছেন সনাতনবাবু। ভাষায় ভঙ্গিতে যতটা সতর্ক থাকা উচিত ছিল—থাকতে পারেন নি। এর একটা কারণ সম্ভবত এই যে কলেজে আসার পথে, শহর কলকাতার ফুটপাতে, স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে, তিনি এখন প্রত্যহই রুগ্ন নিরন্ন মানুষের মিছিল দেখে থাকেন। কখনো কখনো মরেও পড়ে থাকতে দেখেন দু'একজনকে। কিন্তু তার চেয়েও

বড় কারণ সম্ভবত শৈলবালার সংক্ষিপ্ত চিঠি। আজ সকালের ডাকেই পেয়েছেন চিঠিখানা। শৈল লিখতে জানে না। তার বড় মেয়ে অর্থাৎ সনাতনবাবুর বড় ভাগ্নী আঁকাবাঁকা অক্ষরে মা'র হয়ে লিখে দিয়েছে : 'শ্রীচরণেষু দাদা, গ্রামে একেবারেই চাল পাওয়া যাইতেছে না. এক ছটাক গমও না। আমার ছেলেমেয়েরা তিন-দিন একরকম না খাইয়া আছে। ঘোষপাড়ার অনাদি ঘোষ না খাইয়া মারা গিয়াছে। যদুর বউ পাগলের মত হইয়া বাচ্চাকাচ্চা সমেত নিজের খড়ের চালায় আগুন লাগাইতে গিয়াছিল—তাহাকে ধরিয়া হাত পা বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। পুব পাড়ার নিত্য সরকার ২।১ দিনের মধ্যে কলিকাতা যাইবে। তাহার সহিত ছেলেমেয়েদের পাঠাইয়া দিব। আমার যা হয় হইবে, তুমি দাদা এই দুঃসময়ে দুই মুঠা ভাত দিয়া তাহাদের জীবন রক্ষা করিবে।'

চিঠিটা পাওয়ার পর থেকেই সনাতনবাবু চোখেমুখে অন্ধকার দেখছেন। স্ত্রীকেও কিছু বলেন নি। অনাহারে মৃত অনাদি ঘোষ সম্পর্কে স্ত্রীর কাকা হয়। শুনলে হয়ত কান্নাকাটি করবে। তার উপর শৈলর ছেলেমেয়েরা দু'একদিনের মধ্যেই এসে যাচ্ছে শুনলে কি যে করবে বলা মুস্কিল।

এ সব কারণেই হয়ত একটু ধৈর্য হারিয়েছিলেন সনাতনবাবু। নিজের গ্রামে, আত্মীয় পরিজনের সংসারে, আকালের ছায়া স্পষ্ট দেখতে পেয়ে আবেগের বশে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিলেন। পঁচিশ বছরের স্বাধীনতার মূল ধরে টান দিতে চেয়েছিলেন। এখন বুঝতে পারছেন ও-সব বলা তাঁর পক্ষে নিরাপদ হয় নি। এখন সময় বড় খারাপ। কলেজে কলেজে আর শিক্ষার পরিবেশ নেই। শিক্ষকের নিরাপত্তাও রক্ষিত হয় না সবসময়। এখন কোন্ কথার কে কি অর্থ দাঁড় করায়, কিভাবে কিসের ব্যাখ্যা হয়, কে বলতে পারে! স্বাধীনতার পঁচিশ বছর পরেও যে-দেশের শহরেগ্রামে অনাহারে মানুষ মরে পড়ে থাকে, সেটা আর যাই হোক কোনো সভ্যদেশ নয়, তার মুখে গণতন্ত্র ইত্যাদি বড় বড় বুলি আদপেই মানায় না—এই কথাটা

তিনি কি এখন নিরাপদে নির্ভয়ে ক্লাসে দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করতে পারেন? এমন কি ওই যে তিনি লেখালেন, 'মানুষ অনাহারে মারা যাইতেছে', এই কথাটাও কি এই জরুরী অবস্থার কালে কম বিপজ্জনক? এখুনি যদি দুর্বিনীত মস্তানগোছের কোনো তর্কবাগীশ ছেলে দাঁড়িয়ে উঠে বলে, 'প্রমাণ কি স্যর? সরকারী প্রমাণ?' তিনি কি তা দিতে পারবেন? আঁকাবাঁকা মেয়েলি অক্ষরে লেখা শৈলবালার চিঠিখানা কি কোনো প্রমাণ বলে গ্রাহ্য হতে পারে? সরকারী কোনো কাগজেপত্রে, কোনো পরিসংখ্যানে একথা কি বলা হয়েছে, মানুষ অনাহারে মরছে? অপুষ্টিতে মৃত্যুর কথা দু'একটা অবশ্য আছে, কিন্তু অনাহারে মৃত্যু আর পুষ্টির অভাববশত মৃত্যু কি এক বস্তু! সেই দুর্বিনীত ছাত্রটি যদি ধমক দিয়ে বলে, 'এদেশে অনাহারে মৃত্যুর কোনো সরকারী রিপোর্ট নেই—আপনি স্যর আবোলতাবোল বলে জনপ্রিয় সরকারের বিরুদ্ধে কুৎসা ছড়াচ্ছেন।' তাহলে তার প্রতিবাদ করার মতো সাহস কি সনাতনবাবুর আছে? এই দেশে, এখন, কণ্ঠরুদ্ধ অবস্থায়?

এ রকম ঘটনা তো এখন অনায়াসেই ঘটতে পারে। ঘটা কিছুই বিচিত্র নয়। এই তো ক'সপ্তাহ আগে ইতিহাসের হৃষিকেশবাবু '৪৭-এর দেশভাগের দায়দায়িত্ব নিয়ে ক্লাসে কি একটা মন্তব্য করেছিলেন। কিছু ছেলে ক্ষিপ্ত হয়ে চড়াও হ'ল তার উপর, 'আপনি স্যর আমাদের ন্যাশনল লীডরদের অপমান করেছেন!'

হৃষিবাবু যত তাদের বোঝান, 'তোমরা তো ক্লাসে ছিলে না, ইতিহাসের ছাত্রই নও অনেকে, কি শুনতে কি শুনেছ!'—ততই তারা উদ্ধত হয়ে চিৎকার করে, 'ওসব আমরা শুনতে চাই না, আপনাকে স্যর উইথড্র করতে হবে, এখুনি সব উইথড্র করতে হবে!'

শেষটায় হৃষিবাবুও রেগে যান। রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলেন, 'কি উইথড্র করব? আমি যা পড়িয়েছি তা ইতিহাস, সঠিক এবং সত্য ইতিহাস। ইতিহাস উইথড্র করব? ইতিহাস কি উইথড্র করা যায়?'

সনাতনবাবু সেদিন কলেজে আসেন নি। তাঁর অফ্ ডে ছিল। পরের দিন এসে শুনেছেন সব। ছেলেরা হৃষিবাবুকে ঘেরাও করে রেখেছিল। রকমারি মন্তব্য করে শ্লোগান দিয়েছিল। দু'একজন পদত্যাগও দাবি করেছিল। তারপর অধ্যক্ষের মধ্যস্থতায় একটা মীমাংসা হবার পর তিনি ছাড়া পান। এখন ছুটিতে আছেন। সমস্ত স্টাফরুমে এখনও একটা চাপা থমথমে ভাব। কেউ মন খুলে কথা বলছেন না! হাসিঠাট্টা রসিকতা করছেন না। সকলেরই মুখে দুশ্চিন্তার ছাপ, আতঙ্কের ছায়া। যেন রাতারাতি সবারই বয়স বেড়ে গেছে বেশকিছু।

সব শুনে নিজেকেও সেদিন থেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন সনাতন। তাঁর বুঝতে অসুবিধা হয় নি, বাইরের প্রবল প্রচণ্ড ঘোলা রাজনীতি কলেজের চত্বরেও হিংস্র হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে বন্যার মতো। এখন একটু অসতর্ক অসাবধানী হলেই সর্বনাশ। পা ফেলতে হবে টিপে টিপে কথা বলতে হবে মেপে মেপে, সযত্নে সাবধানে বাঁচিয়ে চলতে হবে আত্মসম্মান, টিকিয়ে রাখতে হবে চাকরিটা—

সনাতনবাবু আরো একবার সতর্ক ভঙ্গিতে ক্লাসঘরের চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। কোনোদিক থেকে কোনো একজন ছাত্রও তাঁর কথার প্রতিবাদ করতে উদ্যত কিনা বুঝতে চাইলেন। তারপর ছেলেদের মধ্যে তেমন কোনো বিরূপ প্রতিক্রিয়া নেই দেখে কিছুটা আশ্বস্ত হতে গিয়ে প্রবলভাবে চমকে উঠলেন।

পেছনের দরজা-বরাবর ডানপাশের একটা বেঞ্চির দিকে তাঁর দৃষ্টি আটকে গেল। কোঁকড়ানো বাবরি চুল, গাল পর্যন্ত নামানো জুলপি, সাদায়কালোয় ডোরাকাটা চটকদার গেঞ্জি গায়ে, পুষ্ট স্বাস্থ্যবান লম্বাটে ধরণের ওই ছেলেটা আজ ক্লাসে কেন? ও তো ক্লাস করার ছেলে না! কোনোদিন বড় একটা করেও না। ও কখন এসে ঢুকল ক্লাসে? কি মনে করে ঢুকল?

সনাতনবাবুর দেহের উত্তাপ অনেকখানি শীতল হয়ে গেল। ছেলেটাকে চেনেন তিনি। ওর বিরুদ্ধে অনেক শিক্ষকেরই অনেক

ক্ষোভ, অনেক অভিযোগ! কিন্তু কিছু করার নেই। কলেজের এক উপদলীয় ছাত্রগোষ্ঠির নেতৃস্থানীয় সে। হৃষিবাবুকে ঘেরাও করার ব্যাপারে এই ছেলেটাও জড়িত ছিল!

তার দিকে তাকিয়ে কেমন যেন নার্ভাস বোধ করলেন সনাতন-বাবু। সামান্য ইতস্তত করে ছেলেদের বললেন, 'স্বাধীনতার পঁচিশ বছর পরে ইত্যাদি শব্দগুলো কেটে দাও! কেটে নেকসট্ পয়েণ্ট লেখো—মূল্যবৃদ্ধির কারণ—'

একবার লিখে আবার কিছু কাটতে হ'ল বলে অনেক ছেলে বিরক্ত হ'ল। একটা মৃদু গুঞ্জনও শোনা গেল। সনাতনবাবু কান পাতলেন। কি বলছে ছেলেরা? কেউ কি প্রতিবাদ করছে? অথবা কেউ বলছে কি, 'আপনি তো স্যার ঠিকই বলেছেন! এটা লজ্জার কথা, ঘৃণার কথা যে, স্বাধীনতার পঁচিশ বছর পরেও এদেশের কোটি কোটি মানুষ উপবাসী উলঙ্গ, আমরা এটা কাটব কেন? এতে ভুল কোথায়?'—না, বলছে না। কেউ বলছে না কিছু।

অথচ বলতে পারত। বলার মত অনেক ছেলে এই ক্লাসে ছিল। দূরদূরান্ত থেকে আসা মলিন পোশাক, শীর্ণ মুখের অনেক ছেলে। বর্ধিত দ্রব্যমূল্যের চাপে যাদের ঘরে ঘরে হাহাকার। যারা নিত্য অভাব আর অপুষ্টিতে ভোগে! অথচ বলল না ওরা কিছু! ওরাও কি ভয় পেয়েছে? প্রতিবাদের ভাষা হারিয়েছে? চারদিকে তাকিয়ে বড় হতাশ হলেন সনাতন। তাঁর মনে পড়ল, উপযুক্ত খাদ্য ও চিকিৎসার অভাবে তাঁর স্ত্রী রক্তাল্পতায় ভোগে, ছেলেমেয়েরা পুষ্টিকর খাদ্য দূরে থাক সাদা ঝরঝরে সিদ্ধ চালের ভাতটুকুও সবদিন চোখে দেখে না। কলেজে এসে একটা-দুটো ক্লাস করার পরই তাঁর পাকস্থলীতেও ক্ষুধাবোধ মোচড় দেয়—

কিন্তু তিনি তো এখন প্রৌঢ়। জীবনের অনেকটা কাটিয়ে এসেছেন। সংসারের আর পাঁচটা প্রাণীর মুখ চেয়ে মাসান্তিক বাঁধা মাইনের কাছে বন্ধকদত্ত। তিনি কোনো ঝুঁকি নিতে পারেন না। তাঁকে প্রয়োজন মতো 'অনাহারে মৃত্যু' কেটে 'অপুষ্টিতে মৃত্যু' লেখাতেই হয়! কিন্তু এই

সব তাজা-বয়সের ছেলেরা ? তারাও কি কোনো ঝুঁকি নিতে ভয় পায় আজকাল ? তারাও সতর্ক, সাবধানী সংসারী হয়ে গেল ? অথচ ওরা যদি সমস্বরে প্রতিবাদ জানাত, সম্মিলিতভাবে পাশে এসে দাঁড়াত তাহলে সনাতনবাবু কি কেটে দিতেন ওই শব্দগুলো ? ইতিহাস কি বিকৃত করে পড়াতেন হৃষিকেশবাবু ?

সনাতনবাবুর বুকের মধ্যে কেমন একটা কষ্ট হ'ল। তাঁর খুড়-শ্বশুর অনাদি ঘোষ অনাহারে মরেছে না অপুষ্টিতে—এই নিয়ে গ্রামের অঞ্চল-অফিসে নিশ্চয়ই এতদিনে বাদানুবাদ শুরু হয়েছে। বি-ডি-ও সাহেবের রিপোর্টে হয়তো উল্লেখ থাকবে কালাজ্বর, রক্ত-আমাশয়। আর সন্তুর দুর্ভাগিনী বৌয়ের কি অবস্থা দাঁড়িয়েছে ? কেউ কি খুলে দিয়েছে তার হাতপায়ের বাঁধন ? তার শিশুসন্তানেরা কি পেয়েছে এক মুঠো ভাত ? গ্রাম জুড়ে আকাল। গ্রাম জুড়ে অনাহার। মানুষ কি চুপ করে আছে ? বিনা প্রতিবাদে মেনে নিচ্ছে সব ?

সনাতনবাবু অকস্মাৎ বড় রুষ্ট হয়ে ছাত্রদের ধমকে উঠলেন, 'চুপ কর। চুপ কর সব। যা কাটতে বলেছি কেটে দাও। কিছু ভাবো না, কিছু বোঝ না, কেবল মূর্খের মতো হল্লা কর !'

ছেলেরা চুপ করল। দরকারী নোট, ঠিকমতো না লিখলে পরীক্ষার হলে অসুবিধা হবে ! চুপ করে উল্টে ছেলেরাই তাড়া দিল সনাতনবাবুকে, 'বলুন স্যার, আপনি বলুন—'

নিতান্ত অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতে সনাতনবাবু আবার শুরু করলেন। 'এই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধির কারণ কি ? প্রথম এবং প্রধান কারণ বলা যাইতে পারে উৎপাদনে ঘাটতি। দেশের প্রয়োজন বা চাহিদা অনুযায়ী কোনো দ্রব্যই উৎপন্ন হইতেছে না। ফলে অল্প সংখ্যক দ্রব্যের উপর অধিক সংখ্যক ক্রেতার চাপ পড়িতেছে। ফলে ব্যবসায়ীরা মূল্যবৃদ্ধি করিতেছে। ......দ্বিতীয় কারণ হইল, মজুত-দারদের চক্রান্ত। তৃতীয় কারণ, মুদ্রাস্ফীতি। ......সপ্তম এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কারণ, সরকারী—'

বলতে গিয়ে আবারও থেমে পড়লেন সনাতনবাবু। সামনে

নিলেন নিজেকে। মজুতদার চোরাকারবারিদের চক্রান্তের কথা অনেকখানি বলা যায়। কাজে না হোক মুখে তো এখন ওদের আক্রমণ করছে সবাই। ভাষাকে যতখানি সম্ভব শাণিত করে মুনাফাবাজ ওইসব হোর্ডারদের কথা সংক্ষেপে লেখালেন সনাতনবাবু। পণ্ডিত নেহেরু এদের ল্যাম্পপোস্টে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দিতে চেয়েছিলেন—এই কথাটাও বললেন। এইসময় ছোটছেলেটার কথা চকিতে একবার মনে পড়ে গেল তাঁর। কলেজে আসার সময় তাকে একটা খালি টিন নিয়ে বাজারে ছুটতে দেখেছেন। কোন্ দোকানে নাকি কেরোসিন এসেছে। ছুটে গিয়ে লাইন দিতে হবে। এর আগে দু'দিন দাঁড়িয়ে এক ফোঁটাও পায় নি। উপরন্তু মারামারি, বোমাবাজি। ভয়ে পালাতে গিয়ে একদিন পুরো একটা টাকা হারিয়ে এসেছে ছেলেটা। আজ আবার কি হয় কে জানে! এত কষ্ট করে লাইনে দাঁড়িয়ে তেল পাওয়া যায় না। অথচ তেলের কি অভাব? পাড়ার পাঁচু সেদিন তাঁকে বলেছিল, 'আড়াই টাকা লিটার দেবেন মাষ্টারমশাই? মাল ঘরে পৌঁছে দেব।' কোত্থেকে দেবে! তেলের তো তাহলে অভাব নেই! বেশী দামের জন্য চমৎকার মজুত করা আছে সব। ......ভাষায় যতখানি সম্ভব রূঢ়তা এনে সনাতনবাবু অভিসম্পাত দিলেন মজুতদারদের। তারপর আরো ক'টা কারণ পার হয়ে সপ্তমে এসে হোঁচট খেলেন। মুহূর্তে গুটিয়ে নিলেন নিজেকে। আসলে তিনি বলতে চেয়েছিলেন, সর্বস্তরে প্রশাসন-যন্ত্রের চূড়ান্ত ব্যর্থতার কথা। কোনো রাজনীতির মঞ্চ থেকে নয়, নিজের জীবনের তিক্ত করুণ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে দাঁড়িয়েই বলতে চেয়েছিলেন, 'সমস্ত মূল্যবৃদ্ধির মূল এবং একমাত্র কারণ হইতেছে এই নষ্টচরিত্র অযোগ্য অপদার্থ প্রশাসন-ব্যবস্থা। ইহার এমন নীতি নির্ধারণের ক্ষমতা নাই যাহাতে উৎপাদন বাড়াইতে পারে, এমন শক্তি নাই যাহাতে উৎপাদিত দ্রব্যের সুষ্ঠু বণ্টন হইতে পারে, এমন আইন নাই যাহাতে মজুতদারি বন্ধ করিতে পারে, এমন সাহস নাই যে চোরাকারবারিদের দণ্ডবিধান করিতে পারে। প্রকৃতপক্ষে এই প্রশাসন

ঠুঁটো জগন্নাথ, কার্যত উহাদের হাতের পুতুলমাত্র—'

কিন্তু এসব সাংঘাতিক কথা! মনে থাকলেও ক্লাসে দাঁড়িয়ে মুখে উচ্চারণ করা যায় না। করলে এখুনি একটা হৈ চৈ শুরু হয়ে যাবে। তারপর চাই কি, তাঁকে 'মিসা'য় ধরে নিয়ে যাওয়াও আশ্চর্য নয়। দেশ এখন দ্রুত সমৃদ্ধির পথে, এই অবস্থায় তিনি কিনা সমৃদ্ধি-রথের সারথিদের এমন কটু সমালোচনায় প্রবৃত্ত!

সামলে নিয়ে সনাতনবাবু তাকালেন ছেলেদের দিকে, 'বলো তোমরাই বলো, আর কি বলা যায়?' আসলে তিনি একটু যাচাই করে নিতে চাইলেন ওদের। দেখা যাক কেউ কিছু বলে কিনা। কিন্তু ছেলেদের তরফে বিশেষ উৎসাহ দেখা গেল না। বরং নোট লেখানো বন্ধ হওয়ায় তারা বিরক্তই হ'ল। শুধু সামনের বেঞ্চি থেকে সাদামাঠা গোছের একটা ছেলে উঠে বলল, 'স্যার জনসংখ্যা বৃদ্ধি—'

সনাতনবাবু খুশি হয়ে ঘাড় নাড়লেন, 'হ্যাঁ, ওটাও একটা কারণ, অন্যতম প্রধান কারণ। খুব ভাল পয়েণ্ট বলেছ তুমি। লেখো, রাইট ডাওন—'

কিন্তু লেখাতে গিয়ে কোথায় যেন একটু খট্‌কা লাগল তাঁর। সত্যিই কি জনসংখ্যাবৃদ্ধি বর্তমান মূল্যবৃদ্ধির একটা প্রধান কারণ? এই দেশের মানুষের সংখ্যা হু হু করে বাড়ছে বলেই কি জিনিসপত্রের দরদামও হু হু করে বাড়ছে? মানুষজন সব মরে দেশটা শ্মশান হয়ে গেলেই সব দরদাম নেমে যাবে? জিনিসপত্র জলের মতো সস্তা হবে? ১৩৫০ সালে দেশে মানুষের সংখ্যা তো বেশী ছিল না তবু মন্বন্তর কেন হয়েছিল? আরো দুশো বছর আগে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর কেন হয়েছিল? সে সময় কেন জিনিসপত্রের দর বেড়েছিল? পৃথিবীর এমন দেশও তো আছে যার জনসংখ্যা এ দেশের দেড়গুণ, কই সেখানে তো মানুষ অনাহারে মরছে বলে শোনা যায় না? তাহলে। এসব কথাও কি বলবেন তিনি? বলা ঠিক হবে?

কে যেন উঠে দাঁড়িয়ে খর খরে গলায় ডাকল, 'স্যর!'

সনাতনবাবু তাকিয়ে দেখলেন পেছনের বেঞ্চির সেই ডোরাকাটা গেঞ্জি গায়ে ছেলেটা। দাঁড়িয়ে দাঁত বের করে হাসছে।

সনাতনবাবু থিতিয়ে গেলেন মুহূর্তে। ম্রিয়মাণ গলায় বললেন, 'কি হ'ল তোমার?'

'আপনি আসল কারণটাই যে মিস্ করে গেলেন স্যর!'

সনাতনবাবু আরো নার্ভাস বোধ করলেন, 'কি কারণ?'

হাসিটা আরো একটু বিস্তৃত করে শূন্যে ডানহাত নাচিয়ে ছেলেটা বলল, 'শ্রমিকদের বেইমানি স্যর। বেটারা কুঁড়ের বাদশা এক একটা, কিছু কাজ করে না, খায় দায় ফ্‌র্তি করে বেড়ায়, আর থেকে থেকে চেঁচায়, মাইনে বাড়াও, ডি-এ বাড়াও, বোনাস দাও! ওদের জন্যই কাঁড়ি কাঁড়ি নোট্ ছাপতে হয় ফি-বছর।'

এক নিঃশ্বাসে মুখস্থ বলার মতো এতগুলো কথা বলে একটু থামল ছেলেটা। ওর দাঁড়ানোর ভঙ্গি থেকে দাঁত বের করে হাসার ও কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাত নেড়ে কথা বলার ভঙ্গি দেখে রাগে বিরক্তিতে সমস্ত শরীর ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল সনাতনবাবুর। ইচ্ছে হ'ল প্রচণ্ড জোরে ক্লাস কাঁপিয়ে ধমকে ওঠেন। কিন্তু সামলে নিলেন নিজেকে। একধরণের স্তম্ভিত বিস্ময় নিয়ে শুধু বললেন, 'কি বলছ তুমি!'

ছেলেটা একইরকম ভঙ্গিতে বলল, 'হ্যাঁ, স্যর। কথায় কথায় আবার মিছিল করে, ধর্মঘট করে, কলকারখানার যন্ত্রপাতি ভেঙেচুরে নষ্ট করে। চুরি করে মাল সরিয়ে ফেলে। আমার বাবার কারখানা আছে স্যর, আমি জানি। ওদের জন্যই প্রোডাকশন্ বাড়ছে না, জিনিসপত্রের অভাব লেগেই আছে! কাজেই দরও বেড়ে যাচ্ছে! —এই পয়েন্টটাও আপনাকে লিখিয়ে দিতে হবে স্যর!'

অনুরোধ নয়, সনাতনবাবুর উপর রীতিমত যেন একটা আদেশ জারি করে বসে পড়ল ছেলেটা। রাগে অপমানে সনাতনবাবুর মুখচোখ গরম হয়ে উঠল, ঠোঁটদুটো কাঁপতে লাগল থরথর করে। কুঁচকানো-চামড়ার প্রৌঢ়হাতের মুঠো পাকিয়ে উঠল। কয়েক মুহূর্তের জন্য রুদ্ধবাক্ হয়ে গেলেন তিনি।

ক্লাসে একটা গুঞ্জন উঠল। প্রথমে অস্পষ্ট ও মৃদু, তারপর ক্রমশ সরব ও সোচ্চার। স্তম্ভিত সনাতন প্রথমটায় কিছু বুঝতে পারলেন না, তারপর শুনলেন প্রথম বেঞ্চির সেই সাদামাঠা নিরীহগোছের ছেলেটা একটি ঋজু সরলরেখার মতো দাঁড়িয়ে বলছে, 'এসব থাক। এসব আমরা লিখব না।'

তার দেখাদেখি উঠে দাঁড়াল আরেকজন, 'হ্যাঁ স্যর, আপনি অন্য পয়েন্ট বলুন।'

গোলমালের মধ্যে কে যেন বলে উঠল, 'আমার বাবার তো কারখানা নেই স্যর।'

তার বলার ভঙ্গিতে কিছু ছেলে চাপাগলায় হেসে উঠল।

সনাতনবাবু পর্যায়ক্রমে সমস্ত ছেলের মুখের দিকে তাকালেন। তার বুকের মধ্যে একটা অসহায় ক্রোধের দাপাদাপি। চিৎকার করে কিছু বলতে চাইছেন। কিন্তু ক'দিন আগের হৃষিবাবুর ঘটনাটা মনে পড়ছে। সাহস হারিয়ে ফেলছেন সঙ্গে সঙ্গে। ক্রোধ এবং অস্থিরতা আরো বাড়ছে। উত্তেজনায় আবার প্ল্যাটফর্মের উপর উঠে দাঁড়ালেন তিনি। দাঁড়িয়ে মাথা উঁচু করে তীব্র ঘৃণা ও অবজ্ঞার দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন পেছনের ডোরাকাটা চিতাবাঘের মতো গেঞ্জিটার দিকে। তারপর রূঢ় চাপাগলায় বললেন, 'তোমরা নেকস্ট পয়েন্ট লেখো, প্রতিকার। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিকার—'

ঘণ্টা পড়ার পর রেজিস্ট্রি খাতা, চক ও ডাস্টার নিয়ে ক্লাস থেকে বেরিয়ে এলেন সনাতনবাবু। লম্বা বারান্দায় ছাত্রদের ভিড় ঠেলে সামনের দিকে এগুতে লাগলেন। সিঁড়ি ভেঙে এবার তাঁকে দোতলায় উঠতে হবে। তারপর স্টাফ রুম।

তাঁকে বড় ক্লান্ত, বিমর্ষ, বিপর্যস্ত দেখাচ্ছিল। যেন মনের ভিতর কোথাও একটা প্রবল ঝড় বইছে, তার ঝাপটায় এলোমেলো আর শিথিল হয়ে গেছে তাঁর শরীরের গ্রন্থিগুলো। সমস্ত চেতনা জুড়ে বিষণ্ণ অবসন্নতা। পিপাসায় গলা বুক শুকিয়ে কাঠ হয়েছে।

আজ রাত ভোর হলেই গাঁ থেকে হয়ত এসে পড়বে শৈলর উপবাসী ছেলেমেয়েরা। তাদের মুখে অনাদি ঘোষের মৃত্যু সংবাদ শুনে হয়ত কাঁদবে তাঁর স্ত্রী। তারপরই অভাবের সংসারে বাড়তি কিছু পোষ্য নিয়ে অশান্তি শুরু হয়ে যাবে। একের ক্ষুধার অন্নে ভাগ বসাবে অন্যজন। কি দিয়ে কি করবেন সনাতনবাবু! কাকে অনাহারে রেখে কার ভাত জোটাবেন—

হ্যাঁ, প্রতিকার! ……'উৎপাদন বাড়াইতে হইবে, মজুতদারি বন্ধ করিতে হইবে, চোরাবাজারিদের শাস্তি দিতে হইবে, মুদ্রাস্ফীতি রোধ করিতে হইবে, বণ্টন ব্যবস্থায় সাম্য আনিতে হইবে—'

……কিন্তু এ সব কি স্থায়ী প্রতিকার? অথবা তিনি কি বিশ্বাস করেন এ সব কাজ কোনোদিন করা হবে? এদের পক্ষে করা সম্ভব? তা হলে স্বাধীনতার পর পঁচিশ বছর ধরে কেউ করল না কেন? বাধাটা কোথায় ছিল?

হ্যাঁ, এখন তিনি জানেন, বিশ্বাস করেন, স্থায়ী প্রতিকারের পথ এসব নয়। এ সবই গৌণ ব্যাপার। আসলে আমূল গভীর সর্বব্যাপী একটা পরিবর্তন চাই। পুরনো গাছ শিকড় সমেত উপড়ে ফেলে নতুন চারার রোপণ চাই। যেমন চাই পচাগলা ঘুণধরা শিক্ষাব্যবস্থায়, তেমনি রাষ্ট্রক্ষেত্রেও। সব ভেঙেচুরে তছনছ করে একটা নতুন রাষ্ট্র নতুন সমাজ চাই! এ না হলে কিছুই হবার নয়।

কিন্তু এই কথাগুলো তিনি বলতে পারলেন কই? সতেজ সরব গমগমে গলায় ডাক দিয়ে স্পষ্ট উচ্চারণে বলতে পারলেন কই, 'ছাত্রসকল! প্রতিকারের পথ এখন একটাই, এই রাষ্ট্রব্যবস্থাকে সবলে এবং সমূলে উৎখাত করা, এই সমাজব্যবস্থাকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করা! ধ্বংসের মধ্য দিয়ে নতুন সৃষ্টির উৎসব ত্বরান্বিত করিতে না পারিলে এই দেশে উপবাসের কোনো প্রতিকার নাই, অনাহারে মৃত্যুর কোনো প্রতিবিধান নাই—'

কিন্তু এসব বড় সাংঘাতিক কথা, বলা যায় না! বার বার শব্দগুলো জিভের ডগায় এসেও ফিরে ফিরে গেল। রুদ্ধ বাক্যস্রোত

এখন অন্তরে ঝড় তুলেছে। বিপর্যস্ত হয়ে গেছেন সনাতনবাবু। দোতলার এক একটা সিঁড়িকে এক একটা পাহাড়ের মতো মনে হচ্ছে তার।

স্টাফ্‌রুমে এসে বড় গ্লাসে জল খেলেন সনাতনবাবু। তারপর পাশের চেয়ারে হৃষিবাবুকে দেখতে পেয়ে সতর্কভঙ্গিতে চারদিকে তাকিয়ে ক্ষুব্ধ চাপাগলায় বললেন, 'বুঝলেন হৃষিবাবু, ক্লাসে আমরা যা পড়াই, সবই ভুল পড়াই! মিথ্যে পড়াই, মিথ্যে শেখাই! সত্যি কথাগুলো বলতে পারি কই?'

উত্তাপ

—'ছাখো মা, আমার আবার জ্বর এসে গেল!'

রোগা দুর্বল একটা হাত সামনের দিকে অল্প একটু বাড়িয়ে দিয়ে পুষ্প বলল। তক্তপোশের এককোণায় কাত হয়ে শুয়েছিল ও। পা থেকে কোমর পর্যন্ত নীলরঙের কাঁথায় ঢাকা। মুখটা শুকনো শুকনো, চোখের মণিদুটো ঈষৎ লাল, সাদা জমিটুকু সামান্য হলদে।

দুপুরে ভাত খাওয়ার পর লম্বা ঘুম দিয়েছিল পুষ্প। অল্পক্ষণ হ'ল জেগেছে। তারপর অনেকখানি সময় নিয়ে চুপ করে শুয়েছিল। বোধ হয় জ্বরটা সত্যি সত্যি আসছে কিনা চুপ করে থেকে বুঝে নিতে চাইছিল। কয়েক মিনিট না যেতেই সেই পুরনো পরিচিত উপসর্গ-গুলো এক এক করে দেখা দিতে লাগল। একটু শীত শীত ভাব, সারা গায়ের লোমকূপে মৃদু শিরশিরানি, কপালের উপর-দিকটায় সামান্য ব্যথা এবং বুকের পাঁজরগুলোর গায়ে-গায়ে ছটফটে একটা উত্তাপ—এসবকিছু ক্রমশ ছড়িয়ে পড়তে দেখে পুষ্প মুখ কালো করে হাত পা টান-টান সোজা করে দিল। শরীরটাকে এ-পাশ ও-পাশ করে বার দুই ঝাঁকিয়ে নিয়ে থুতনি বেঁকিয়ে গুণে গুণে হাই তুলল তিনটে। অম্বলের চোঁয়া ঢেকুরের মতো তিক্ত বিস্বাদ খানিকটা গরম বাতাস বুকের উপর ছড়িয়ে পড়ল। বিরক্ত হয়ে পুষ্প দাঁতে দাঁত ঘষে একধরণের বিচিত্র কুর কুর শব্দ করল। তারপর যথেষ্ট অন্যমনস্ক থেকেও অভ্যাসবশে বিছানার তলা থেকে খুঁজে-পেতে পুরনো শাড়ি জুড়ে জুড়ে সেলাই-করা নীলরঙের পাতলা কাঁথাখানা বের করে কোমর পর্যন্ত ঢেকে নিল। হাঁটুদুটোর ভাঁজ ভেঙ্গে ছোট করে কাত হয়ে শুল। ইতিমধ্যে কপালের চিনচিনে ব্যথাটা বাড়তে লাগল এবং আস্তে আস্তে উপরের দিকে উঠে গিয়ে মাথায়, চুলের ফাঁকফুঁকগুলোতে ছড়িয়ে পড়ল। পুষ্পর চোখদুটো

আগে ঘোলাটে, পরে ঈষৎ রক্তাভ হ'ল। গালদুটো চুপসে গর্তে বসে যেতে লাগল এবং থুতনিটা সামনের দিকে সামান্য ঝুলে পড়ল। দাঁতে-দাঁতে কুর-কুর শব্দটা বন্ধ রেখে পুষ্প তখন জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছিল।

আর এই জ্বর আসার আগের মুহূর্তগুলোতে ইদানীং পুষ্প যা ভাবে—সেই পুরনো ভাবনাটা আজও ওকে পেয়ে বসেছিল, আমার জ্বর এ-সে গে-ছে! তাহলে আজ রাতেও ভাত খেতে পেলুম না। আমাকে বার্লি খেয়ে কাটাতে হবে। রান্নাঘরে হাত পা ছড়িয়ে বসে নন্তু বিলু মা বাবা সবাই যখন মাছের ঝোল, এঁচোড়ের চচ্চড়ি কি কুমড়ো-ভাজা দিয়ে ভাত খেতে খেতে মজা করে গল্প জুড়ে দেবে, আমাকে তখন চুপটি করে বিছানায় শুয়ে থেকে কেবল চিনি-বার্লি, জল সাগু এসব খেতে হবে, না খেলে বাবার ধমক, মার বকুনি খেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হবে। নন্তুটা বদমাইশ হয়েছে খুব। বয়সে বাচ্চা হলে কি হয় বিলুও কম যায় না। রাগে ফুলতে ফুলতে নাকচোখ বন্ধ করে আমি যখন বার্লির বাটিটা কামড়ে ধরে থাকব, আমার খাওয়া নিয়ে তখন ওরা হাসাহাসি, গা টেপাটেপি করবে। 'বিলু দ্যাখ, দিদিটা কেমন প্যাঁচার মতো মুখ করে বার্লি খাচ্ছে দ্যাখ' —নন্তু দরজার আড়ালে থেকে দাঁত বের করে বলবে। বিলু হাসবে না, কচিমুখখানা গম্ভীর করে গাল ফুলিয়ে চোখদুটো বড় বড় করে বয়স্কলোকের মতো ঘাড় নাড়বে। অথবা অবিকল মায়ের গলা নকল করে আঙ্গুল উঁচিয়ে ভারিক্কি ভঙ্গিতে বলবে, 'খেয়ে নে দিদি, লক্ষ্মীটি, আর এতটুকুত আছে, খেয়ে নে টুপ করে!'

কিন্তু নন্তু বিলুর গা টেপাটেপি কি হাসাহাসিটা এমন মারাত্মক কিছু না। ওরা দিব্যি পেট পুরে দু'বেলা ভাত, চুরি করে শুকনো আমসি কি তেঁতুলের আচার খেতে পায় বলে আমি ওদের ঈর্ষা করি না। ওরা এখনও ছোট, বয়সে বুদ্ধিতে আমার চেয়ে বেশকিছু ছোট, ছোট ভাই-বোনের খাওয়া নিয়ে ঈর্ষা করলে পাপ হয়। পাপ করলে ঈশ্বর শাস্তি দেন। স্কুলে আমি একদিন আমার চেয়ে বয়সে

ছোট একটা মেয়েকে চড় মেরেছিলুম, দিদিমণি অনেকক্ষণ ধরে আমাকে বুঝিয়েছিলেন।

তবু যে-মেয়েটা মাসের মধ্যে বিশদিন জ্বরে কাবু হয়ে বিছানায় পড়ে থাকে, দুধ না, হরলিকস না, ফল-মূল দূরে থাক একটুকরো বিস্কুট কি একটা চকলেট পর্যন্ত যার ভাগ্যে জোটে না, বিশদিন দু'বেলা যাকে জল-জল-বার্লি খেয়ে কাটাতে হয়, তার পক্ষে বাকি দশদিনের ভাতের স্বাদ ভোলা কিছুতেই সম্ভব না। আর তা পারে না বলেই জ্বরের মুহূর্তগুলোতে কই-মাগুরের আঁশটে গন্ধ, হিঞ্চে কি থানকুনি পাতার তিতকুটে স্বাদ, পুরনো লালচালের সুন্দর রঙ্‌টা— পুষ্পর অনুভূতির সঙ্গে এমন ঘন হয়ে জড়িয়ে যায়। বিশেষ করে মাখা-তেঁতুলের টক-টক ঝাল-ঝাল গন্ধটা পুষ্পর সবচেয়ে বেশী প্রিয়। প্রিয় বলেই জ্বরে কাঁপতে কাঁপতেও সারাক্ষণ এইরকমের একটা বিচিত্র গন্ধ অনুভব করে। জ্বর যত বাড়তে থাকে সমস্ত ঘরে ছড়িয়ে থাকা ঘ্রাণের বৃত্তটাও তত ছোট হতে থাকে। অবশেষে একটি বিন্দুর রূপ নিয়ে পুষ্পর নাকের ডগায় ঝুলে পড়ে। এ সময় পুষ্পর জিভ যে শুকিয়ে যায় না, তেতো বিস্বাদ জল জমে জমে কেবলই মুখ ভরে উঠতে থাকে—সে কি এই গন্ধটার জন্যই। অথচ এসব বস্তু আজকাল নিষিদ্ধ হয়ে গেছে ওর কাছে। কতকাল যে তেঁতুল খায় না পুষ্প! নন্তু কি বিলু গরমের দুপুরগুলোতে তেঁতুল মাখে। নুন লঙ্কার সঙ্গে ঝোলাগুড়, আচারের তেল মিশিয়ে চট্‌কে চট্‌কে শক্ত কাঠির মতো তেঁতুলগুলোকে কেমন সুন্দর মোলায়েম করে ফেলে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে করুণ চোখে চেয়ে থাকা ছাড়া পুষ্পর আর কিছু করার থাকে না। রান্নাঘরের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে ওরা যখন এসব চেটেপুটে খায়, বড়জোর মাকে ও ডেকে দিতে পারে, 'দ্যাখোগে মা, নন্তু বিলু আবার হাঁড়ি থেকে তেঁতুল, বোয়েম থেকে আচারের তেল নিয়েছে, আমি গন্ধ পাচ্ছি।'

সুবর্ণ ঘরে ঢুকল আরো একটু পরে। রান্নাঘর ধোয়া-মোছার কাজ সেরে উনুনের ছাই ঝেড়ে ঘুঁটে সাজিয়ে ও তাতে কেরোসিন

ঢেলে দিয়েছে। তারপর নির্দিষ্ট জায়গাটুকুতে দেশলাই খুঁজতে গিয়ে পায় নি। এখানেই ত থাকে বাক্সটা, তবে কোথায় গেল, অন্য আর কোথায় রাখলাম—ভেবে অবাক হয়ে সুবর্ণ আরো দু'এক জায়গায় হাত চালিয়ে খুঁজে ব্যর্থ হবার পর মুখ কালো করে ফেলল। আর ঠিক তখুনি ইন্দুমাধবের উপর ও পুরোপুরি বিরক্ত হ'ল। মানুষটার জ্বালায় একটা জিনিস যদি ঠিক জায়গামতো থাকত। ওলট-পালট কিছু করবেই। নির্ঘাত পকেটে পুরে নিয়ে গেছে অফিসে। আমি এখন আগুন পাই কোথায়, উনুন ধরাই কি দিয়ে, কেরোসিনটুকু যে সব উবে গেল—বিড়িখোর ভূত কোথাকার। রাগ করে ইন্দু-মাধবকে মনে মনে গাল দিতে দিতে সুবর্ণ এ ঘরে ছুটে এসেছিল। যদি একটা কাঠি কোথাও পাওয়া যায়। রান্নাঘরে অনেক ফালতু বাক্স পড়ে আছে, ঘষে জ্বালিয়ে নিলেই হবে। পুষ্প নামে একটা মেয়ে, যে প্রায়ই জ্বরে ভোগে এবং যার এই মুহূর্তে জ্বর এসে যাওয়াও কিছু বিচিত্র না, সে যে ধনুকের মতো বেঁকে-দুমড়ে কাঁথা জড়িয়ে পড়ে আছে, যেন দেখেও দেখল না সুবর্ণ। ঘুঁটের উপর থেকে কেরো-সিনটুকু শুকিয়ে গিয়ে একটা বাড়তি খরচের বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, আরো দেরি করলে ফের নতুন করে কেরোসিন ঢালতে হবে, ভেবে অসম্ভব বিরক্ত হয়ে তাকের উপরকার জিনিসপত্রগুলো শব্দ করে ঠেলে সরিয়ে দেশলাইয়ের একটা কাঠি খুঁজছিল সুবর্ণ।

ফলে পুষ্পকে নিজে থেকেই জানান দিতে হ'ল। ঘরে ঢুকে মা আমাকে কেন দেখল না, আমার কি হয়েছে, শুয়ে আছি কেন, এই মনোরম বিকেলটুকুতে কাঁথা জড়িয়ে শুয়ে থাকার মতো এমন কি কারণ ঘটল—একবার জিজ্ঞেস পর্যন্ত করল না, ভেবে সুবর্ণর উপর যে সামান্য অভিমানটুকু হয়েছিল আঙুলের ডগায় রোদ্দুরের তাপের মতো ত' মনের মধ্যে পুরে রেখে আস্তে আস্তে পাশ ফিরল। রোগা দুর্বল হাড়সর্বস্ব একটা হাত সামনের দিকে অল্প প্রসারিত করে বাচ্চা চড়ুই পাখির ডাকের মতো করে বলল, দ্যাখো মা, আমার আবার জ্বর এসে গেল।'

'এসে গেল না কি !' সুবর্ণ পলকে মেয়ের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। অস্থির ছটফটে দৃষ্টিটা স্থির শান্ত নিরুত্তাপ হয়ে এল, 'চমৎকার। আমাকে সগ্‌গে তুলে দিলে একেবারে !'

বলার ভঙ্গিটুকু কর্কশ হয়ে বাজল। শুধু দেশলাই খুঁজে না পাওয়ার ক্ষোভে না, পুষ্পর মনে হ'ল আমার জ্বরের খবরটাই আচমকা আরো বেশী করে রাগিয়ে দিল মাকে। সোজা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে কেমন কটু বিস্বাদ চোখে কটমট করে তাকাচ্ছে দ্যাখো, যেন ঠাস-ঠাস করে গালে ক'টা চড় মারতে পারলে খুশী হয় ! চোয়াল-ওঠা রোগা হিজিবিজি দাগকাটা ডিমের মতো ছুঁচলো মা'র ফর্সা মুখটা কি বিচ্ছিরি দেখাচ্ছে। তুমি অমন করে তাকিয়ে থেকো না মা, আমার মোটেই ভাল লাগছে না, ভয় করছে। আমি মিথ্যে করে বললুম, আমার জ্বর আসে নি। পুষ্প মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিয়ে চোখ বন্ধ করল।

'দেখি কতটা জ্বর এসেছে।' সুবর্ণ আস্তে আস্তে মেয়ের দিকে এগিয়ে এল। উনুন ধরাতে গিয়ে হাতদুটো যথেষ্ট নোংরা হয়ে আছে বলে কনুই আর কব্জির মাঝামাঝি একটা জায়গা পুষ্পর কপালে চেপে ধরে গায়ের উত্তাপ অনুভব করতে চাইল। 'হুঁ, দিব্যি গরম ঠেকছে গা।' পুষ্পর কপাল থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে মোলায়েম করে বলল, 'বিছানা ছেড়ে নামিস নে কোথাও, কাঁথাটা ভাল করে টেনে শুয়ে থাক চুপ করে।'

'শুয়ে থাকব ?' পুষ্প আস্তে আস্তে চোখ খুলল। মা আর রেগে নেই, ধমকের মতো চেঁচিয়ে কথা বলছে না, কি চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে থাকছে না, গলায় মমতার স্পর্শ, কপালে চিন্তার ছায়া টের পেয়ে পুষ্পর সামান্য অভিমানটুকু গলে জল হয়ে যেতে বেশী সময় নিল না। খুশী হয়ে পাশ ফিরে মা'র মুখের দিকে তাকাল। মা, তুমি কি অসম্ভব রোগা ! কয়লা ভেঙে উনুন ধরাতে গিয়ে কতটুকু বা পরিশ্রম হয়েছে, অথচ দেখ তোমার রোগা মুখটায়, কপালে চোখের ভাঁজগুলোতে এখনও ঘাম চিক চিক করছে।...রোজ বিকেলে

সাবান দিয়ে হাতমুখ ধুয়ে তুমি পরিপাটি করে চুল বাঁধো না কেন মা, তাহলে তোমার ফর্সা নরম গালদুটো দেখতে তত খারাপ লাগবে না……

মা'র কাছ থেকে আরো বেশী সহানুভূতি পাবে বলে পুষ্প মুখটাকে যথাসম্ভব করুণ ও অসহায় করে তুলেছিল। স্বর্ণ এখনও চলে যায় নি, পুষ্পর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে, কোমল স্নেহময় চোখের ছায়া ফেলে রেখেছে বুঝতে পেরে পুষ্প খুব তাড়াতাড়ি টস টস করে বলল, 'আমার কিন্তু এখন আর একটুও শীত করছে না, মা।'

—'না করুক। একটা কিছু গায়ে রাখা ভাল। এখন ঋতু বদলাচ্ছে, সময় খারাপ।'

—'রাতে কি খাব মা, বার্লি?'

—'না ত কি, আঙুরের রস? শুয়ে থাক চুপ করে, আমি রান্নাঘরে চললুম।'

পুষ্প ফের নিবে গেল দপ করে। গাছের শুকনো পাতা অল্প বাতাসেই নড়ে ওঠে, কাঁপতে থাকে, ঝরে যেতেও দেরি করে না বেশী। স্বর্ণ রান্নাঘরের দিকে পা বাড়ানো মাত্র খুশির আমেজটুকু ঝরে গেল পুষ্পর। একটা প্রিয় খেলনা হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার মতো মনটা খারাপ হয়ে গেল খুব। কেন, ও কি ভেবেছিল ঘরের কাজকর্ম সব ফেলে রেখে মা এখন ওর পাশে বসে থাকবে? ওর গায়ে পিঠে হাত বোলাবে, আদর করবে, শীতে হি হি করে কাঁপতে থাকলে লেপকাঁথা চাপিয়ে রোগা শরীরটাকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকবে? আগে যেমন থাকত, জ্বর আসার প্রথম দিনগুলোতে? পুষ্প দেখল, মা বারান্দাটুকু পার হয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে যাচ্ছে। চলে গেল! মাকে আর দেখা যাচ্ছে না। একটুপরেই রান্নাঘর থেকে পুষ্প মা'র গলা শুনতে পেল, 'রাঙাদি, দুটো দেশলাইয়ের কাঠি পাঠিয়ে দাও না কাউকে দিয়ে। নন্তু বিলু? ওরা রাত আটটা না বাজলে মাঠ থেকে ফিরবে ভেবেছ! পুষ্পটার আবার জ্বর এসে গেছে। আমার হয়েছে শতেক জ্বালা রাঙাদি!'

'রাঙামাসি আমারও।' চুপ করে শুয়ে থেকে দাঁতে দাঁত বাজিয়ে পুষ্প কুর কুর শব্দ শুরু করেছিল। এরকম শব্দ করতে ওর ভাল লাগে। এতে মাথা ব্যথার যন্ত্রণা একটু নাকি কম মনে হয়, কান পেতে শুনতেও খুব একটা খারাপ লাগে না। অনেকক্ষণ ধরে শুনলে শব্দটাকে ঝিঁঝিঁর গান বলে মনে হয়। গান শুনতে শুনতে পুষ্পের একসময় ঘুম পায়। কিন্তু এখন ও গান শুনবার জন্য কি ঘুমোবার জন্য ওই শব্দ করছিল না। সুবর্ণর ব্যবহারে ও কতখানি বিরক্ত হয়েছে বোঝাবার জন্য একটা চোখ ছোট করে দাঁতে দাঁত ঘষছিল। মা'র কথামতো কাঁথাটাকে বুকগলা পর্যন্ত টেনে দেবে বলে মুঠো করে ধরেছিল। এখন আর শীত করছিল না, প্রথম কাঁপুনির ধাক্কা সামলে নিয়ে পুষ্প সামান্য সুস্থ বোধ করছিল। গলায়, বুকের ভাঁজে অল্প অল্প ঘাম জমছিল বলে গরম লাগছিল। কিন্তু এই সুস্থ গরমটুকু বেশীক্ষণ থাকবে না, কোনোদিন থাকে না, পুষ্প জানে। আর একটু পরেই ফের ওর শীত করতে শুরু করবে। সারা গা থর থর ক'রে কেঁপে ঠাণ্ডা হয়ে জমে আসতে থাকবে। মুখেচোখে গভীর অন্ধকার দেখতে দেখতে পুষ্প বুঝতে পারবে আসল জ্বরটা এবার এসে গেল। এখন আমাকে জ্ঞান হারাতে হবে। আর কিছু দেখবার বোঝবার কি ভাববার উপায় থাকবে না।

সব জেনেও পুষ্প মা'র কথামতো কাঁথাটা ভাল করে জড়িয়ে নিল না। বরং একটু যেন রাগ করেই পায়ের নখগুলোকে বেড়ালের মতো করে আঁচড়ে আঁচড়ে আরো নীচের দিকে নামিয়ে দিতে লাগল। পাশের বাড়ির রাঙামাসিকে মা আর কিছু বলছে কি না, বিশেষ করে তার সম্পর্কে আর কোনো কথা ওঠে কি না, মনোযোগ দিয়ে শুনবার চেষ্টা করছিল।

তোমার আবার জ্বালা কি মা। পুষ্প ভাবছিল, আর ভাবতে ভাবতে কাঁথাটাকে গোড়ালির কাছে জড়ো করে পা দিয়ে পিষছিল। তুমি তো দিব্যি হাত পা খেলে বেড়াচ্ছ, দু'বেলা মজা করে ফুলকপির ডালনা দিয়ে ভাত সাঁটছ, পান চিবুতে চিবুতে গোল হয়ে শুয়ে সুন্দর

ঘুম দিচ্ছ, তারপর ঘুম থেকে উঠে রাঙামাসি, বটুদের বাড়ি বেড়াতে চলে যাচ্ছ। সেদিন আবার বিলুকে আমার কাছে ঘুম পাড়িয়ে রেখে তুমি বাবা নন্তু তিনজনে চমৎকার রাতের শোয়ে সিনেমা দেখে এলে। আমি যেতে চাইলুম, তুমি ঠাণ্ডা লাগবে, শরীর খারাপ করবে বলে ধমকে আমাকে চুপ করিয়ে দিলে। তুমি, তোমরা সবাই চমৎকার সুখে আছ, শতেক জ্বালা ত আমার মা। দেখ না কেমন মাসের মধ্যে বিশদিন জ্বরে ভুগি, কোথাও বেরুনো দূরে থাক, বিছানা ছেড়ে নড়তে পাই নে। নন্তু বিলু দুপুরে স্কুলে, বিকেলে মাঠে খেলতে চলে যায়, আমাকে চুপ করে বিছানায় শুয়ে থেকে কেবল তোমার রাগ, বাবার বিরক্তি, নন্তু বিলুর হাসি-ঠাট্টা-ইয়ার্কি সহ্য করতে হয়। একটা বাচ্চা ছেলেমানুষ মেয়ে ভাত না খেয়ে, ঘর থেকে এক পা কোথাও না বেরিয়ে, এভাবে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কতদিন কাটাতে পারে বল ত মা? তাছাড়া……

উঁহুঁ, না। ওসব কথা আমি ভাবি না। উঁচু জায়গা থেকে গড়িয়ে নামতে নামতে আচমকা গাড়ির ব্রেক কষার মতো সারা গায়ে একটা প্রবল ঝাঁকুনি অনুভব করে চুপ করে গেল পুষ্প। মনের এলোমেলো ভাবনাগুলোকে ঠিক এভাবে ও আর বেশিদূর এগুতে দিল না। দিয়ে লাভ নেই, মোটেই উচিত না, পুষ্প জানে। বস্তুত এসব চিন্তার কোনো একটাও প্রিয় না ওর কাছে, সুখের না। বরং ভাবতে যেন ওর ভয়ই করে। ভোঁতা অলস একটা ভয় মনের পর্দায় কালো রঙের ভারী ছায়া ফেলে কাঁপতে থাকে। পুষ্প, যার বয়স পনেরোর উপর, বারোমাস অসুখে ভোগার জন্য যাকে দেখলে বারো কি তেরোর বেশী মনে হয় না এবং যার রোগা দেহ জুড়ে কৈশোরের সতেজ ছটফটে পুষ্টতার পরিবর্তে সরল অসহায় শিশুতা ছড়িয়ে আছে ইঁট-চাপা ঘাসের বিবর্ণতা নিয়ে, এ কথা ভেবে বিন্দুমাত্র আনন্দ কি রোমাঞ্চ অনুভব করে না যে, আমার বিয়ে হবে! আমার মতো রোগা প্যাকাটি একটা মেয়ের কোনোদিন বিয়ে হতে পারে। দেখে-শুনে পছন্দ করে কেউ ঘরে নিয়ে যেতে পারে। মা'র মতো কপালে

সিঁদুর দিয়ে, ঘোমটা টেনে আমি কারো বৌ হতে পারি।

তাই ক্বচিৎ-কখনো এসব খারাপ, আজেবাজে ভাবনাগুলো ওর মনের চারপাশে ভিড় করে এলে পুষ্প তাড়াতাড়ি অন্য কথা ভাবে। তেঁতুলের টক-টক ঝাল-ঝাল গন্ধটা কত সুন্দর, কতদূর থেকে বাতাসে ভর দিয়ে ভেসে আসতে পারে, বিলুটা ডালের সঙ্গে এক খাবলা নুন মিশিয়ে জল ঢেলে কি বিচ্ছিরি ভাবে যে খায়, স্কুলের দিদিমণিদের সঙ্গে আমি একবার চিড়িয়াখানায় বেড়াতে গিয়েছিলুম, সেখানে ডোরাকাটা চিতাবাঘের খাঁচার মধ্যে রক্তে মাখামাখি মস্ত বড় একটা ছাগলের মাথা পড়ে ছিল, বাঘটা দাঁত দিয়ে কামড়ে কামড়ে চেটেপুটে তাই খাচ্ছিল, মাঝে মাঝে দু'পায়ের থাবা দিয়ে নেড়ে-চেড়ে মাথাটা নিয়ে খেলা করছিল। দেখতে মোটেই ভাল লাগে নি, গা বমি বমি করে উঠেছিল বলে তাড়াতাড়ি অন্যদিকে সরে গিয়ে আমি হরিণ দেখছিলুম। হরিণের মাংস খেতে খুব ভালো, দু'চারদিন বাসি করে খেলে কিরকম মিষ্টি লাগে দিদিমণি বলছিল। আমি দিদিমণির উপর রাগ করে একটু আড়ালে সরে গিয়ে হরিণের মসৃণ টলটলে চোখ জোড়ার দিকে তাকিয়েছিলুম। বাবা বলেছে, আমি একটু ভাল হয়ে উঠলেই বাড়িতে মাংস আনবে।...আনবে কি! আমি বাজার থেকে একদিন লালরঙের দু'গজ সিল্কের ফিতে আনতে বলেছিলুম, বাবা আনে নি। আমার চুলগুলো এখনও ভালো আছে। তেল দিয়ে ঘষে আঁচড়ে বিনুনি করলে লালরঙের ফিতেটা জবা ফুলের মতো কোমরে দুলবে। সেই সঙ্গে নীল-জমি খয়েরি-পাড়ের শাড়িটা যদি পরি তাহলে এই রোগা কাঠির মতো শরীরে খুব একটা ভাল দেখাবে কি! একটুও ভালো?

পুষ্প হঠাৎ অনুভব করল শ্বাস টানতে কষ্ট হচ্ছে। ঘরের বাতাস খুব একটা ভারী হয়ে গেছে বলে পুষ্প ওর নাকের ছোট ছিদ্র দুটো দিয়ে পরিমাণমতো টেনে বুকে ঢোকাতে পারছে না। হাঁ করে বাতাস টানতে গিয়ে দেখল বুক জ্বালা করে উঠছে। এমন কেন হ'ল, ঘরের ঠাণ্ডা নরম বাতাসটা সহসা এত ভারী তেতো জ্বালা-

ধরানো হয়ে উঠল কি করে বুঝতে না পেরে বিরক্ত হয়ে চোখ পাকিয়ে দরজার দিকে ঘুরে তাকাল। আর তখুনি টের পেল পুষ্প, মা'র উনুন ধরানো হয়ে গেছে। উনুনের ধোঁয়া এ ঘরে এসে ঢুকছে, বাতাসকে ভারী করে দিয়েছে। এ বাড়িটা ভাল না. যেমন ছোট তেমনি অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন। চুন-বালি-খসা দেয়ালের গায়ে হাত ঠেকাতে আমার গা ঘিন ঘিন করে, তক্তপোষের উপর দাঁড়িয়ে হাত বাড়ালে আমি ছাদ ছুঁতে পাই। বর্ষার দিনে ঘরে লাফিয়ে লাফিয়ে ব্যাঙ উঠে আসে। বাড়িটা এমন নোংরা আর ছোট বলেই আমার অসুখ করেছে। এই রকম একটা ঠাণ্ডা স্যাঁতসেঁতে দুর্গন্ধী বাড়িতে বারোমাস বাস করলে কার না অসুখ হয়, জ্বর আসে, মাথা ধরে, শরীরের মাংস শুকিয়ে কাকের পালকের মতো হয়ে যায়। ধোঁয়ায় আমার বুক জ্বালা করছে, দম নিতে কষ্ট হচ্ছে, আর একটু পরে আমার বেশী করে মাথা ধরবে, আমি এখন কি করি। পুষ্প অসহায় চোখ মেলে ঘরের চারদিকে তাকাল। একটি মাত্র জানালা রাস্তার ধারে। দুপুরে শোবার সময় বন্ধ করে রেখেছিল। এখন জানালাটা কি আমি খুলে দেব, পুষ্প ভাবল। বিকেল হয়ে গেছে, সূর্য ডুবে গেছে অনেকক্ষণ। বাইরে ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। এখন সময় ভাল না, কার্তিক অগ্রাণ দুই মাস হেমন্তকাল, এখন তাহলে হেমন্তের শেষ, আর ক'দিন পরেই শীত নামবে। জানালা খুলে দিলে ঠাণ্ডা বাতাসে আমার শীত করবে। শীত করলে জ্বর বাড়বে। মা জানালা খুলে দিয়ে যায় নি। জ্বরের সময় জানালা খোলা বারণ আছে মা'র। বাবা বলেছে মোটা দেখে একটা পর্দা কিনে আনবে, জানালায় টাঙ্গিয়ে দিলে ঘরে নাকি আর লোকজনের দৃষ্টি, রাস্তার ধুলোবালি, ঠাণ্ডা বাতাস কিছুই ঢুকতে পারবে না। কিন্তু আনবে কি? মা এক কৌটো সিঁদুর আনতে বলেছে কতদিন, বাবা আনে নি। তাই নিয়ে মা রাগ করে বাবার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়েছিল, 'সোনা না, রূপা না, যে গয়না গড়িয়ে সেজেগুজে পাড়া বেড়াতে যাব, এসব ছাই-ভস্ম তোমার জন্যই না মাখতে হয় আমাকে।' 'মাখো কেন,

না মাখলেই ত পার। কত বাড়ির মেয়েছেলে ওসব ব্যবহার করছে না আজকাল, কার কি ক্ষতি হচ্ছে তাতে।' মা নন্তুকে দিয়ে পরের দিন সিঁদুর কিনিয়ে এনেছিল। আমি মাকে ডেকে জানালাটা কি খুলে দিতে বলব।

পুষ্প চুপ করে গেল। মাকে ও ডাকবে না। নিজে উঠে গিয়ে খুলে দেবে সে সাহসও পেল না। বিছানা ছেড়ে নামতেই ওর ভয় করছিল। এই জ্বর আসার সময় ওর সারা গায়ে একটুও জোর থাকে না। উঠে দাঁড়াতে গেলে মাথা ঝিমঝিম করে, পা কাঁপতে থাকে, মাজা ভেঙে আসে বলে বাতাসে বেতসডগার মতো পুষ্প টলতে থাকে, মনে হয় শক্ত কঠিন মেঝের উপর এখুনি হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে। কাজেই সে চেষ্টা না করে অলস অসহায় একটা দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকল পুষ্প।

আর তখন ও জানালা না খুলেও অনেক কিছু দেখতে পেল। অনেকদিন ধরে দেখে দেখে অভ্যাস হয়ে গেছে। অভ্যাস থেকে অভিজ্ঞতা। ফলে বস্তুটা সামনে না থাকলেও দেখতে অসুবিধা হয় না। জানালার ও-পাশে সরু রাস্তায় এখন কি ধরনের লোক যাতায়াত করছে, পায়ের শব্দে পুষ্প তা বুঝতে পারল। জুতো টেনে টেনে কারা অফিস থেকে ফিরছে, খালি পায়ে কোলাব্যাঙের মতো লাফিয়ে কেউ কারখানা থেকে, বনানীর দাদার নতুন বিয়ের জুতোর শব্দটা কি বিকটভাবে গলি কাঁপিয়ে চলে, রাঙামাসির বড় দেওর তিনবার স্কুল ফাইন্যাল ফেল্ করে বখে গিয়ে হাওয়াই চটি পায়ে মৃদু থুপ থুপ শব্দ তুলে আড্ডা দিতে বেরুল—ঘরে শুয়ে থেকেও সব ঠিক ঠিক টের পেল পুষ্প। রাস্তার ও-পাশে তারুকাকার বাড়ির ভাঙা নড়বড়ে দেয়াল সামনের দিকে হেলে পড়েছে। ইঁটের রঙ বোঝা যায় না, তারুর বিধবা বৌ ঘুঁটে দিয়ে দিয়ে রং ফিরিয়ে দিয়েছে। বাতাসে গোবরের গন্ধ নাকে এসে লাগে। খুব খারাপ লাগে না আজকাল। হয়ত বারোমাস শুঁকে শুঁকে আর দশটা অভ্যাসের মত এটাও পুষ্পর কাছে, এ বাড়ির সব মানুষগুলোর কাছে সহ্য হয়ে

গেছে। সেই তারুর বৌ কখন দুধ দুইয়ে গরুকে খড়-বিচালি খাইয়ে গোয়ালঘর ঘেঁটে একতাল গোবর নিয়ে লম্বা ঘোমটা মাথায় জড়োসড়ো হয়ে ঘুঁটে দিতে এল, কখন বা লোকের চোখ বাঁচিয়ে সাত-তাড়াতাড়ি ঘুঁটেগুলো তুলে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে, জানালা না খুলেও শুধু শব্দ শুনে সব টের পায় পুষ্প।

আর শুধু এই জগৎটুকুই ত সম্বল না ওর, আরো কিছু আছে। পুষ্প জানে, জানালার ফাঁকে মুখ গলিয়ে একটু উঁচু করে চোখ রাখলে আরো কিছু দেখা যায়। ভাঙা দেয়ালের ঘুঁটে-গন্ধী অস্তিত্বের উপরে একফালি আকাশ, সামান্য রোদ, জ্যোৎস্না. মেঘ, অল্প কয়েকটা তারা, দূরে বড় রাস্তার বুকে দুটো তিনটে আলোর ইসারা এবং খুব লম্বা প্রায় আকাশ-ছোঁয়া আধডজন পামগাছের ঘন সবুজ চিরল-চিরল পাতার মাথা-দোলানি। ওই গাছগুলো পার্ক নামে এক স্বতন্ত্র জগতের অস্তিত্ব ও স্বাদঘ্রাণ বয়ে আনে। বিকেল হলে নন্তু বিলু ওখানে খেলতে যায়। রাঙামাসিকে সঙ্গে নিয়ে মা একদিন গিয়েছিল। আমি আগে রোজ যেতাম। রাঙামাসির বখে-যাওয়া দেওরটা 'পুষ্প কুল খাবি' বলে পার্কে একবার আমার দিকে কাশীর পাকা বাদামি রঙের কুল ছুঁড়ে মেরেছিল। আমি রাগ করে চোখ পাকিয়ে ওর দিকে কটমট করে তাকিয়েছিলাম। ও যায় নি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছিল। আমি মাকে বলে দিয়েছিলাম। মা রাঙামাসিকে বলেছিল। রাঙামাসি কি সেদিন পেণ্টুদা-কে বকেছিল?

একটা না, তিন তিনটে রাধাচূড়া গাছ আছে পার্কে। নন্তু বলেছে, রাধাচূড়া ফুল কৃষ্ণচূড়া ফুলের বৌ, রাধার চূড়ায় থাকে। পামগাছগুলো লম্বা হয়ে আকাশে উঠে গেলে কি হবে, ফুল হয় না বলে কেমন রোগা-ঢ্যাঙা বাড়ি-পালানো ছেলের মতো দেখতে লাগে। বছরে একবার রাধাচূড়া গাছ তিনটে ফুলে-ফুলে ভরে যায়। তখন বসন্তকাল এল বলে আমি বুঝতে পারি। ফাল্গুন-চৈত্র দুইমাস বসন্তকাল। বসন্ত এলে ফুল ফোটে, শুকনো গাছে নরম ঘন সবুজ

রঙের পাতা গজায়, আমের বোল ধরে। কিন্তু বসন্তকালে পাখিরা তেমন আসে না। ওরা দল বেঁধে আসে শীতকালে। চিড়িয়াখানায় ঘুরে ঘুরে সব দেখানোর সময় দিদিমণিরা আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছিল। মাঘ মাসে আমরা গিয়েছিলুম। পৌষ মাঘ দুইমাস শীতকাল। শীতকালে হাজার হাজার রঙবেরঙের পাখিতে চিড়িয়াখানা ভরে যায়।······সেরে উঠলে বাবাকে বলব আর একদিন চিড়িয়াখানায় নিয়ে যেতে। না নিয়ে যায়, মাকে বলে নন্তুকে সঙ্গে নিয়ে যাব। ও এখন বড় হয়ে গেছে, ঠিক চিনে যেতে পারবে। একবার বাসে কি ট্রামে চাপলে কতক্ষণই বা লাগে। আমি কতদিন যে কোথাও যাই না। পর্যন্ত ওই পার্কটুকুতেও না। চব্বিশ ঘণ্টা কি কেবল শুয়ে থাকতে, না থাকলে চুপটি করে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে থাকতে ভাল লাগে। আমার কি একটু কোথাও বেরুতে ইচ্ছে করে না, মা?

'এই মা।' পুষ্প খুব একটা রেগে গিয়ে আচমকা চেঁচিয়ে উঠল। সুবর্ণ হাতমুখ ধুয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। শুকনো গামছা দিয়ে ঘষে ঘষে ফর্সারঙের রোগা গালদুটো লালচে করে তুলেছে। এরপর মাথায় একটু চিরুনি ছুঁইয়ে ছোট করে সিঁদুরের কৌটা দিয়ে ঘরের দরজাগুলোতে সামান্য জলের ছিটে দেবে, সন্ধ্যাবাতি জ্বালাবে। চারআনায় পঁচিশটা ধূপকাঠির তলানি থেকে মাজা-ভাঙা একটা বেছে ধরিয়ে লক্ষ্মীর ছবিটার কাছে গিয়ে হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে মশা কি মাছি তাড়ানোর মত হুটপাট করে ধূপকাঠিটা বারকয়েক ঘুরিয়ে কোথাও গুঁজে দিয়ে চাল ধুতে চলে যাবে। সাজানো গোছানো ছবির মতো, পুষ্প জানে, এসব এখন ঠিক পর পর হয়ে যাবে। জানালা থেকে চোখ সরিয়ে মা-কে ও অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ্য করছিল। কেমন নিস্পৃহ নিরুত্তাপ ভঙ্গি করে নিয়মমাফিক ঘরসংসারের কাজকর্মগুলো করে যাচ্ছে। কোথাও কোনো ব্যতিক্রম নেই, ব্যতিক্রম ঘটবার সম্ভাবনা নেই। পুষ্পর জ্বর এসে গেল বলে চলায়বলায় কাজকর্মের ছন্দে কোথাও একটুখানি অস্থিরতা, বিন্দুমাত্র দুশ্চিন্তার ছায়া নেই। মা-কে

রোজকার মতো সচ্ছন্দ স্বাভাবিক দেখে পুষ্পর প্রথমটায় মন খারাপ, পরে রাগ হতে থাকল। একই সঙ্গে পার্কের কথা চিন্তা করে ঘর থেকে কোথাও বেরুতে না-পারার দুঃখকেও অনুভব করছিল বলে দুটো তিক্ততার সংঘর্ষে চট করে উত্তপ্ত হয়ে উঠতে পারল। রাগ করে চেঁচিয়ে মাকে আচমকা ডেকে উঠে পুষ্প যেন নিজের রুগ্ন অসহায় অস্তিত্বকে ঘোষণা করল, সুবর্ণর স্বাভাবিক নিস্পৃহতাকে ছিন্ন ভিন্ন করে দিতে চাইল।

'জল খাব মা, আমাকে একটু জল দিয়ে যাও।' যেন অনেকক্ষণ ধরে জল চেয়ে চেয়ে হতাশ হয়েছে, পিপাসা সীমা ছাড়িয়েছে বহুক্ষণ, জলের অভাবে পুষ্পর গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে বলে আওয়াজটা এমন তীব্র কর্কশ শোনাল। মুখ মুছতে মুছতে সুবর্ণ মেয়ের দিকে ঘুরে তাকাল। বাইরে কিছু আলো থাকলেও ঘরে সামান্য অন্ধকার জমতে শুরু করেছে। সেই ধূসর অন্ধকারের ছায়ার মধ্যে পুষ্পর মুখ, মুখের রেখাগুলোর সঙ্গে মিলিয়ে চোখের উত্তাপটুকু বারান্দা থেকে স্পষ্ট করে দেখতে পেল না। কিংবা দেখবার চেষ্টা করল কি? রান্নাঘর থেকে জল গড়িয়ে গ্লাস হাতে সুবর্ণ মেয়ের কাছে এসে দাঁড়াল। 'জল খাবি তো অমন চেঁচিয়ে উঠলি কেন!' চোখ ছোট করে গালেচিবুকেক'টা ভাঁজ ফেলল সুবর্ণ, 'শুনে মনে হ'ল কিছু একটা দেখে ভয় পেয়ে গেছিস!'

পুষ্প কথা বলল না। অল্প ঘোলাটে, ঈষৎ রক্তাভ চোখদুটোয় তীব্র তিক্ত একটা ঘৃণার দৃষ্টি নিয়ে নিঃশব্দে মা'র মুখের দিকে চেয়ে রইল। ক্রমে চোখদুটো বুজে আসতে লাগল। দৃষ্টিটা শান্ত হতে হতে একসময় শূন্য নিরর্থক হয়ে গেল। জলের গ্লাস হাতে মা'র ছবিটা দেখতে দেখতে ও আর উত্তপ্ত হয়ে থাকার কোনো কারণই খুঁজে পেল না। কচি অবোধ কোনো শিশুর মতো নিরীহ মুখে ঠোঁট ফাঁক করে ছোট একটু হাঁ করল পুষ্প, 'দাও মা!'

'ঢেলে দিতে হবে নাকি, বা রে!' মুখ গম্ভীর এবং গালের ভাঁজগুলো আরো স্পষ্ট করে সুবর্ণ গ্লাসটা কাৎ করে পুষ্পর ঠোঁটে

রাখল। মনে মনে যথেষ্ট বিরক্ত হয়েছিল ও। পুষ্পর আচমকা চেঁচিয়ে-ওঠাটা ভাল লাগে নি, চমকে গিয়েছিল। তারপর ছাখো, ধুমসি মেয়েটা দিন দিন কেমন ন্যাকা হয়ে উঠছে ছাখো, বয়স কমে কমে ছোট হয়ে যাচ্ছে যেন। একটু উঠে হাত বাড়িয়ে জলের গ্লাসটুকু টেনে নেবে তা না, ভুগে ভুগে এ মেয়ে আর যে কত জ্বালাবে ঈশ্বর জানেন। সুবর্ণ শব্দ করে গ্লাসটা তক্তপোষের নিচে ঠেলে দিল। জল খেয়ে হাতের তেলো দিয়ে মুখ মুছল পুষ্প। মা'র চোখে চোখ রেখে কাঁথাটা ও টেনে নিচ্ছিল। ঘাড় গলা বুক ভাল করে ঢেকেঢুকে শুধোল, 'তোমার উনুন ধরে গেছে?'

—'ধরে এল।'

—'আমায় একটু চা করে দেবে মা, আদা কুচিয়ে?'

—'তোর বাবা আসুক, বারে বারে কত চা করব!' হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে আলোটা জ্বালিয়ে দিল সুবর্ণ। আর দাঁড়াল না। নিজের কাজে যেতে যেতে শেষবারের মতো বলে গেল, 'এত বকছিস, ফের মাথা ধরবে। চুপ করে শুয়ে না-থাকার মজা তখন টের পাবি!'

সুবর্ণ এ ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা ধাক্কা খেল পুষ্প। গড়িয়ে গড়িয়ে ঢালু জমি বেয়ে অনেকখানি নিচে নেমে গেল। রোগা দুর্বল শরীরটা ঠক করে ঠেকল শক্ত কঠিন কোনো পাথরের গায়ে। দাঁতে দাঁত ঘষে শব্দ করতে করতে দুর্বোধ্য একটা মানসিক যন্ত্রণা চাপা দিতে চাইল পুষ্প। এ সংসারে কেউ আর আমার কথা শোনে না, আমার দুঃখ বোঝে না, আমার অসুখের জন্য একটুও ভাবে না। ভারী থমথমে বুক-ভরা দীর্ঘশ্বাস নিয়ে ভাবনাটাকে কান্নার মতো করে ঘরের বাতাসে ছড়িয়ে দিল। আদা কুচিয়ে একটু চা করে দিতে কত সময় যায় মা, কতখানি কয়লা পোড়ে, চা লাগে চিনি লাগে দুধ খরচ হয় যে তুমি বাবা না এলে আমার এই জ্বরের সময়কার সামান্য ইচ্ছেটুকু পুরোতে পার না! আসলে আমি জানি, সব বুঝতে পারি, তুমি আর আমাকে একটুও ভালবাস না মা। তুমি না, বাবা না, এমন কি নন্তু বিলু পর্যন্ত না।

তুমি কথায় কথায় এখন আমাকে মেজাজ দেখাও। আমার সব ইচ্ছে-সাধ-আহ্লাদগুলো ধমকে চুপ করিয়ে দাও। বাবা নিত্যি পেট পুরে ঠেসে ভাত গিলে বিড়ি টানতে টানতে অপিস চলে যায়, ফিরে এসে কেমন সুন্দর বারান্দায় গোল হয়ে বসে চা মুড়ি চিবুতে চিবুতে তোমার সঙ্গে গল্প, হাসি ঠাট্টা ইয়ার্কি দেয়। আমি আছি কি নেই, কিছু খেলুম অথবা সারাদিন উপোস দিয়ে কাটালুম একবার ভাল করে খোঁজ পর্যন্ত করে না। দেখাদেখি নন্তু বিলুও চমৎকার অবহেলা করতে শিখে গেছে আমাকে। বিকেল হলে নিজেরাই কেমন কাপড়-জামা পরে চুল আঁচড়ে পার্কে চলে যায়। আমি যাব কিনা, যাওয়ার মত ইচ্ছে অবস্থা কি মনের জোর আছে কিনা একবার খোঁজ পর্যন্ত নেয় না। বস্তুত না গিয়ে গিয়ে আমি এমন একটা অভ্যাসের ছবি ওদের চোখের সামনে তুলে ধরেছি, এখন আমার বিছানায় শুয়ে থাকাকেই নিয়ম বলে জেনে গেছে ওরা। বিলু রোজ রাতে আমার সঙ্গে খেতে বসত। এখন ও কখন ফেরে খায়-দায়-ঘুমোয় আমি চট করে জানতেও পারি না। কেউ আর কিছু জানানো দরকার মনে করে না। আজকাল সবাই বাতিল করে দিয়েছে আমাকে। পুরনো খাতা ছেঁড়া শাড়ি কি বাবার ভাঙা পুরনো ছাতাটার মতো সংসারের নোংরা আবর্জনাস্তূপে গুঁজে দিয়েছে।

—'ও কে শুয়ে, পুষ্প না ?'

পুষ্প সাড়া দিল না। ও কি ঘুমিয়ে পড়েছিল ? ঘুমন্ত অবস্থায় বুকের শ্বাস কি অমন ছোট বড় মাঝারি সাইজের ঢেউয়ের মত ভেঙে পড়ে ! কান্না চেপে রাখার মতো ! পুষ্প তাহলে ঘুমোয় নি, কেননা, বাবা কখন অফিস থেকে ফিরল, দরজার কড়া নেড়ে খুট খুট শব্দ তুলে নন্তু না বিলু কার নাম ধরে ডাকল, মা গিয়ে দরজা খুলে দিলে ঘরে ঢুকে জুতো ছাড়ল, সব শব্দগুলোই ও তো শুনতে পেয়েছে ! ঘুমিয়ে থাকলে এতসব শব্দ মানুষ কি নির্ভুলভাবে শুনতে পায় ? আর শুধু শব্দ কেন, পুষ্প সবকিছুই টের পাচ্ছিল। জুতোজোড়া

তক্তপোষের তলায় ঠেলে দিয়ে বাবা খালি পায়ে হেঁটে এ ঘরে চলে এল, ছাতাটা দেয়ালের গায়ে একটা পেরেকে ঝুলিয়ে রেখে জামা খুলল, গেঞ্জি খুলল, কাপড় ছেড়ে আলনায় তুলে রেখে লুঙি পরতে পরতে কিছুক্ষণের জন্য স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। পুষ্প টের পেল বাবা এবার তাকে লক্ষ্য করেছে। পা থেকে মাথা কাঁথায় মোড়া নির্জীব নিঃস্পন্দ ভূতুড়ে ছায়ার মতো কে যেন শুয়ে আছে, সামান্য অবাক হয়ে বাবা তার দিকে তাকিয়ে আছে। পুষ্প পলকের জন্য একবার চোখ খুলেছিল। ফের বন্ধ করে চুপচাপ শুয়ে রইল।

একটু পরেই বাবার গলা শুনতে পেল, 'এখন শুয়ে আছিস কেন রে পুষ্প, ঘুমিয়ে পড়লি না কি?'

সব দেখল বুঝল শুনল অথচ জবাব দিল না পুষ্প। মুখের উপর থেকে কাঁথা সরাল না। একটুও নড়ল না। বরং রোগা দুর্বল শরীরটা আরো স্থির শক্ত কঠিন করে দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে থাকল। ওর সমস্ত মন জ্যৈষ্ঠর রোদে-আগুনে ঝলসানো মাঠের মতো রিক্ত শূন্য উত্তপ্ত হয়ে ছিল। কোথাও সামান্য সবুজ ঘাস, একটু মেঘলা ছায়ার স্পর্শমাত্র অবশিষ্ট ছিল না বলে শরীরের সমস্ত হাড়গুলো পুরনো যুগের ক্ষয়ে যাওয়া কি মরচে ধরা পাথুরে-অস্ত্রের মত করুণ নিষ্প্রাণ ভোঁতা করে চুপচাপ পড়েছিল। বাবার ডাকে সাড়া দিয়ে কথা বলতে ভাল লাগছিল না, মোটেই ইচ্ছে করছিল না। ঠুনকো দরদ, নিখরচার ভালবাসায় আমার আর দরকার নেই! সব অনুভূতি জুড়িয়ে ঠাণ্ডা করে আমি এখন মরে আছি। আমাকে আর জাগাতে এসো না তোমরা!

অথবা পুষ্প ভয় পাচ্ছিল। ওর জ্বর আসার খবর এ বাড়ির কাউকেই যে খুশী করে না, আগের মতো আর ভাবিয়ে তোলে না বরং বিরক্ত করে, রাগিয়ে দেয়—পুষ্পর তা বুঝতে বাকি নেই বলে চুপ করে থাকাই বুদ্ধির কাজ ভেবে নিয়েছিল। বস্তুত বাবার ডাকে ও যদি এখন কাঁপাগলায় বাচ্চা কুকুরের ডাকের মতো করে সাড়া দেয়, মুখ থেকে কাঁথা সরিয়ে অসহায় করুণ চোখ ছলছলিয়ে জ্বর

আসার খবরটা শুনিয়ে দেয়, তাহলে সারাদিন খেটে-খুটে ঘামে-রোদে তেতে-পুড়ে ফিরে-আসা মানুষটা কেনই বা বিরক্ত না হবে, রাগ না করবে। ঘাড়েগলায় নোংরা ঘাম জমেছে, বিড়ি খেয়ে খেয়ে ঠোঁটদুটো কালো, বেঁটেখাটো মাঝবয়সি মানুষটা—মুখখানা গম্ভীর, কপালের ভাঁজগুলো ওলট-পালট, এতটা পথ হেঁটে আসার পর বাবাকে এমনিতেই কেমন রাগী দেখায়। এ সময় মেজাজ ঠিক রাখাই ত মুশকিল। মা তুমি মেয়েমানুষ, শুনেছি মেয়েমানুষ হয়ে জন্মালে মাটির মতো অনেক সইতে হয়, ঝড়ঝাপ্টা রোদবিষ্টি মানিয়ে নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় সংসার গুছিয়ে রাখতে হয়, তা তুমিই পারো না আমাকে সহ্য করতে, বাবা ত পুরুষমানুষ! ফের আমার মাথা ধরেছে, বুকে যন্ত্রণা হচ্ছে, হাত পা চিবুচ্ছে, শিশি নিয়ে এখুনি ডাক্তার-খানায় ছুটতে হতে পারে শুনে আচমকা রেগে গিয়ে ঠাস করে যদি একটা চড় মেরেই বসে—দোষ কী!

পুষ্প টের পেল, বাবা আরো দু'একবার নাম ধরে ডেকে সাড়া না পেয়ে অনেকটা কাছে এগিয়ে এল। এখন প্রায় তক্তপোষের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। বাবার নিঃশ্বাসের শব্দ আমি শুনতে পাচ্ছি। এরপর কি হবে! কি করবে বাবা! মুখের উপর থেকে টেনে খামচে কাঁথাটা সরিয়ে দিয়ে আমার কপালে হাত রাখবে কি! কপাল থেকে গলায় বুকে, হাতের এ-পিঠ ও-পিঠ দিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে গায়ের তাপ বুঝবে কি! যেন এই একটা খেলা হয়েছে সকলের। মা বাবা নন্তু বিলু এমন কি দু'দণ্ড বেড়াতে আসা ও-বাড়ির রাঙামাসির পর্যন্ত। হাত পা টান করে চুপচাপ একটু শুয়ে আছি, চোখদুটো সামান্য লেগে এসেছে কি গা'টা একটু ম্যাজ-ম্যাজ করছে অমনি হুমড়ি খেয়ে পড়বে সবাই। পুষ্প, শুয়ে পড়লি কেন, মুখে কথা নেই কেন, অত জোরে জোরে শ্বাস টানছিস যে বড়—দেখি চোখ মেলে তাকা দেখি একবার ভাল করে......সবাই মিলে নতুন কিনে আনা খাট পালং কি অন্য কোনো দামী বস্তুর ওপর ঝুঁকে পড়ে অখণ্ড মনোযোগে খুঁটিয়ে দেখার মতো গায়ে পিঠে হাত বোলাতে

শুরু করবে। যেন আমার জ্বর এসে যাওয়াটা সকলের কাছে একটা মজার বস্তু, যেন নন্তু বিলুর জিভে শব্দ তুলে ঠোঁট চেটে-চেটে তেঁতুলমাখা খাওয়ার মতো স্বাদু রুচিকর কোনো লোভের খেলা।

কেন, বারে বারে অত গায়ে হাত দেওয়া কেন! গায়ে হাত না দিলে কী হয়! সেই কবে কোন্‌কালে একটা ডাক্তার ডেকে এনেছিলে, মোটা ভোঁতকা চেহারা, আলকাতরার মতো গায়ের রঙ, ডান গালে লম্বা আঁচিল, দেখতে কি বিচ্ছিরি! আমার হাত টিপে চোখ টেনে, বুকে পিঠে কল বসিয়ে দেখে গিয়েছিল। ওর সামনে হাত পা ছড়িয়ে বিছানায় শুয়ে পড়তে, হাঁ করে জিভ দেখাতে কি বুকেপেটে ওর মোটা খসখসে আঙুলগুলোর ছোঁয়া নিতে, বুকের উপর কলটাকে চেপে ধরতে দিতে কি অসম্ভব খারাপ লেগেছিল। যত বার ওর দিকে তাকাচ্ছিলুম আমার কেবল চিড়িয়াখানার কচ্ছপগুলোর কথা মনে পড়ছিল। ওর গলাটা আর একটু সরু আর লম্বা হলে ও ঠিক কচ্ছপ হয়ে যেত। পার্কের বাঁ দিকে বড় রাস্তার গায়ে কেমন সাজানো-গোছানো সুন্দর একটা ডাক্তারখানা আছে। পাশ দিয়ে হেঁটে রাস্তা পার হয়ে আগে রোজ আমি পার্কে বেড়াতে যেতুম। ফর্সা গোলগাল সুন্দর-মুখ টলটলে-চোখের একজন ডাক্তার ওখানে রোজ বসে, বন্ধু-বান্ধব নিয়ে গল্প করে, চা খায়, খবরের কাগজ পড়ে, আমি কতদিন দেখেছি। হাতের কাছে এত ভাল কমবয়েসি চটপটে নাম-করা একজন ডাক্তার থাকতে তুমি ওই নিকষ কালো-রঙের বিচ্ছিরি ভূতটাকে কোত্থেকে এনে জোটালে ভেবে সেদিন রাগ হয়েছিল, দুঃখ হয়েছিল। বারোমাস অসুখে ভুগলাম ত কি, আমার গায়ের রঙ ফর্সা, চোখদুটো টানাটানা গভীর কালো, মায়ের মতো মুখের মিষ্টি আদল পেয়েছি, আমি দেখতে শুনতে এখনও এমন কিছু খারাপ না যে একটা লোমশ কুচ্ছিত কদাকার লোককে আমার বুকে-পিঠে হাত ঠেকাতে দিতে ভাল লাগবে। তুমি কোনোদিন ওকে আর না ডাকাতে, আর কাউকেই না ডাকাতে আমি খুশিই হয়েছি। এখন যদি এত দরদ তোমাদের, আমার জন্য এত ভাবনা দুশ্চিন্তা, তা হলে ওই ডাক্তারকে একবার খবর দাও না

কেন। তোমরা রোগের কি জান, কতটুকু বোঝ যে একশবার করে গায়ে পিঠে হাত দিতে আস। মা বাবা নন্তু বিলু রাঙামাসি তোমরা সবাই ডাক্তার হয়ে গেলে কি!

আর দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখলে কি জ্বর বোঝা যায় না! সেই পশ্চিমা লোকটা প্রকাণ্ড একটা ভালুকের গলায় দড়ি বেঁধে বিকেলের দিক করে পার্কে খেলা দেখাতে আসত। ভালুকটার কখন জ্বর এসে গেল, দু'পা তুলে ডিম্ ডিম্ বাজনার তালে আর নাচবে না, উঁচু-করে-ধরা লাঠিটা লাফিয়ে পার হয়ে মাথা নুইয়ে লোকগুলোকে নমস্কার করবে না, কাঁপতে কাঁপতে এককোণায় বসে পড়ে জোরে জোরে শ্বাস ফেলবে আর মুখ দিয়ে লালা ঝরাবে—আমি ত দূর থেকে দেখেই কতদিন বুঝে নিয়েছি।······তুমি আমার মুখ থেকে কাঁথা সরিও না বাবা, আমার কপালে হাত দিও না!

পুষ্প নড়ল না। বরং অদ্ভুত কায়দা করে শরীরটাকে আরো শক্ত করে ফেলল। মাথার নীচে গোঁজা কাঁথার প্রান্তভাগ বালিশে চেপে ধরে রাখল, যেন হাত দিয়ে চট্ করে কেউ সরিয়ে নিতে না পারে। বাবা একেবারে কাছে এসে গেছে, পুষ্প বুঝতে পারছিল। আর একটু পরেই আমি ধরা পড়ে যাব। আমি ঘুমোই নি, দিব্যি চোখ মেলে জেগে আছি, জেগে থেকেও বাবার ডাকে সাড়া দিলুম না, মুখ থেকে কাঁথা সরালুম না, বাবা বুঝতে পেরে যাবে। পুষ্প ভয়ে কাঁপতে শুরু করেছিল, হাত পা অল্প ঘামছিল, মুখ সাদা করে ঢোঁক গিলে নিঃশ্বাসের শব্দ আটকাতে চাইছিল। ধরা পড়ে গেলে বাবা আমাকে মারবে কি!

আর ঠিক সেই সময় সুবর্ণকে এ ঘরে আসতে হ'ল একবার। চা কি চিনি অথবা অন্য কিছু নিতে পুষ্প বুঝতে পারল না কিন্তু বাবার হাত থেকে বেঁচে গেল। পুষ্প ঘুমিয়ে আছে মনে করে ইন্দুমাধব সুবর্ণর দিকে ঘুরে তাকাল। পুষ্প শুনতে পেল বাবা মোটা বিরক্ত গলায় মাকে জিজ্ঞেস করল, 'পুষ্প শুয়ে কেন, কি হয়েছে ওর?'

—'কি হয়েছে, তুমি জান না?'

—'জানলে জিজ্ঞেস করব কেন।'

—'তবে আর জেনে দরকার কি। যেমন আছ থাক সব ভুলে।'

—'ভুলে? আমি সংসারের সব ভুলে থাকি!'

—'না, সব মনে রেখে সোনা দিয়ে মুড়িয়ে দিচ্ছ! কি সুন্দর সুখের সংসার আমার।'

চমৎকার! মা বাবা দু'জনেই রেগে গেল তাহলে! কাঁথার নীচে পুষ্পর শরীরটা দুলে উঠল। ঘন শ্বাস পাতলা হয়ে এল। মা রেগে গিয়ে বাবার সঙ্গে ঝগড়া বাঁধাবে বলে তৈরি হয়ে গেছে। বাবাও নিশ্চয়। মা বাবা দু'জনেই রেগে গিয়ে দু'জনের দিকে চোখ পাকিয়ে মেজাজ গরম করে ঝগড়ার জন্য তৈরি হয়ে গেছে। চমৎকার! মা'র গলা বিস্বাদ তেতো, বাবার গলা শুকনো খসে-খসে। দুজনেই জোরে জোরে চেঁচিয়ে কথা বলছে এবং দুজনের কথাগুলোই বিশ্রী রকমের বাঁকা শোনাচ্ছে। লাগুক, ঝগড়াটা লেগে যাক ভাল করে। আমিও তাই চাই। তা-ই চা-ই।

কানদুটো খরগোশের মত নিঃশব্দ তীক্ষ্ণ রেখে চোখ মিটমিট করে তাকাল। কাঁথার তলে মুখ ঢেকে ও তখন আস্তে আস্তে দাঁত ঘষছিল, ঠোঁট কামড়াচ্ছিল, মনে মনে নখে নখ বাজিয়ে শেয়ালকাঁটার নাম করছিল। সঙ্গে আরো যা যা করলে ও বললে পরস্পরের মন কষাকষি প্রবল, দীর্ঘস্থায়ী হয় বলে শুনেছে একে একে সবগুলোই করছিল। আর এতে সে অদ্ভুতরকমের একটা আনন্দ পাচ্ছিল। খুশিতে ভারি থমথমে মনটা হালকা ফুরফুরে হয়ে উঠছিল। আমি চাই, তোমরা সুখে নেই শান্তিতে নেই আমি দেখতে চাই। আমার দেখতে ভাল লাগে বলে মাঝে মাঝে তোমাদের চলায়-ফেরায় আচারে-ব্যবহারে জ্বালাঅশান্তিযন্ত্রণা বুঝতে চাই। আমি একা কেন বিছানায় পড়ে থেকে সকলের রাগ বিরক্তি অবহেলা সহ্য করব! একা কেন কষ্ট পাব, অশান্তিতে ভুগব, জ্বলে-পুড়ে অঙ্গার হব। আমার কষ্টের ভাগ তোমরা একটু নাও, তোমাদেরও নেওয়া উচিত। আমার রোগ ব্যথা ছটফটানি দেখে যদি তোমাদের মুখ ভার হয়, মন খুশি হয়, আমাকে

সারামাস বার্লি খাইয়ে রেখে যদি মজা পাও—তাহলে তোমাদের ঝগড়াঝাটি জ্বালাঅশান্তি দেখে আমিও কেনই বা না খুশি হব, মজা না পাব !

মা, বাবা আজ তোমার দেশলাই নিয়ে গিয়েছিল, উনুন ধরাতে তোমার কষ্ট হয়েছে, পরের বাড়ি থেকে হাত পেতে কাঠি চেয়ে আনতে হয়েছে, তুমি ভুলে যাওনি ত। আর মনে করে দেখ, বাবা কোনোদিন তোমার কথা শোনে না, কোনো কথা রাখে না, একটা জিনিস আনতে বললে কিছুতেই আনতে চায় না। কলকাতায় কত কি দেখার আছে চিড়িয়াখানা যাদুঘর মনুমেণ্ট গড়ের মাঠ, কোনোদিন কোথাও নিয়ে যায় না। রাঙ্গামাসি মাসের মধ্যে কতবার সেজেগুজে সিনেমা দেখতে যায়, তুমি একবারের জন্য পয়সা চাইলে বাবা চোখ রাঙ্গিয়ে ধমকে তোমায় থামিয়ে দেয়। অপিসের ভাত দিতে একটু দেরি হয়ে গেলে থালা-বাটি-গ্লাশ ছুঁড়ে মারে। তুমি বাবাকে আজ ছেড়ো না মা, কড়া করে দু'কথা শুনিয়ে বাবার গরম ভেঙে দাও।

বাবা গো, মা-টা কি পাজি হয়েছে যদি জানতে ! তুমি ভালো-মানুষ, দিব্যি খেয়ে-দেয়ে অপিস চলে যাও, সারাদিন মা তোমার নামে কত কি বলে, বানিয়ে বানিয়ে রাঙামাসির কাছে লাগায়। তুমি উড়নচণ্ডে, তোমার কাণ্ডজ্ঞান নেই, তোমাকে নিয়ে সংসার করার চেয়ে বেড়ালকুকুরের ঘর নাকি অনেক ভাল······যদি শুনতে বাবা ! এ-ঘরে কাঠি খুঁজতে এসে, আমি স্পষ্ট শুনলুম, তোমাকে বিড়িখোর ভূত পর্যন্ত বলে গেল মা-টা। সন্ধ্যাবেলায় আমি একটু জল চেয়েছিলুম. তৃষ্ণায় আমার বুক জ্বলছিল, ডেকে ডেকে সাড়া পাই নি। রোগা টিকটিকে হলে কি হয়, হাড়ে হাড়ে বজ্জাতি ঢুকে গেছে মা-র। হাত-পা দাপিয়ে খুব করে ধমকে মাকে ভাল রকম একটা শিক্ষা দিয়ে দাও দেখি বাবা !

'কি চমৎকার সংসার আমার, কি সুখেই রেখেছ সবাইকে !' শব্দগুলো পাথরের টুকরোর মতো একটি একটি করে হাতে তুলে নৈর্ব্যক্তিক ভঙ্গিতে ইন্দুমাধবের দিকে ছুঁড়ে মারল সুবর্ণ।

পুষ্প টের পেল, তারপর ডালা-ভাঙা কাঠের আলমারি থেকে কিসের একটা কৌটো টেনে নিয়ে জোরে জোরে পা ফেলে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। বাবা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। স্থির শক্ত হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। না দেখেও পুষ্প বুঝতে পারল, হুলো বেড়ালের মতো বাবা এখন রোঁয়া ফোলাচ্ছে, রাগে গরগর করছে। পায়ের আঙুলগুলো মেঝের উপর শক্ত হয়ে চেপে বসছে। একটু পরেই ছটফট করে প্রায় লাফ দিয়ে বারান্দা, বারান্দা থেকে রান্না-ঘরের দরজার কাছে পৌঁছে গেল। চুপ করে শুয়ে থেকে পুষ্প এইরকম একটা সুন্দর পরিপূর্ণ সুযোগের অপেক্ষা করছিল। আর একটুও দেরি করল না, চটপট মুখের উপর থেকে কাঁথাটা টেনে সরিয়ে দিল। এক ঝলক উজ্জ্বল আলো, কাঁথার নিচে যা এতক্ষণ হালকা নীলাভ পরিমণ্ডল রচনা করেছিল, চোখের মণির উপর অতর্কিতে আছড়ে পড়ায় প্রথমটা ঝাপসা, পরে অস্বস্তি বোধ করে চোখ বন্ধ করল পুষ্প। আবার খুলল, বন্ধ করল, খুলল। ঘুরিয়ে বারান্দায়, রান্নাঘরের দরজার কাছে নিয়ে গিয়ে দৃষ্টিটা স্থির নিস্পলক করে রাখল। মনের খুশিটা ওর অল্প ঘোলাটে ঈষৎ রক্তাভ মণিদুটোর উপর অদ্ভুত উজ্জ্বল হিংস্রতার ছায়া ফেলে থির থির করে কাঁপছিল। পুষ্প শুনল, আরো দু'একটা কথা কাটাকাটির পর বাবা এবার ভয়ানক রেগে উঠে হাত পা নেড়ে চিৎকার করছে, 'আমার জানা দরকার, এ সংসারে কোথায় কি হয় না হয় আমাকে সব জানাতে হবে। জানাতে তুমি বাধ্য।'

—'কেন, অত লাটসাহেবি কিসের! দু'বেলা দুটো খেতে-পরতে দাও বলে কি!'

—'সুবর্ণ!'

—'চুপ কর, চুপ কর! চেঁচিও না অমন গলা তুলে।'

সুবর্ণ খুব শান্ত গলায় যেন ভয় পেয়েছে এমনভাবে টেনে টেনে বলল। জল ফুটে গেছে দেখে কেটলিটা উনুন থেকে নামিয়ে নিল। পুষ্প চমকে উঠে ভয় পেয়ে চোখ বন্ধ করল। কেটলিটা এত জোরে

প্রায় ছুঁড়ে মারার মতো আছড়ে ফেলল কেন মা। যদি মুখটা খুলে গিয়ে থাকে, ফুটন্ত জল গায়েপায়ে ছিটকে পড়ে, ফোস্কা পড়ে যাবে না কি তাহলে। ফোস্কা গলে গিয়ে জ্বালা করবে, ঘা হলে আরো বেশী জ্বলুনি শুরু হবে। ভাত সেদ্ধ হয়েছে কিনা দেখতে গিয়ে একবার গরম ফেন আমার পায়ের উপর ছল্‌কে পড়েছিল, ফোস্কা পড়ার যন্ত্রণা কত জানি। আমি তা চাই না, অতটা আমি চাই না মা। তুমি বিছানা নিলে বিলুকে, আমার ছটফটে ছোট ভাইটাকে দু-বেলা কে ভাত রেঁধে দেবে। ভাত ছাড়া ও ত আর কিছু খায় না, খেতে পারে না। বিলু বড় ভাল ছেলে, লক্ষ্মী ছেলে—ওর কষ্ট হোক আমি তা চাই না। তার চেয়ে বাবা তুমি, এইবার এই সুযোগে মা'র হাতটা মুঠো করে ধরে বরং একটা ঝাঁকুনি দিয়ে দিতে পারো, একবার যেমন দিয়েছিলে। ইনিয়ে-বিনিয়ে মা সারাদিন কেঁদেছিল, ভাত খায় নি, নন্তুর বইপত্র সব ছুঁড়ে ফেলেছিল, বিলুর অমন কচি-কোমল গালে চড় মেরে পাঁচ আঙ্গুলের দাগ বসিয়ে দিয়েছিল। তা-হোক, আমিও ত কতদিন একা একা বিছানায় বালিশে মুখ গুঁজে কাঁদি, ভাত খেতে পাই না, নন্তু বিলুর উপর মেজাজ খারাপ হয়ে যায় বলে কিল চড় মেরে ওদের কথা হাসি ঠাট্টা ইয়ার্কিগুলো চুপ করিয়ে দিতে ইচ্ছে হয়। বাবা দেখ, মা এখনও তোমার উপর মেজাজ দেখাচ্ছে, চোখ রাঙাচ্ছে, তুমি বুঝতে পারছ কি বাবা!

—'পুষ্পর জ্বর, সে ত রোজই উঠছে একবার করে। এই নিয়ে এত চিৎকার করার কি মাথা খারাপ করার কি আছে, আমি বুঝতে পারছিনে।'

—'পারবে কেন। বুঝতে গেলেই যে ডাক্তার চাই, কোবরেজ চাই, অষুধ-পত্তরের হাজার ঝামেলা পোয়ানো চাই। তার চেয়ে এমনি এমনি মেয়েটা একসময় মরে গেলেই ত তোমার ভাল, তোমার হাড় জুড়োয়।'

—'মরুক, মাসের মধ্যে ত্রিশদিন এতসব ঝামেলা আর সহ্য হয় না আমার। মরেই যাক ও!'

'তবে আর কি, মরুক, মরুক মুখপুড়ী! আমিও তাই চাই!'

পুষ্প শুনল, ছটফটে তিক্ত গলায় মা বলল। বলল আর বলেই চুপ করে গেল। একেবারে নিথর চুপ। ছটফটে তিক্ত গলায় বাবা আরো কি বলতে যাচ্ছিল, বলল না, চুপ করে গেল, একেবারে নিথর চুপ। মা বাবা দুজনেই চুপ করে গেলে গোটা বাড়িটা চুপ হয়ে গেল, নিথর নিস্তরঙ্গ চুপ। পুষ্প টের পেল, চায়ে চিনি ঘাঁটতে ঘাঁটতে চামচ সমেত মার হাতটা কেমন স্থির শক্ত নিঃস্পন্দ হয়ে গেল। মা কি এখন খুব একটা দুঃখ পেয়ে, রাগ করে বাবার দিকে চোখ তুলে তাকাল, আর বরফের কুচির মতো ঠাণ্ডা ধারালো সেই দৃষ্টি সহ্য করতে পারল না বলে বাবা এমন লাফিয়ে রান্নাঘরের দরজা থেকে পালিয়ে গেল! বারান্দা থেকে বালতিটা তুলে নিয়ে বাবা এখন কলতলার দিকে চলে যাচ্ছে। বাবাকে আর দেখা যাচ্ছে না।

সেই নিথর নিঃস্তব্ধ বাড়ির চারপাশে ঝনঝনিয়ে মৃত্যুর শব্দগুলো বেজে উঠতেই পুষ্পর চোখ থেকে সব আলোই নিভে গেল। এখন পুষ্প একটা গভীর অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। ঘরে বাতিটা জ্বলছে, দু'একটা পোকা চারপাশে ঘুরে ঘুরে উড়ছে, তামাটে রঙের পেটফোলা টিকটিকিটা দেয়ালে ঝুলে আছে, পোকাগুলোর দিকে এগুচ্ছে। গলা ফুলিয়েছে, চোখ বড় বড় করেছে, একটা পোকা মুখের কাছে, ঝাঁপ দিল, পুষ্প দেখতে পেল না। পুষ্প দেখতে পাচ্ছে না। সমস্ত ঘর অন্ধকার হয়ে গেছে, সমস্ত বাড়ি অন্ধকারে ডুবে গেছে। পুষ্প সেই তরল অন্ধকারের পুকুরে ছোট হয়ে হয়ে, ছোট হতে হতে একটা পুতুলের আকার নিয়ে টুপ করে ডুবে যাচ্ছে। বাবা, আমিও তাই চাই। মা, আমিও তাই চাই। পুষ্প হাত ছুঁড়ল, পা ছুঁড়ল, হাত-পা টান-টান সোজা করে স্থির শক্ত হ'ল। আমি ভাল হয়ে উঠি, সুস্থ সবল হয়ে বেঁচে থাকি, তোমরা কেউ চাও না বলে আমিও চাই না, আমিও মরতেই চাই। মরলেই আমি নির্ঝঞ্ঝাট, আমার শান্তি। মরলেই তোমরা নির্ঝঞ্ঝাট, তোমাদের শান্তি। আমি জানি, আমি সব বুঝতে পারি।

তোমাদের মনের কথা কিছুই আর গোপন নেই আমার কাছে। গোপন থাকল না। আমাকে নিয়ে এতসব ঝগড়া-ঝাটি, রাগ-বিরাগ সব উপর-উপর। সব লোক-দেখানো। আসলে আমার জন্য কেউ আর ভাবো না তোমরা, কিছুমাত্র না। এতক্ষণ গলা ফুলিয়ে দু'জনে এত চেঁচালে, কি হ'ল। কি ফল ফলল তার। এখুনি ত চা, মুড়ির বাটি ধরে দেবে বাবার সামনে। রাতের বেলা পরিপাটি করে ভাতের থালা সাজিয়ে খেতে ডাকবে। বারান্দায় মাদুর পেতে সুন্দর গোল হয়ে বসে গল্প জুড়ে দেবে, ঠাট্টা-ইয়ার্কি করবে, চেঁচিয়ে হেসে একজন মুখে আঁচলচাপা দেবে, অন্যজন ফস করে বিড়ি ধরাবে, ধোঁয়া ছড়াবে। রাত গাঢ় হলে, নন্তু বিলু সব ঘুমিয়ে কাদা হয়ে গেলে আমার ঘরের দরজা আস্তে আস্তে ভেজিয়ে দেবে।

মা, তোমার আবার বাচ্চা হবে! তোমার পেটে বাচ্চা আছে। আমি সব জানি মা, সব টের পাই!

পুষ্প আচমকা ছটফট করে বিছানায় উঠে বসল। কাঁথাটা টেনে ছুঁড়ে ফেলে দিল। ওর মুখ লাল টকটকে দেখাচ্ছিল, ঈষৎ রক্তাভ চোখদুটো ছুরির ফলার মত ঝিকুচ্ছিল, কপালে নাকের ডগায় বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছিল, হাত পায়ের পেশী শক্ত কঠিন দৃঢ় হচ্ছিল। জানালাটা খুলে দেবে ও। রাস্তা দেখবে, রাস্তার মানুষজন, কুলি মজুর ফিরিওলাদের মুখ দেখবে। দূরে পার্ক, পার্কের আকাশে উঁচু পামগাছের চিরল-চিকণ পাতার শীর্ষে আলোর ঝিলিমিলি, জ্যোৎস্নার ছায়া, তারার মেলা দেখবে। ঠাণ্ডা বাতাস আসবে, আসুক। ঠাণ্ডায় বুকে সর্দি বসবে, বসুক, শীতে গা কেঁপে জ্বর এসে যেতে পারে—এসে যাক। এই বদ্ধ ঘরে আমার দম আটকে আসছে, আমি শ্বাস টানতে পারছি নে, আমি মরে যাচ্ছি, জানালা আমি খুলে দেব। তোমার বকুনিকে আর ভয় করি না মা, একটুও না, জানালা আমি খুলে দেবই।

হাঁটুদুটো ভাঁজ করে তক্তপোষে হাতের ভর রেখে পুষ্প ছটফট করে এগুতে চাইল। আর একটু, আর সামান্য হলেই পা নামিয়ে মেঝে ছুঁতে পারত। পারল না। রোগা দুর্বল শরীর এমনিতেই

যথেষ্ট উত্তেজিত হয়েছিল বলে মাথা ঘুরে গা বমিবমি করে উঠল। তলপেট থেকে তিক্ত বিস্বাদ অম্বলের চোঁয়া ঢেকুরের মতো এক ঝলক গরম বাতাস উঠে এসে গলার কাছটায় জড়ো হ'ল। গোটা মুখ জলে ভরে উঠল পুষ্পর। ঈষৎ রক্তাভ চোখদুটো ঘোলাটে হতে হতে পরিপূর্ণ সাদা হয়ে গেল। মাথার শিরা উপশিরা ঝন ঝন শব্দে বাজতে শুরু করল। আর বসে থাকতে পারল না পুষ্প। হাত বাড়িয়ে কাঁথাটা টেনে নিল, দলা পাকিয়ে পুঁটলির মতো করে বুকের কাছে খামচে ধরে বিছানায় টলে পড়ল। বেঁকে-দুমড়ে একটা ধনুকের চেহারা নিয়ে টলে পড়ে থাকল। ওর ঠোঁটের কস বেয়ে লালা গড়াচ্ছিল, শীতে শরীরটা থেকে থেকে প্রচণ্ডভাবে কেঁপে উঠছিল, ফুসফুস শব্দ করে ফেটে যাওয়ার মত আওয়াজ দিচ্ছিল।

পুষ্পর আর কোনো বোধ কি চৈতন্য ছিল না বলে আসল জ্বরটা যে এতক্ষণে এসে গেল: বুঝতে পারছিল না। কিন্তু মাখা-তেঁতুলের টক-টক ঝাল-ঝাল উগ্র গন্ধটা অনুভব করছিল। আর তাই শুঁকতে শুঁকতে অস্পষ্ট আবছা চেহারায় ও সেই চিড়িয়াখানার ডোরা-কাটা বাঘটা দেখতে পেল। বাঘটা মাবাবানন্তবিলুসমেত গোটা বাড়িটার উপর জিভ মেলে দিয়েছে। হরিণের মতো সুন্দরপরিপুষ্টটলটলে বাড়িটা চেটেপুটে খাচ্ছে। মাঝেমাঝে প্রকাণ্ড থাবা ছড়িয়ে নেড়ে-চেড়ে বাড়িটা নিয়ে খেলা করছে। বাঘটার চোখ জ্বলছে। জিভ দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। থাবাদুটো রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে।

পুষ্প ভয় পেল, চোখ বুজল। চোখ বুজে পুষ্প গোঙাতে লাগল।

……একটুপরেই পুষ্প অনুভব করল, ওর রোগাদুর্বল শরীরটা কারা যেন অসম্ভব মমতায় শক্ত করে ধরেছে, কারা যেন মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে আকুল আবেগে কি সব জিজ্ঞেস করছে। কারা? মা বাবা কি? নন্তু বিলু? রাঙামাসি? গায়ের সমস্ত জোর একত্র করে চিৎকার করতে গিয়ে অস্ফুট গলায় পুষ্প কেঁদে উঠল, 'আমাকে মরতে দিও না। আমি বাঁচতে চাই। মাগো, আমি বাঁচতে চাই……'

[একতা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখপত্র ১৯৬০]

সম্পাদকবন্ধুবরেষু, শারদীয় সংখ্যার জন্য গল্প চেয়ে মফস্বলবাসী এই সামান্য লেখককে বহুমানিত করেছেন। লেখা নিশ্চয়ই পাঠাব কিন্তু তার আগে আপনার কাছে আমার দুটি আর্জি আছে। আপনি শহর কলকাতার পুরনো বাসিন্দা, লোকমুখে শুনে থাকি, সেখানে পয়সা দিলে বাঘের দুধও পাওয়া যায়। তাই ভরসা রাখি, আর্জি দুটি আপনার পক্ষে পূরণ করা অসম্ভব হবে না।

না, কমলাকান্ত শর্মার মতো আফিঙের জন্য দরবার করছি না, আমি কোনো নসীবাবু-আশ্রিত অথবা ব্রাহ্মণভোজনে পরিপুষ্ট নিষ্কর্মা বেকার বাউণ্ডুলে মানুষ নই, বিনামূল্যে দুগ্ধঘৃতছানা সরবরাহের জন্য আমার কোনো সঙ্গীত-রসিকা প্রসন্ন গোয়ালিনীও নেই। আমি গাঁয়ের স্কুলের নিরীহ মাস্টার। নিজের জীবিকা নিজে অর্জন করি, নিজের পুত্রকন্যাজায়াজননী অধ্যুষিত সংসার নিজে প্রতিপালন করি। গাঁজাআফিঙভাঙচরসে আমার আসক্তি নেই।

আপনি অনুগ্রহপূর্বক এ-বছর গল্পের আগাম দক্ষিণা বাবদ কিছু সাদা কাগজ ও কয়েক লিটার কেরোসিন পাঠাতে পারেন? লেখার কাজটা তাহলে শুরু করি! এ অঞ্চলে এখন ও-দুটো বস্তুই দুর্লভ। গাঁয়ে নেই, সদরে নেই, এমন কি এ জেলাতেই আছে কিনা সন্দেহ! এ বছর স্কুলের হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষা মুখে মুখে হয়েছে। হেডমাস্টার জগন্নাথবাবু সদরে গিয়েও কাগজ যোগাড় করতে পারেননি। মুখে মুখে পরীক্ষা হওয়ায় উঁচু ক্লাসের ছেলেরা বিষম রুষ্ট। এ ব্যবস্থায় তো নকল করা যায় না! তারা শাসিয়েছে, এ্যানুয়েল পরীক্ষা এ ভাবে হলে স্কুলের চেয়ারবেঞ্চি আস্ত রাখবে না। 'হেডু'-র প্রশস্ত টাকেও তারা তবলা বাজিয়ে ছাড়বে! খবরের কাগজে লাল কালিতে লিখে এ-রকম দু'একটা পোস্টারও মেরেছে! জগন্নাথবাবু ভয় পেয়ে

বলেছেন, 'তোমরা তাহলে বাপু সদরে যাও। কাগজের জন্য এখন থেকেই ডি. এমের কাছে দরবার কর—'

স্কুলে যা হবার হোক, আমার মাথাব্যথা নেই। এই শিক্ষাব্যবস্থাটাই তো পচতে পচতে একেবারে পচনের শেষ সীমায় পৌঁছে গেছে। এর একটা প্রহসন মুখে হ'ল কি লিখে হ'ল কি আসে যায় তাতে! লাশ-ঘরের মড়াকে দুটো ভালো জামা-কাপড় পরানো হ'ল অথবা উদোম ন্যাংটা চিতায় তোলা হ'ল—তাতে মড়ার কি! পুড়তে পারলেই তার সদ্‌গতি। গালভরে নিজেদের বলি বটে 'মাস্টার'—আসলে আমরা শিক্ষা-শ্মশানের ডোম ছাড়া তো কিছু না। চিতায় আগুন দেবার ক্ষমতা নেই বলে বাঁশের বদলে বই হাতে মড়া আগলাচ্ছি!

সে যাক, নিজের পেশাগত দুঃখের কথা আপনাকে শুনিয়ে লাভ কি! বলছিলাম সাদা কাগজের কথা। কাগজ ছাড়া তো কিছু লেখা যায় না! ছোট থাকতে তালপাতা কলাপাতায় লেখার অভ্যাস তো আমরা করিনি! করা থাকলে এই দুর্দিনে কি উপকারই না হ'ত! আমার বাড়ির গা ঘেঁষেই তিনতিনটে তালগাছ চমৎকার দীর্ঘ ডাঁটালো শরীর আর তেমনি সুন্দর পুষ্ট মোলায়েম পাতা। রসের জন্য লাটু শেখ রোজ দু'বেলা তরতর করে গাছে ওঠে। জানালা দিয়ে বলতাম, 'দাও হে লাটু, আজ আর একখানা পাতা দাও, গল্পের বাকিটুকু লিখে ফেলি!'

কিন্তু তা তো আর হবার না! আমরা যে মডার্ন হবার লোভে পূর্ব-পুরুষগণের সযত্ন-সৃষ্ট ট্রাডিশন ভেঙে ফেলেছি। এখন হাজার চেষ্টা করলেও তালপাতা কলাপাতায় আর তো লিখতে পারব না। আকাশে ক'দিন শারদ মেঘ ও মেঘের বুকে রৌদ্রছায়ার লুকোচুরি দেখে একটা যুৎসই প্লট মনের আঙিনায় ঘোরাফেরা করছিল। পুকুরে চার দিলে বড় মাছ যেমন ঘুর-ঘুর করে অনেকটা তেমনি। কিন্তু ছিপে গেঁথে যে তুলতে পারলাম না তার একটা কারণ ওই কাগজ—

আশে পাশে কোথাও না পেয়ে শেষপর্যন্ত স্কুলের অফিস থেকে কয়েক পাতা হাতানোর তালে ছিলাম। দরকারে অদরকারে এমন

তো কতই নিয়েছি। কিন্তু এবার সুবিধা হ'ল না। আমাদের কেরানি কাম্ টাইপিস্ট কাম্ নীচুক্লাসের বাংলা মাস্টার মৃগেন পালিত ওই কাজটা আগেই করে ফেলায় অথবা করবার ধান্ধা করায় হেডমাস্টার সন্দেহক্রমে সমস্ত কাগজ সযত্নে কুড়িয়ে বাড়িয়ে ফাইল বন্ধ করে আলমারিতে তালা দিয়েছেন। স্কুলে যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থা দেখো না দিলে তা খরচ করা নিষিদ্ধ হয়েছে। সেদিন অঙ্কের মাস্টার হাফ্ বৃদ্ধ ব্রজসুন্দরদা ছুটির দরখাস্ত করবেন বলে এক সীট্ চেয়েছিলেন। হেডমাস্টার উত্তর দিয়েছেন, 'ও সব লেখালেখির পাট উঠে গেছে ব্রজবাবু। মুখে মুখে দরখাস্ত করুন।'

ব্রজদা রসিক লোক। শোনামাত্র চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে গড় গড় করে বলতে শুরু করেছিলেন, 'টু দি হেডমাস্টার, স্যর, ফর সাম্ আনএ্যাভয়েডেবল্ সারকামস্টেন্সেস ইট উইল নট্ বি পসিবল্ ফর মি...'

জগন্নাথবাবু হেসে বলেছিলেন, 'ঠিক আছে। ইউর লিভ্ ইজ গ্র্যাণ্টেড্!'

আমি নিরুপায় হয়ে স্ত্রীর শরণাপন্ন হয়েছিলাম। আমার এই অকপট স্বীকারোক্তিতে, সম্পাদকমশাই, আপনি যদি মিটি-মিটি হাসেন, হাসতে পারেন, কিন্তু আমি দীর্ঘ বিবাহিত জীবনের অভিজ্ঞতায় বুঝেছি, ঈশ্বর এবং রাজা যা করতে পারে না, আমাদের মতো দরিদ্র ঘরে স্ত্রী-ই সেই অসাধ্য সাধন করতে পারে! তা না হলে সংসারটা এখনো টিকে আছে কি করে? মাসের শেষে উনুন থেকে কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া এবং হাঁড়িতে চালডাল ফোটে কি-ভাবে? যখন গাঁয়ের এত মানুষ না খেয়ে আছে, বুনোকচু ঘাস শামুক গুগলি শাপলা খেয়ে দিন কাটাচ্ছে, তখনও আমি, সামান্য বেতনের স্কুল মাস্টার, অনাহারে না থেকে দু'বেলা পাতে তপ্ত ভাত পাই কি করে! এই দুর্মূল্যের বাজারে এমন আশ্চর্য কাণ্ড স্ত্রী ছাড়া আর কে সম্ভব করতে পারে! সেবার ছোট বাচ্চাটার ম্যানেন্জাইটিস্ হ'ল, টাকার জন্য পাগলের মতো ঘুরছিলাম। পুরনো ভাঙা একটা চামড়ার স্যুট-

কেশের কাঁথাকানির তলা থেকে নোটে-খুচরোয় মিলিয়ে বের করে দিল সাতান্ন টাকা চল্লিশ পয়সা! পারত? বউ ছাড়া আর কেউ?

আপনি যা-ই ভাবুন, এই গাঁয়ে এখন চালের দর তিন টাকা, আটার দর তিন টাকা, সরষের তেল বারো টাকা, কয়লার গাড়ি সব সময় আসে না, দর চল্লিশ কেজি দশ টাকা, এই অবস্থায় রান্নার পাট চুকিয়ে বাচ্চা-কাচ্চা সমেত গর্ভধারিণী জননীর হাত ধরে আমি যে এখনো অধরবাবুর লঙ্গরখানায় একবেলাও লাইন দিইনি—তা আমার ওই রোগা ক্যাংটা বউটার জন্যই!

একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দাঁত মাজতে মাজতে আমি তাকেই বললাম, 'ঘরে কিছু কাগজ আছে না-কি? দিতে পার?'

আমার বাড়ির সামনেই মাঠ। সেখান থেকে কোন্ ফাঁকে কিছু গোবর কুড়িয়ে এনে ছাই ও কয়লার গুঁড়ো মিশিয়ে হাতের থাবায় নাচিয়ে গুল তৈরি করছিল বউটা। নাচানো বন্ধ রেখে এমনভাবে আমার দিকে তাকাল, যেন আমি তার বৈধ বিবাহিত স্বামী না, অন্য গাঁয়ের লম্পট কেউ, সুযোগ বুঝে তার সতীত্বের উপর হামলা করতে এসেছি!

আমি মিন মিন করে আবার বললাম, 'গেল বছরের পরীক্ষার খাতাগুলো? একপিঠে লেখা অনেক কাগজ ছিল তাতে...'

'ছিল না-কি? মনে আছে?' হাটতলার ভাঙাচোরা ইঁদারাটার ঘুরন্ত কপিকল বেয়ে দড়ি-বালতি নীচে সবেগে নামার সময় যেমন একটানা কর্কশ ক্যাঁচ-ক্যাঁচ আওয়াজ হয়, বউটাও তেমনি গলা করে ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'এত মনে থাকে তোমার! সকালে ঘুম ভাঙতেই কাগজ খুঁজতে এসেছ। আমি যে তিনদিন থেকে বলছি চিনি নেই চিনি নেই চিনি নেই, মনে থাকে না কেন সে কথা? চিনির জন্য সকাল থেকে চা হচ্ছে না। তোমার মা থেকে থেকে চেঁচাচ্ছেন...'

সঙ্গে সঙ্গেই ঘর থেকে মা'র গলা পাওয়া গেল, 'কি বলেছি বউমা, কি বলেছি তোমাকে?'

আমি বেগতিক দেখে পলায়ন করলাম। গাঁ থেকে চিনিও অদৃশ্য

হয়েছে। চিনির জন্য আমাকে এখুনি সদরে যেতে হবে। দৌড়ে গেলে সকালের ট্রেনটা পাওয়া যেতে পারে।

বিকেলে স্কুল থেকে ফিরে দেখলাম বউ কাগজ বের করেছে। পুরনো পরীক্ষার খাতা থেকে ছেঁড়া। সাদা পাতাগুলো আগেই ছিঁড়ে বড় ছেলেটার রাফ খাতা বানানো হয়েছিল। এখন একপিঠে লেখা কিছু পাওয়া গেছে।

কাগজ ক'টার তুমড়ানো-মুচড়ানো অবস্থা পরীক্ষা করে দেখছি, বউ এক কাপ চা নামিয়ে দিয়ে বলল, 'ভাগ্যিস, বিক্রির সময় এ ক'টাও এবার ছিঁড়ে রেখেছিলাম, তাই পেলে!'

আমি খুব আন্তরিকভাবেই বললাম, 'সত্যি, তোমার কি বুদ্ধি!' কিন্তু শোনামাত্র বউটার ভুরু কুঁচকে গেল, নাকের পাটা ফুলে উঠল! চোখ ছোট করে এমনভাবে তাকাল যেন আমি তার না, বরং তার সামনেই অন্য কোনো যুবতী পরস্ত্রীর রূপগুণের স্তুতিপাঠ শুরু করেছি!

কিন্তু সম্পাদকমশাই, কাগজগুলোতে লেখা গেল না। অনেকদিন খাটের তলায় হাঁড়িকুড়ি বাসনকোসনের সঙ্গে পড়ে থেকে কেমন ন্যাতা ন্যাতা হয়ে গেছে। লিখতে গেলে ছিঁড়ে যায়, কালি ধেবড়ে কদাকার হয়ে ওঠে। নিজের লেখা নিজেই চিনতে পারি নে। গল্পের নায়ক যত্ন সহকারে 'নায়িকার দুই গাল ধরিয়া মুখখানা উঁচু করিয়া চুমু খাইল' লিখলে কাগজ কালি ছিঁড়ে ধেবড়ে এমন দাঁড়ায় মনে হয় বুঝি লিখলাম, 'দুই হাতে দুই গাল ধরিয়া কষিয়া চড় মারিল!' বলুন দেখি, তন্বী তরুণীর ফোলা নরম গালে চুমু খাওয়া আর কষে চড় মারা কি এক বস্তু? কোন্ পাষণ্ড এমন লিখতে পারে? কোন্ নিষ্ঠুর সম্পাদক এমন ছাপতে পারে?

আমি লেখা বন্ধ রেখেছি। আপনি কিছু কাগজ পাঠাতে পারেন?

শুধু কাগজ পাঠালেই চলবে না, সঙ্গে কয়েক লিটার কেরোসিনও চাই। কাগজের চেয়েও ওটা এখন বেশী জরুরী—কেননা সংসারের অত্যাবশ্যক পণ্য-তালিকায় কাগজ সম্প্রতি বিলাসবস্তু, হলেও চলে না হলেও ক্ষতি নেই কিন্তু চাল ডাল তেলের পরেই যে কেরোসিন।

কেরোসিন ছাড়া আমরা, গাঁয়ের মানুষেরা, সন্ধ্যা লাগলেই অন্ধ অসহায়। ঘর থেকে বারান্দায় নড়াচড়ার ক্ষমতা পর্যন্ত নেই। লেখা-পড়া চুলোয় যাক, এখন আমার সংসারই অচল হতে বসেছে। সম্পাদকমশাই, আপনার কাছে বিনীত আর্জি, কাগজ না পাঠান ক্ষতি নেই, আমি যেমন করে পারি যোগাড় করে নেব, কিছু কেরোসিন নিশ্চিতই পাঠাবেন। অন্তত পাঁচ লিটারও।

আজ তিনমাস গাঁ থেকে কেরোসিন উধাও। শহরে গিয়ে মাথা খুঁড়লেও পাওয়া যায় না। একটা দুটো দোকানে হঠাৎ হঠাৎ আসে, লম্বা লম্বা লাইন পড়ে, হাতাহাতি ধস্তাধস্তি থেকে ছুরি চালাচালি হয়, তারপরই নেই নেই হাহাকার। চোকোচ্যাপ্টা গোল রঙবেরঙের শূন্য টিন আঙুলে ঝুলিয়ে ঘরে ফেরে সবাই। আমরা গাঁয়ের মানুষেরা শহরে তেল আসার খবরও পাই না।

মুদীর দোকানের মধু আমাদের তেল দিয়েছে বরাবর। এখন চাইলে বিজ্ঞের মতো মাথা নাড়ে, 'ক্রাছিন্ নিয়ে যুদ্ধু লেগেছে মাস্টর-বাবু, জানেন না? ঘোর যুদ্ধু! খোলা বাজারে ও বস্তু আর পাবেন নাই। রেশনের দোকানকে চলে যান—'

রেশনের দোকানের অটল দাস বলে, 'ক্রাছিন্? ই গাঁয়ের কোনো কোটা নাই তো মাস্টরবাবু। আপনি ওই বারবনির হাট-তলায় পঞ্চাবেনের দোকানকে চলে যান…'

দুই ক্রোশ দূরের বারবনির পঞ্চানন দুই হাতের দুই বুড়ো আঙুল নাচিয়ে বলে, 'ঢন্ ঢন্! গেল মাসে তিন টিন এসেছিল, চিলের মতো ছোঁ মেরে নিয়ে গেল ছোঁড়ারা—'

'কোন্ ছোঁড়ারা?'

'সে বলব না। আমাকেও ছোঁ মেরে নিয়ে যাবে তাহলে! আপনি মাস্টারমশাই, সামনের মাসে একবার খোঁজ নিন।'

'টিনটা…'

'রেখে যাবেন? পুরো তিন কুড়ি হবে তাহলে। ওই যে উঁকি মেরে দেখুন…'

পঞ্চা বেনের দোকানের একদিকে টিনের পাহাড় জমেছে। সনাক্তকরণের জন্য কোনোটায় কাগজে লিখে নাম সাঁটা, কোনোটায় ছুরি দিয়ে রং কেটে রকমারি চিহ্ন দাগা।

আমি খালি টিন আঙুলে ঝুলিয়ে ফিরে এলাম।

চাল চিনি তো বটেই কেরোসিনের জন্যও এখন পাগল পাগল অবস্থা। শুধু আমার না, আমার মতো বেশ কিছু যারা এ গাঁয়ের স্থায়ী বা অস্থায়ী বাসিন্দা, সকলেরই। হাটেগঞ্জেসদরে সবাই টিন হাতে ছুটে বেড়াচ্ছে। ব্যতিক্রম শুধু মুচিপাড়া ডোমপাড়া মিঞাপাড়ার মানুষগুলো। ওদের আর কেরোসিনের দরকার নেই। চাল ডালের মতো এটাও ওদের কাছে এখন বিলাসদ্রব্য। গাঁয়ের আনাচে কানাচে পুকুর নদী জলায় জঙ্গলে বউ মেয়ে বাচ্চা বুড়ো সকলেই দল বেঁধে ধুঁকতে ধুঁকতে খুঁজে বেড়াচ্ছে পুষ্ট ঘাস শাকপাতা শামুক গুগলি মেঠো ইঁদুর পাখপাখালি—যা হোক কিছু পেলেই আজকের মতো প্রাণটুকু বাঁচে। কেরোসিন দিয়ে ওরা কি করবে! কেরোসিন তো খাদ্যবস্তু না! এমন কি ফলিডল বা কল্কে ফুলের বিচির মতো খেয়ে মরাও যায় না! তার চেয়ে কপালগুণে অধরবাবুর লঙ্গরখানায় এক হাতা গম কি মাইলোর খিচুড়ি যদি জুটে যায়, আহা, সে তো ভোজ!

সম্পাদকমশাই, মাপ করবেন, গাঁ-ঘরের গরীব-হাভাতে মানুষের দুঃখের কথা আমি আপনাকে শোনাতে বসি নি। শুনে আপনার ভালোও লাগবে না। আপনারা রাজধানীর মানুষ, আপনাদের চালচলন মনমেজাজই আলাদা। গাঁয়ের এইসব অনাহারী মানুষগুলোর চামড়ায় ঢাকা হাড় ক'খানা দেখে পাছে আপনাদের কষ্ট হয়, পাছে আপনারা উত্তেজিত হয়ে পড়েন—তাই তো আপনাদের রাজধানীর পুলিস সরকারীভাবে শহরে ঢোকা বন্ধ করে দিয়েছে ওদের। তাড়া করে ফের ঠেলে পাঠাচ্ছে গাঁয়ের দিকে। আহা, মরতে হয় তো গাঁয়ের মাটিতেই মরুক! মরণকালে তবু তো একটু জল পাবে আত্মীয়জনের হাতে! একেবারে কিছু না খেয়ে নির্জলা মরেছে সরকারীভাবে আর তো বলা যাবে না—

থাক, ওদের কথা থাক। চাল ডাল গম চিনির কথাও থাক। আমি বলছিলাম কেরোসিনের কথা……

আজ তিনমাস এক ফোঁটাও কেরোসিন যোগাড় করতে না পারায় আমার সংসারে রীতিমতো কুরুক্ষেত্র চলছে। গোড়ায় ক'টা মোমবাতি এনেছিলাম। বড়োলোকের নাত্‌নিনাত্‌নির মতো দিব্যি গোল গাল হৃষ্টপুষ্ট দেখেই এনেছিলাম। কিন্তু কাজের বেলা দেখা গেল, যত পোড়ে তত আলো দেয় না। একটা জ্বালালে যদি বা রান্না হয়, আরেকটা না জ্বালালে খাওয়া হয় না।

একদিনে দুটো মোমবাতি শেষ হতেই ঘর যত না অন্ধকার হ'ল আমার মুখ তার তিনগুণ! দাম তো কম না। তার উপর কেরোসিনের টানাটানির সুযোগ নিয়ে সার চার্জ বসেছে। ফলে মোমের চর্বি পোড়ে কি আমার চর্বি পোড়ে বলা মুস্কিল।

দেখলাম বউটার বুকের রক্তও শুকিয়ে গেছে, 'এভাবে মোম জ্বেলে কাজ করলে মোমই জ্বলবে, ভাত জুটবে না!'

'ঠিকই তো! কি করা যায় বলো দেখি?' আমি স্ত্রীর কাছে পরামর্শ চাই, কেননা স্ত্রীর সংসারী-বুদ্ধির উপর আমার গভীর আস্থা।

বউ বলে, 'সলতে পাকিয়ে সরষের তেলের প্রদীপ করব।'

'সরষের তেল? সেও তো বারো টাকা!'

'হলেও কম লাগবে।'

'দেখো ক'দিন।'

ক'দিন সরষের তেলের প্রদীপ জ্বলে। তারপর সেটাও বন্ধ হয়। আরো সস্তার জন্য রেড়ির তেল কিনে আনি। ঘর বাড়ি ধোঁয়ায় ভরে যায়। সামনে থাকলে শ্বাস টানতে কষ্ট হয়। তবু নিরুপায়। ঠেকা কাজ ওতেই চালাতে হয়। এখন দিনের আলো থাকতেই রান্নার কাজ শেষ হয়। বাচ্চাদের বিছানা করা মশারি টাঙানো হয়ে যায়। বড় ছেলেটা অন্ধকারে কিছুক্ষণ ঘুর-ঘুর করে শুয়ে পড়ে। সব শেষের বাচ্চাটা ঘুমোতে চায় না। এখানে ওখানে হামাগুড়ি দেয়। গড়িয়ে পড়ে, চেঁচিয়ে কাঁদে। বউটা বিরক্ত হয়ে পিঠে ক'টা কিল রসিয়ে

মশারির তলায় ছুঁড়ে দেয়। আমার মা অন্ধকার খুপরি ঘর থেকে ভাঙা ভাঙা গলায় চিৎকার করে বলতে থাকেন, 'কি হ'ল, অ বউমা কি হ'ল? একটা আলো দিবি খোকা আমার ঘরে? অ বউমা একটা আলো দেবে আমার ঘরে? আমি একটু দেখি কি হ'ল?'

বউমা ঝাঁঝিয়ে জবাব দেয়, 'হ্যাঁ, আলো আমি বানাচ্ছি! আমার গায়ে তেল দেখেছেন তো অনেক, সেই তেলে ফর্‌ফর করে জ্বলবে।'

আমি চুপ করে নিজের বিছানার এককোণে বসে থাকি। হাতের কাছে একটা টর্চ থাকে। কিন্তু তার আলো নিতান্ত ম্রিয়মাণ। মাসে একবারের বেশী ব্যাটারি পাল্টাতে পারি না বলে খুব হিসেব করে খরচ করি।

এদিকে ধমক খেয়ে মা চুপ করে যান। বিছানায় শুয়ে বাচ্চাটা সুর তুলে কাঁদে। বউ ফস্‌ করে একটা দেশলাই-কাঠি জ্বালিয়ে কি দেখে চেঁচিয়ে ওঠে, 'একটা ব্যাঙ ঘরে! মস্ত ঢাউস ব্যাঙ্‌! শুনছ, কোথায় গেলে তুমি?'

আলোর আভাস পেয়ে মা আবার চেঁচিয়ে ওঠেন, 'দিবি? আমার ঘরে একটা আলো দিবি খোকা? আমার তামাকের কৌটোটা যে কোথায় গেল...'

সত্তরের উপর বয়স হয়েছে মা'র। দিনের আলোতে যদি বা কিছু দেখেন, রাত হলে অন্ধ। ভাঙাচোরা শরীরটা নিয়ে বিছানায় শুয়ে থাকেন। হাতের কাছে একটা হ্যারিকেন থাকলে অনেক সুবিধা তাঁর। উঠে কলসি থেকে জল গড়িয়ে খেতে পারেন। তামাকের কৌটা থেকে আন্দাজ মতো পাতা মুখে পুরতে পারেন। কানের কাছে কিংবা হাঁটুর পেশীতে বাতের ব্যথা শুরু হলে লণ্ঠনের উপর কাপড় গরম করে সেঁক দিতেও পারেন। বুড়োমানুষ বলে ঘুম ভালো হয় না। সারারাতই তাঁর একটা আলো দরকার হয়। কিন্তু আমি কোত্থেকে দিই! আকাশে ফুটফুটে জ্যোৎস্না উঠলে আমরা যে এখন আলো না জ্বালিয়েই দিব্যি বারান্দায় বসে ভাত খাই,

কুয়োতলায় আঁচাতে যাই, মশারি গুঁজে শুয়ে পড়ি! এখন আলো যোগানো কি সহজ কথা!

বুড়ো মা বুঝেও বুঝতে চান না! বাচ্চাদের মতো গোঁ ধরেন, জিদ্ করেন। কখনো অনুনয়, কখনো রাগ, কখনো দুঃখ, 'দিবি নে খোকা? একটা আলো দিবি নে আমার ঘরে? অ খোকা! অ বউমা! কানের মাথা খেয়ে বসে আছিস সব, মরণ! মরণ হয় না আমার! তেষ্টায় যে ছাতি ফেটে গেল, আঁধারে যে গেলাসটা খুঁজে পাই না। অ বউমা, অ খোকা—'

সেই সন্ধ্যা থেকে শুরু, তারপর সারা রাতই এ রকম ডাকাডাকি, খিটিমিটি, রাগারাগি। কতবার যে উঠতে হয় আমাকে। কখনো টর্চ, কখনো দেশলাই, কখনো রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বেলে সামাল দিতে হয়। সারাদিন খেটেখুটে বউটা তো মড়ার মতো ঘুমোয়, টেরও পায় না। কিন্তু আমাকে তো খেয়াল রাখতেই হয়। মা, কিনা গর্ভধারিণী জননী, জঠরের অন্ধকার থেকে বসুন্ধরার আলোর মুখ দেখিয়েছেন আমাকে, বুড়োবয়সে তাঁর ঘরে সামান্য আলো দিতে পারি না বলে তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেলে জলটুকুও কি গড়িয়ে দিতে পারব না? না সম্পাদকমশাই, সংসারের জাঁতাকলে পিষে এত নিষ্ঠুর এখনো হয়ে যাই নি আমি। ওই বুড়ী মায়ের জন্যই আরো বেশী হন্যে হয়ে কেরোসিন খুঁজতে হয় আমাকে। তাঁর রাতের বেলার চোখের দৃষ্টি, তেষ্টার জল, ব্যথার সেঁকটুকু কেড়ে নিতে ইচ্ছে হয় না। ফলমূল দুধের আহার না, তীর্থযাত্রার পুণ্যিও না, এই বয়সে এইটুকুমাত্র তাঁর দাবি, আমি ঠেকাই কোন্ যুক্তিতে। কিন্তু গোটা গাঁয়ের মানুষ তিন মাস যে বস্তু চোখে দেখে না, আমি কোন্ যাদুমন্ত্রে তা কব্জা করি? অশরীরী কোনো শক্তি নেই তো আমার!

কিংবা সম্পাদকমশাই, একটু ভুল হ'ল! জেনেশুনেই একটা ভুল তথ্য দিলাম আমি। কাগজে ছেপে বেরুলে এখুনি অধরবাবুর নির্দেশক্রমে তাঁর অনুগত বশংবদরা তীব্র প্রতিবাদ পাঠাবে! বলবে, আলো নেই গাঁয়ে কে বলেছে এ কথা! ওই তো ধবধবে সাদা

হ্যাজাকের আলো জ্বলছে অধরবাবুর বারান্দায়, চণ্ডীমণ্ডপে, তাসপাশা জুয়া খেলার আড্ডায়। ওই তো তেল-ভরা জ্বলন্ত হ্যারিকেন ঝুলছে তাঁর ভাইপো ভাগ্নে ভাইঝিদের ঘরে। বামুনপাড়ায় এত আলো থাকতে নাড়াজোলে আলো নেই বলে কোন্ বাঞ্চোৎ···

সম্পাদকমশাই, মাপ করবেন, গালাগালটা মুখ ফস্কে বেরিয়ে গেল। কিন্তু এটা আমার ভাষা না। অধরবাবুর অনুগত আশ্রিতরা এই ভাষাতেই কথা বলে—এটা ওদের সম্পত্তি! ওই যে মাসখানেক আগে গাঁয়ের মিঞাপাড়ার জামির মিঞা হাটবারে হাটতলায় ভিক্ষে করতে এসে টান-টান মরে পড়ে থাকল, গোল হয়ে হাটুরে মানুষের ভিড় জমে গেল তার চারপাশে, কুকুরে এসে শুঁকতে লাগল তার গাঁজলা-ওঠা মুখ—তারপর অনাহারে মৃত্যু বলে কিছু হৈ-চৈ হ'ল, লালকালিতে লেখা দু'একটা পোস্টারও পড়ল অধরবাবুর বেনামী নিত্য মণ্ডলের ধানচালের আড়ৎঘরের দেয়ালে, তারপরই চণ্ডী-তলার জুয়ার আড্ডা ভেঙে বেরিয়ে এল ওরা, নাকের পাটা হাতের পেশী ফুলিয়ে হাটতলার হাটুরে মানুষদের ডেকে ডেকে জিজ্ঞেস করল, 'এই গাঁয়ে মানুষ না খেয়ে মরছে কোন শালা লিখেছে এ কথা? এত সাহস কোন্ বাঞ্চোতের!'

না সম্পাদকমশাই, এ সব কথাও থাক! অধরবাবু এ গাঁয়ের রাজা মানুষ। গাঁয়ের তাবৎ জমিজমা বিলপুকুর জলাজঙ্গল তাঁর দখলে। তাঁর এক ভাগিনেয় এম-এল-এ, এক ভ্রাতুষ্পুত্র পঞ্চায়েতের অধ্যক্ষ, এক ঘরজামাই স্কুলের সেক্রেটারি। এ গাঁয়ে আমরা সকলেই অধরবাবুর প্রজা। ক্বচিৎ কাজেকর্মে দেখা হয়ে গেলে আমি অতি বিনীতভাবে প্রণত হই। ইজিচেয়ারে শায়িত তাঁর বিপুল কৃষ্ণবর্ণ শরীরখানি উত্তরে সামান্য নড়েচড়ে উঠলে কৃতার্থ বোধ করি। যাঁতায় ফেলে কলাইডাল পেষাইয়ের মতো ঘড়ঘড়ে গলায় যদি প্রশ্ন করেন, 'কিহে মাস্টার,স্কুলে কোনো গোলমাল নেই তো?' আমি তৎক্ষণাৎ প্রবলবেগে ঘাড় মাথা ঝাঁকিয়ে বলে উঠি, 'আপনার স্কুলে গোলমাল করে কোন্ শা—'

'শালা'টা এসে যেতে চায় কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জিভের ডগায় লোপাট করে বলি, 'কোন্ সা—হসে! কার এত বুকের পাটা!'

অধরবাবু অল্প অল্প হাসেন। যেমন কালো মোষের চকচকে নির্লোম গলা বেয়ে জ্যোৎস্না গড়িয়ে নামে অধরবাবুর কৃষ্ণবর্ণ মাংসল দুই ঠোঁট বেয়ে হাসিটা তেমনি ঝরতে থাকে। আমি আবার নমস্কার করে চাকরি বাঁচাই।

এমন মানুষের ঘরে আলো জ্বলবে না তো কি মৃত জামির মিঞার বিধবার ঘরে জ্বলবে! না সম্পাদকমশাই, ঈর্ষা করি না। ঈর্ষা সাহসীর ধর্ম। প্রতিদ্বন্দ্বিতার শক্তি থাকলেই ঈর্ষা জন্মায়। আমার সে সামর্থ্য নেই। বরং আমি খুব অসহায়ভাবে অধরবাবুর দ্বিতল পাকা বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকি। অন্ধকারে সমস্ত গাঁ যখন ডুবে যায় তখন তাঁর বাড়ির চৌহদ্দি ঘিরে আম জাম বটের মাথায় হ্যাজাকের উজ্জ্বল আলোর ছটা কেমন আশ্চর্য অশরীরী জ্যোতির্লোক সৃষ্টি করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি। অনেক রাত পর্যন্ত সে আলোর দ্যুতি দপদপ করতে থাকে। কেননা এখন সরকারী পয়সায় অধরবাবু দিনান্তে একবার লঙ্গরখানায় মাইলো গমের খিচুরি বিতরণ করেন। তাঁর অনুগত বশংবদরা কখনো জুতোর ঠোক্কর দিয়ে, কখনো লাঠির খোঁচা দিয়ে, কখনো সটান পদাঘাতে আছড়ে ফেলে অভুক্ত মানুষের লাইন ঠিক রাখে। তারপর অনেক রাত পর্যন্ত হাঁড়ি হাণ্ডা ধোয়া-ধুয়ি চলে। তাঁর অনুগতরা বাঁধানো চণ্ডীতলায় গোল হয়ে বসে জুলপীর চুল টেনে টেনে তিনতাসের জুয়া খেলার পয়সা গোণে।

বউটার সাংসারিক বুদ্ধি যতই থাক বাইরের বুদ্ধি তো একটুও নেই! অধরবাবুর বাড়ির দিকে তাকিয়ে কখনো-সখনো বোকার মতো প্রশ্ন করে, 'ওই তো ওদের বাড়িতে আলো জ্বলছে। কত আলো! ওরা কেরোসিন পায় কোথায়?'

আমি খুব ঠাণ্ডা গলায় বলি, 'বারবনির পঞ্চা বেনের দোকানে।'

স্বভাবমতো বউটা ঝাঁঝিয়ে ওঠে, 'তুমি পাও না কেন?'

আমি আরো ঠাণ্ডা হয়ে বলি, 'ওঁরা গাঁয়ের রাজা। রাজার ভোগ কি প্রজার জোটে!'

কথার অর্থ পরিষ্কার বুঝতে পারে না বলে বউটা আরো রেগে যায়, 'ও সব নি-মুরোদের কথা। গতর নেড়ে কিছু খোঁজ কর না তো তুমি। খুঁজলে আবার কেরোসিন না পাওয়া যায়! ওই অধর-বাবুদের গিয়ে একটু ধরাধরি করলেও তো পারো?'

'সে চেষ্টা কি করিনি? একদিন ধরেছিলাম এক সাগ্‌রেদকে! ঘাড়ের লম্বা চুল ঝাঁকিয়ে বললে, সাড়ে তিন টাকা দর যাচ্ছে স্যর, কিন্তু এখন হবে না, শালা পঞ্চুর দোকানে আবার তেল এলে...'

'এক লিটার তেল সাড়ে তিন টাকা!' বউটা হাঁ হয়ে যায়।

আমি বলি, 'হ্যাঁ, প্রজাদের জন্য।'

অন্ধকারে আমাদের কথাবার্তা শুনতে পেয়ে ও ঘর থেকে মা চেঁচিয়ে ওঠেন, 'তোরা ঘুমুসনি এখনো? অ বউমা, অ খোকা! দে, একটা আলো দে বাবা আমার ঘরে। মাথার বালিশটা কোন্‌দিকে গেল ঠাহর পাই না যে!'

সম্পাদকমশাই, সাড়ে তিন টাকা দরেও দু'-এক লিটার আমি কিনতে চেয়েছিলাম। অন্তত মা'র ঘরের বাতিটা তো জ্বলুক। কিন্তু ছোঁড়াগুলো আমাকে কি চোখে দেখেছে কে জানে, দিল না কিছুতেই। নিতান্ত নিরুপায় হয়ে আপনার শরণ নিলাম। ছোট কাগজ হলেও আপনারা তো সংবাদপত্রেরই লোক, নানা আঁটঘাট জানা আছে, যাতায়াত আছে বহুস্থানে—একটু চেষ্টা করলে ক'লিটার কেরোসিন কি আর যোগাতে পারবেন না? কেরোসিন দিলেই আমি লেখা পাঠাব। এখন রাত্রে ছাড়া আমার লেখার তো আর সময়ও নেই। সারাদিন ঘুরতে হয় চাল ডালের ধান্ধায়, কখনো গঞ্জে কখনো সদরে, কোথায় কখন কি যে পাই ঠিক নেই তো কিছু। রাতের বেলায় একটু সময় পাই। আমন্ত্রণ এলে এখনো লিখতে ইচ্ছে করে। রেড়ির তেলের ধোঁয়ায় কিছু কি লেখা যায়, না লেখা সম্ভব! নিদেনপক্ষে একটা লণ্ঠন তো চাই-ই!

যদি লোক মারফৎ পাঠান বিশ্বস্ত কারো হাত দিয়ে পাঠাবেন। টিনখানা চটের থলিতে মুড়ে আনলে ভালো হয়। বাইরে থেকে হঠাৎ দেখলে কি বস্তু যেন বোঝা না যায়। না, ট্রেনে যদি লুটপাট ছিনতাই না হয় তাহলে এ গাঁয়ে তার কোনো আশঙ্কাই নেই। গাঁয়ের মানুষ লুটপাট দূরে থাক এখনো ফর্সা জামাকাপড় দেখলে মাথা তুলে কথা বলতেও ভয় পায়। যদি লুট করতেই জানত তাহলে কি ঘাসপাতা খায়, না অধরবাবুর লঙ্গরখানায় আধহাতা খিচুড়ির জন্য প্রাণপাত করে। গাঁয়ে ধান চাল নেই এমন তো না। ফসল তো এ বছর ভালোই হয়েছিল।. আমাদের স্কুলের লাগোয়া মাঠগুলোও হলুদ ধানে ভরে উঠেছিল। এখন মাঠ থেকে অদৃশ্য হয়েছে বটে কিন্তু গাঁ থেকে তো হয়নি। অধরবাবুর মস্ত বাড়ির অন্ধিসন্ধিতে নাড়া দিলে এখনও পাহাড়প্রমাণ বের হতে পারে। তার উপর আছে রেশনের চাল গম। প্রায় সব মানুষের রেশনকার্ডই তো দু'দশটাকায় অধর-বাবুর বাড়িতে বাঁধা। দেয়ালীর একটা মশাল যেমন দল বেঁধে সমস্ত পোকা টেনে চারপাশে জড়ো করে, গাঁয়ের সমস্ত কার্ড এখন তেমনি ঝাঁক বেঁধে অধরবাবুর গৃহবন্দী হয়েছে, ফি হপ্তা তার চাল-গম-চিনি অধরবাবুর অনুগত বশংবদরা চড়া দামে হাটতলায় বিক্রি করছে, আর গাঁয়ের মাঠের সরেস ফসল ধীরেসুস্থে পাচার হয়ে যাচ্ছে বাইরে, হয়ত বা আপনাদের শহরেও, এবং পাঁচ টাকা দরে নাড়াজোলের মিষ্টি চালের ভাত রেঁধে খান সম্ভবত আপনিও—

কিন্তু এ প্রসঙ্গ অবান্তর। কেরোসিনের কথাই বলি। চটে মুড়ে যে আনতে বললাম তার প্রধান কারণ আমার সহকর্মীবৃন্দ। একবার টের পেলে আর রক্ষে নেই! নিশ্চিতই ভাগ বসাতে চাইবে। তাদের ঠেকানো মুস্কিল। বিশেষ করে হেডমাস্টার জগন্নাথবাবুকে। পদমর্যাদার জোরেই তিনি অর্ধেকটা খাবলে নেবেন। 'না' তো করতে পারব না। তাঁর বউটা হাঁপানীর রোগী। সন্ধ্যা হলেই টান ওঠে। প্রায় সারারাত বসে থাকতে হয় তাঁকে বাতি জ্বালিয়ে। তেলের জন্য তাঁরও পাগল-পাগল অবস্থা। টিন হাতে রোজই ছুটছেন পঞ্চাননের

দোকানে। সদরেও ঘোরাঘুরি করছেন। ফিরে এসে গজ-গজ করছেন স্কুলে বসে, 'এ তো আচ্ছা ফ্যাসাদ হ'ল রে ভাই, চাল না চিনি না কাপড় না, কেরোসিন হেন বস্তু তাও উবে গেল রাজ্য থেকে। সেই যুদ্ধের সময় দেখেছিলাম লাল কেরোসিন বেরিয়েছিল—আমি তখন সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ি। একেবারে ঝোলাগুড়ের মতো টকটকে লাল, যত না আলো তার তিনগুণ কালি। তা তোরা যদি বাপু সাদা না দিতে পারিস সেই লালটাই আন না ফিরিয়ে। এখন লাল হলেও যে বাঁচি...'

মুখে মুখে দরখাস্তকারী ব্রজসুন্দরবাবু বলে ওঠেন, 'অত লাল লাল করবেন না মাস্টারমশাই, কেউ শুনে ফেললে বিপদ হবে।'

'বিপদ হবে! কেন, এমন কি বললাম!' হেডমাস্টার হঠাৎ কেমন ভয় পেয়ে থমকে যান। তাঁর কৃশ বয়স্ক চোখে-মুখে একটা অসন্তুষ্ট উদ্বেগের ভাব ফুটে ওঠে। স্কুলের বড় দরজাটা দিয়ে তিনি সোজা তাকান অধরবাবুর বাড়ির দিকে। বাড়িটা দেখা যায় না কিন্তু চণ্ডীমন্দিরের চূড়ায় গাঁথা ত্রিশূল নজরে আসে।

হেডমাস্টারের মুখের দিকে তাকিয়ে মিট-মিট করে হাসেন ব্রজদা, তারপর বলেন, 'আর কিছুদিন সবুর করুন মাস্টারমশাই, তেলের কষ্ট থাকবে না। ইলেকট্রিক তো এসে গেল বলে—'

শোনামাত্র জগন্নাথবাবু চাপা উত্তেজনায় গর্ গর্ করে ওঠেন, 'আর ইলেকট্রিক! যান, ক্লাসে যান দেখি আপনারা...'

সম্পাদকমশাই, ভুল হয়ে গেছে। মস্ত বড় ভুল! এত কিছু বললাম, এত লিখলাম—আসল কথাটাই যে বাদ পড়ে গেল! আসুন সম্পাদকমশাই, আসুন একবার আমাদের গাঁয়ে, দয়া করে একবার ঘুরে যান আমাদের স্কুলবাড়িটা! দেখবেন ঘরে ঘরে ইলেকট্রিকের লাইন টানা হয়ে আছে, দেয়ালে দেয়ালে আলোর ব্র্যাকেট, দরজার গায়ে গায়ে সুইচ্‌বোর্ড। সাদা তার একটু ময়লা হয়েছে, ঝুল জমেছে কোথাও, অধৈর্য অসহিষ্ণু ছেলেরা কোথাও বোর্ড থেকে সুইচ উপড়ে নিয়েছে। তবু দেখবেন, আছে, এখনো প্রায়

সবই আছে, নতুন ঝকঝকে পালিশ করা। মনে হয় একটা বাল্ব লাগিয়ে দিলেই আলো জ্বলে উঠবে, পাখা ঝুলিয়ে দিলেই বন বন শব্দে ঘুরতে শুরু করবে। কিন্তু না, জ্বলবেও না, ঘুরবেও না! এ এক অদ্ভুত কাণ্ড। এত বড় মজার কাণ্ডটাই তো আপনাকে বলা হ'ল না সম্পাদকমশাই—

সেই যে সে বছর, শোনেননি, দশ হাজার গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে গেল? নাড়াজোলও তার একটা! অধরবাবুর এম-এল-এ ভাইপো তদ্বির তদারক করলেন। অধরবাবুর বড় শ্যালক সরকারী ঠিকাদার —লাইন টানার ঠিকা নিলেন। দেখতে দেখতে গাঁয়ের ধানমাঠে, কাঁচারাস্তায় খুঁটি পোঁতা, তার টাঙানো হয়ে গেল। আলাদা ঠিকায় স্কুলবাড়ি, হেলথ্-সেণ্টারের কাজটাও শেষ করে রাখা হ'ল। ডাইনে বাঁয়ে টাকা গেল জলের মতো। সব ঠিকঠাক, শুধু এলেই হয়! কিন্তু সেই জলস্রোতের উজান বেয়ে বিদ্যুৎ এল না! আজও না, কালও না!

গোড়ার দিকে রুক্ষ পিঙ্গল ধানমাঠের বুকে সুদৃশ্য সুঠাম খুঁটিগুলো আর তার মাথায় সাদাবাটির গায়ে জড়ানো এলুমিনিয়ম তারের ঝলমলানি দেখে চোখ জুড়িয়ে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল, বুঝি-বা শহরের একদল চিকন-চাকন টেরিকাটা ফুলবাবু কোঁচা দুলিয়ে গাঁয়ের মাঠে হাওয়া খেতে এসে অবাক কিছু দেখে মাথা উঁচু করে এখানে ওখানে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে!

বছর না ঘুরতেই ঝড়ে জলে খুঁটিগুলো কেমন মলিন হয়ে গেল। তারের রং ধুয়ে মুছে লোহা বেরিয়ে এল। সাদা বাটিগুলো হলুদ হয়ে গেল। এখানে ওখানে বেশ কিছু তার ছিঁড়ে খুঁটিগুলো কাৎ হয়ে গেল। তখন তাকিয়ে দেখলে গাঁ-ঘরের ঝি বলে মনে হত ওদের। যেন পুকুরঘাটে এঁটো ধুতে এসে কুকুরের তাড়া খেয়ে থমকে দাঁড়িয়েছে। উঁচানো ডানহাতের থাবায় ডাঁই করা বাসনের ভারে শীর্ণ শরীরটা একদিকে হেলে পড়েছে!

তারপর আরো এক বছর পার হ'ল। এখন অনেক খুঁটি মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়েছে! অনেক তার ছিঁড়ে লোপাট হয়েছে। ছেলেরা

সাদা বাটিগুলো রাস্তায় গড়িয়ে গড়িয়ে কিছুদিন খেলার পর অদৃশ্য করেছে। গাঁয়ের তিনু কামার বেশ কিছু তার হাতিয়ে কামারশালায় ঢুকিয়েছে। অধরবাবুর এক ভাইঝির বিয়েতে কটা খুঁটি তুলে নিয়ে সামিয়ানা টাঙানো হয়েছিল—এখন চণ্ডীমণ্ডপের গায়ে জড়ো করা আছে। ধানমাঠে শায়িত ছেঁড়াখোরা তার জড়ানো বিপর্যস্ত খুঁটিগুলির দিকে তাকালে এখন চোখ জ্বালা করে। মনে হয়, সব নষ্ট চরিত্রের বন্ধ্যা মেয়েমানুষ। সারারাত ধামসাধামসির পর এখন নির্লজ্জভাবে খোলামাঠে চিৎপাত শুয়ে শরীর জুড়িয়ে নিচ্ছে।

গাঁয়ে বিদ্যুৎ এল না, উপরন্তু লণ্ঠনের টিমটিমে আলোটুকুও উবে গেল। এখন সন্ধ্যার পরে আপনি যদি কখনো এ গাঁয়ে ঢুকে পড়েন —মনে হবে জনমানবহীন অন্ধকারের রাজত্ব! ডাইনে-বাঁয়ে দূরে অদূরে কোথাও বুঝি কোনো আলোর ইশারা নেই। ঘন নিচ্ছিদ্র অন্ধকারে শেয়াল ও কুকুরের ডাক শুনে হাঁটতে হাঁটতে যদি এক সময় অধরবাবুর বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে যান তাহলে অবশ্য আলাদা কথা। সেখানে চণ্ডীতলায় উজ্জ্বল হ্যাজাকের আলোতে চোখ ধাঁধিয়ে যাবে। দেখবেন, আম-জাম-বটের মাথায় সে আলোর ছায়া নাচছে। ফুটফুটে সাদা আলোয় চারদিকে গোল হয়ে বসে একদল গ্রাম্য মস্তান লঙ্গরখানার সরকারী চাল-গম-মাইলোর ভাগ-বাঁটোয়ারার হিসাব করছে, অন্যদল তাস কিংবা সাট্টার কাগজ হাতে নাচিয়ে নাচিয়ে হা হা করে হাসছে।

এখন অন্ধকারে আমাদের ঘরে অতর্কিতে সাপেরা উঠে আসে। ব্যাঙ লাফায়। বাদুড়গুলো ডানা ঝটপটিয়ে মশারির চালে আছড়ে পড়ে। বাচ্চারা ভয় পেয়ে চিৎকার করে ওঠে। মা-গুলো তার চেয়েও বেশী চেঁচায়। বার বার দেশলাই জ্বালতে গিয়ে কারো ঘরে বিছানাপত্রে আগুন ধরে যায় হঠাৎ। চারদিকে চাপা গোলমাল শুনে আমার বুড়ি-মা চিৎকার করতে থাকেন, 'একটা আলো দিবি খোকা আমার ঘরে? একটা আলো? আমি যে কিছু ঠাহর পাই না।' নিষ্প্রদীপ অন্ধকারে ডোমপাড়া মুচিপাড়া মিঞাপাড়ার মানুষগুলো

কি করে আমি বলতে পারব না। রাতের দিকে কখনো যাই না তো ও-পাড়ায়। সারা শরীরে শূন্য পাকযন্ত্রের যন্ত্রণা নিয়ে এখানে ওখানে পড়ে অকাতরে ঘুমোয় হয়ত, কিংবা হয়ত ঘুম আসে না অনেকেরই। যারা ঘুমোয় সকালে তাদের দু'একজনের ঘুম কিছুতেই ভাঙে না। তখন অস্পষ্ট একটা কান্নার রোল ভেসে আসে বাতাসে। বোঝা যায়, লঙ্গরখানার লাইন থেকে আরো একজন কমল। একটি শিশু, একটি বৃদ্ধ কিংবা একজন নারী—

আমার স্কুল-কোয়ার্টারের ঢালাই-করা ছাদের উপর একটা ইলেকট্রিকের তার লুটোপুটি খায়। গত বর্ষায় ছিঁড়ে আধখানা খেজুর গাছের মাথায়, আধখানা ছাদে পড়েছিল। বাতাসে নড়ে চড়ে উঠলে ঘর্ষণে শব্দ হয়, ঠুন-ঠুন। রাতে ঘুম ভেঙে গেলে মনে হয়, এক স্যাকরা বুঝি চুপিসারে চোরাই সোনা ভেঙে গয়না বানাচ্ছে উপরে বসে। কখনো মনে হয়, অধরবাবু তাঁর বিশাল শরীর নিয়ে ছাদে বসে রাতের অন্ধকারে রূপোর টাকা গুণে যাচ্ছেন একটি একটি করে। আবার কখনো, আধো ঘুম আধো জাগরণে হঠাৎ মনে হয়, বারবনির পঞ্চা বেনের দোকানে গরুর গাড়ি বোঝাই কেরোসিনের টিন আসছে। গাড়ির ঝাঁকুনিতে শব্দ হচ্ছে ঠন্‌ঠন্‌—

ঝড়ো বাতাসে একদিন শব্দ কিছু বিকট হতে বউটার ঘুম ভেঙে গেল। ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে ডাকল আমাকে, 'শুনছ, শুনছ তুমি? টর্চটা জ্বালো শীগ্‌গির...'

'টর্চে ব্যাটারি নেই। কেন, কি হয়েছে?'

'ওই শোন, কাঁসার বাসনগুলো টানাটানি করছে কেউ—'

'না। ছাদের উপর ইলেকট্রিক তারের শব্দ।'

'ইলেকট্রিকের তার!' অল্পকাল নিঃশব্দ থেকে কান পেতে শোনে বউটা, তারপরই তিক্ত বিস্বাদ গলায় বলে ওঠে, 'কতদিন বলেছি ছিঁড়ে আনো। উঠোনে টাঙিয়ে কাপড় মেলব!'

'আনব, কাল আনব। এখন ঘুমোও।' ভয়ের ভাবটা দূর করার জন্য আস্তে আস্তে একটা হাত তার শরীরের উপর রাখতে চাই। পারি না। তার আগেই অন্ধকারে মা'র আকুল চিৎকারে প্রবলভাবে চমকে উঠি, 'ঝড়ে যে মশারিটা উড়ে যায় রে খোকা। দিবি? একটা আলো দিবি আমার ঘরে? অ খোকা, একটা আলো—'

সম্পাদকমশাই, এত আলো আমি পাই কোথায়? ঘরে ঘরে আলো জ্বালিয়ে রাখার সাধ্য কি আমার আছে? আমি গাঁয়ের স্কুলের নিরীহ মাস্টার, এই নিষ্প্রদীপ মন্বন্তরে রাতভর জননীর শিয়রে আলো জ্বালিয়ে রাখা কি আমার ক্ষমতা! আমার কাজ! বলুন দেখি আপনি—

আমেরিকার কেপকেনেডি থেকে নিক্ষিপ্ত চন্দ্রযান 'এ্যাপেলো একাদশ' উল্কাবেগে আড়াই লক্ষ মাইল পাড়ি দিয়ে চাঁদে চলে গেল। সারা বিশ্বের বিস্ময় উৎপাদন করে মার্কিন মহাকাশচারীদ্বয় আর্মষ্ট্রং ও অলড্রিন আড়াইঘণ্টাকাল চাঁদের বুকে বিচরণ করলেন এবং তথায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পতাকাসহ একটি সুন্দর সুদৃশ্য ফলক স্থাপন করলেন, যাতে নাকি অসম্ভব উজ্জ্বল অক্ষরে মানবজাতির শান্তি-টান্তির কথা লেখা ছিল। তাঁদের চাঁদে অবস্থানের জন্য প্রতি মিনিটে খরচ হ'ল ১৫ কোটি ডলার। আর মার্কিন চন্দ্রাভিযান কর্মসূচী রূপায়ণের জন্য মোট খরচের পরিমাণ হ'ল ২৪০০ কোটি ডলার। এই বিপুল পরিমাণ অর্থ মানবজাতির শান্তি-টান্তির উদ্দেশ্যে ব্যয় করে চাঁদের মাটি ও পাথরের নমুনা সংগ্রহের জন্য মহাকাশচারীরা মহাশূন্যে পাড়ি দিলেন।

অথচ কড়িধ্যা মৌজার অন্তর্গত হুসনাবাদ গ্রামের পতিতপাবন মণ্ডল মোটে দেড় ক্রোশ পথ হেঁটে স্কুলবোর্ড অফিসে পৌঁছুতে পারল না। তার আগেই অক্সিজেনের গুরুতর অভাববশত তার ফুসফুস ডাঙায় তোলা মাছের মত খাবি খেতে লাগল এবং হৃদপিণ্ডে রক্তসঞ্চালনক্রিয়া বন্ধ হয়ে আসায় একটা খোলা নর্দমার ধারে তার শরীরটা গড়িয়ে পড়ল। হুসনাবাদ থেকে স্কুলবোর্ড যেতে রিক্সা ভাড়া লাগত মোটে সত্তর পয়সা। কিন্তু পতিতপাবনের পকেটে পাঁচ পয়সার বেশী একটা আধলাও ছিল না। অগত্যা সে হেঁটেই রওনা হয়েছিল। চাকরিটা কোনোরকমে বাঁচিয়ে মাসপয়লার মাইনেটা ঘরে আনবে—এই ছিল তার মনোগত ইচ্ছা। চাঁদ-টাদের ব্যাপারে তার তিলমাত্র আগ্রহ ছিল না।

স্কুলবোর্ডের ডি. আই মজুমদারসাহেবের বেয়ারা পতিতপাবন। বয়স পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন। দেখে মনে হয় ষাট-সত্তর। কেননা মাথার কদমছাঁট রুক্ষ চুল ও খোঁচা-খোঁচা দাড়ি-গোঁফ ইটচাপা ঘাসের মত ফ্যাকাসে সাদা। সামনের দাঁত পড়ে গেছে। শরীরের চামড়া কুঁচকে গেছে। চোয়ালদুটো ছাগলের শিঙের মত উঁচু, আর গলার নীচে কণ্ঠাদুটো ওল্টানো নৌকোর মত কটকটে ভাসমান। ঘোলাটে চোখের দু'পাশে সাদা নোংরা সর্বদা ডাঁই হয়ে থাকে। আর বেঢপ লম্বা শরীরটা হাঁটাচলার সময় এমন কুঁজো হয়ে পড়ে যে, মনে হয়, বাতাসের অল্প ধাক্কাতেই মুখ থুবড়ে পড়বে।

এখন পতিতপাবনের জ্বরজারি সর্দিকাশি লেগেই থাকে। শীতে বর্ষায় হাঁপানির টান। মাঝেমধ্যে দাঁতের গোড়া ফুলে ওঠে। প্রায়ই বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না। ফলে অফিস কামাই হয়। ফলে বড়সাহেব রুষ্ট হ'ন। তার ফলে কোনো কোনো মাসে মাইনে কাটা যায়।

তার শেষ অবস্থায় গ্রামে রেশনের দোকানের দেয়ালে লাল-ত্রিকোণের আবির্ভাব। এই ত্রিকোণ তার জীবনে কোনো কাজে লাগে নি। মা ষষ্ঠীর কৃপায় পতিতপাবন চারটি পুত্র ও তিনটি কন্যার জনক। তার চল্লিশ ছুঁই ছুঁই বউটা গরমে গায়ের কাপড় সরিয়ে শুয়ে থাকলে পতিতের মনটা এখনও ছোঁক ছোঁক করে। কিন্তু ন্যাপলার মা নয়নতারা স্বাভাবিক আত্মরক্ষার তাগিদেই পতিতকে আর আমল দেয় না। নগদ কিছু অর্থপ্রাপ্তির আশায় মাঝে মাঝে পতিতপাবন সদর হাসপাতালের একটি বিশেষ বিভাগের বারান্দায় ঘুর ঘুর করে। কিন্তু এই বয়সে রোগা-শরীরে ছুরিকাঁচির ধকল সইতে তার সাহস হয় না। আর বউ মাগীটা এমন দজ্জাল যে তার কাছে কথাটা সে পাড়তেই পারে না!

. মাস গেলে পতিতপাবন মাইনে পায় কেটেকুটে দেনা মিটিয়ে সাকুল্যে সত্তর টাকা। তার বড় ছেলে ন্যাপলার বয়স আঠারো। সিনেমা-হলের চা-মিষ্টির দোকানে কাজ করে। খোরাকি সমেত মাইনে পায় দশ টাকা। তার ছোট গোপালের বয়স বারো।

সে একটা আটাকলের মেসিনে গম ভরে। মাইনে পায় এগারো টাকা। খোরাকি পায় না। ফি বছর পুজোয় জামাপ্যান্ট পায়। সব মিলিয়ে পতিতের যা আয় তাতে একবেলা হাঁড়ি চড়ে। অন্যবেলা ঈশ্বরে অর্পিত। তিনি যখন যেমন জোটান!

তবু রক্ষা, বড় মেয়েটার বিয়ে দিতে হয় নি। পঁচিশের কোঠায় পৌঁছে সে নিজেই গাঁয়ের বেণেদের এক ছেলের সঙ্গে দুর্গাপুর ভেগে পড়েছে। বিধিমতে বিয়ে সাদি না হলেও এখন নাকি সুখেই আছে ওরা। পতিত চিঠি লিখলে কোনো মাসে পাঁচ সাত টাকা লোক-মারফৎ পাঠিয়েও থাকে। গাঁ-মুখো হয় না।

হুসনাবাদ গাঁয়ের এই ভাঙ্গাচোরা মাটির বাড়িটা তার পৈতৃক। এখন চালে খড় নেই, জানালায় কাঠ নেই, পাল্লায় পেরেক ঠুকে পুরনো টিন লাগানো। রাস্তার দিকে একদা কোমর-সমান মাটির পাঁচিল ছিল। এখন আর আব্রু বলতে নেই। সারবন্দী কলা পেঁপে সজনে গাছের দেয়াল তুলে বাড়ির বউ ও উঠতি মেয়েগুলোর ইজ্জৎ বাঁচানোর চেষ্টা।

ঘটনার দিন পতিত সবে ভাত খেয়েছে।

পর পর সাত দিন জ্বর ও রক্ত-আমাশা রোগে শয্যাশায়ী ছিল। সেই সঙ্গে সর্দিকাশি হাঁপানির টানে প্রায় মর মর অবস্থা। গেল অমাবস্যায় ধানমাঠে মিত্তিরদের পুকুরে চুরি করে মাছ ধরতে গিয়েছিল। সঙ্গে ছিল আবগারী অফিসের পিওন হরলাল। সারারাত দু'জনে জাল টেনেছে। বুকজলেও নামতে হয়েছে কয়েকবার। ভোর রাতে সের আড়াই রুই কাতলার চকচকে পোনা নিয়ে বাড়ি ঢুকেছে। কিন্তু সেই মাছ ভাল করে খেতেই পারল না পতিত। এক বেলাতেই ওর পেট ছুটল। তারপর চোখ মুখ লাল হয়ে বিষম জ্বর। হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে শয্যা নিল পতিত। ঘরেই মাটির হাঁড়িতে ঘন ঘন পায়খানা যেতে শুরু করল। সেই হাঁড়ি ধুয়ে সাফসুফ করতে করতে নয়নতারা চাপাগলায় গজরাল, 'খালভরা, যমেরও অরুচি! বুড়া কালে গেলি কিনা মাছ চুরি করতে! ঝাঁটা মারি তোর নোলার মুখে—'

পতিত চিঁ চিঁ করে শাসাল, 'এই-ও মাগী! মুখ সামলে। মিত্তিররা শুনতে পেলে এখুনি পিঠের চামড়া তুলে নেবে।'

নয়নতারা বলল, 'নিক তুলে! নেওয়াই উচিত তোমার! আমি বলছি ডেকে সবাইকে—'

পতিত ঘাবড়ে গিয়ে অনুনয়ের ভঙ্গিতে বলল, 'এইবার চুপ যা ন্যাপলার মা! চুপ যা।'

বিকেলের দিকে হরলাল এল খোঁজখবর করতে। নয়নতারা তাকেও কড়া করে দু'কথা শুনিয়ে দিল। পতিত লজ্জা পেয়ে বলল, 'মাগীটার মেজাজ বড় চড়া! তুই যেন রাগ করিস না হরু।'

হরলাল হেসে বলল, 'আমার বউটাও ওমনি বটে!'

পতিত হাঁপানির টান সামলাতে সামলাতে বলল, 'বাপঠাকুদ্দার আমলে ওই পুকুরটা ত আমাদেরই ছিল রে। শালা মিত্তিররা দেনার দায়ে লিখে নিলে—'

গাঁয়ের হোমিওপ্যাথ সাতপুরিয়া অষুধ দিয়ে আট আনা দাম নিল। সাতদিন শুধু বার্লির জল খেয়ে কাটাল পতিত। এর মধ্যে একদিন অফিস থেকে ভুবন এসে বলে গেল, 'তোমার আর চাকরি থাকবে না পতিতদা! কাল ডি. আই সাহেব বলছিল—'

পতিত প্রায় কেঁদে মিনতি করল, 'কাল আমি ঠিক যাব ভুবন। তুই বড়বাবুকে বলিস, সাহেবকে যেন একটু মানিয়ে রাখে—'

ভুবন বলল, 'বড়বাবুকে বলেও কিছু হবে না পতিতদা, বছরে পাঁচ মাস তুমি কামাই দাও। তোমার উপর শালার সাহেব দারুণ বিগড়েছে—'

পতিত বলল, 'তাহলে কি হবে ভুবন! আমি যে আজও ছ'বার পায়খানা গেছি—'

ভুবন গম্ভীর হয়ে বলল, 'আচ্ছা, বলে দেখব বড়বাবুকে!'

সে চলে গেলে খুব ম্রিয়মাণ বিমর্ষ অবস্থায় শুয়ে থেকে ধুঁকতে লাগল পতিত। এই ক'টা কথা বলেই সে খুব কাতর হয়েছে। বুকের ভেতরটা ধক ধক করছে। তলপেটে আমের ব্যথা।

বাইরের উঠোনে তখন নয়নতারার সঙ্গে ন্যাপলার তুমুল ঝগড়া চলছে। তার কিছু কিছু শুনতে পাচ্ছে পতিত। নয়নতারা বলছে, 'কাল মালিকের কাছে পাঁচটা টাকা আনতে বলেছিলাম, কি হ'ল ?'

ন্যাপলা বলছে, 'পাওনা নেই।'

'নেই কেন রে খালভরা। এই মাসের মাইনেটা কি উড়ে গেল!'

'নিয়ে নিয়েছি।'

'নিয়ে কি করেছিস ? সেই গেট্‌কীপারের মেয়েটার গভ্যে ঢেলেছিস বুঝি!'

'বেশ করেছি! তোর কিরে হারামজাদি! আমি তোদের খাই না পরি?'

নয়নতারা চিৎকার করে উঠল, 'তবে এ বাড়ি ঢুকিস কোন্ মুখে ? না এলেই পারিস!'

'আর আসব না।'

দুপদাপ শব্দে বাড়ি কাঁপিয়ে ন্যাপলা শিস্ দিতে দিতে চলে গেল। পতিতপাবন মস্তবড় হাঁ করে দম টানল। শালার ছেলে লায়েক হয়েছে। মেয়েমানুষের জন্য গায়েগতরে গরম ধরতে শুরু করেছে। বুড়ো বাপটা না খেয়ে মরলেও হুঁস হয় না। শালা বেইমান, বজ্জাতের ধাড়ি।

অনেক কষ্টে গলা তুলে ন্যাপলার মাকে ডাকল। গাছ থেকে গোটা দুই পেঁপে আর একটা কলার মোচা কেটে গোপালের হাত দিয়ে বড়বাবুর বাড়ি পাঠিয়ে দিতে বলল। যদি দয়া করে বড়বাবু মজুমদার-সাহেবকে একটু মানিয়ে রাখেন!

দিন দুই পরে জ্বরজারি একটু কমল পতিতের। গাঁয়ের হোমিও-প্যাথ বলল, 'কাল চাট্টি ভাত দিও ন্যাপলার মা। সেরেফ কাঁচকলা সেদ্ধ আর হেলেঞ্চার ঝোল—'

সকালে উঠেই পতিত বলল, 'আমি আজ অপিসে যাব গো।'

নয়নতারা বুকেপিঠে হাত ঠেকিয়ে বলল, 'জ্বর আর নাই। কিন্তু দুব্‌লা শরীলে অতখানি পথ হাঁটতে পারবে কি?'

পণ্ডিত বলল, 'না পারলে চলবে না ন্যাপলার মা। আজ মাস পয়লা, মাইনে হবে।'

কথা বলতে বলতে বিছানা থেকে নামল পণ্ডিত। সরু বাঁশের মত লম্বা পা-দুটো নিয়ে অল্পকাল দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর ডান পা'টা আস্তে আস্তে তুলে ধপাস্ করে মাটিতে ফেলল। বাঁ পা'টা টেনে তুলল। হাত দুটো দেয়ালের দিকে ছড়িয়ে রেখে একটু আগোছালো এলোমেলো ভঙ্গিতে কাঁপা কাঁপা পা ফেলে কয়েকবার পায়চারি করল। ওর লম্বা রুক্ষ শরীর, ঠেলে-ওঠা চোয়াল, কটকটে দৃশ্যমান কণ্ঠা ও বুকের হাড়-পাঁজরা চলার তালে থর থর করে কেঁপে উঠছিল। দেখে মনে হচ্ছিল, ভারশূন্য শরীর নিয়ে কিভাবে চলা-ফেরা করতে হয় পণ্ডিত তার মহড়া দিচ্ছে।

একটুপরেই অসম্ভব ক্লান্ত হয়ে বিছানায় বসে পড়ল পণ্ডিত। জিভ দিয়ে শুকনো আমসির মত ঠোঁট চাটতে চাটতে বলল, 'খুব খেতে পারব ন্যাপলার মা। তুমি চাট্টি ভাত রাঁধো—'

নয়নতারা বলল, 'সে আমি চাপিয়ে দিয়েছি। তুমি মাথা ধুয়ে নাও—'

তারপর প্রায় ঘণ্টাকালের পরিশ্রমে ও যত্নে ন্যাপলার মা ও ন্যাপলার বোনেরা ঘষামাজা করে পণ্ডিতকে এতদূর পথ যাওয়ার উপযোগী করে তুলল। আজ মাসের পয়লা তারিখ। পণ্ডিত আজ মাইনে পাবে। এই কথাটা সকলেরই মনে ছিল।

মেজ মেয়ে বিন্দু গরম তেল এনে পণ্ডিতের বুকের খাঁচায়, পায়ের পাতায় ও হাতের তেলোতে ঘষে দিল। তার ছোট মেয়ে পুঁটি এক ঘটি গরম জল এনে গামছা ভিজিয়ে সারা শরীর মুছে দিল। কাজে বেরুবার আগে গোপাল গাছ থেকে পেঁপে আর কাঁচকলা কেটে দিল। সকলের ছোট শিবু একদৌড়ে নান্টু ঘোষের কুয়োতলা থেকে থানকুনি পাতা তুলে আনল। ন্যাপলার অভাবে এ বেলা পুকুর থেকে হেলেঞ্চা তোলা গেল না বলে নয়নতারা গজগজ করতে লাগল।

ভাত খেতে বসে পণ্ডিত বলল, 'নাককাটার দোকান থেকে পাঁচ-

পয়সার বিড়ি নিয়ে আয় দেখি শিবু।' শিবু চলে গেলে আবার কি মনে পড়ল। পঁুটিকে ডেকে বলল, 'দৌড়ে যা, একটা দেশলাইও নিয়ে আয়।'

নয়নতারা বলল, 'চাট্টি কম খাও দিকিনি। নাকেমুখে গিলচ যে।'

পতিত বলল, 'কিছু হবে না। তুমি আর এট্টু কলার ঝোল দাও!'

খাওয়া হয়ে গেলে ছেঁড়া গেঞ্জির উপর একটা মোটা সূতির জামা গায়ে দিল পতিত। পরণের খাটো ধুতিখানা টেনেটুনে ঠিক করল। নয়নতারা সব কেচেকুচে রেখেছিল। এখন ফর্সা ধুতি ও জামায় পতিতপাবনকে দিব্যি বাবু বাবু দেখাল। বিন্দু একটা দাঁতভাঙ্গা চিরুণি দিয়ে বলল, 'মাথাটা একটু আঁচড়ে নাও বাবা।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' বলে কদমছাঁট মাথায় দু'বার চিরুণি চালাল পতিত। তেল ছাড়া রুক্ষ চুলগুলো সজারুর কাঁটার মত খাড়া হয়ে থাকল।

ভাঙ্গা চৌকিটায় চুপ করে একটু বসল পতিত। নাকেমুখে গরমভাত গিলে সে এখন দরদর করে ঘামছিল। পোয়াতি বউয়ের মতো পেটটা ভার ভার। বসে আরো একগ্লাস জল খেল। নয়নতারার হুকুমমতো বিন্দু একটা ঝিনুকের বোতাম এনে গলার কাছে লাগাতে শুরু করল। পতিত সূঁচ বাঁচিয়ে ঘাড়টা উটের মতো খড়ের চালার দিকে উঁচিয়ে রাখল।

ন্যাপলার মা বলল, 'সন্ঝেকালে যখন ফিরবে সব বোতাম এঁটে আসবে।'

পতিত বলল, 'আচ্ছা।'

'পথে কেলান্তি লাগলে কোথাও বসে খানিক জিরিয়ে নেবে।'

'আচ্ছা।'

'একদাগ ওষুধ থাকল পকেটে, সূয্যি পচ্চিমে হেললে খেয়ে নেবে।'

'আচ্ছা।'

'ঠোঙ্গায় চাট্টি মুড়ি দিয়েছি। দুপুরে জল দিয়ে ভিজিয়ে খাবে।'

'আচ্ছা গো, আচ্ছা।'

খুব খুশি হয়ে উঠে দাঁড়াল পতিত। এই মুহূর্তে নয়নতারাকে তার অসম্ভব ভাল লাগল। আজ সবাই তার জন্য কেমন ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। তার সুখ-সুবিধার দিকে খুঁটিয়ে নজর রাখছে। পতিতের মনটা আবেগে দুলে উঠল। শুধু ন্যাপলাটা যদি বাপ বলে একটু মানত! ঘর সংসারের দিকে একটু নজর দিত! শালা হারামির বাচ্চা, বেইমান! গেটকীপারের ওই কালো নাকবোঁচা মেয়েটার সঙ্গে সে কিছুতেই বিয়ে দেবে না ন্যাপলার।

শতচ্ছিদ্র বাঁট-ভাঙ্গা ছাতাটা মুঠোয় ধরে বেরুবার জন্য তৈরি হ'ল পতিত। টায়ারের চটিটা পায়ে গলিয়ে বলল, 'আমি তাহলে যাচ্ছি ন্যাপলার মা।'

নয়নতারা বলল, 'সাহেবকে বলে আর দু'দিন ছুটি লিখিয়ে এনো। বলবে, গায়ে গতরে বল নাই, চলতে ফিরতে ভির্মি লাগে।'

পতিত কিছু বলল না। ডাইনেবাঁয়ে মাথা দুলিয়ে ছাতা খুলে গাঁয়ের পথে পা দিল। এখন দেড়ক্রোশ পথ হাঁটতে হবে তাকে।

সংবাদে প্রকাশ, কেপকেনেডির মহাকাশকেন্দ্র থেকে নভশ্চরদ্বয় মহাশূন্যে পাড়ি দেবার আগে ভূপৃষ্ঠে নির্মিত একটি কৃত্রিম চন্দ্রলোকে চলাফেরার মহড়া দিয়েছিলেন এবং বায়ুশূন্য এলাকায় ভারহীন দেহ নিয়ে কিভাবে লাফিয়ে চলতে হয় তাও রপ্ত করেছিলেন। একই সঙ্গে যন্ত্রের সাহায্যে চন্দ্রপৃষ্ঠে মাটি খুঁড়বার পদ্ধতিও তাঁরা বুঝে নিয়েছিলেন। অতঃপর 'এ্যাপেলো একাদশ' মহাযানটিতে আবদ্ধ হবার সময় তাঁদের সঙ্গে প্রচুর পরিমাণে ওষুধপত্র এবং রকমারি ফলের ও মাংসের জুস টিউবে ভরে দেওয়া হয়েছিল। এই বাবদ মহান আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কি পরিমাণ খরচ হয়েছিল জাতীয়তাবাদী আনন্দবাজারে তার উল্লেখ নেই। অনুমান, হাজার দশেক ডলার!

সংবাদে আরো প্রকাশ, হাউসষ্টোন থেকে চন্দ্রযান আকাশে উৎক্ষিপ্ত হবার সময় লক্ষ লক্ষ আমেরিকান-নাগরিক নভোচারীদের হাত নেড়ে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়েছিল এবং কয়েক সহস্র ক্যামেরায়

ক্রমাগত কয়েক লক্ষ ছবি উঠেছিল। তারপর নভোচারীরা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে কি একটা শান্তি-টান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে মিনিটে পনেরো কোটি ডলার খরচ করতে করতে চন্দ্রলোকে অভিযান করেছিলেন।

পতিতপাবনের এক পকেটে বিড়ি দেশলাই, অন্য পকেটে এক আনা মূল্যের একপুরিয়া হোমিওপ্যাথ ওষুধ ও ছয়পয়সার আন্দাজ এক ঠোঙা মুড়ি, সে স্কুলবোর্ড অফিসে যাচ্ছিল মাসপয়লার বেতন আনতে। উঠোনে দাঁড়িয়ে যতক্ষণ দেখা যায়, একমাত্র ন্যাপলার মা বিমর্ষ ভঙ্গিতে তাকে দেখছিল।

তখন বেলা আটটা ন'টা হবে। রোদ চড়চড়িয়ে উঠেছে আকাশে। তালিমারা ছাতার ফুটো দিয়ে পতিতের চাঁদিতে রোদ ঠিকরে পড়ছে। ছাতাটা বার বার ঘুরিয়েও কোনো সুরাহা হচ্ছে না। চারদিকের বাতাসও গরম হয়ে উঠেছে।

গোড়ার দিকে হাঁটতে খুব কষ্ট হচ্ছিল পতিতের। পা টলছিল। শরীর কাঁপছিল। বুকের খাঁচা ধড়ফড় করছিল। উজ্জ্বল রৌদ্র পচা মাছের পিঠের মত ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল। কিন্তু কিছুক্ষণ হাঁটবার পর জোর পেল পতিত। হাত পা বুকের হাড় স্থির, শক্ত, স্বাভাবিক হ'ল। শরীরের ভেতরে একটা অদৃশ্য শক্তি কাজ করতে শুরু করল এবং সেই শক্তিই ঠেলেঠুলে পতিতকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। নিজের চেষ্টায় আর কিছু করতে হ'ল না, হাঁটার ঝোঁকেই অতঃপর সে হাঁটতে লাগল।

শুধু মাঝে মাঝে চোখ তুলে সে যখন আকাশ মাটি পীচের রাস্তা, রাস্তার দু'পাশে গাছপালা, মাঠে সবুজ ধান আর ঘাসে ঘাসে শালিক চড়ুই কি গঙ্গাফরিঙ দেখছিল তখন ওর মনে হচ্ছিল সবকিছুই ন্যাপলার মার স্যাৎলা-পড়া দাঁতের মতো এমন ঘোলাটে হলুদবর্ণ কেন! ধানমাঠে এমন কালো কালো অন্ধকার গর্তগুলো কোথা থেকে এল। এত কাছের জিনিষটাকেই বা এমন দূরের আর

ঝাপসা লাগছে কেন। ওটা কি উড়ে গেল? বক না সারস? নাকি বাদামি রঙের একটা ছাগল চরছে? ক'দিনের জ্বর-আমাশায় আমার চোখদুটো বুঝি খারাপ হয়ে গেল।

নতুন হাসপাতালের কাছে পৌঁছে সার সার রিক্সা দেখল পতিত। কিন্তু তার পকেটে মোটে পাঁচ পয়সা। এখান থেকে চাপলেও ভাড়া নেবে আট আনা। আগে চার পাঁচ আনা ছিল। তখনও কোনো-দিন চাপে নি পতিত। আর এ জীবনে বিয়ের দিন ছাড়া কবে যে রিক্সা চেপেছে মনেই করতে পারে না।

নাকি বছর তিনেক আগে আর একবার চেপেছিল? সেই যখন নতুন হাসপাতালটা তৈরি হ'ল এখানে? সেবার ন্যাপলার মা'র পেটে ব্যথা উঠল। সাত মাসেই ব্যথা। গাঁয়ের ধাই বলল, 'ইবার মনে হচ্ছে গবেবাপাত হবে।' রক্তের ডেলায় পরণের কাপড় ভিজে উঠতে লাগল। তাড়াতাড়ি রিক্সা ডেকে বৌকে পতিত হাসপাতালে আনল। চার আনা মোটে ভাড়া, তাও একদিন সময় না নিয়ে মেটাতে পারল না পতিত। ফেরার সময় ন্যাপলার মাকে হাঁটিয়ে নিয়ে এল।

রিক্সাগুলো দেখতে দেখতে নতুন হাসপাতাল পার হয়ে ডান দিকে বাঁক নিল পতিত। নবনীধর হাইস্কুলের সামনে এসে একটা পান খাবার ইচ্ছে হ'ল। কেমন বমি বমি বোধ হচ্ছে। সারা মুখটা তেতো, বিস্বাদ। অম্বলের চোঁয়া ঢেকুর থেকে থেকে বুকের খাঁচায় ধাক্কা মারছে। খাবলিয়ে অতগুলো ভাত না খেলেই ভাল হ'ত। এখন উদরে ভাতগুলো যেন লোহার শলার মত নড়েচড়ে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু পান কেনার জন্য থামল না পতিত। কেননা ওর মনে হ'ল একবার থামলে আর চলতে পারবে না। যে টানে ছুটছে সেই টানটা ছিঁড়ে যাবে। তাহলেই হুমড়ি খেয়ে পড়বে মাটিতে। আর কিছুতেই উঠতে পারবে না।

নেশাগ্রস্তের মতো অবশ বোধহীন পা ফেলে এগুতে লাগল

পতিত। ছাতার ডাঁটিটা হাতের মুঠোয় শিথিল হয়ে আসতে লাগল। ঘাড়ে গলায় ঘাম জমতে শুরু করল। টায়ারের চটিটাও ভারি বলে মনে হ'ল। লম্বা শরীর সামনের দিকে অনেকখানি ঝুঁকে পড়ল।

ক্রমে দু'পাশের বাড়িঘর রোদ আকাশ আরো ঝাপসা হয়ে এল। অনেক উঁচু থেকে তাকালে যেমন হয়, পতিতের কাছে মানুষজন গাড়িঘোড়া তেমনি সুদূরবর্তী ও ছোট ছোট মনে হ'ল। জামার হাতায় একসময় কপালের ঘাম মুছল। জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটল। তারপর গতি আরো দ্রুততর করল। আজ সময়মত তাকে অফিসে পৌঁছতেই হবে।

এক নাগাড়ে আধঘণ্টা হেঁটে কাছারিতলায় পৌঁছল পতিত। ঘাড় উঁচু করে কালেকটরির বড় দেয়ালঘড়িতে সময় দেখতে চাইল। কিন্তু কাঁটাদুটো জড়াজড়ি করে ঠিক কোন্ ঘরে যে আছে তা আজ কিছুতেই বুঝতে পারল না। এখনও অর্ধেকটা পথ বাকি।

পতিতপাবন হাঁ করে দম টানল। তার অসম্ভব জল পিপাসা পেয়েছে। বুকের ভেতরটা শুকিয়ে কাঠ! তালু শুকিয়ে শ্বাসনলী বুজে আসছে। এইবেলা একটু জল না খেয়ে নিলে সে আর এক পাও হাঁটতে পারবে না।

বাসস্ট্যাণ্ড পার হয়ে বটতলায় এসে দাঁড়াল পতিত। গাঁয়ের সাধু ঘোষ দোকান দিয়েছে এখানে। বটতলায় জোড়া বেঞ্চি পাতা। পতিতপাবন দাঁড়িয়ে পড়া মাত্র থরথরিয়ে কেঁপে উঠল। তারপর বুকের বাঁ দিকটা শক্ত থাবায় খামচে ধরে বেঞ্চিতে ধপ করে বসে পড়ল।

কোর্ট কাছারির কাজ তখনও শুরু হয় নি। সাধু দোকান গোছ-গাছ করছিল। পতিতকে দেখে বলল, 'বড় কাহিল দেখছি যে গো, মামা!'

পতিতপাবন কুকুরের মত জিভ ঝুলিয়ে শ্বাস টানছিল। কোনো রকমে বলল, 'এট্টু জল দিতে বল্ সাধু।' সাধু দোকানের বাচ্চা

ছেলেটাকে ডেকে জল দিতে বলল। খবরের কাগজখানা হাতে নিয়ে নিজে এসে বসল গদীতে। সাধুর কাঁচের আলমারিতে খয়েরি রঙের পান্তুয়া এবং সাদা পদ্মকুঁড়ির মত বড় বড় রসোগোল্লা গামলাভর্তি রসে হৃষ্টপুষ্টভাবে ভাসমান দেখতে দেখতে পতিতপাবন ঢক ঢক করে দু'গ্রাস জল খেল। তারপর জামার হাতায় মুখ মুছতে মুছতে বলল, 'বড় ভুগলাম। কিছু ত আর খোঁজ রাখিস না তোরা।'

সাধু বলল, 'থাকি কখন গাঁয়ে যে খোঁজখপর করব। অষ্টপহর এই দোকানের ঝামেলা—'

পতিতপাবন একটা বিড়ি ধরিয়ে নিল, 'তুই নাকি ঘোষালদের কাছে জমি কিনছিস সাধু?'

সাধুচরণ গম্ভীর হয়ে বলল, 'না, এখনও কিছু ঠিক হয় নি।'

'কিনলে দলিলপর্চা এট্টু দেখে কিনিস।'

'সে ত একশবার! আমাকে ঠকানো এত সহজ না মামা!'

পতিতপাবন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'আমার পাঁচ বিঘা জমি-পুকুর বাপের আমলে মিত্তিরদের ঘরে ঢুকে গেল। এখন বুড়ো বয়সে আমার দুটো ভাত জোটে নারে সাধু—'

সাধু হঠাৎ বলল, 'তোমার ন্যাপলার ওপর একটু নজর দাও মামা।'

'কেন, কি করেছে শালা?' চোখমুখ শক্ত করে পতিতপাবন রেগে উঠল, 'শালাকে আমি বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেব।'

সাধুচরণ বলল, 'সেদিন সিনেমাহলে কোন্ মেয়েছেলের চুল ধরে টানছিল। বেদম মার খেয়েছে।'

'কারা মেরেছে?'

'আবার কারা, ওই পাঁচ পাবলিক।'

'বেশ করেছে। শালাকে থানায় দেয় নি কেন—'

খুব রেগে চেঁচিয়ে বলল পতিত। আর এই সামান্য উত্তেজনাতেই ওর রোগা দুর্বল শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল। চোয়াল ও কণ্ঠা ঠেলে উঠল। ঠোঁট ফাঁক হয়ে মাড়ি বেরিয়ে পড়ল। দুই হাতের থাবা দুই দিকে ছড়িয়ে বেঞ্চির ওপর ভর রেখে উঠে দাঁড়াল।

আর দেরি করা চলে না। আবার হাঁটতে হবে।

সাধু ততক্ষণ একটা চিরুণি বের করে চুল আঁচড়ে নিয়েছে। খবরের কাগজটা উল্টেপাল্টে মন দিয়ে কি একটা ছবি দেখছে। একসময় নিজের মনেই বলে উঠল, 'শালার মানুষ চাঁদে চলে গেল গো মামা! কি তাজ্জব কাণ্ড—'

কিন্তু সে কথা পতিতের কানে গেল না। সে ততক্ষণে ছাতাটা খুলে সামান্য এগিয়ে গেছে। মোরাম ঢাকা রাস্তার দু'পাশে বট আর শিমুলের গাছ। গুঁড়িগুলো গোল করে সিমেণ্ট দিয়ে বাঁধানো। গাছের ছায়া পড়েছে বলে রাস্তা তেমন গরম হয়ে উঠতে পারে নি। পতিতপাবন খুব আস্তে আস্তে পা ফেলে এগুচ্ছিল। এখন ওর সারা শরীর অসম্ভব ভারি ঠেকছিল। চুলদাড়ি বেয়ে টপটপ করে ঘাম ঝরছিল। পেটের মধ্যে কেমন গুমগুম শব্দ। মাটিতে পা ফেলার সময় কি একটা কষ্ট থেকে থেকে হৃদ্‌পিণ্ড খামচে ধরছে। কোথাও শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে পতিতের। বটের ঘনছায়ায় কোনে একটা বাঁধানো চাতালে!

কিন্তু উপায় নেই। আজ যেমন করেই হোক দশটার আগে পৌঁছে যেতে হবে অফিসে। বড়সাহেবের হাতেপায়ে ধরে বুঝিয়ে বলতে হবে। সন্ধ্যাবেলা মাইনে নিয়ে বাড়ি ফিরলে শ্রীধরের দোকানে ধারবাকি মিটিয়ে চাল কেনা হবে। তারপর কাঁচকলা কি পেঁপে সেদ্ধ দিয়ে চাট্টি গরম ভাত।…কিন্তু ন্যাপলার মা রাতে কি ফের ভাত দেবে তাকে? নাকি সেই জলের মত ঠাণ্ডা বিস্বাদ বার্লি?

একটু ভাল হয়ে উঠলে হরলালের সঙ্গে আবার মাছ চুরি করতে যাবে সে। ওই পুকুরে একটা মাছও থাকতে দেবে না। তার বাপ ঠাকুর্দার আমলের পুকুর। মিত্তিররা ঠকিয়ে নিয়েছে। দরকার হলে মাছ মারার ওষুধ মিশিয়ে দিয়ে আসবে জলে।

সাধুর দোকানের পান্তুয়াগুলো কত বড় বড়! কি টকটকে রং! কত জানি দাম এক একটার। ন্যাপলাটা চা মিষ্টির দোকানে কাজ করে। মাঝেমধ্যে ভাইবোনগুলোর জন্য তো আনতে পারে দু'একটা।

কিন্তু শালা মানুষের পেটে শুয়োরের ছা। গেটকীপারেরর ওই নাক-বোঁচা মেয়েটাই ওর মাথা খেয়েছে। এবার কোন্‌দিন হাজতে গিয়ে পচবে! কিংবা পাঁচ-পাবলিকের পিটুনি খেয়ে মরবে।

কি জানি বলল সাধু? কে নাকি চাঁদে গেছে? কে গেছে? কোন্‌ দেশে? ন্যাপলাও সেদিন উঠোনে দাঁড়িয়ে গোপালকে কি যেন বলছিল। ওদের সিনেমায় চাঁদের ছবি দেখানো হয়। তাহলে সাধু ওই ছবির কথাই বলল বোধ হয়। বায়স্কোপের ছবিতে অনেক আজগুবি কাণ্ডকারখানা হয়। ছবির মানুষ চাঁদে কেন সূর্যেও যেতে পারে। যেখানে খুশি যাক। আমার কি তাতে! আমি অপিসে পৌঁছেই বড়সাহেবের পা জড়িয়ে বলব, 'বুড়োমানুষ আজ্ঞে, জ্বর গায়ে অতটা পথ যেতে আসতে কষ্ট হয়। এবারের মত ছুটিটা মঞ্জুর করে দেন হুজুর—'

বটশিমূলের ছায়া পার হয়ে ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরে এসে পড়ল পতিত, বাচ্চাছেলের প্রথম হাঁটাচলার মত এলোমেলো পা ফেলে। তারপর হঠাৎ—

একটা সরকারি জীপগাড়ি হর্ণ বাজিয়ে পাশ দিয়ে চলে গেল। পোড়া পেট্রোলের গন্ধ নাকে গেল পতিতের। একপাশে সরে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। তারপরই হঠাৎ শরীরটা ধনুকের মত বাঁকিয়ে তলপেট খামচে ধরে বমি করতে শুরু করল। ওর নাকমুখ দিয়ে হলুদবর্ণ পিচ্ছিল জলরাশির সঙ্গে গোটা গোটা ভাত বেরুতে লাগল। বমির ধাক্কায় হাড়পাঁজরা ঝন ঝন করে বাজতে শুরু করল। চোখের মণি সামনের দিকে ছিটকে এল।

পতিতের হাত থেকে ছাতাটা খসে পড়ল। বাতাসের ধাক্কায় গড়িয়ে গড়িয়ে নর্দমার ধারে গিয়ে স্থির হ'ল। টক টক গন্ধে চারপাশ ভরে উঠল। শিমূলের ডাল থেকে ক'টা কাক উড়ে এল। একটা রোম-ওঠা কুকুর লেজ দুলিয়ে পতিতের বমি ও মুখ দেখল।

পতিতপাবন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। দু'হাতের আঙ্গুল ছড়িয়ে মাটিতে ভর রেখে বসে পড়ল। তারপর হাত তুলে বুকের

খাঁচা শক্ত করে চেপে ধরে গড়িয়ে পড়ল। রাস্তার ধুলোবালি মিশ্রিত তরল বমির ওপর ওর মুখটা ছাল-ছাড়ানো শুয়োরের মুণ্ডুর মত কুৎসিতভাবে এপাশ ওপাশ নড়তে লাগল।

তারপর কয়েক মিনিট পার না হতেই দেখা গেল, পতিতের পঞ্চাশ-পার-হওয়া ক্ষুধাক্লিষ্ট রোগজীর্ণ শরীরটা একান্ত অসহায় ভঙ্গিতে কখনো কুঁকড়ে ছোট হয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে যাচ্ছে, কখনো বিকারের ভঙ্গিতে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে, আবার কখনো টান টান সোজা হয়ে স্থির নিশ্চল শক্ত হয়ে উঠছে। ওর ঠোঁট দুটো হাঁ করে শ্বাস টানতে চাইছে। চোখ উল্টে গেছে। গলা দিয়ে অদ্ভুত একধরণের শব্দ বেরুচ্ছে।

আরো দেখা গেল, পতিতপাবন মাথার দু'পাশে দুই শীর্ণ হাত ছড়িয়ে দিয়েছে এবং অস্থির ভঙ্গিতে সরু আঙ্গুলগুলো দিয়ে ক্রমাগত খামচে খামচে মাটি তুলছে। ওর নাকে মুখে কপালে কাদার দাগ লেগেছে।

কে একজন পথচারী এইসময় জল আনতে ছুটল। একজন এগিয়ে এসে পতিতের বুকে হাত রাখল। অন্যজন নাকে রুমাল চাপা দিয়ে বলে উঠল, 'এক্ষুনি হাসপাতালে খবর দাও। চাদ্দিকে কলেরা হচ্ছে—'

একজন রিক্সাওলা বলল, 'আমার গাড়িতে তুলে দেন বাবু। আমি দিয়ে আসি।'

মোটাসোটা এক উকীলবাবু দেখেশুনে একগাদা থুতু ফেলে কোর্টের দিকে ছুটে চলে গেলেন।

আর পতিতপাবন সাঁড়াশির মত আঙ্গুল বাঁকিয়ে খামচে খামচে অনেক মাটি তুলল। পায়ের কাছটা নখ দিয়ে খুঁচিয়ে গর্ত করে ফেলল। বারকয়েক বিড় বিড় করে কি যেন বলল। তারপর বরফের মত স্থির শক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। শুধু ওর ডানহাতের মুঠোয় অনেকখানি মাটি ধরা রইল।

মানবজাতি শুনল, আমেরিকার কেপকেনেডিস্থিত মহাকাশ

গবেষণাকেন্দ্র থেকে বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করেছেন, মিনিটে ১৫ কোটি ডলার খরচ করে কি একটা শান্তি-টান্তির কারণে নভশ্চরদ্বয় চন্দ্রলোক থেকে যে-মাটি পৃথিবীতে বহন করে আনছেন তার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণের দ্বারা এই পৃথিবীর যাবতীয় জন্মরহস্য উদ্ঘাটিত হবে।

মানবজাতি আরো শুনল, এই মাটি বিশ্লেষণের দ্বারা চন্দ্রজগতের তাবৎ রহস্যও উদ্ঘাটিত হবে।

সারা বিশ্বের বিজ্ঞানীরা একটুখানি চাঁদের মাটির জন্য উদ্গ্রীব হয়ে রইল।

পতিতপাবনের হস্তধৃত মাটি এইসময় যদি কেউ পরীক্ষা করত তাহলে শক্ত ও ঠাণ্ডা ওই মাটির ডেলাটুকুতে একটি অপরিপুষ্ট দেহের মৃত্যুকালীন যন্ত্রণাবোধের নানাবিধ কম্পন, কুঞ্চন ও প্রসারণজনিত এমনসব বিচিত্র রেখা এবং জীবিতকালীন লোভ, আকাঙ্ক্ষা ও ক্রোধের এমনসব বিচিত্র স্তরবিন্যাস দৃষ্টিগোচর হ'ত—যা কিনা অতিশয় অদ্ভুত, অত্যাশ্চর্য।

কিন্তু এই মাটি পরীক্ষার জন্য কেপকেনেডির মহাকাশকেন্দ্রে একজন বিজ্ঞানীও নেই!

শোভনের জন্য বিজ্ঞাপন

আপনারা যদি কেউ শোভন নামে সেই ছেলেটির দেখা পান অথবা সে জীবিত কি মৃত এই খবরটুকুও পান তাহলে দয়া করে আমার ঠিকানায় জানাবেন। সে আমার ছোট ভাই, আজ পাঁচ মাস তার কোনো খোঁজ নেই।

পাঁচ মাস আগে কি একটা সম্মেলনে যোগ দেবার জন্য নীলরঙের ঝোলা কাঁধে সে আমাদের পঁচিশের এক সুভাষপল্লী, নৈহাটির বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল। তার পরণে ছিল পাজামা আর হ্যাণ্ডলুমের খাটো কলারের পাঞ্জাবি, পায়ে ছিল সাধারণ চটিজুতো। পাঞ্জাবির রং ছিল গেরুয়া, জুতোর লাল। পকেটে একটা কালোরঙের সস্তা কলমও গোঁজা ছিল।

বেরুবার সময় মা তাকে নিষেধ করেছিলেন। কেননা ক'দিন আগেই সে জ্বর থেকে উঠেছিল। তার শরীর দুর্বল ছিল, মুখটা শুকনো দেখাচ্ছিল। সে নিষেধ শোনেনি।

বৌদি অর্থাৎ আমার স্ত্রী রমার কাছে সে দুটো টাকা চেয়েছিল। বলেছিল, সম্মেলন থেকে ফিরেই দিয়ে দেবে।

টাকা ফেরতের কথায় আমার স্ত্রী ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিল, 'তুমি চাকরি করতে যাচ্ছ নাকি ঠাকুরপো যে মাইনে নিয়ে ফিরবে ?'

এতে শোভন হয়তো সামান্য আহত হয়েছিল। কেননা তার সত্যি কোনো কাজ ছিল না। তিন বছরের উপর বি.এ পাশ করে সে চাকরির জন্য ঘোরাঘুরি করছিল। অভাবের সংসার বলে আর পড়াতে পারি নি। আমিও তার জন্য একটা চাকরি খুঁজছিলাম।

বৌদির কথায় মুখ কালো করে সে বলেছিল, 'থাক দিতে হবে না। তোমার কাছে চাওয়াই ভুল হয়েছে।'

রমা বলেছিল, 'ভুল তো ঠিকই। জান না আজ মাসের কত তারিখ?'

'জানি, জানি।' বলে ঝোলাটা কাঁধে নিয়ে শোভন রাস্তায় নেমে পড়েছিল।

রমা দরজা পর্যন্ত এগিয়ে এসে বলেছিল, 'কবে ফিরবে বলে যাও।'

হন্ হন্ করে রাস্তা হাঁটতে হাঁটতে রাগী গলায় চেঁচিয়ে সে জবাব দিয়েছিল, 'আর ফিরব না।'

আর ফেরে নি।

এখন জীবিত বা মৃত যে কোনো অবস্থায় আমরা তাকে খুঁজছি।

প্রথম দিকে আমরা বিচলিত হই নি। কারণ ওর স্বভাবটা সম্প্রতি এইরকমই দাঁড়িয়েছিল। প্রায়ই ডুব মারত বাড়ি থেকে। চার পাঁচ ছয় দিন খোঁজ থাকত না। মা ঘরবার করতেন। রমা রান্না করে ভাত নিয়ে বসে থাকত। আমার বড় ছেলে স্বপন পাড়া ঘুরে খবর আনতে যেত। আমি মনে মনে অসন্তুষ্ট হতাম। সব মিলিয়ে আমাদের অভাবের সংসারে অশান্তি দানা বেঁধে উঠত। বাড়ি ফিরলে মা বকাঝকা করতেন। রমা অনুযোগ করত। কিন্তু শোভন তেমন গ্রাহ্য করত মনে হয় না। রমা যদি বলত, 'তুমি আর ছোটটি নেই ঠাকুরপো। এখন তোমার দায়িত্বজ্ঞান হওয়া উচিত।'

শোভন বলত, 'অভাবটা কি দেখলে?'

'কেন? এই যে তুমি সাতদিন ডুব মারলে, সংসারের রেশন কে তোলে? বাজার কে করে? কয়লা আনে? ইলেকট্রিকের বিল দেয়?'

'কিছু ত অচল থাকছে না, হচ্ছে তো সব ঠিক ঠিক।'

'সে তো আমি বউমানুষ বাইরে বেরুচ্ছি বলে। তাতে কি তোমাদের সম্মান বাড়ছে?'

'অসম্মানটা কোথায়? আমি তো তোমাকে বাইরেই নিয়ে যেতে চাই বৌদি। মিছিলে, মিটিঙে, ময়দানে—'

'ওসব নাটুকেপনা রাখ। এটা তোমাদের স্টেজ না!'

রাগ করে উঠে যেত রমা। তিন চার দিন মুখ ভার করে থাকত। কথা বলত না ভাল করে। শোভনকেও কিছুটা মনমরা দেখাত।

তিন

আমার রেলের চাকরি। কখনো দিনে ডিউটি কখনো রাত্তে। কখনো বদলি খাটার জন্য বাইরেও যেতে হত। সংসারের কাজকর্ম দেখার সময় ছিল না আমার। সব দায়দায়িত্ব ছিল রমার উপর। মাইনে আর ওভারটাইমের টাকা ওর হাতে তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকতাম। তার কতটা দুধে খরচ হবে, কতটা জলে—রমা হিসাব রাখত। আমি আমার চাকরি নিয়ে ব্যস্ত থাকতাম।

কিন্তু শোভন আমাকে ভাবিয়ে তুলেছিল।

'এত ঘন ঘন কোথায় যায় ও? কি কাজ?' —আমি রমাকে জিজ্ঞেস করতাম।

'আমি কি জানি!' রমা বিরক্ত হয়ে উত্তর দিত।

'জান না? বলে যায় না তোমাকে?'

'সব সময় বলে না।'

'আশ্চর্য তো। ওর যা ইচ্ছে তাই করছে। এটা কি হোটেল নাকি, যখন খুশি আসবে যাবে খাবে শোবে—'

আমার রাগ দেখে রমা থমকে যেত। কি ভাবত। তারপর শোভনের হয়ে কৈফিয়ৎ দেওয়ার সুরে বলত, 'একটা দল আছে ওদের। নাটক করতে বাইরে যায়।'

'নাটক?' আমি অবাক হতাম, 'শোভন নাটক করে? কতদিন করছে এসব?'

'অনেকদিন।'

'বাইরে যায় কেন? পয়সাকড়ি কিছু পায়?'

'না বোধ হয়।'

'তাহলে?'

'প্রচারের জন্য।'

'কি প্রচার?'

'মানুষের দুঃখকষ্টের কথা, অভাবের কথা। আমি কি অতশত বুঝি? শোভনকে জিজ্ঞেস করো তুমি!'

'ঠিক আছে। আমি দেখছি—'

চার

শোভনের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি ওকে বকতে পারতাম না। মনে হ'ত ওর বুকের ভিতর একটা কষ্ট আছে। সেটা চাকরি না পাওয়ার কষ্ট হওয়াই সম্ভব। একজন বয়স্ক উপার্জনক্ষম মানুষ কতদিন বেকার বসে থাকতে পারে। কতদিন অন্যের উপার্জনের অর্থে গ্রাসাচ্ছাদন চালাতে পারে। তার সঙ্কোচ হওয়া স্বাভাবিক। মনে একটা হীনমন্যতা আসাও অসম্ভব না। শোভন কি এইজন্যই বাইরে বাইরে থাকতে চায়?

কড়া করে ধমক দেওয়ার বদলে আমি সুর নরম করে বলতাম, 'যখন যেখানে যাস, মা কিংবা বৌদিকে বলে যাস না কেন?'

শোভন অপরাধীর মত মাথা নীচু করে বলত, 'এবারেই দেরি হয়ে গেল।'

ওর এই বিনীত ভাবটা আমাকে খুশি করত। আমি একটু থেমে বলতাম, 'দত্তসাহেব আশা দিয়েছেন, রেলের চাকরিটা হতে পারে।'

শোভন বলত, 'সবাই আশা দেয়, কেউ কাজ দেয় না।'

'সেটা ঠিক। কাজের বড় টানাটানি। সবাই হন্যে হয়ে ঘুরছে—'

'আরো বাড়বে!'

'বাড়বে?'

'হ্যাঁ, এখন পশ্চিম বাংলায় ৫৪ লক্ষ বেকার। ফোর্থ প্ল্যানের শেষে ১ কোটি দাঁড়াবে। এটা সরকারী হিসাব!'

'তাহলে প্ল্যান করে কি উপকারটা হচ্ছে?'

'কিছুই না। গরীব আরো গরীব হচ্ছে, বড়লোক আরো বড়লোক—'

শুনে আমি শোভনের মুখের দিকে তাকাতাম। ফোর্থ প্ল্যানের ফলাফল ভেবে না, শোভনের কথা বলার ভঙ্গিতে আমি চিন্তিত হতাম। কেমন যেন সন্দেহ হ'ত, ও রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েছে।

জিজ্ঞেস করতাম, 'তোর বৌদিকে সেদিন মিটিং-মিছিলে নিয়ে যাওয়ার কথা কি বলছিলি?'

'ও কিছু না, ঠাট্টা করছিলাম।'

'তোদের নাকি নাটকের দল আছে? কি নিয়ে নাটক করিস?'

'একদিন যাবে? আমি কার্ড দেব তোমাকে।'

পাঁচ

আমি কখনো নাটক দেখতে যাই নি। আমার সে সময় ছিল না। কাছাকাছি হলে রমা ছেলেপুলে নিয়ে যেত। ওর মুখ থেকে শুনতাম শোভন নাকি চমৎকার অভিনয় করে। যেমন গমগমে ওর গলার স্বর, তেমনি পার্ট বলার কায়দা। দর্শকরা খুশি হয়, হাততালি দেয়, কখনো বা উত্তেজিত হয়ে সমস্বরে সবাই মিলে শ্লোগান দিয়ে ওঠে। তখন সমস্ত হল্ আবেগে কাঁপতে থাকে থর থর করে। সামনের সারিতে বসে থেকে রমার বুক গর্বে ভরে যায়, শরীরের রক্ত ছল্ ছল্ করে। আমার ছেলেমেয়েদের চোখ অন্ধকারে উত্তেজনায় জ্বলতে থাকে।

'এসব কি নাটক, যাতে মানুষ এমন উত্তেজিত হয়? শ্লোগান দেয়?' আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করতাম। বাঁধা মঞ্চে দু'একটা নাটক আমিও দেখেছি। কখনো হাততালিও দিয়েছি। কিন্তু নাটক দেখতে-আসা তাবৎ মানুষ শূন্যে মুঠি পাকিয়ে শ্লোগান দিচ্ছে, মঞ্চের কুশীলব আর নাটকের দর্শক একাকার হয়ে যাচ্ছে—এমন দৃশ্য কখনো দেখি নি।

রমা বলত, 'ওদের নাটক তো এইরকমই।

'কি রকম ?'

'চোখে আঙুল দিয়ে শত্রু দেখিয়ে দেয়।'

'কে শত্রু ?'

'কেন ? ওই জমির মালিক, কল-কারখানার মালিক, থানা পুলিশ আদালত—'

'সর্বনাশ !' আমি চমকে উঠতাম। আমার মুখের রেখা কঠিন হয়ে উঠত। সন্দেহ থাকত না, নাটকের নামে শোভন রাজনীতি শুরু করেছে। বিরুদ্ধ-পক্ষের বিপজ্জনক রাজনীতি—এ দেশে যা করলে পুলিশ-রিপোর্টে চাকরি হয় না কোনোদিন, স্থায়ী চাকরিও একনিমেষে চলে যায়।

'নাটক ছাড়া আর কি করে শোভন ?' আমি রমাকে জেরা করতাম। রমা ভয় পেয়ে যেত, 'কেন, আর কি করবে ?'

'এই মিটিং, মিছিল, পোস্টার মারা—'

'করে বোধ হয়। সেদিন পাড়া দিয়ে একটা মিছিল নিয়ে যেতে দেখেছি—'

'চমৎকার ! এতদিন বলো নি কেন আমাকে ?'

'কেন ? কি হয়েছে ?'

'কি হয়েছে। তুমি মুখ্যু মেয়েমানুষ কি বুঝবে ? যেদিন পুলিশ ঢুকবে ঘরে—'

'পুলিশ !' রমা কেঁপে উঠত, মুখ কালো হয়ে যেত ওর, 'কি বলছ তুমি ?'

আমি নিজেকে সামলে নিতাম। এ সব কথা রমাকে বলে কি লাভ। যা বলার শোভনকেই বলতে হবে।

ছয়

'কি শুরু করেছিস তুই ?'

'কি করলাম ?'

শোভন মাথা উঁচু করে তাকাত। আমি লক্ষ্য করতাম, ওর

চোখেমুখে সেই চাপা কষ্টের ভাবটা আর নেই। একটু দুর্বিনীত দৃঢ়তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে। রোদে পুড়ে পুড়ে ফর্সা রং তামাটে, চোখের চাউনিতে খরতা।

আমি উত্তপ্ত হয়ে বললাম, 'দিনরাত নাটক আর রাজনীতি নিয়ে মত্ত থাকিস, চাকরির খোঁজ করিস কখন?'

'করলেই পাওয়া যায়?'

'না করলে একেবারেই পাওয়া যায় না, এটা বোঝার বয়স হয়নি তোর?'

'করছি তো মাঝে মাঝে।'

'ঢিল দিয়ে কাজ হয় না। ওসব রাজনীতি ছেড়ে সিরিয়াসলি কর।'

শোভন চুপ করে থাকত। ডানহাতের বুড়ো আঙুলের নখ খুঁটত দাঁতে। কপালে বিরক্তির ভাঁজ স্পষ্ট হয়ে উঠত। আমি বলতাম, 'ছেলেপুলে নিয়ে আমার অভাবের সংসার, তাছাড়া বুড়ো মা আছেন বেঁচে, একটা চাকরিবাকরি জুটিয়ে তুই যদি পাশে না দাঁড়াস, আমি চালাই কি করে। জিনিসপত্রের দাম কেমন হু হু করে বাড়ছে, দেখছিস না চেয়ে?'

শোভন আস্তে আস্তে বলত, 'তার জন্যই তো রাজনীতি।'

আমি খুব রেগে চেঁচিয়ে উঠতাম, 'ওসব বড় বড় বুলি রাখ, তাতে পেট ভরে না, সংসার চলে না।'

আমাকে এভাবে রাগতে দেখে শোভন খুব অবাক হয়ে যেত। তারপর আস্তে আস্তে উঠে যেত বাইরে। আমি বুঝতে পারতাম, শোভন আমার শাসনের বাইরে চলে যাচ্ছে।

রমা কাছে এলে বলতাম, 'আফিঙের নেশা জানো? যে একবার ধরে ছাড়তে পারে না। রাজনীতিটাও তাই, শুরু করলে আর ছাড়া যায় না। রক্তে রক্তে মিশে যায়।'

সাত

দিনকালের অবস্থা যদি স্বাভাবিক হত আর শোভন যদি আর

পাঁচটা ছেলের মত সাধারণ হ'ত—আমরা বিচলিত হতাম না। ভাবতাম, শোভন আমার উপর বা ওর বৌদির উপর অভিমান করে কোথাও গা ঢাকা দিয়েছে। রাগ পড়লেই ফিরে আসবে। অথবা একটা চাকরি পেলে। সেই কোন্ ছোটবেলায় বাবা মরার পর থেকে আদর দিয়ে, ভালবাসা দিয়ে আমরা ওকে মানুষ করেছি—ও কি আমাদের ছেড়ে থাকতে পারে? মা'র কথা ভুলতে পারে?

কিন্তু এখন দিনকাল স্বাভাবিক নেই। কথায় কথায় এখন মানুষ খুন হয়, ঘরবাড়ি পুড়ে যায়, মেয়েদের মানইজ্জত নষ্ট হয়। চারদিকে এখন অরাজকতা, মাৎস্যন্যায়। এখন একটা মানুষ সকালে বেরুলে সন্ধ্যায় ঘরে ফিরবে এমন নিশ্চয়তা নেই।

তার উপর শোভন রাজনীতি করত। বিরুদ্ধপক্ষের বিপজ্জনক রাজনীতি। দীর্ঘ শরীর আর গমগমে গলা নিয়ে মঞ্চে দাঁড়িয়ে কে শত্রু কে মিত্র স্পষ্ট করে চিনিয়ে দিত। জেলায় জেলায় ঘুরে হাজার হাজার মানুষকে নতুন পথের সন্ধান দিত।

তার জন্য আমাদের চিন্তার কারণ আছে।

সাতদিনের জায়গায় যখন দশদিন হ'ল তখন আমাদের সকলের মুখই গম্ভীর দেখাল। এর মধ্যে কৃষ্ণা বাড়িতে আসায় ব্যাপারটা আরো জটিল হয়ে উঠল।

কৃষ্ণা ওদের দলের মেয়ে। নাটকে অভিনয় করে, গানও করে। আমি কখনও দেখিনি। রমার কাছে নাম শুনেছি। রমা সন্দেহ করে, শোভনের সঙ্গে ওর একটা অন্যরকম সম্পর্ক আছে। সেটা ভালবাসা কিনা এখনও স্পষ্ট করে জানা যায় নি।

নাইট ডিউটি দিয়ে সকালে বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে রমা আমাকে আড়ালে ডেকে নিল, 'তুমি এখুনি ঠাকুরপোর খোঁজ নাও ভাল করে।'

ওর মুখ চোখ শুকনো, গলার স্বর কাঁপছিল। দেখে আমিও উৎকণ্ঠিত হলাম, 'কেন, কি হয়েছে? খবর এসেছে কিছু?'

'কৃষ্ণা এসেছিল খোঁজ করতে। ওর মুখে শুনলাম, সম্মেলনের শেষে নাটক করে শুভ ঠাকুরপো বাসে উঠেছিল। তারপর আর

খোঁজ নেই।'

'সঙ্গে কেউ ছিল না?'

'একজন ছিল, সে পথে নেমে যায়।'

'তাহলে? কোথায় গেল?'

'ওরাও খুঁজছে।'

'কারা?'

'ওই কৃষ্ণারা। তুমি ওদের সঙ্গে দেখা কর—'

বলতে বলতে রমা হঠাৎ থেমে গেল। ওর মুখ আরো শুকিয়ে গেল। চোখের পাতা কাঁপতে লাগল। গলার স্বর ভাঙ্গা ভাঙ্গা শোনাল। আমার আরো কাছে সরে এসে বলল, 'কৃষ্ণা বলছিল, ওদের উপর এখন খুব হামলা হচ্ছে। মঞ্চ ভেঙ্গে দিচ্ছে, থানায় ধরে নিয়ে যাচ্ছে, গুণ্ডারা খুন করছে—'

'খুন!' রাত জাগার সমস্ত ক্লান্তি ঠেলে আমি সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। একটা ঠাণ্ডা শীতল স্রোত শিরদাঁড়া বেয়ে পায়ের পাতায় নেমে এল। মাথাটা ঝিম ঝিম করে উঠল। আমি কিছু বলার আগেই আর্ত চাপা কণ্ঠে রমা বলে উঠল, 'কোথায় গেল? শুভ-ঠাকুরপো কোথায় গেল?'

আট

নানা উল্টোপাল্টা খবরে মন ভারি হয়ে উঠল।

শুনলাম, যেদিন শোভনের ফেরার কথা সেদিন সেই পথেই ট্রেন এবং বাস থেকে দু'জন যুবককে জোর করে নামিয়ে নেওয়ার ঘটনা ঘটেছে। একজন বেলেঘাটার এক কারখানার কর্মী—দূরে একটা খোলামাঠের ধারে তার মৃতদেহ পাওয়া গেছে। অপহৃত অন্যজন কে, কি নাম, কত বয়স, ভাল করে জানা যাচ্ছে না। তার মৃতদেহ এখনও পাওয়া যায় নি বলে সে জীবিত না মৃত, বোঝা যাচ্ছে না সে আমাদের শোভন হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য প্রমাণ নেই।

আমি থানায় গিয়েছিলাম।

বিকেলের দিকে মোটা কালো চেহারার অফিসারটি টিফিন করছিল। চওড়া টেবিলের উপর চীনেমাটির প্লেটে পাউরুটি আর মাংস। শোভনের নাম শুনে সে চোখ বড় বড় করে তাকাল। তারপর ঘন রক্তাভ মাংসের ঝোলে এক খণ্ড রুটি ডুবিয়ে মুখে পুরতে পুরতে বলল, 'আমরা চিনি। ছোকরা বড় বাড়াবাড়ি করছিল। আগে থাকতে সামলাননি কেন?'

আমি জানতে চাইলাম, 'কি বাড়াবাড়ি?'

অফিসারটি বলল, 'অনেক রকম। বোমা বাঁধা, ছুরি চালাচালি লুঠপাটের ষড়যন্ত্র। থানায় রিপোর্ট আছে ওর নামে। ক'দিন পরে আমরাই তো ধরে আনতাম—'

'ধরে আনতেন?' আমার মুখ কালো হয়ে গেল। তবু গলায় জোর এনে বললাম, 'না, ধরে আনার মত কিছু করে নি সে। আপনারা ভুল রিপোর্ট পেয়েছেন। সে নাটক ছাড়া আর কিছু করত না।'

'নাটক? ওর নাম নাটক?' কপাল ভুরু কুঁচকে অফিসারটি আমায় ধমকে উঠল। জোরে কথা বলার জন্য ওর মোটা ধ্যাবড়া মুখ থেকে চর্বিত রুটির ভগ্নাংশ টেবিলের ফাইলপত্রে ছিটকে পড়ল। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সে বলে গেল, 'নাটক আমরা দেখি না? নাটক কাকে বলে জানি না? স্টেজে উঠে বর্শা-বল্লম নিয়ে মার মার কাট কাট বলে হল্লা করলেই কি নাটক হয়? ওসব লোক ক্ষেপানো শয়তানি আমরা ধরে ফেলেছি। আর চালাকি চলবে না, সব শালাকে পিটিয়ে ঠাণ্ডা করব—'

এরপর কিছু বলার থাকে না। বলা উচিত নয়। তবু মা'র মুখ, রমার মুখ মনে করে বললাম, 'সেদিন রাত্রির দিকে ট্রেন কিংবা বাস থেকে যাকে জোর করে নামিয়ে নেওয়া হয়েছে, এখনও যার ডেড্‌বডি পাওয়া যায় নি, তার সম্পর্কে আপনাদের কোনো খোঁজ আছে?'

অফিসারটি আবার রক্তাভ মাংসের ঝোলে রুটি ডোবাল। হাঁ করে মুখে পুরতে পুরতে ঘাড় নাড়ল, 'নেই।'

'খুনী গুণ্ডারা একটা জ্যান্ত মানুষ নামিয়ে গায়েব করে ফেলল, আপনারা কেয়ারই করেন নি?'

'কত করব? হামেশাই ঘটছে, অত সময় নেই আমাদের।'

টিফিন শেষ করে গ্লাস তুলে জল খেল অফিসারটি। ড্রয়ার থেকে একটা ময়লা তোয়ালে বের করে হাতমুখ মুছে নিল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে কোমরের বেল্ট ঠিক করতে করতে বলল, 'আমি এখন বেরুবো। আপনার ইচ্ছে হলে ডাইরী করে যান। ওহে সমাদ্দার, ছেলে হারানোর একটা ডাইরি নাও তো—'

নয়

কৃষ্ণাদের বাড়ি গেলাম। ইতিমধ্যে ওরা যদি কোনো খোঁজ পেয়ে থাকে।

কৃষ্ণা বাড়ি ছিল না। আমি শোভনের দাদা শুনে ওর ছোট বোন কিছুক্ষণ অপলকে আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। ফ্রক-পরা এই ছোট মেয়েটির মুখে আমি এক অসাধারণ গাম্ভীর্য লক্ষ্য করলাম। সে আমাকে গলিঘুঁজি ঘুরিয়ে অন্য এক বাড়িতে নিয়ে গেল। একটা বড় আলোকিত ঘরে সতরঞ্চি পেতে কৃষ্ণারা বসেছিল। খুব সম্ভব এটা ওদের রিহার্সেল রুম। কিংবা ওদের রাজনৈতিক দলের অফিসও হতে পারে। দেয়ালে কিছু ছবি, একটা কাঠের আলমারিতে কিছু বই, লাঠিতে জড়ানো কাপড়ের ফেস্টুন, কাগজে লেখা দলা-পাকানো কিছু পোস্টার। একটা ছবিতে আমি শোভনকে দেখলাম। অভিনয়ের একটা দৃশ্য। উঁচু মত জায়গায় শোভন দাঁড়িয়ে হাত তুলে কিছু বলছে। তার মুখে মঞ্চের আলো এসে পড়েছে। চোখদুটো অস্বাভাবিক চক-চক করছে। তার তিন দিকে ঘিরে তেলকালি মাখা কিছু মানুষ। তাদের একজনের দীর্ঘ পেশীবহুল কাঁধে একটা লাল নিশান।

ঘরে ঢুকেই এই ছবিটা আমার চোখে পড়ল। শোভনের সুন্দর আলোকোজ্জ্বল মুখ দেখে আমি থমকে দাঁড়ালাম। মনে হ'ল, জীবন্ত শোভনকেই দেখছি। বুকের ভিতর একটা যন্ত্রণা মোচড় দিয়ে উঠল।

সেই কবে কোন্ ছোটবেলা থেকে…

কৃষ্ণারা নিজেদের মধ্যে কথা বলছিল। আমাকে দেখে, আমিই শোভনের দাদা এটা বুঝতে পেরে, অকস্মাৎ সবাই চুপ করে গেল। আমি পর্যায়ক্রমে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ বিষণ্ণতার সঙ্গে একটা ক্ষুব্ধ কাঠিন্য অনুভব করলাম। আর তাতেই বুঝলাম, ওরা ওদের সঙ্গীকে ফিরে পায় নি।

কৃষ্ণা আস্তে আস্তে আমার কাছে উঠে এল।

আমি ওকে প্রথম দেখলাম।

গভীর শ্যামল রঙের একটি মেয়ে। আঠার উনিশের বেশি বয়স না। একটু রোগাটে ধরনের শরীর। মুখটা সুন্দর কি-না বলা মুস্কিল, তবে চোখ নাক আর চিবুক মিলিয়ে বড় বেশি মিষ্টি। মাথার ঘন চুলের রাশি পিঠে ভেঙ্গে পড়েছে। রমার কথা মনে পড়ল, শোভনের সঙ্গে কৃষ্ণার একটা অন্যরকম সম্পর্ক আছে, সেটা ভালবাসা কিনা আমরা জানি না। একটা বেকার বাউণ্ডুলে ছেলের ভালবাসার ক্ষমতা আছে কিনা, থাকলে তার মূল্য কতটুকু—তাও বুঝি না। কিন্তু কৃষ্ণা যখন ধীর পায়ে আমার কাছে এসে দাঁড়াল, মাথা নীচু করে আঙুল দিয়ে শাড়ির আঁচল জড়াতে লাগল, তখন ওর সেই নতশির বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে আমার বুকের ভিতর আবার একটা কষ্ট ঠেলে উঠল।

আমি বললাম, 'কৃষ্ণা, একটু বাইরে এস।'

'চলুন।'

দু'জনে বাইরে এলাম।

ততক্ষণ সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে। রাস্তার আলোগুলো জ্বলে গেছে। জোরে বাতাস বইছে। দূরে আকাশের এক কোণে মেঘ ডাকছে। তার অস্পষ্ট গুরু গুরু শব্দ শোনা যাচ্ছে।

একটা লাইটপোস্টের তলায় দাঁড়িয়ে আমি নীচু গলায় বললাম, 'শোভন কি বোমা বাঁধত? ছুরি চালাত? লুটপাট করত?'

শোনামাত্র মাথা উঁচু করে তাকাল কৃষ্ণা, 'কে বলল?'

'থানা থেকে বলেছে।'

'ও, থানা! পুলিশ।' কৃষ্ণার গভীর শ্যামল মুখের কালো চোখ দপ্ করে জ্বলে উঠতে দেখলাম। সে এক আশ্চর্য দহনদীপ্তি। রাগে ঘৃণায় মাখামাখি এক আশ্চর্য কঠিন মুখ। সেই চোখের দিকে তাকিয়ে যা বোঝার বুঝলাম। চুপ করে থাকলাম কিছুক্ষণ। তারপর কোনো ভনিতা না করে সোজাসুজি প্রশ্ন করলাম, 'কৃষ্ণা, সত্যি করে বলো দেখি, শোভন বেঁচে আছে কি না?'

আস্তে আস্তে আবার মাথা নামিয়ে নিল সে। অল্পকাল কি যেন ভাবল। তারপর অস্পষ্ট ধরা গলায় বলল, 'এখনও খোঁজ পাইনি। আপনি বাড়ি যান। কিছু জানতে পারলে বৌদিকে বলে আসব।'

আমি দেখলাম, একটু আগে ওর যে চোখ আগুনের শিখার মত জ্বলে উঠেছিল এখন তাতে শিশিরের ফোঁটার মত জল টল টল করছে!

দশ

আমার স্ত্রীর চোখেও জল ছল ছল করে। সম্পর্কটা তো অল্প দিনের না। পনের বছর আগে রমা যখন প্রথম বৌ হয়ে এসেছিল এ বাড়িতে তখন শোভন কতটুকু? অভাবের সংসারে টানাটানি আছে, দুঃখ কষ্ট আছে। তা নিয়ে মান-অভিমান, ঝগড়াঝাটি, বাদ-বিসম্বাদও আছে। হয়ত রমা কখনো কোনো রূঢ় কথা বলেছে শোভনকে, শোভন কটু করেই তার উত্তর দিয়েছে। কথা বলাও হয়ত বন্ধ থেকেছে ক'দিন। কিন্তু এসব তো আসল ছবি না। এটা আমাদের সংসারের উপরকার মরুভূমির ছবি। সেখানে খাঁ খাঁ বালু ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। কিন্তু অন্তরে অন্তরে ঠিকই বইছে অন্তঃ-সলিলা এক নদী। স্নেহ মমতা ভালবাসার শীতল জলে তা কানায় কানায় পূর্ণ। সেখানে আমি আর শোভন, এক মায়ের পেটের দু'-ভাই যেমন সাঁতার কাটি; তেমনি শোভন আর রমাও। আজ তার চোখে জল ছলছলিয়ে উঠবে বৈকি।

কিন্তু কান্নাটা তাকে যথাসম্ভব নিঃশব্দ রাখতে হয়। যেন মা টের

না পান। অনেক আঘাত অনেক শোক সহ্য করেছেন মা। অনেক চড়াই উৎরাই পার হয়ে এখন মৃত্যুর মুখে এসে ঠেকেছেন। এই বয়সে নতুন একটা আঘাত তিনি কি সইতে পারবেন!

আমরা তাঁকে বলেছি, শোভনের খোঁজ পাওয়া গেছে। বিহারে এক বন্ধুর ওখানে আছে। শীঘ্রি তার একটা চাকরি হওয়ার সম্ভাবনা। সে ব্যবস্থা হলেই ফিরে আসবে।

মা বিশ্বাস করেছেন কিনা বলা শক্ত। তার মুখের ভাব ক্রমশই সন্দেহজটিল হয়ে উঠছে। ক্রমে ক্রমে একটা ভয়ঙ্কর অশুভ কিছুর ইঙ্গিত পেয়ে যাচ্ছেন তিনি।

তার সামনে কান্নাটা লুকোতে হয় বলেই রমা আড়ালে কাঁদে।

কিন্তু আমাকে তো মেয়েদের মত ভেঙ্গে পড়লে চলে না। শক্ত হতেই হয়। আমি রমাকে বোঝানোর চেষ্টা করি, 'এত ভয় পাওয়ার কি আছে। তেমন কিছু হলে শোভনের ডেড্‌বডিটাতো পাওয়া যেতই।'

রমা উত্তর দেয়, 'সব কি পাওয়া যায়? ওরা মাটিতে পুঁতে ফেলে।'

আমি বলি, 'তুমি কি করে জানলে?'

রমা বলে, 'তুমিও জান, শুধু আমাকে পরিষ্কার করে বলতে চাও না।'

আমি চুপ করে যাই। রমাও চুপ করে থাকে। শোভনের অনেক স্মৃতি মাঝখানে শুইয়ে রেখে আমরা দু'জনেই অনেকক্ষণ ক্লান্ত বিমর্ষ মুখে চুপ করে বসে থাকি।

তারপর একসময় ক্ষুব্ধ কান্না-ভেজা গলায় রমা জিজ্ঞেস করে, 'এদেশে এখন কি আইনটাইন কিছু নেই? যার যা খুশি করতে পারে?'

আমি আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়ি, 'না নেই। যার যা খুশি করতে পারে। আসলে কি জান, আমরা এখন একটা ভয়ঙ্কর সময়ের মধ্য দিয়ে চলেছি। এটা যে কত ভয়ঙ্কর আগে বুঝতে পারি নি। শোভন হারিয়ে গিয়ে চোখ খুলে দিয়ে গেল।'

'এগারো

একদিন রাত্রে ঘুম ভেঙ্গে গেল। মনে হ'ল বাইরের বারান্দায়

অন্ধকারে কেউ বসে আছে। আমি ঘর থেকেও তার নিশ্বাস পতনের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। কে সে? রমা কি? হাত বাড়িয়ে রমার শরীর পেলাম। সে ঘুমুচ্ছে। তাহলে?

আস্তে আস্তে উঠে বাইরে এলাম।

মা বসে আছেন। একা, অন্ধকারে।

'বসে আছ কেন মা? একটু একটু ঠাণ্ডা পড়েছে।'

'কে? কে? শোভন?' আমার গলার স্বরে প্রবলভাবে চমকে উঠলেন মা। আমি আরো কাছে এসে ঝুঁকে বললাম, 'না, আমি মোহন—'

'ও! তুই!' মা'র গলা নিঃস্তেজ হয়ে এল। বিড় বিড় করে বললেন, 'মনে হ'ল বাইরের দরজায় কে শেকল ঠুকল। উঠে এসে দেখি কেউ না—'

'বেড়াল কুকুর হতে পারে। তুমি ঘরে যাও মা।'

'না, বসি আর একটু। শুভ তো এরকম রাত করেই ফেরে।'

'ফিরলে আমরা দেখব। তোমার বসে থাকার কি দরকার? ওঠ মা, ওঠ তুমি—'

প্রায় জোর করেই মাকে ঘরের দিকে ঠেলে নিয়ে গেলাম।

এই ঘরটাতেই মা আর শোভন শোয়। দু'দিকে দুটো তক্তাপোষ পাতা। নীল চাদরে ঢাকা একটা বিছানা কতদিন খালি পড়ে আছে!

ঘরে ঢুকে মা হঠাৎ ঘুরে দাঁড়ালেন। অন্ধকারে আন্দাজ করে আমার একটা হাত খামচে ধরে বলে উঠলেন, 'হ্যাঁরে, শুভ ফিরবে তো ঠিক? তোরা আমার কাছে কিছু লুকোচ্ছিস না তো? আমি যে কি-সব শুনতে পাই? বউমা যে লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে?'

আমি আস্তে আস্তে হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে বললাম, 'তুমি শুয়ে পড় মা। সে আসবে, ঠিক আসবে। আমি আজই চিঠি দিয়েছি তাকে—'

মা'র ঘরের দরজা টেনে দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

আকাশ মাটি পৃথিবী জুড়ে বড় বেশী অন্ধকার। অন্ধকারে গাছপালার মাথা বাতাসে দুলছে। মানুষের গলায় একটা বেড়াল

ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে। লেবুতলায় জোনাকিরা জ্বলছে নিভছে।

অন্ধকারে আমি আমার হৃদপিণ্ডের শব্দ শুনতে পেলাম। রক্তের ভিতর অস্থিরতা সঞ্চারিত হ'ল। কান্না না, হতাশা না, বুকের মধ্যে বিশাল বিস্তৃত একটা ক্রোধ ঘৃণার আকৃতি নিয়ে ফুঁসে ফুঁসে উঠতে লাগল। শরীরের সমস্ত পেশী শক্ত করে খর চোখে আমি কালো শ্লেটের মত অন্ধকারের দিকে তাকালাম। আমার কেমন জানি মনে হ'ল, শোভন, আমাদের শোভন ঘুরে ঘুরে মানুষদের ডেকে ডেকে শত্রু চেনাচ্ছিল বলে শত্রুরাই ফাঁক বুঝে ওকে চুরি করে নিয়ে গেছে। এখন এই অন্ধকারে সেই ভয়ঙ্কর মুখগুলো ভেসে উঠতে পারে। ওরা তো আলোতে আসে না, আলোতে হাঁটে না। আমি অন্ধকারে আততায়ীর মুখ দেখার জন্য সমস্ত শরীর প্রতিরোধের ভঙ্গিতে টান টান সোজা করে তুলতে চাইলাম।

বুঝতে পারিনি আমার বড় ছেলে স্বপন কখন বিছানা থেকে উঠে এসেছে। কাছে, খুব কাছে এসে সে ডাকল, 'বাবা!'

মা'র মত আমিও প্রবল ভাবে চমকে উঠলাম। মনে হ'ল শোভন এসে ডাকল 'দাদা' বলে। স্বপনের গলা ওর কাকার মত এমন সুন্দর ভরাট হয়ে উঠেছে কখন—টের পাই নি তো! ও কি আস্তে আস্তে আর একটা শোভন হয়ে উঠছে? আমি ঝুঁকে পড়ে ওর মুখ দেখার চেষ্টা করলাম।

'বাবা কাকু কি ফিরেছে?'

'না।'

'তবে তুমি বাইরে দাঁড়িয়ে কেন?'

'এমনি।'

স্বপন চুপ করে গেল। সম্ভবত চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে অন্ধকারে সে-ও কিছু একটা দেখার চেষ্টা করল। তারপর ভাঙ্গাভাঙ্গা গলায় বলল, 'বাবা, কাকুকে ওরা খুন করেছে?'

আমি কেঁপে উঠতে গিয়ে স্থির শক্ত হয়ে গেলাম, 'কে বলল তোকে?'

'স্কুলে সব বলাবলি করে।'

'না, মিথ্যে কথা। শোভন ফিরে আসবে।'

'না এলে আমিও খুঁজতে যাব বাবা। ঠিক যাব দেখো, কারো কথা শুনব না—' প্রত্যেকটি শব্দ সে স্পষ্ট করে উচ্চারণ করল। অন্ধকারে এই বালকের চোখে আমি আগুনের ফুলকি দেখলাম। তারপরই সে দু'হাতে মুখ ঢেকে চিৎকার করে কেঁদে ফেলল।

বারো

আমরা সবাই এখন শোভনকে খুঁজছি। আমি মা রমা স্বপন কৃষ্ণা আর কৃষ্ণার দলের ছেলেমেয়েরা সবাই। জীবিত বা মৃত—যে কোনো অবস্থায় শোভনের সন্ধান চাই।

তার বয়স চব্বিশ, গায়ের রং ফর্সা, মাঝারি স্বাস্থ্যের লম্বা চেহারা, সঠিক উচ্চতা জানা নেই, কখনো মেপে দেখি নি, পাঁচ ফুট পাঁচ কিংবা ছয় হতে পারে। মুখটা গোল ছাঁদের, চোখদুটো বড়বড়, গলার স্বর স্পষ্ট ও গম্ভীর, অভিনয়ে দক্ষতা আছে, অকারণে কথা বলার চেয়ে চুপ করে থাকাই বেশি পছন্দ করে, যখন চুপ করে থাকে তখন তাকে খুব অসন্তুষ্ট চিন্তান্বিত দেখায়, তখন সে প্রায়ই ডানহাতের বুড়ো আঙুলের নখ দাঁতে খোঁটে। রাস্তা দিয়ে হাঁটাচলার সময় জোরে পা ফেলে হাঁটে, যেন জরুরি কাজের তাড়া আছে এমন ভঙ্গি—জীবিত অবস্থায় দেখলে তাকে এইভাবেই দেখবেন।

আর যদি মৃত দেখেন—তাহলে অবশ্য মুস্কিল। তখন তো আর গমগমে গলার স্বর কিংবা নখখোঁটার লক্ষণগুলো থাকবে না। তখন স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে, মাঠের ধারে অথবা আপনার বাড়ির ঠিক দরজার কাছেই পড়ে-থাকা আর দশটা মৃতদেহের মধ্যে থেকে শোভনের আটপৌরে শরীরটা পৃথক করে চেনা অসম্ভব হবে। আমি ভাল করেই জানি, ওর পিঠে বা কপালে কোনো কাটা দাগ নেই অথবা বুকে গালে কোনো জড়ুল চিহ্ন। খুব ছোটবেলায় একবার বসন্ত হয়েছিল অবশ্য, মুখে ক'টা দাগও বসেছিল—কিন্তু এখন তা আর

বোঝা যায় না। এই অবস্থায়, মৃতদেহটা যদি অবিকৃত থাকে অর্থাৎ কেউ কেটেকুটে কদাকার না করে দেয়, যদি মনে হয় মুখটা গোল-ছাঁদের, ফর্সা ও মোটামুটি সুন্দর, বয়সটা তেইশ-চব্বিশের কোঠায়, আর মৃত ব্যক্তি আপনার আত্মীয় পরিজন বা এলাকার পরিচিত কেউ নয়, তাহলে তাকে শোভন সন্দেহ করে একটা খবর দেবেন। আমরা কেউ গিয়ে সনাক্ত করে আসব……

সেই ভয়ঙ্কর ঘটনাটি ঘটতে সামান্যই সময় লাগল। খুব দ্রুতবেগে হাঁটছিল সমীর, হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে মুহূর্তের জন্য একেবারে স্থির শক্ত অনড় হয়ে গেল। তৎক্ষণাৎ ফুটপাতের এই অন্ধকার অংশে এলোমেলো ছড়িয়ে-থাকা মানুষজনের মধ্য থেকে প্রথমে অতিশয় কচি একটা শিশুকণ্ঠের আর্তনাদ, পরে পরে অথবা তার সঙ্গেই একটা বয়স্ক নারীকণ্ঠের দীর্ঘ সুতীব্র চিৎকার, অনেকটা কান্নার মতো অথচ ঠিক কান্না নয়, হিংস্র বুকফাটানো তীক্ষ্ণ চিরল হাহাকার ধ্বনি—ফুটপাতের সমস্ত অংশ কাঁপিয়ে, অন্ধকারকে প্রবল-ভাবে চমকে দিয়ে একটা বাসের গোঁ গোঁ গর্জনকে নিমেষে চাপা দিয়ে যেন দমকা ঝড়ের মত সমস্তকিছু ছিঁড়েকুটে ছত্রখান ক'রে দিল। থমকে-দাঁড়ানো সমীরের চেতনা মুহূর্তের জন্য অবশ হয়েছিল। সে কি করেছে, কতটুকু করেছে, বুঝবার মত বুদ্ধিটুকুও লোপ পেয়েছিল! কিন্তু নারীকণ্ঠের উত্থিত চিৎকার তীব্র যন্ত্রণা নিয়ে চতুষ্পার্শ্বে ছড়িয়ে পড়ার পর এবং সেইসঙ্গে আরো কিছু এলোমেলো কণ্ঠস্বর যুক্ত হয়ে তা আরো জোরালো রূপ নিতেই—সমীর হঠাৎই যেন সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে ফেলল। আর সঙ্গে সঙ্গে তার সমস্ত শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল, চোখদুটো বিস্ফারিত হয়ে গেল, তার বুকের উপর সশব্দে ভারি একটা পাথর এসে আছড়ে পড়ে হৃদপিণ্ডটা যেন চূর্ণ করে দিল। সে ভয়ে আতঙ্কে নীল পাণ্ডুর হয়ে সহসা দু'হাতে মুখ ঢেকে একটা অব্যক্ত কাতর ধ্বনি করতে গিয়েও পারল না, তার কণ্ঠনালীর কাছে এসে সব শব্দ যেন আটকে গেল।

ঠিক তখুনি আকাশ কাঁপিয়ে কড় কড় শব্দে একটা বাজ পড়ল। কালো মেঘে আবার বিদ্যুৎ চমকাল। ঝিরঝিরে বৃষ্টি ফোঁটায় ফোঁটায় বড় হয়ে সহসা ঝমঝমিয়ে নামল। সমীরের সামনে পেছনে চারপাশে,

এলোমেলো ছড়িয়েছিটিয়ে থাকা রুগ্ন নিরন্ন ফুটপাতবাসী মানুষজন, মেয়ে-পুরুষ, শিশু-বৃদ্ধ সকলেই চারদিক থেকে আরো এগিয়ে এসে ঝুঁকে পড়ে কি হয়েছে, একটা মেয়েমানুষ এমন প্রাণপণে চেঁচিয়ে উঠল কেন, একটা বাচ্চা প্রাণপণ চিৎকার করেই বা থেমে গেল কেন, খোঁজ করতে গিয়ে ওরাও বৃষ্টির শব্দ চাপা দিয়ে হাউমাউ করে চেঁচিয়ে উঠল। সমীর আর একমুহূর্ত দাঁড়াল না! দাঁড়ানো নিরাপদ মনে করল না। যেন তার রক্তের ভিতর থেকেই কেউ ডাক দিয়ে বলে উঠল, 'পালাও, শীগগির পালাও!' সকলের সম্মিলিত চিৎকার সহসা তার কাছে ভয়ঙ্কর মনে হ'ল। তার ভয় হ'ল, এখুনি এইসব চিৎকারের মালিকেরা, নগ্ন সিক্ত নিরন্ন ফুটপাতবাসী মেয়েপুরুষ-বৃদ্ধের দল, কালো কালো শীর্ণ হাত ধারালো হিংস্র থাবার মত বিস্তার করে তার দিকে ছুটে আসবে, তাকে ঘিরে ফেলবে, ধরে ফেলবে—

এখন অন্ধকার। বাইরে ঝমঝম বৃষ্টি। আর ক'পা দৌড়ে গেলেই শেয়ালদা স্টেশন। হাজার হাজার মানুষের ভিড়। ভিড়ের স্রোতে একবার মিশে যেতে পারলেই ··

তখনো সমীরের সারা শরীর কাঁপছে। রক্তের মধ্যে প্রবল অস্থিরতা। গলার কাছে সেই চাপা অব্যক্ত কাতর চিৎকারটা রুদ্ধ হয়ে আছে। বিকারগ্রস্ত জ্বরো রুগীর মত সমীর একবার ঘাড় ঘুরিয়ে পেছন ফিরে তাকিয়ে কিছু একটা দেখতে চাইল। তারপরই ত্রস্ত উত্তেজিত ভঙ্গিতে ফুটপাত ছেড়ে লাফিয়ে রাস্তায় নেমে পড়ল। একটা ডবল ডেকার তার পাশ দিয়েই রাস্তার গর্ত থেকে সর্বাঙ্গে কাদাজল ছিটিয়ে ছুটে গেল। সমীর ভ্রূক্ষেপ করল না। জল সপসপে রাস্তায় যতখানি দ্রুতবেগে সম্ভব অর্থাৎ প্রায় ছুটতে ছুটতেই সে কখনো ট্রামের লাইনে পা পিছলে, কখনো কোনো ছাতাধারীর সঙ্গে ঠোক্কর খেয়ে, কখনো একটা রিক্সা বা ঠেলাগাড়িকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে পথ করে, কালো প্যাঁচ প্যাঁচ কাদা জল হকার ভিখিরি মানুষজনে গিজগিজ-করা স্টেশনের চত্বরে ফুটফুটে আলোর নীচে পৌঁছে গেল। পৌঁছে সে আবার কয়েক মুহূর্তের

জন্য স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে সামনে ও পেছনে অকারণেই অস্থির ভয়-ভয় মুখে তাকাল।

এখন পরিষ্কার আলোর নীচে সমীরের চেহারাটা বড় অদ্ভুত দেখাচ্ছিল। তার মাথা ঘাড় গলা হাতের শিরা বেয়ে টপটপ করে জল ঝরছিল। পাতলা চুলগুলো ভিজে জবজবে হয়ে কানের দু'পাশে, কপালে চামড়ার সঙ্গে লেপটে গিয়েছিল। কালো সুতির প্যান্টটা জলেকাদায় ভিজে কুঁচকে কিম্ভুত আকার, সাদা জামাটার এখানে ওখানে বাসের চাকা থেকে ছিটকে-আসা তরল কাদার আঁকিবুকি নক্‌শা কাটা। লম্বাটে ধরনের মোটামুটি স্বাস্থ্যবান সমীরের মধ্যবিত্ত ভদ্র চেহারাটাকে এখন রীতিমত চোয়াড়ে মনে হচ্ছিল। বিশেষ করে তার চোখেমুখে একটা ক্ষিপ্ত হতাশাগ্রস্তভাব এবং ভয় বেদনা ক্রোধ ইত্যাদি মিশ্রিত থাকায়—তাকে আরো অস্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। এইসময় পরিচিত কেউ তাকে দেখলে চেনাই মুস্কিল হত।

ঠাসাঠাসি ভিড় থেকে যথাসম্ভব দূরে আলগা হয়ে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে শ্বাস টানল সমীর। প্যান্টের পকেট থেকে রুমাল বের করে ঘাড়গলামুখের জল মুছবার চেষ্টা করল কিন্তু রুমালটা একেবারেই শুকনো না থাকায় খুব সুবিধে হ'ল না। একদিকের পকেটে ক'টা সস্তার সিগেরেট ছিল, ভিজে কাগজ ফেটে মশলা ছড়িয়ে একাকার হয়েছে। সমীর দুটো আঙুল সাঁড়াশীর মত করে বিরস বিরক্ত মুখে মশলাগুলো টেনে বের করে অস্থির ভঙ্গিতে প্ল্যাটফর্মে ছড়িয়ে দিতে লাগল।

আসলে এইসময় সে খুব তীক্ষ্ণভাবে নিজের জুতো জোড়ার দিকে তাকাচ্ছিল। বিশেষ করে ডান পায়ের জুতোটার দিকে। চীনেপট্টি থেকে অনেক দরকষাকষি করে কেনা কাবুলী স্যাণ্ডেল। পুরনো হয়েছে বলে দিন কতক আগে হাফশোল লাগানো হয়েছে। জলে ভিজে জুতোজোড়া এখন বেজায় ভারি হয়ে উঠেছে, রং পালিশ ধুয়ে গেলেও কালো চামড়া আলোতে চক চক করছে। এই জুতো সমেত ডান পা'টাই সে চাপিয়ে দিয়েছিল—

নরম অবুঝ একদলা মাংসপিণ্ড। ছেঁড়াস্থাকড়া জড়ানো একটা কচি শিশুর হাড় পাঁজর! ঘুমভাঙা কোমল গলার একটা মর্মান্তিক আর্তনাদ—

মনে পড়তেই সমীরের সারা শরীর আবার কেঁপে উঠল।

এইসময় তিননম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ইলেকট্রিক ট্রেনের হুইসেল বেজে উঠল ভোঁ করে।

সেই অতর্কিত ধাতব শব্দের তীক্ষ্ণতা সমস্ত চত্বরটা কাঁপিয়ে দিল প্রবলভাবে। এই ট্রেনটা সমীরকেও ধরতে হবে। এরই জন্য হন্ হন্ করে ছুটে আসছিল সে। টিপটিপ বৃষ্টির জন্য রাস্তা ছেড়ে ফুটপাত আশ্রয় করেছিল। ফুটপাতের উপর কোথাও কোথাও আচ্ছাদন আছে। গা-মাথা বৃষ্টির ছাঁট থেকে সামান্য বাঁচানো যায়। শেয়ালদার কাছাকাছি আসতেই লোড্‌শেডিং-এর পাল্লায় পড়ল। দু'পাশের দোকান পাট অন্ধকার। কোথাও মোম জ্বলছে, কোথাও হ্যারিকেন, কোথায় বা হ্যাজাক। চারদিকে আলো অন্ধকারের ভুতুড়ে ছায়া। তার মাঝে হেডলাইট জ্বালিয়ে বাসগুলো ছুটে যাচ্ছে। ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে ছুটছে ট্রাম। সমীর রাস্তাতেই নেমে পড়বে ঠিক করেছিল। কেননা ফুটপাত ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হয়ে আসছিল। সেই সঙ্কীর্ণ অংশে আবার মানুষজনের স্থায়ী সংসার। ছেঁড়া কাঁথা, মাদুর, হাঁড়িকুড়ি, বউ-বাচ্চা-অথর্ব-রুগী। বৃষ্টির জন্য গাদাগাদি হয়ে আছে সব। পা ফেলতে গেলেই মানুষের শরীরে পা লাগে। সমীর একবার বুঝি কাদের বিছানার একটা অংশে পা দিয়ে ফেলেছিল। একটা বুড়ো মানুষের গলা ধমকে উঠেছিল তাকে। সেটা সামলাতে গিয়ে বাঁ পা'টা টেনে লম্বা করে একটা ছোটখাটো লাফ দিতে গিয়েই জুতো সমেত ডান পা'টা সজোরে আছড়ে পড়ল নরম দলাপাকানো একটা শিশুর উপর—

ইলেকট্রিক ট্রেন আবার হুইসেল দিল। কি কর্কশ জান্তব শব্দ। সমীর মাথা উঁচু করে রুক্ষভাবে তাকাল গাড়িটার দিকে। হাতের কাছে এসেও ট্রেনটা পাছে ফসকে যায়—এই ভয়ে আবার

ছুটতে শুরু করল। এই ট্রেনেই তাকে বাড়ি ফিরতে হবে।

…এদিকটায় এখন আর বৃষ্টি নেই। ওভারব্রিজটা বাঁ পাশে রেখে প্ল্যাটফর্মের ঢালু জায়গা বেয়ে সে নীচে এল। তারপর লাইন ধরে হাঁটতে শুরু করল। এই রাস্তাটা তেমন ভাল না। লাইনের পাথরে হোঁচট খাওয়ার ভয় আছে, খানাখন্দে আছাড় খেয়েও পড়তে পারে। এই রাস্তায় কদাচিৎ বাড়ি ফেরে সমীর। কিন্তু আজ সে স্টেশনের সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে পাকা রাস্তা ধরল না। ওই রাস্তায় গেলে দু'একজন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হবেই। বিশেষ করে খালপাড়ের হাফ বুড়ো মৃগেনবাবুর সঙ্গে। তিনি এই ট্রেনেই বাড়ি ফেরেন। সমীরের সঙ্গে অনেকদূর পর্যন্ত যান তিনি। তারপর উত্তরে মোড় ফেরেন। রাজ্যের অভাব অভিযোগ নিয়ে সারা পথ বক বক করা তাঁর অভ্যাস। কথা বলায় তাঁর ক্লান্তি নেই।

সমীর আজ পরিচিতদের এড়াতে চায়। তার মনটা ভাল নেই। অদ্ভুত একটা থমথমে ভাব। ক্রোধ বেদনা বিষণ্ণতার সঙ্গে একটা দমচাপা আতঙ্ক সমস্ত সত্তাকে জড়িয়ে ধরেছে। ট্রেনে উঠেও এককোণে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছিল সে। পরিচিত কাউকে দেখলে ডেকে নেওয়ার পরিবর্তে মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে আড়াল করছিল। আজ সে সঙ্গী চায় না। একটু একা থাকতে চায়। একা হাঁটতে চায়। প্রতিদিনের অভ্যস্ত পথটা তাই সে বর্জন করেছে।

খুব ক্লান্ত ভঙ্গিতে নিজের বাড়ির দরজায় পৌঁছে কড়া নাড়ল সমীর। প্রথমটায় আস্তে, তারপর জোরে জোরে। যেন একটা রাগী মানুষ অনেকক্ষণ অপেক্ষা করে ধৈর্য হারিয়েছে।

বাচ্চা দুটো ঘুমিয়ে পড়লেও সমীরের বউ শীলা বরাবর জেগেই থাকে। তাকে শোনানোর জন্য জোরে কড়া নাড়া বা ডাকাডাকির দরকার হয় না। জুতোর শব্দেই সে সমীরের আসাটা টের পায়, দরজা খুলে দেয়। কিন্তু আজ বৃষ্টির জন্য মাটি ভেজা, জুতোও ভেজা —কোনো শব্দ হয় নি। ফলে সমীরকে কড়া নাড়তে হয়েছে এবং একবার মৃদু শব্দ তুলেই যেন বিষম বিরক্ত এমন ভঙ্গিতে জোরে

জোরে শব্দ শুরু করেছে।

শীলা এসে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে দিয়ে সামান্য অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতে বলল, 'কি ব্যাপার? পাড়া যে একেবারে মাথায় তুলেছ? আমি কি ঘুম মারছিলাম নাকি? ঘুমোই কোনোদিন?'

সমীর কথা বলল না। নিঃশব্দে ঘরে ঢুকল। শীলা তার আপাদমস্তক লক্ষ্য করে চমকে উঠল, 'ইস্, জামাপ্যাণ্ট সব যে ভিজে গেছে একেবারে। তার উপর নোংরা কাদা—'

সমীর মাথা নাড়ল, মৃদু গলায় বলল, 'কলকাতায় খুব বৃষ্টি হচ্ছে।'

'এখানেও হয়েছে বিকেলের দিকে। নাও, তাড়াতাড়ি সব ছাড়ো, ঠাণ্ডা লেগে যাবে'

'সে যা লাগার লেগে গেছে। লুঙ্গিটা আনো।'

গামছা আর লুঙ্গি এনে দিল শীলা। একটা শুকনো গেঞ্জিও। টুলে বসে সবার আগে পা থেকে জুতো জোড়া টেনে খুলতে গিয়েই আবার কেঁপে উঠল সমীর। মুখটা হঠাৎ আবার কেমন সাদা হয়ে গেল। ভাদ্রের এই পচা ভ্যাঁপসা গরমেও তার মনে হ'ল কেমন যেন শীত-শীত করছে। জুতোতে হাত রেখে মুহূর্তের জন্য কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেল সে।

শীলা বলল, 'কি হ'ল? বসে আছ কেন? আগে জুতো-জোড়া খোল—'

সমীর মুখ তুলে তাকাল। কোঁচকানো, বিষণ্ণ দৃষ্টি। সারামুখে একটা সংকুচিত অপরাধীর ভাব। যেন বুকের ভেতরে কোথাও একটা যন্ত্রণা হচ্ছে, একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্ক থমকে আছে। মুখেচোখে তার প্রতিফলন! ফুটপাতবাসী সেই নিরন্ন রুগ্ন দুধের শিশুটা সত্যি কি তার পায়ের চাপে পিষ্ট হয়েছে? শক্ত জুতোর চামড়ার তলায় থেঁৎলে গেছে কি তার কচি বুকের হাড় পাঁজর? মুখ দিয়ে রক্ত উঠে এসেছে? কচি শরীরের মাংস দলা পাকিয়ে গেছে? মরে গেছে কি সে? মরে গেছে।

ভাবতেই সমীরের হাত পা আবার অবশ হয়ে এল। গলার কাছে

আটকানো অব্যক্ত চিৎকারটা ঘরের চারদেয়ালের মধ্যে বাধাহীনভাবে গোঙানির মত ছিটকে বেরুল। যেন সমীরকে বিষাক্ত কিছু একটা কামড়ে দিয়েছে এমনভাবে জুতো জোড়া একটানে খুলে ছুঁড়ে দিয়ে সে ছটফট করে উঠে দাঁড়াল। শীলা সমস্ত কিছু লক্ষ্য করছিল। অফিসফেরত স্বামীর এমন অদ্ভুত আচরণ সে আর কখনো দেখে নি। অবাক হয়ে বলল, 'কি হয়েছে তোমার? শুনছ! এই—'

সমীর মাথা উঁচু করে বউয়ের মুখ দেখল। তার চোখের দৃষ্টি অতিশয় ফ্যাকাশে, কপালের ডান দিকে নীলবর্ণের শিরাটা ভীষণভাবে ফুলে উঠে দপ দপ করছে!

শীলার গলায় উদ্বেগ ফুটে উঠল, 'কি হয়েছে বলবে তো!'

সমীর সামলে নিল নিজেকে। অনেক কথা আছে যা নিজের স্ত্রীকেও বলা যায় না! বলা উচিত নয়। সমীর খুব দ্রুত ভেবে সিদ্ধান্ত করল, আজকের ঘটনার কথা শীলাকে এইমুহূর্তে বলা যাবে না। হয়ত বা কোনোদিনও না।

হাত বাড়িয়ে লুঙ্গিটা টেনে নিয়ে বলল, 'কই কিছু হয় নি তো! জলে-ঠাণ্ডায় মাথাটা ধরেছে। একটু শুতে পারলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

'এখন শোবে? খাবে না?'

'না। খাওয়ার ইচ্ছে নেই একদম।'

'দু'একটা রুটি খাও।'

'না, প্লিজ, জোর করো না। আমার বিছানাটা ঠিক করে দিয়ে তুমি খেতে যাও।'

অনেক রাতে আকাশের সবটুকু মেঘ কেটে গিয়ে চাঁদের আলো ঘরে এসে পড়ল। সারাদিনের পরিশ্রমে এত ক্লান্ত সমীর, তবু ঘুমোতে পারছিল না। এতক্ষণ চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকার পর এবার একটা সিগেরেট খাবে বলে উঠে বসল। আর তখুনি বিচ্ছুরিত চাঁদের আলোআঁধারি রহস্যময়তায় ঘরের বিছানায় শায়িতা শীলা আর তার দুই বাচ্চার ঘুমন্ত শরীর তার নজরে পড়ল। শীলা

ছ'পাশে বাচ্চা দুটো নিয়ে কেমন নিশ্চিন্তে শুয়েছে। বড়টার একটা পা শীলার কোলের উপর। ছোটটার মুখ বগলের কাছাকাছি। সম্ভবত একটু আগেই বুকের দুধ চুষেছে। কেননা শীলা ডানদিকে সামান্য কাৎ হয়ে আছে। তার একটা স্তন পুরোপুরি অনাবৃত। চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত মা ও শিশুর এমন চমৎকার সহাবস্থান দেখে সমীর মুগ্ধ হতে পারত, কারণ মাঝরাতে ঘুম ভেঙে এমনটি সে কখনো দেখেনি। কিন্তু মুগ্ধতার পরিবর্তে আজ তার সমস্ত অন্তরাত্মা ভীষণ ভাবে চমকে উঠল। কেননা তৎক্ষণাৎ আবার ফুটপাতের সেই শিশুটির কথা মনে পড়ে গেল, আর তার প্রায়-নগ্ন কঙ্কালসার মায়ের চেহারাটা! জলের ছাঁটে শিশুদেহ ভিজে যাবে বলে ফুটপাতবাসিনী সেই জননী তার শেষতম সন্তানটিকে কোলের কাছে টেনে মলিন আঁচলে শরীর ঢেকে ছেঁড়া কাঁথায় শুইয়ে রেখেছিল।

প্রাত্যহিক ট্রেন ধরার তাগিদে ধাবমান সমীর দেখেও দেখেনি। সে একটা পরিপূর্ণ প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষিত মানুষ, অথচ তারই পায়ের চাপে মহানগরীর বুকে পিষ্ট হ'ল এক নিরন্ন শিশু—

সমস্ত চাঁদের আলো মুহূর্তে কালো হয়ে সেই চিৎকারগুলো ভেসে এল। প্রথমে শিশুকণ্ঠের চাপা অতর্কিত আর্তধ্বনি। তারপর মায়ের গলার তীক্ষ্ণ চেরা দীর্ঘ আর্তনাদ। তারপর ফুটপাতবাসী বহু মানুষের সম্মিলিত চাপা ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর। এই নীরব নিঃশব্দ রাত্রিতে সমস্ত চিৎকার একসঙ্গে মিলেমিশে যেন ভয়ানক একটা তাণ্ডব শুরু করে দিল। সমীর সহসা দারুণ ভয় পেয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে চাপাগলায় গুঙিয়ে উঠল, 'না, না, আমার কোনো দোষ নেই, আমার কিছু দোষ নেই!'

'দোষ নেই!' সমীরের মনের মধ্যে আরেকটা মন তৎক্ষণাৎ গর্জে উঠল, 'একটা জীবন্ত শিশুসন্তানকে পা দিয়ে পিষে দলে চলে এসেছ তুমি, বলছ দোষ নেই! চমৎকার!'

সমীর আবার অপ্রকৃতিস্থের মত ঘাড় নাড়ল, অস্ফুটে বলল, 'না, আমার কি দোষ! আমি কি ইচ্ছে করে পা দিয়েছি!'

'ইচ্ছেয় হোক, অনিচ্ছেয় হোক, তুমিই দায়ী। একমাত্র তুমিই!'

সমীর হাঁটুর উপর থেকে হাত নামাল। অন্ধকারে ওর চোখের মণি জ্বলজ্বলে দেখাল। চোয়ালদুটো শক্ত হয়ে ঠেলে উঠল। হাতের আঙুলগুলো দিয়ে সে বিছানার চাদরের অংশ খামচে ধরল। যেন সামনেই কোনো এক অদৃশ্য বিচারক তার অপরাধের দণ্ডবিধানের জন্য প্রবলভাবে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে, সমীর আত্মরক্ষার চেষ্টায় শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করে সোজা টানটান হয়ে বসল—

'আমার ট্রেন ধরার তাড়া ছিল।'

'জানি।'

'বাইরে বিশ্রী রকমের বৃষ্টি পড়ছিল।'

'জানি।'

'লোডশেডিং ছিল। অন্ধকার—'

'তাতে কি?'

'আমি দেখতে পাইনি।'

'কেন দেখ নি? তুমি কি অন্ধ? জান না, এখন এই শহরে হাজার হাজার মানুষ, শিশু নারী যুবা বৃদ্ধ দিনেরাতে ফুটপাতে সংসার পেতে বসে আছে?'

'কেন বসে আছে?' সমীর হঠাৎ বিশ্রী রকমের ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল, 'ফুটপাত কি সংসার পেতে বসার জায়গা? মানুষ যাবে না ফুটপাত দিয়ে?' প্রশ্নটা শেষ হতে না হতেই সমস্ত অন্ধকার যেন হেসে উঠল হা হা করে। আসলে বাইরে একটা দমকা বাতাস বয়ে গেল। বাড়ির পাশের সুপুরী গাছের পাতায় বাতাসের ধাক্কা লেগে শব্দ উঠল সর্-সর্। একখণ্ড মেঘের আড়ালে প্রাক্ পূর্ণিমার চাঁদ ঢাকা পড়ায় ঘরের ভেতরে অন্ধকার আরো গাঢ় হ'ল। সমীর স্পষ্ট শুনতে পেল তার মনের ভেতর যে মন সে তীব্র বিদ্রূপের সুরে বলছে, 'নিয়মের কথা বলছ তুমি? আইনের কথা? জান না, কারা আজ ভিটেমাটি ছেড়ে শহরের ফুটপাতে এসে ভিড় জমিয়েছে? দেখো নি ওদের হাড় জিরজিরে শরীরগুলো? শোনো নি ওদের দীর্ঘ

উপবাসী আর্তনাদ ? জানো না, এখন দেশ জুড়ে দুর্ভিক্ষ ? মানুষ গাছের পাতা বুনোঘাস খাচ্ছে—'

সমীর আস্তে আস্তে মাথা নত করল, 'জানি।'

'তোমার সংসার চলে না বলে তুমিও তো সেদিন ডি-এ বাড়ানোর দাবিতে মিছিল করলে।'

'করেছি।'

'ঘরে তোমার বাচ্চাদুটোও পেট ভরে খেতে পায় না, বউটা কত দিন উপোসী থাকে।'

'থাকে।'

'তোমার বাঁধা আয়টুকু আজ চলে গেলে ওরাও ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে কালই ফুটপাতে যাবে—'

'ফুটপাতে ? না—না।' সমীরের সমস্ত মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। নিক্ষিপ্ত আবর্জনায় দুর্গন্ধময় ফুটপাত, এখানে ওখানে গর্ত, কুকুর বেড়াল, তারই সঙ্গে একত্রে উলঙ্গ অভুক্ত শিশুর দল, প্রায়-উলঙ্গ মেয়েরা, পাশাপাশি গাদাগাদি ছেঁড়াকাঁথা টিনের বাসনের সংসার, ক'দিনের বাসি রুটি, পচা ভাত, নিমন্ত্রণ বাড়ির ভুক্তাবশেষ, কুড়িয়ে আনা পচা তরিতরকারির খোসা, ইটের উনুনে কোথাও ধোঁয়া উঠছে, চিৎকার চেঁচামেচি গালমন্দ, তার মধ্যে খিদের জ্বালায় প্রাণ-পণ চেঁচাচ্ছে একটা বাচ্চা, নিরুপায় বেদনায় কোনো মা বুক চাপড়ে কেঁদে চলেছে, খড়ি-ওঠা শরীরের এক বৃদ্ধ কুঁজো হয়ে নিজের মাথার চুল নিজেই ছিঁড়ে যাচ্ছে নিষ্ফল ক্রোধে—

এই সমস্ত দৃশ্য মনে পড়তে এবং গলিত দুর্গন্ধময় নরকতুল্য সেই ফুটপাতের কোনো অংশে আপন স্ত্রী ও সন্তানের অবস্থানের কথা ভাবতেই সমীরের সারা শরীর কেমন ঠাণ্ডা হয়ে এল। ভয়ে ভয়ে আবার ঘাড় নাড়ল সে, 'না—না।'

অদৃশ্য বিচারক কথা বলল না। আবার হাসল শব্দ করে।

সমীর অল্পকাল চুপচাপ বসে থেকে বিড় বিড় করে বলল, 'হ্যাঁ, আমি অপরাধী, আমার সাবধানে পথ হাঁটা উচিত ছিল।'

'শুধু এইটুকু ?' অন্ধকার আবার গম গম করে উঠল।

সমীর তাকাল ভ্রূ কুঁচকে। অন্ধকারে দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করল। যেন কিছু দেখতে চাইল। তারপর বলল, 'না, আমার অপরাধ আরো বেশী। বাচ্চাটার গায়ে পা পড়ার পর আমার উচিত ছিল দাঁড়িয়ে পড়া। দেখা, তার আঘাত কতটুকু। দরকার হলে কাছাকাছি কোনো ডাক্তারখানায় নিয়ে যাওয়া, অথবা হাসপাতালে—'

'দাঁড়াও নি কেন ?'

'ভয়ে।'

'কার ভয় ? ওই কঙ্কালসার অভুক্ত উলঙ্গ মেয়ে-পুরুষ—'

'না, ঠিক ওদের ভয় না। ওরা বড় অসহায়, বড় দুর্বল। আমি ভয় পেয়েছিলাম বাচ্চাটা যদি পায়ের চাপে থেঁৎলে গিয়ে থাকে—'

'তাহলে ?'

'তাহলে আশেপাশের লোকজন দোকানদাররা ছুটে এসে আমাকে হয়ত মারতে শুরু করবে। হয়ত পুলিশে দেবে—'

'তার জন্য তুমি পালিয়ে এলে ?'

'পালিয়ে এলাম।'

'একটা নিরন্ন ক্ষীণপ্রাণ শিশুকে পায়ের তলায় পিষ্ট করে সে বাঁচল কি মরল খোঁজটুকু না নিয়েই পালিয়ে এলে ?'

'এলাম।'

'তুমি ?'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। আমি।'

'তুমি কি মানুষ ?'

'নই ?'

'মানুষ কি এমন কাজ করে পালাতে পারে ?'

'পারে না ?'

'তুমি কি বল ?'

'কিন্তু দাঁড়িয়ে পড়লে আমার জীবন যে বিপন্ন হত ?'

'হ'ত না। সেই আহত শিশুটিকে বুকে তুলে নিয়ে তুমি যদি

তৎক্ষণাৎ কোনো ডাক্তারখানার দিকে দৌড়ে যেতে, সবাই তোমাকে সাহায্য করত। এমন কি যার শিশু সেই হতভাগিনী মা-ও তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকত—'

'হয়ত থাকত। কিন্তু আমি…আমি……'

সমীর সহসা চুপ করে গেল।

চুপ করে থাকল অনেকক্ষণ।

ঘর নিঃশব্দ। মাঝে মাঝে স্ত্রীপুত্রদের নিশ্বাসপতনের শব্দ শোনা যাচ্ছে। বাচ্চাদুটোর কেউ একজন পা দাপাল। বাইরে অন্ধকারে রাস্তায় একটা কুকুর ডাকল।

সমীর আস্তে আস্তে ভাঁজ করা হাঁটুর উপর মাথাটা নামিয়ে আনল। তার চোখের জ্বল-জ্বলে ভাবটা মরে গেছে। এতক্ষণ পরে বুকের ভেতর একটা কান্না গুড় গুড় করছে। ঠোঁটদুটো কেঁপে কেঁপে উঠছে। শুকনো চোখের পাতা জলে ভিজে উঠতে চাইছে। যেন এতক্ষণ পরে তার অপরাধের গুরুত্ব অনুভব করছে সে। অনু-শোচনায় সমস্ত মন ভরে উঠছে। বুকের ভেতরটা থর থর করে কাঁপছে।

অনেকক্ষণ একই ভাবে বসে থাকার পর আবার আস্তে আস্তে মাথা তুলল সে। ঘরের ঘনীভূত অন্ধকারের মধ্যে অপেক্ষমান যে অদৃশ্য বিচারক, তার দিকে সজল নেত্রে তাকিয়ে অস্ফুটে উচ্চারণ করল, 'হ্যাঁ, আমি অপরাধী। আমার শাস্তি হওয়া দরকার—'

বার কয়েক শব্দ ক'টি আবৃত্তি করে সে যেন মনে জোর পেল। আবার নিঃশব্দ থেকে গভীরভাবে কিছু একটা চিন্তা করল। তার মুখের ভাব কঠিন হ'ল। চোখ আবার অন্ধকারে জ্বলতে লাগল। চোয়াল দৃঢ়, ওষ্ঠাধর সংবদ্ধ হ'ল। খুব তীক্ষ্ণ ধারালো দৃষ্টিতে সম্মুখপানে তাকিয়ে স্পষ্ট তীক্ষ্ণ গলায় মনে মনেই চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমি তো অপরাধী, অন্ধকারে না জেনে শিশুকে মাড়িয়ে দিয়েছি। কিন্তু এইসব শিশুরা ফুটপাতে কেন? কেন হাজার হাজার মানুষ শহরের পথঘাট জুড়ে সংসার পেতেছে? . কে

ওদের গ্রাম ছাড়া করল? ঘর ছাড়া করল? ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করে প্রাণহীন শহরের শক্তঠাণ্ডা ফুটপাতে ঠেলে দিল? কার অপরাধে ওরা নিরন্ন, উপবাসী? কার চক্রান্তে ওদের শিশুরা অন্ধকারে আবর্জনায় শুয়ে শুয়ে খিদের জ্বালায় ছটফট করে? কেন পথচারীর পায়ের চাপে ওদের দুখের শরীর পিষ্ট হয়? এর জন্য কে দায়ী? সেই আসল অপরাধীরা কোথায়? কোন্ অন্ধকারে সেই খুনীগুলো লুকিয়ে আছে? তার বিচার কে করে? তার শাস্তি কে দেয়? বলো, বলো তুমি, তার শাস্তির কি হবে—'

বলতে বলতে উত্তেজনায় সমীর বিছানা ছেড়ে মেঝের উপর সোজা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। ভঙ্গিটা এমন, যেন এক্ষুনি সে আক্রমণের জন্য কারো উপর সবেগে ঝাঁপিয়ে পড়বে!

পথ হাঁটতে মানুষ

হাওড়া থেকে ছ'টা বাইশে ছেড়ে রাত আটটার কাছাকাছি যে ট্রেনটা পূর্বরেলের এই মফস্বল স্টেশনে পৌঁছায়, তারই কোনো কামরা থেকে হালকা নীল রঙের ব্যাগ হাতে অর্চনা বসু প্ল্যাটফর্মে নেমে ক্ষণকালের জন্য থমকে দাঁড়ায়। অনুজ্জ্বল আলোর বৃত্তের দিকে তাকিয়ে সতৃষ্ণভাবে মানুষ খোঁজে। একজন পরিচিত বিশ্বস্ত মানুষ। অনেকটা পথ তাকে হাঁটতে হবে। যা দিনকাল, একা একা কি পথ হাঁটা যায়, না হাঁটা উচিত? সঙ্গী চাই, পরিচিত নির্ভরযোগ্য একজন সঙ্গী।

অথচ এই অর্চনা ক'দিন আগেও মানুষের উপর বিতৃষ্ণ ছিল। মানুষ এড়িয়ে চলত। মানুষ দেখলে বিরক্ত হ'ত। এমন কি, ক্রুদ্ধ মুহূর্তে এমন কথাও ভাবত, 'মানুষের কাছে মানুষের মতো ঘৃণ্য আর কি আছে!'

মানুষ সম্পর্কে এ রকম অদ্ভুত ধারণা, এমন ক্ষোভ ও তিক্ততা আগে অবশ্য ছিল না। আগে এ সব ভাবতও না। ক'বছর চাকরিতে ঢুকে ক্রমে তার মনটা বিষিয়ে উঠেছিল। ট্রেনে ট্রামে বাসে ফুটপাতে সর্বত্র অফুরান অসংখ্য ধাবমান মানুষের পিণ্ড দেখতে দেখতে ক্রমে তার মনে হ'ত, কালো কুচ্ছিৎ লোম-ওঠা কাদা-মাখা যত শূকরছানা কিলবিল করতে করতে খাদ্যের সন্ধানে ছুটছে। একজন আরেকজনের গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ছে, ঠেলে দিচ্ছে, কামড়াকামড়ি রক্তারক্তি করছে, আর্তনাদ তুলে গড়াগড়ি খাচ্ছে, আবার ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দে ছুটে যাচ্ছে দল বেঁধে! হুঁস বলে কারো কোনো বস্তু নেই। অভদ্র অসহিষ্ণু ইতর লম্পট সব! মানুষ আর মানুষ নেই, জন্তু জানোয়ার হয়ে গেছে—

কলকাতার বড়বাজার এলাকায় পোস্ট অফিসে কাজ করে অর্চনা।

মনিঅর্ডার নেয়, খাম পোস্টকার্ড বিক্রি করে, রেজিস্ট্রি বা পার্শেলের কাউন্টারেও বসে। আসলে পোস্টমাস্টার যখন যেমন হুকুম করে—তখন তেমন কাজই করতে হয়।

সকাল আটটা চল্লিশের ট্রেন ধরে সে হাওড়া আসে। ভিড়ের চাপে ঠাসাঠাসি গাদাগাদি হয়ে রীতিমতো যুদ্ধ করেই আসতে হয়। এইসময় তার ছিমছাম ফর্সা মুখের সামান্য প্রসাধন ঘামে ধুয়ে যায়, পরিপাটি চুলের খোঁপা ভেঙেচুরে কাঁধের উপর এলিয়ে পড়ে। শাড়ির ভাঁজ স্থানে স্থানে বিশ্রীভাবে কুঁচকে যায়, এমন কি কোনো কোনো দিন তার সস্তা ব্রেসিয়ারের বাঁধনও আলগা হয়ে যায়, ব্লাউজের তলা দিয়ে ফিতা ঝুলে পড়ে। সকালের স্নান-করা ধোয়া-মোছা দোহারা সুন্দর শরীরটা মানুষের চাপে গরমে ঘামে কটুগন্ধে বিশ্রী রকমের অস্থির, অবসন্ন, তিক্ত হয়ে ওঠে! নিজের দেহকে নিজের কাছেই অশুচি অস্পৃশ্য মনে হয়। যেন আর একবার গঙ্গায় ডুবে স্নান করতে পারলে বাঁচে—

ভিড়ের স্রোতে ভাসতে ভাসতে সে হাওড়া স্টেশনের বাইরে এসে দাঁড়ায়। অসহায়ভাবে তাকায় ট্রামবাসগুলোর দিকে। তারপর হাঁটতে থাকে। হাঁটতে হাঁটতে সে বড়বাজারে পৌঁছায়। নিতান্ত দায়ে না ঠেকলে রিক্সার কথা চিন্তাও করে না।

ছুটির পর আবার হেঁটেই তাকে ট্রেন ধরতে হয়। তখনো ট্রামে-বাসে ওঠা তার মতো মেয়েলি শরীরের সাধ্যের বাইরে। হাওড়ার টার্মিনাস থেকেই যে উঠতে পারে না, সে কি মাঝপথে কোথাও পা রাখার জায়গা করতে পারে। বিশেষ করে বিকেলের দিকটায় এই অঞ্চলে ট্রামবাসঠেলারিক্সামুটেমজুর মিলে এমন কদর্য একটা জট পাকিয়ে যায় যে কিছুই আর এগুতে চায় না। এক মিনিটের পথ এক ঘণ্টা হয়। তখন গাড়িঘোড়ার ভরসায় থাকলে ছ'টা বাইশ কেন, এগারোটা বত্রিশের শেষ লোক্যালও ছেড়ে যাবার দাখিল হয়! অর্চনা ঝুঁকি নেয় না। অফিস থেকে পথে নেমে সোজা হাঁটতে থাকে।

কিন্তু স্বচ্ছন্দে হাঁটার পথটুকুও কি আছে? রাজ্যের ট্রাফিক

আইনকে চমৎকার কলা দেখিয়ে দিনভর দু'পাশে দাঁড় করানো থাকে রঙ বেরঙের গাড়ি। সঙ্কীর্ণ রাস্তার বুকে জট-পাকানো যানবাহন ঠেলাঠেলি করে। ফুটপাতে সার বেঁধে বসে থাকে হকারেরা। ডাইনে বাঁয়ে জিনিষপত্র, আবর্জনা, তরল কাদার স্তূপ। তার মাঝখান দিয়ে এঁকেবেঁকে কষ্ট করে আসাযাওয়া করে রাজ্যের মানুষ। সোজা চলার উপায় নেই, দ্রুত হাঁটার পথ নেই। পায়ে পায়ে থামতে হয়, বেঁকতে হয়, ফুটপাত ছেড়ে রাস্তায় নামতে হয়, আবার ঠোক্কর খেয়ে লাফিয়ে ফুটপাতে উঠতে হয়।

রাগে বিরক্তিতে অর্চনার শরীর রি রি করে! একেই তো মানুষের জন্য ট্রামেবাসে ওঠার উপায় নেই, যদি-বা কালেভদ্রে কখনো পাদানিতে একটু জায়গা পেয়ে গেল, অমনি চারদিক থেকে গোল হয়ে ঠেসে ধরল মানুষ। সামনে পেছনে সমান চাপ! যেন নরম শরীরের একটা মেয়েমানুষকে কব্জায় পেয়ে উৎসব বেঁধে গেল চারপাশে! হিংস্র আরণ্যক উৎসব। তলার দিকে কোমরের মাংসে কদর্যভাবে চাপ দিচ্ছে কেউ, সামনে মাথার চুলে মুখ ঠেকিয়ে বুকটা ঠেসে ধরেছে একজন, হাতের ডানা জড়িয়ে আরেকটা হাত, হাঁটুর কাছে আর একটা হাঁটু। ইতরতা বর্বরতার শেষ নেই, অথচ সকলের মুখে-চোখেই দিব্যি ভদ্র নিরীহ ভাব, যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না, যেন নিতান্ত নিরুপায় হয়েই—

অর্চনা বোঝে সবই। সাতাশ বছর বয়স হ'ল তার, ভিড়ের মধ্যে কোন্ মানুষটা নিরুপায়, আর কোন্ মানুষটা মতলববাজ, মেয়ে-মানুষের শরীরে শরীর লেপটে সুখ খুঁজতে চাইছে—তার কি অজানা! কিন্তু জেনেবুঝেও কি করার আছে? কি করতে পারে সে! সর্বত্র মেয়েদের ওই এক অবস্থা! মানুষ আর মানুষ নেই, দিনে দিনে অমানুষ হয়ে উঠছে ক্রমশ! একদিন হাওড়ায় পৌঁছে বাস থেকে নামার সময় কে যেন পা দিয়ে চেপে ধরেছিল তার আঁচলটা, শাড়ি খুলে উপরের সবটুকু প্রায় অনাবৃত হয়ে পড়েছিল, শক্ত মুঠিতে একটা অংশ চেপে-ধরে ভয়-বিবর্ণ গলায় চিৎকার করে উঠেছিল অর্চনা।

অথচ আশ্চর্য, ভিড়ের মানুষগুলো দাঁত বের করে হাসছিল!

ফুটপাতে ট্রামবাসের মত দমবন্ধ করা ঠাসাঠাসি ভিড় নেই। তবু হাঁটা যায় না ঠিকমতো। কেননা, রাস্তা সঙ্কীর্ণ এবং মানুষ অসংখ্য। অসহিষ্ণু ধাবমান মানুষ। ক্ষণে ক্ষণে থামতে হয় অর্চনাকে। ক্ষণে ক্ষণে রাস্তা বদলাতে হয়। ভিড়টা কোথাও হঠাৎ জমাট বেঁধে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠলে অচঙ্গ অনড় দাঁড়িয়ে পড়তে হয়। এইসময় আগে-পিছের মানুষের সঙ্গে শরীর জড়িয়ে যায়। চাপ পড়ে। মানুষের গায়ের গন্ধে, ঘামের গন্ধে, রকমারি চুল চামড়া তেল জামাকাপড়ের কটু গন্ধে নাক জ্বালা করে, শ্বাস টানতে কষ্ট হয়, গা ঘুলিয়ে বমিভাব দেখা দেয়। তখন ফাঁদে-পড়া জন্তুর মতো দু'হাতের থাবায়-কনুইয়ে প্রাণপণে ভিড় ঠেলে ফাঁকা জায়গায় বেরিয়ে আসার জন্য ছটফট করে। অসম্ভব রুক্ষ, বিপর্যস্ত মনে হয় তখন অর্চনাকে, কেননা সারাদিনের খাটাখাটুনিতে সে ক্লান্ত থাকে। চোখ গর্তে বসে যায়। গাল ও চিবুকের মাংস সেদ্ধ-হওয়া শাকসব্জীর মতো কোঁচকানো চুপসানো মনে হয়, গলার কাছে কণ্ঠার হাড়ে ধুলোবালির মলিন কণা ঘামের সঙ্গে লেপটে থাকে, কোমরের কাছে সায়ার দড়িটা আলগা হয়ে খুলে পড়তে চায়। আসলে এ-সময় খুব খিদে লাগে তার। খিদেয় পেটটা চুপসে যায়, পাকস্থলী মোচড় দেয়। শিথিল অবসন্ন ক্লান্ত শরীর নিয়ে শক্ত সবল হয়ে হাঁটতে পারে না নিজেই, তার উপর ক্রমাগত মানুষের চাপ যদি পড়ে, মানুষের জন্য ক্রমাগত দাঁড়িয়ে পড়তে হয় কি রাস্তা বদলাতে হয়, তাহলে মানুষ সম্পর্কে কি ভাবতে পারে সে?

মানুষ বেড়ে গেছে, অসম্ভব বেড়ে গেছে। অস্বাভাবিক ব্যস্ত বিকারগ্রস্ত মানুষ। জ্বরো রুগীর তপ্ত খিঁচ মানুষের শরীরে। তার হাঁটা চলা কথা বলায় কোথাও কোনো সুস্থতা নেই। মানুষের সঙ্গে মানুষ আর পথ হাঁটতে পারে না। বিশেষত যদি মেয়েমানুষ হয়—

ঝাঁক-বাঁধা পঙ্গপালের মতো মানুষের ভিড় ঠেলে হাওড়া ব্রীজের ফুটপাতে পৌঁছায়। পায়ে পায়ে হেঁটে ব্রীজের উঁচু অংশ পার হতে

খুব কষ্ট হয় অর্চনার। কোমর ভেঙ্গে আসতে চায়, পায়ের পাতা অবশ হয়ে আসে। মনে হয় খাড়া পাহাড় বেয়ে উপরে উঠছে, বুকে পিঠে অনেক বোঝা, শরীর টলমল করছে, মাথায় যন্ত্রণা, গঙ্গার বুক থেকে উঠে-আসা ফুরফুরে ঠাণ্ডা বাতাস চলমান মানুষের মিছিলের ফাঁকফু`ক দিয়ে নাকেমুখে ঝাপটা দিয়ে যাচ্ছে ঠিকই কিন্তু ফুসফুস তাকে ভেতরে টানার শক্তি হারিয়েছে বলে দমচাপা কষ্ট। কষ্টে সারা দেহ গরম হয়ে উঠছে, ঘাড় গলা বুক বেয়ে টপটপ ঘামের ফোঁটা ঝরছে, শরীরের শাড়ি সায়া ব্লাউজ মনে হচ্ছে ফাঁস, এমন কি নিজের স্তন-জোড়াকেও মনে হচ্ছে বোঝা, যেন সবকিছু ছিঁড়েফেঁড়ে গঙ্গায় ছুঁড়তে পারলেই হাল্কা হয়ে ভিড় ঠেলে ঠেলে এই উঁচু পথটা কোনোক্রমে পার হয়ে যেতে পারবে সে……এইভাবে অর্চনা কুঁজো হয়ে হাঁটতে থাকে। তারপর ঢালু দিকটায় পা ফেলা মাত্র শরীরের ভার লঘু হালকা হওয়ায় গভীর একটা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করতে গিয়েও ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে। কেননা পেছন থেকে তর্‌তর্‌ করে এগিয়ে আসা মানুষ দম টানার জন্য তাকে একমুহূর্তও দাঁড়াতে দেয় না, একরকম গায়ে গা ঠেকিয়ে ধাক্কা দিয়েই সামনের দিকে ক্রমাগত ঠেলে নিয়ে যায়।

তারপর প্ল্যাটফর্মে পৌঁছে আবার মানুষ! অজস্র অসংখ্য মানুষ। ট্রেনের কামরা উপচে পড়ছে মানুষে। অর্চনা অসহায়ভাবে তাকায় আর পায়ে পায়ে এগুনোর চেষ্টা করে। এইসময় কথা বলার শক্তিটুকুও অবশিষ্ট থাকে না বলে পরিচিত কেউ ডাকাডাকি করলে সাড়া দেয় না। বসার জায়গা নয় শুধু সোজা হয়ে একটু দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভব—এমন কামরা খোঁজার চেষ্টা করে। কথা বলার জন্য পরিচিত মানুষ সে খোঁজে না।

এই ট্রেনেই সন্ধ্যা দাস বাড়ি ফেরে। একদা কলেজের বন্ধু ছিল। দেখতে পেলে ডাকাডাকি করে, 'আয় অর্চনা! এই যে আমি, এদিকে—'

অর্চনা ক্লান্তভাবে ঘাড় ফেরায়, 'আছে? জায়গা আছে?'

'না, দাঁড়িয়ে যেতে হবে। আয়—'

'জায়গা নেইতো কি হবে গিয়ে?'

'আয় না, পালা করে বসা যাবে, গল্প করা যাবে—'

'উঁ হুঁ! সামনের কামরাগুলো দেখে আসি বরং—'

দাঁড়ায় না। মানুষ ঠেলে ঠেলে এগুতে থাকে। সন্ধ্যার সঙ্গে একত্রে বসে বা দাঁড়িয়ে কি আছে গল্প করার? কি থাকতে পারে তাদের জীবনে? বস্তাপচা কিছু পুরনো কথার পুনরাবৃত্তি কে শুনতে চায়! কে বলতে ভালবাসে! সন্ধ্যাকে পেছনে ফেলে যতখানি সম্ভব দ্রুত সামনের দিকে এগিয়ে যায় অর্চনা।

এ সময় আবার হয়ত কেউ ডাকে, 'এই যে মিস বসু, আসুন, উঠে আসুন!' দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে মানুষটা, ভেতরেও ঢুকতে পারে নি। তবু ছাখো, অন্যকে ডাকার উৎসাহে ভাঁটা নেই! অর্চনা ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসির মতো একটা ভঙ্গি করে। তার পর সামান্য রুক্ষভাবেই বলে, 'কোথায় উঠব? নিজেই তো ঝুলছেন!'

'হয়ে যাবে! আসুন না। সব কম্পার্টমেন্টেরই তো এক অবস্থা!

'আচ্ছা দেখি, মেয়েদের গাড়িটা দেখি—'

আসলে এইসব পরিচিত মানুষকে ইচ্ছে করেই এড়িয়ে যায়। যেন কাউকেই সহ্য করতে পারে না অর্চনা। পথ চলতে আর সঙ্গীর দরকার নেই তার। কারো সাহায্যও চায় না সে। একটা কামরা বেছে নিয়ে নিঃশব্দে দাঁড়াতে চায়। সারাদিন মানুষে মানুষে সে বিধ্বস্ত, বিপর্যস্ত। মানুষের কটুগন্ধে, মানুষের ঘামে, গায়ের তাপে তার শরীর অবসন্ন, শিথিল, জ্যাবজ্যাবে। এখনো এই ট্রেনের কামরায় দমচাপা ভিড় সে এড়াতে পারবে না, এখনো অনেকেই গোল হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়বে শরীরের উপর, এখনো অনেকখানি পথ মনে হবে এক দঙ্গল মানুষ না, একরাশ আবর্জনার স্তূপের মধ্যে দমচাপা হয়ে বেঁকে তুমড়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। তবু পথটুকু ঘাড় গুঁজে বোবা হয়ে অতিক্রম করতে চায়। এসময় কারো সঙ্গে কথা বলতেও প্রচণ্ড ক্রোধ ও ঘৃণা হয় তার!

স্টেশনে নেমে অনেকখানি পথ হেঁটে বাড়ি পৌঁছতে হয়। প্রথমে পড়ে ছোটখাটো একটা বাজার। একটু এগিয়ে স্কুল বাড়ি। তার চৌহদ্দি পার হলে পুরনো শিবমন্দির। রাস্তা ক্রমশ নির্জন হতে থাকে। বাঁ-দিকটায় বিশাল ভূখণ্ড কাঁটাতারে ঘেরা। কারখানার জন্য সংরক্ষিত জমি। বছরের পর বছর পড়ে থেকে এখন ঝোপ ঝাড় জঙ্গলে সাপ শেয়ালের আড্ডা হয়েছে। ডান-দিকটায় ছাড়া ছাড়া ভাবে দু'একটা পাকা বাড়ি, মিত্তিরদের মস্ত বড়ো একটা কাঠগোলা, ইটের ভাটা, চুণ-সুরকির আড়ৎ। মাঝখান দিয়ে খোয়া-ছড়ানো সরু রাস্তাটা বার কয়েক বাঁক নিয়ে এগিয়ে গেছে উদ্বাস্তু কলোনীর দিকে। এখানে পর পর অনেক ঘড়বাড়ি আছে। কোনোটা ইটের, কোনোটা টিনের, কোনোটা বাঁশের। এরই একটায় থাকে অর্চনারা। তাদের বাড়িটা অবশ্য একতলা, ইটের গাঁথুনির। বাবা বনিয়েছিলেন। এখন অর্চনারা অর্থাৎ অর্চনার উপর নির্ভরশীল মা ভাই বোনেরা ভোগ করে। বাবার সম্পর্কে অনেক অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও মাথা গোঁজার এই স্থায়ী ঠাঁইটুকুর জন্য অর্চনার বুকে এখন অসম্ভব কৃতজ্ঞতা টলমল করে।

সে যখন বাড়ি ফেরে এই পথটা তখন প্রায় নির্জন হয়ে যায়। কলকাতার নিত্য যাত্রীরা আগের ট্রেনে চলে আসে বলে লোক চলাচল তেমন থাকে না। কাঠগোলা, ইটের ভাটার কাজও বন্ধ হয়ে যায়। দূরে দূরে ইলেকট্রিকের খুঁটিতে কম পাওয়ারের আলোগুলো নিস্তেজভাবে জ্বলে। কারখানার পোড়ো জমিতে শেয়াল ডাকে। বট পাকুড় আমলকির ডালে নিশাচর পাখি ডানা ঝাপটায়। রাংচিতা কাসুন্দি বনতুলসীর ঝাড়ে জোনাকিরা মিট মিট করে। কচিৎ কোনো বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছে গেলে শিশুর কান্না, মায়েদের ধমকধামক এবং পুরুষকণ্ঠের উচ্চ হাসির শব্দ শোনা যায়। দূরের উদ্বাস্তু কলোনীর টিমটিমে আলোগুলি আকাশের তারার সঙ্গে মিলে মিশে একাকার হয়ে থাকে। নির্জন নিরিবিলি এই পথটুকু একা একা হাঁটতে কি ভালই যে লাগে অর্চনার। মনে হয়, গ্রীষ্মের

প্রখর রোদ্দুরে ঝলসে-যাওয়া শরীর নিয়ে চমৎকার ঠাণ্ডা এয়ার-কণ্ডিশনড কোনো জনশূন্য হলঘরে ঢুকে পড়েছে। ভিড় নেই, মানুষজনের গায়ের ঘাম, চামড়ার গন্ধ, ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি হৈ-হট্টগোল নেই। চারদিক থেকে ফুরফুরে বাতাস উঠে এসে দেহমন জুড়িয়ে দিচ্ছে, ক্লান্ত ক্রুদ্ধ স্নায়ুগুলোকে সুন্দর আরামের স্পর্শে নরম সতেজ করে তুলছে। আগোছালো পা ফেলে পার্কে বা ময়দানের ঘাসে বেড়ানোর মতো হেঁটে যেতে কি আশ্চর্য ভাল লাগছে। আহা, কলকাতার পথঘাট, ট্রাম বাস ট্রেন, কি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মগুলো যদি এমন নির্জন, এমন মনুষ্যশূন্য হত!

এই পথ-হাঁটাটুকুই পরিপূর্ণ বিশ্রাম অর্চনার কাছে। এমন নিশ্চিন্ত নিরুদ্বিগ্ন বিশ্রামের অবসর সে আর কোথাও পায় না, কখনো পায় না। ট্রামেবাসে তো কথাই নেই, এমন কি অফিস এবং বাড়িতেও সব সময় সে উত্যক্ত অসহিষ্ণু থাকে। সবসময়ই কিছু মানুষ নিজের নিজের স্বার্থে তাকে তাড়া করে, খুঁচিয়ে মারে। সে যে অফিসে মাইনে-খাওয়া একজন ক্রীতদাসী অথবা সংসারে সকলের কাছে দায়বদ্ধ একথা কেউ কখনো তাকে ভুলতে দেয় না!

অফিসে ভিড়ের চাপে পিষ্ট হয় না বটে, কিন্তু মনিঅর্ডার কিংবা টিকিট বিক্রির কাউণ্টারে বসলে নিজেকে ক্রীতদাসী ছাড়া আর কি মনে হয় অর্চনার? যেন সামান্য বেতনের বিনিময়ে সে তার সমস্ত মানসম্মান, নারীত্ব বাঁধা দিয়েছে। তাকে নিয়ে যে যা খুশি করতে পারে, যে যা খুশি বলতে পারে! যেন খাঁচায় আটকানো সার্কাসের জন্তু সে! 'এই যে দিদিমণি, ঘুমুচ্ছেন নাকি? হাতটা চালান দয়া করে। একটা মণিঅর্ডার নিতেই যে রাত পুইয়ে গেল।' 'এই যে মিস্, নাকি মিসেস্? শালা, আজকাল তো কিছু বোঝাও যায় না! তা, দেড় ডজন খাম পোস্টকার্ডের দাম কষতেই যে ঘেমে নেয়ে উঠছেন! বলি, পেটে কিছু আছে? না স্রেপ খুঁটির জোরে…?' 'যা শ্‌শালা! আমি কেন ভাঙানি খুঁজতে যাব? খুঁজুন, আপনি খুঁজে আনুন যেখান থেকে পারেন। এটা আপনার ডিউটি!' 'অচল?

এই আধুলিটা অচল? ভারি পয়সা চেনেন দেখ্ছি! যান, যান, চোখটা শীগ্‌গির দেখিয়ে আসুন ডাক্তারকে!' 'আরে মশাই, ছাগল দিয়ে কি ধান ভানা হয়! মেয়েছেলের কাজই হাতাখুন্তি নাড়া আর গভ্যোধারণ, হি-হি-হি!'

মানুষ! এরা সবাই মানুষ! জামায় কাপড়ে ভদ্র শিক্ষিত মানুষ! অর্চনার সারা মুখ রাগে অপমানে ঝলসে যায়। নাকের পাটা ফুলে ওঠে। ক্ষিপ্ত আহত দৃষ্টিতে তাকায় ওদের দিকে। দাঁতে দাঁত চেপে অস্ফুটে কি যেন বলে! কাউন্টারের উপচে-পড়া অধৈর্য অসহিষ্ণু ভিড় আবার ধমকে ওঠে, 'চালান, চালান, হাত চালান দিদিমণি—'

সারাদিন এইভাবে অফিসে কাটিয়ে যখন বাড়ি ফেরে তখন সারা সংসার ছুটে এসে ঘিরে ধরে। যেন অর্চনার ফেরার জন্যই অপেক্ষা করে থাকে তারা! ছোট ভাইটা আসে সকলের আগে। সে এখনো অবুঝ। অফিস-ফেরৎ দিদিকে শাড়ি ব্লাউজ পাল্টে সুস্থির বসার সময়টুকু দেবার কথা ভাবে না। বলে, 'এনেছিস দিদি? কলম? কই? আনিস নি? কাল আমি পরীক্ষা দিতে যাব কি দিয়ে!'

একটু পরে বোনটা পায়ে পায়ে এসে দাঁড়ায়, 'ফ্রকের কাপড়টা কিনে আনবি বলেছিলি? আনিস নি? এই দেখ দিদি, পিঠটা দেখ, আজও খানিকটা ছিঁড়েছে! পরতে লজ্জা করে।'

মা আসেন আরো পরে। নিঃশব্দে। শোকের স্তব্ধ পাথুরে মূর্তির মত। অনুচ্চ কুণ্ঠিত গলায় আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করেন, 'পেয়েছিস নাকি গোটা দশেক টাকা? পাস নি কারো কাছে? কাল যে চাল কিছু না কিনলেই নয় রে অর্চি!'

অর্চনার সারা শরীরে যন্ত্রণা আবার মোচড় দিয়ে ওঠে। একটা অসহায় রাগ ক্রোধ ঘৃণা। নিজেকে আবার ঘেরাটোপে বন্দী সার্কাসের জন্তুজানোয়ার মনে হয়। চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে করে, 'পারব না। আমি আর কিছু পারব না মা। আমাকে মুক্তি দাও!'

বলতে পারে না। যেমন অফিসের কাউন্টারে তেমনি বাড়ির বিছানায় তিক্ত বিষণ্ণ মুখে নিঃশব্দে বসে থাকে!

এই নির্জন রাস্তাটুকু এসব কারণেই প্রিয় অর্চনার। এখানে সে একা হয়ে যায়। একেবারে একা। পিণ্ডাকৃতি ধাবমান ভিড়ের অংশমাত্র না, ক্রীতদাসী না, এমন কি কারো দিদি বোন মেয়েও না। এই পথটুকুতে সে শুধুই অর্চনা। সাতাশ বছরের ক্লান্ত করুণ বিষণ্ণ যৌবনের অর্চনা বসু। এই পথ ধরে হাঁটতে হাঁটতে সে নিজের কথা ভাবে। একান্ত গোপন অন্তরঙ্গ নিজের কথা। যেখানে মানুষের বন্যা সেখানে তো কিছু ভাবা যায় না। প্রবল জলোচ্ছ্বাসের মধ্যে কেউ কি নৌকা ভাসাতে পারে, পাল তুলে দিয়ে মাঝিমাল্লার গান শুনতে পারে। কিংবা হাটেবাজারে সহস্র শব্দকোলাহলে কেউ কি বাঁশিতে প্রিয়জনসঙ্গমের সুখ কিংবা হারানোর বেদনার সুর তোলে।

অথচ মানুষের মনে সব সুর গান কথারা তো লুকিয়েই থাকে। নির্জনতার সামান্য সুযোগ পেলেই গুনগুনিয়ে উঠতে চায়! মানুষ তো ভিড়ের সমষ্টিমাত্র না, আসলে সে তো বিচ্ছিন্ন, একক, নিঃসঙ্গ। সঙ্গীবিহীন নির্জনতার দ্বীপখণ্ডেই তো তার শরীরের বিশ্রাম, মনের মুক্তি। ভাবে এবং ভাবতে ভাবতে ঠাণ্ডা বাতাসে শরীর এলিয়ে দিয়ে অর্চনা এলোমেলো পথ হাঁটে। এইসময় তার গোলছাঁদের ফর্সা মুখখানায় চমৎকার প্রশান্তি বিরাজ করে। কালো চুলের উপর চাঁদের আলো চিকচিক করে, ঘাড় ও কোমরের মসৃণ অনাবৃত অংশ দিয়ে জ্যোৎস্না গড়িয়ে নামে। অর্চনাকে বড় সুন্দর অথচ বড় করুণ মনে হয় এখন।

পথ চলতে এইসময় কাঁঠালিচাঁপার গন্ধ পায় সে। নাম-না-জানা একটা রাতজাগা পাখির ঘুম-ঘুম অস্ফুট ডাক শোনে। বাতাসে আঁচল উড়িয়ে অর্চনা তখন কত কি যে ভাবে।

সেই যে ছেলেটা। আহা, কি যেন নাম! অর্চনা যখন কলেজে ঢুকেছিল, তখন এক সঙ্গে এক ট্রেনেই বুঝি যাতায়াত করত।

একদিন এই নির্জন পথটা ধরে অর্চনাকে বাড়ির দিকে অনেকখানি এগিয়ে দিতে এসেছিল সে। বিকেলের ম্লান-হয়ে-আসা গোলাপী আলোয় উদ্ভাসিত অর্চনার টলটলে মুখের দিকে মুগ্ধ চোখে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে সে-ই কি বলেছিল, 'আপনার ঠোঁটের উপর বাঁ দিকের ওই ছোট তিলটা, হাসলে ভারি অদ্ভুত দেখায় তো! মনে হয় টুপ করে খসে পড়বে!' 'খসলে কি হবে?' অর্চনা গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করেছিল এবং তার উত্তরে নির্লজ্জের মতো সেই যুবকটি কি বলেছিল, 'হাতের মুঠোয় ধরে বুকপকেটে যত্ন করে রেখে দেব!'

আহা, সেই ছেলেটি, কি যেন নাম, কোথায় হারিয়ে গেল! সেই দিনগুলো কোথায় হারিয়ে গেল! ঠিক ভালবাসা না, অথচ ভাল-বাসার মতোই একটা কিছু বুকের ভাঁজে ভাঁজে ছড়িয়ে পড়ার আগেই কেমন করে উধাও হ'ল! এখন এই নির্জন পথটায় হাঁটতে হাঁটতে কেন যে তার কথা মনে পড়ে! কেন যে বুকের গভীরে রাতজাগা পাখির মতো ডানা ঝাপটায়। না, প্রেম ভালবাসা কি বিয়ের কথা ভাবে না অর্চনা। বাবা বেঁচে থাকতে হয়ত বা ভাবত। হয়ত সেই ভাবনার বশেই ছেলেটাকে একটু আধটু প্রশ্রয়ও দিয়েছিল। এখন শুধু স্মৃতির কথা ভাবে। এবং এইভাবে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ কোনোদিন যেদিন পরিপূর্ণ জ্যোৎস্নায় মাঠপ্রান্তর ভেসে যায়, প্রবল বাতাস দিগন্ত কাঁপিয়ে শাড়িশায়ারাউজ এলোমেলো করে দেয়, কাঁঠালিচাঁপার গন্ধে বুকের রক্ত তোলপাড় করে ওঠে, সেদিন অর্চনার নিতান্ত আটপৌরে মেয়েমানুষ-মনটা অস্পষ্ট দূরাগত ধ্বনির মতো কোথাও উলুর শব্দ শুনতে পায়। বেহাগে শানাই বাজে, লাজাঞ্জলির সাদা খই লাল আগুনে ছড়িয়ে পড়ে, আর একজন বয়স্ক কিন্তু সুঠাম সুপুরুষ দীর্ঘ দুই হাতের করতল প্রসারিত করে অর্চনার মুখ থেকে ঘোমটা সরিয়ে বলে…

কি বলে? তোমার ঠোঁটের বাঁ দিকের ওই ছোট তিলটা…

ঝর ঝর করে হেসে ফেলে অর্চনা। যেন খুব লজ্জা পেয়েছে, এমনভাবে শাড়ির আঁচল টেনেটুনে বুক পিঠ জড়িয়ে নেয়। তারপর

পথ চলতে চলতে হাসিটা ক্রমশ ছোট হয়ে নিঃশেষে মিলিয়ে যায়। তখন বুকের ভেতর একটা রাতজাগা পাখির ক্লান্ত অস্ফুট ঘুম-ঘুম ডাক ছাড়া আর কিছুই শোনে না অর্চনা।

……কিন্তু পথের সামান্য এই নির্জনতাটুকুও মাঝেমাঝেই মানুষের দ্বারা আক্রান্ত হয়। পরিচিত কেউ এসে সঙ্গ নেয় অর্চনার। পাশাপাশি হাঁটতে থাকে। অকারণে কথা বলে অনর্গল। অর্চনার সর্বাঙ্গ জ্বলতে থাকে তখন। লোকটাকে এড়াতে পারলে যেন সে বাঁচে। অন্তত জোরে ধমক দিয়ে চুপ করাতে পারলেও। কিন্তু মানুষ কি মানুষের মনের ভাষা বোঝে। তাহলে মানুষকে এত ঘৃণা করবে কেন অর্চনা!

বিশেষ করে ওই বটু মিস্ত্রিটা। অর্চনাকে দেখলেই তোবড়ানো মুখে একগাল হাসি ফুটিয়ে ডাক দেয়, 'এই যে দিদিভাই—'

এক পাড়ার মানুষ। অর্চনাকে ছোট থেকে বড় হতে দেখেছে। আগে নাম ধরেই ডাকত, এখন খাতির করে বলে দিদিভাই। বেশ ভারিক্কি আদুরে গলার ডাক। যেন অর্চনা সত্যি তার আপনজন! যেন রক্তের সম্পর্ক আছে তার সঙ্গে।

লোকটা ছুতোরমিস্ত্রির কাজ করে। সকালে একটা কাঠের বাক্সে করাত, আগর, র‍্যাদা, বাঁটালি সাজিয়ে কাঁধে বয়ে কলকাতা চলে যায়। সারাদিন কাজের ধান্দায় ঘুরে-ফিরে সন্ধ্যার ট্রেন ধরে ফেরৎ আসে। ভাঙা শিবমন্দিরের কাছে প্রায়ই অর্চনার মুখোমুখি হয়ে যায়। এককালে শরীর স্বাস্থ্য ভাল ছিল। এখন না খেয়ে শুকিয়ে উঠেছে। কাঁধে যন্ত্রপাতির বোঝার ভারে শরীরটা কুঁজো হয়ে থাকে। মাথা তুলে সোজাসুজি তাকাতে পারে না। জোরে হাঁটতে গেলেও বুকের খাঁচায় হাঁফ ধরে। তবু অর্চনাকে চিনতে পারলে একরকম লাফিয়ে অনেকটা পথ এগিয়ে আসে সে, 'দিদিভাই! এই যে দিদিভাই—'

মুহূর্তে অর্চনার সমস্ত শরীর শক্ত হয়ে ওঠে। ঠাসাঠাসি ভিড় থেকে এই পথটায় পৌঁছে যেটুকু খুশি হয়েছিল, মুছে গিয়ে মনটা

আবার ক্লিষ্ট, নির্মম হয়ে যায়। মানুষের ডাকে তার শরীরে বিরক্তি ও বিদ্বেষের কাঁটা দেখা দেয়। ইতিমধ্যে পায়ে পায়ে বটু এসে ধরে ফেলে তাকে, 'দিদিভাই, ফিরলে?'

লোকটার গা থেকে ঘামের গন্ধ পায় অর্চনা। ছেঁড়াফাটা নোংরা জামাকাপড় থেকেও কটুগন্ধ ওঠে। সারা শরীর ঘুলিয়ে ওঠে। পাকস্থলী আবার মোচড় দেয়। যেমন বিকেলে ভিড়ের মধ্যে হয়, তেমনি এখন এই রাস্তাতেও একটিমাত্র মানুষের সংস্পর্শেই তার কেমন বমিভাব দেখা দেয়। অর্চনা খুব রুষ্ট হয়ে মানুষটার কাছ থেকে দূরে সরতে চায়। প্রশ্নের কোনো উত্তরই দেয় না।

কিন্তু বটু এসব গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না। সে অশিক্ষিত এবং মূর্খ। মধ্যবিত্তের মানসম্মানের বালাই তার নেই। সে আবার অর্চনার গা ঘেঁষে পথ হাঁটতে হাঁটতে প্রশ্ন করে, 'বাড়িতে মা বলেছিলেন একটা তক্তপোষের পায়া ভেঙ্গে গেছে—'

'আমি জানি না!' অর্চনা প্রায় ধমকে জবাব দেয়।

বটু কিন্তু শব্দ করে হেসে বলে, 'তা তুমি কি করে জানবে? সারাদিন তো বাইরে বাইরেই থাকো! মাঠাকরুণকে বলো কাল একবার যাব সকালে—'

'না, যাবে না!' অর্চনা যেন বড় বেশি রূঢ় হয়ে ওঠে। দ্রুত পথ ভেঙ্গে মানুষটার কাছ থেকে পালাতে চায়। বটু মিস্ত্রি তার সঙ্গে তাল রাখতে পারে না। জোরে জোরে শ্বাস টানে, হাঁপায়। ভারি বোঝাটা কাঁধ বদল করে। তার কাঠের চৌকো বাক্স থেকে উঁচিয়ে-থাকা করাতের তীক্ষ্ণ ধারালো মুখ অল্প আলোতেও অসম্ভব চকচক করে। হাসিটা গুটিয়ে একটু অবাক হয়ে বলে, 'যাব না দিদিভাই?'

অর্চনা সামলে নেয় নিজেকে। এই ছন্নছাড়া জংলি মানুষটার উপর এত রাগ দেখিয়ে কি লাভ! ও কি এসব বোঝে! গলা নামিয়ে অর্চনা বলে, 'না, মানে মাসের প্রথম দিকে যাবে।'

'ও, এই কথা।' বটু বাতাসে বিড়ির গন্ধ ছড়িয়ে হেসে ওঠে 'তুমি পয়সার কথা ভাবছ দিদিভাই? মজুরির কথা? তোমাদের

বাড়ির দরজাজানালা সব তো আমিই বানিয়েছি। তোমার বাবা একটি পয়সা বাকি রাখেনি কখনো। তুমি তো তারই মেয়ে। পয়সার জন্য ভাবি না দিদিভাই। কাজ ঠিক করে আসব। সুবিধা মতো পয়সাকড়ি যা হয় দিও তুমি।'

বটু খুব আন্তরিকভাবেই কথাগুলো বলে কিন্তু অর্চনার সারা শরীর আবার রাগে ফুলে ওঠে। করুণা। তাকে করুণা করছে মানুষটা। তীব্র তিক্ত একটা ধমক দিয়ে তাড়িয়ে দিতে ইচ্ছে হয়। পারে না। বাবার আমলের পুরনো মানুষ, সেই কবে কোন্ শৈশব থেকে দেখে আসছে তাকে, বাড়ি তৈরির সময় কাঠের টুকরোটাকরা জোড়া দিয়ে কেমন সুন্দর রথ বানিয়ে দিয়েছিল একটা। এই মানুষটাকে কি এতখানি অপমান করা চলে।

অর্চনা কথা বলে না, গুম হয়ে পথ হাঁটে। সে জানে, লোকটার হাত থেকে আজ মুক্তি নেই। বাড়ি পর্যন্ত এইভাবে অবিশ্রাম বকতে বকতে যাবে। সংসারের অভাব অনটনের কথা, জিনিষপত্রের দরদামের কথা, না-খেতে-পাওয়া ছেলেবউয়ের দুঃখকষ্টের কথা, থেমে থেমে হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে বলবে। আর শুধু তার না, অর্চনার সংসারকেও টেনে আনবে পথের মধ্যে, রাস্তার এই নির্জনতায়।

ক্লান্ত বিপর্যস্ত অর্চনা আজ ভাঙাচোরা শরীর নিয়ে কুঁজো হয়ে পথ হাঁটবে। জ্যোৎস্নায় মাঠঘাট ভেসে গেলেও বাতাসে শাড়ির আঁচল উড়বে না। কাঁঠালিচাঁপার উগ্র গন্ধ কোথায় লুকিয়ে থাকবে! এবং বুকের গভীরে সেই রাতজাগা পাখিটার ঘুম-ঘুম ডাক আজ আর কিছুতেই শোনা যাবে না!

এইভাবে মানুষের ভিড়ে দলিতমথিত নিষ্পিষ্ট অর্চনা ক্রমশ আয়ু ক্ষয় করে বুড়িয়ে যাচ্ছিল। তার শরীরের নরম মাংস জীর্ণ হয়ে কুঁচকে যত বেশী শক্ত হচ্ছিল, চোখের নীচে কালির রেখা গভীর, কণ্ঠার হাড় কটকটে, চুল-ওঠা কপালের চওড়াঅংশ বিবর্ণ এবং বুকের-মধ্যভাগে পুষ্ট ভারি স্তনদ্বয় ক্রমশই শিথিল ও রুগ্ন হচ্ছিল, অর্চনা তত বেশী মানুষ সম্পর্কে ক্রুদ্ধ বিরক্ত বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠছিল। মানুষের স্পর্শ গন্ধ,

মানুষের অস্তিত্ব ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্যের মতোই অসহ্য ঠেকছিল। যেন সর্বদা গনগনে একটা আগুনের আঁচের মতই একদঙ্গল পিণ্ডাকার মানুষের ভিড়ের মধ্য দিয়ে শরীরটাকে, আয়ুটাকে টেনে নিয়ে যেতে হচ্ছে তাকে, সর্বাঙ্গ ঝলসে যাচ্ছে, কুঁচকে যাচ্ছে, পোড়া চুল, পোড়া রক্তমাংসের গন্ধ উঠছে দিকবিদিক থেকে। তবু মুক্তি নেই, পালানোর পথ নেই। অর্চনা ক্রমশই অস্থির ছটফটে হয়ে উঠছিল। চোখ পাকিয়ে, রগ্ ফুলিয়ে খরখরে বিকৃত গলায় ঝগড়া শুরু করেছিল পথেঘাটে, ট্রামেবাসে, ঘরেসংসারে। 'এই যে মশাই! ও পাশটায় সরে দাঁড়ান একটু। ঘরে মা বোন নেই আপনার? অসভ্য, ইতর!' 'হবে না, এর চেয়ে হাত চালিয়ে রসিদ লেখা হবে না, অভদ্রের মতো চেঁচাবেন না, মেসিন নই আমরা!' 'পারব না মা, আর কিছু পারব না আমি। যে দিকে দু'চোখ যায় চলে যাও তোমরা! ছেড়ে যাও আমাকে!'

একদিন প্রচণ্ড জোরে ধমকে দিল বটু মিস্ত্রিকে, 'সঙ্গে সঙ্গে আসবে নাতো তুমি! সারা রাস্তা তোমার বকবক শুনতে শুনতে মাথা ধরে যায় আমার। যাও, আগে চলে যাও—'

অর্চনার মনের এই অবস্থা, বিকারই বলা যায় যাকে, কোথায় গিয়ে ঠেকত বলা মুস্কিল। কেননা সমস্ত মানুষ সম্পর্কেই সে দ্রুত বড়ো-বেশী হিংস্র হয়ে উঠছিল। কিন্তু এ-অঞ্চলে পর পর দুটো ঘটনা ঘটায় অর্চনা বেঁচে গেল। ডাক্তারের কড়া ওষুধে রুগীর হাতপায়ের খিঁচুনি যেমন থেমে যায়, চোখের দৃষ্টিতে স্বচ্ছতা ও চিন্তায় স্বাভাবিকতা ফিরে আসে, বলা যায়, ঘটনাদুটো তেমনি অর্চনার মনের উপর ওষুধের কাজ করল। তীব্র প্রতিক্রিয়ায় অর্চনার অসহিষ্ণু উষ্ণ রক্তস্রোত সহসা ঠাণ্ডা হয়ে এল।

প্রথমে একটা মানুষ খুন হয়ে গেল এই অঞ্চলে।

অর্চনার আরাম ও বিশ্রামের নির্জন পথটার ঠিক উপরে না, কিন্তু তার পাশেই কারখানার সংরক্ষিত পোড়োজমিতে। অন্তত সেখান থেকেই ক্ষতবিক্ষত রক্তমাখা লাশটা উদ্ধার করা হ'ল।

সকালে বাড়ি থেকে রাস্তায় পা দিয়েই খবর শুনতে পেল অর্চনা। তার ভুরু কুঁচকে গেল। চোখদুটো বড়ো বড়ো হ'ল। বুকের হৃদপিণ্ড দপ্ দপ্ করতে লাগল। ফর্সা মুখটা সামান্য বিবর্ণ দেখাল। খুন! এই গ্রাম্য শহরে, তার চলাচলের পথের ধারে মানুষ খুন! এ জেলায় এ রকম ঘটনা দু'একটা ঘটেছে হয়ত, অর্চনা কাগজেপত্রে দেখেছে কিংবা ট্রেনের নিত্যযাত্রীদের মুখে উত্তপ্ত আলোচনা শুনেছে কিন্তু কখনো মনোযোগ দেয় নি। কোথায় কোন্ দূরবর্তী স্থানে কে খুন হ'ল, কেন হ'ল এসব তার জানার বিষয় না, জানতে কোনো আগ্রহও নেই। বরং আদিগন্ত মানুষের চাপে পিষ্ট হতে হতে সে ভেবেছে, এভাবে দু'চারটে মানুষ কমে যাওয়া মন্দ না! অন্তত একটু শরীর টান করে ট্রামেবাসে দাঁড়িয়ে যাওয়া যায় তাহলে। দিন দিন মানুষের সংখ্যা বড়ো বেশী বেড়ে যাচ্ছে!

কিন্তু তাই বলে নিজের শহরে, নিজের চলাচলের পরিচিত পথের ধারে মানুষ খুন!

ছোট ব্যাগখানা শক্ত মুঠিতে ধরে চিন্তাক্লিষ্ট ভঙ্গিতে অর্চনা পথ হাঁটতে লাগল। কারখানার জমির কাছে পৌঁছে বার বার ঘাড় ফিরিয়ে তাকাতে লাগল। এখন জলাজঙ্গলে পরিপুষ্ট চত্বরটার বুকে কাঁটাতারের ফাঁক দিয়ে গরুছাগল ঢুকে দিনভর চরে বেড়ায়, কুঁচো মাছের লোভে জলেকাদায় নাচানাচি করে ন্যাংটা বাচ্চারা, জালি গামছা পরে মায়েরা জ্বালানির শুকনো ডালপালা যোগাড় করে; তারপর সন্ধ্যা নামলেই অজস্র জোনাকি জ্বলে, শেয়াল ডাকে ও সাপেরা বুকে হেঁটে খাদ্য খোঁজে। আবাল্য পরিচিত পরিত্যক্ত ওই ভূখণ্ডের দিকে বার বার ভয়ের দৃষ্টি মেলে রাস্তাটুকু পার হ'ল অর্চনা। ভাঙ্গা শিব-মন্দিরটার কাছে এসে পুলিশের কালো ভ্যান দেখল। মন্দিরের চাতালে বসে শহরের যে বখাটে ছেলেগুলো প্রতিদিন আড্ডা জমায়, ফেরার মুখে প্রতিদিন যাদের উচ্চকণ্ঠের খিস্তিখাস্তার সঙ্গে অট্টরোল হাসির শব্দ শুনতে পায় অর্চনা, যাদের একজনকে পরিপূর্ণ মত্ত অবস্থায় রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে হাত-পা ছুঁড়ে চিৎকার করতে দেখেছিল

একদিন, এখন তারাই কালোগাড়ির দরজার কাছে গোল হয়ে ঘিরে ধরেছে খাকি প্যাণ্টসার্ট-পরা লম্বাগোছের অফিসারটাকে। চেঁচিয়ে হাত-পা নেড়ে কিছু যেন বোঝাচ্ছে। কেউ কেউ হাসছে দাঁত বের করে। নির্মল আকাশে কুণ্ডলী পাকিয়ে সিগেরেটের ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ছে। জায়গাটুকু দ্রুত পার হয়ে এল অর্চনা। ওই ছেলেগুলোর দু'চারজনের মুখ তার চেনা। তাদের কলোনিতেই থাকে। পড়াশুনা ছেড়ে রকবাজদের দলে ভিড়ে গোল্লায় গেছে। এখন পাড়ায় ওদের অনেক বদনাম। ওদের জন্যই সন্ধ্যারাত্রে মন্দিরের এই পথটুকু পার হতে বড় অস্বস্তি হয় অর্চনার। তাকে কিছু অবশ্য বলে না। কিন্তু বলতে কতক্ষণ!

আজ পুলিশের গাড়ির কাছে ওদের নাচানাচি দেখে আরো খারাপ লাগল। শহরে একটা মানুষ খুন হয়েছে, মৃতদেহ পাওয়া গেছে ওই পোড়োজমিতে, তা নিয়ে এই ছেলেগুলো এত চেঁচাচ্ছে কেন, আবার অসভ্যের মত থেকে থেকে হেসেই বা উঠছে কি কারণে? অর্চনা কিছু বুঝতে পারল না। পুলিশের গাড়িসমেত, চোঙাপ্যাণ্ট বাবরিচুলের জুলপিওলা ওই ছেলে ক'টাকে অতিক্রম করে আকাশে মুখ তুলে সূর্য এবং রৌদ্রের তাপ পরীক্ষা করল। তার ঘড়ি নেই। বছর তিনেক আগে পূজোর মুখে বিয়ে-হয়ে-যাওয়া এক সহকর্মিণীর কাছ থেকে অল্পদামে পুরনো একটা কিনেছিল। এখন পুরোপুরি অকেজো হয়ে ঘরে পড়ে আছে। চারপাশে তাকিয়ে এখন সে সময় অনুমান করে। সূর্য অনেকখানি উপরে উঠেছে, রোদের তাপ বেড়েছে, মানুষজন ব্যস্তসমস্ত হয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। ট্রেনের তাহলে দেরি নেই। অর্চনা চলার গতি দ্রুততর করল। তার এলাকায় একটা মানুষ খুন হয়েছে বলে সে তো এই ট্রেনটা ফেল করে পরের গাড়িতে দেরি করে অফিসে পৌঁছে নিজের জীবিকার ক্ষতি করতে পারে না! মৃতের জন্ম জীবিতের ক্ষয়ক্ষতি কে পছন্দ করে!

প্ল্যাটফর্মে তখন অনেক লোক। এখানে ওখানে গোল হয়ে চাপা গলায় কিছু বলাবলি করছে। সম্ভবত খুনের বিষয়টাই। মনের

ভেতর ভয় ও উত্তেজনা নিয়ে অর্চনা একজনের পাশে এসে দাঁড়াল, 'কি হয়েছে মধুদা ?'

মধুসূদন অন্য পাড়ার মানুষ। মন্দিরের গা থেকে অন্য রাস্তায় মোড় নেয়। হেঁটে আসে না, একখানা পুরনো সাইকেল আছে। ট্রেনে যেতে আসতে আলাপ। একপাশে দাঁড়িয়ে নিবিষ্ট মনে পান চিবুচ্ছিল। অর্চনার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিসের কথা বলছেন ? ট্রেনের ?'

অর্চনা ঘাড় নাড়ল, 'একটা কি খুনের কথা শুনছি ?'

'হয়েছে! ওই তো লাশ তোলা আছে পুলিশের গাড়িতে।' চোখের ইসারায় মন্দিরতলার দিকটা দেখিয়ে আবার নিস্পৃহ ভঙ্গিতে পান চিবুতে লাগল মধুবাবু। যেন খুনের ব্যাপারটার কোনো গুরুত্বই নেই তার কাছে। যেন পুলিশের গাড়িতে একটা জীবন্ত মানুষের মৃতদেহ তোলা হয়নি—এক বস্তা আলু কি পটল তোলা হয়েছে! অর্চনার স্বাভাবিক মেয়েলি কৌতূহল মিটল না। কিছুই জানা বোঝা হ'ল না তার। মধুবাবুর উপর সামান্য বিরক্তি নিয়েই বিড় বিড় করে বলল, 'এ শহরে এসব তো হয় নি কখনো। বরাবর শান্ত ছিল জায়গাটা—'

'ছিল। আর থাকবে না!' প্রায় প্রৌঢ় পোড়-খাওয়া মধুসূদন ঠোঁট বাঁকিয়ে হাসল, 'পাশের মলুটির রবার কারখানায় বাইশ দিন স্ট্রাইক চলছে। ভাঙ্গতে হলে আরো দু'একটা খুন হয়ে যেতে পারে! চলুন, ট্রেন এসে গেল—'

ফেরার পথে স্টেশন থেকে বাজারে পৌঁছেই থমকে গেল অর্চনা। এরিমধ্যে দোকানপাট বন্ধ হয়ে গেছে। রাস্তায় লোক চলাচল কমে এসেছে। চারদিকে একটা নির্জন, ছাড়া ছাড়া ভাব। কারখানার শ্রমিক-খুনের প্রতিবাদে কেউ কি হরতাল ডেকেছে ? দোকানপাট বন্ধ করে দিয়ে গেছে জোর করে ? নাকি নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে মৃতের প্রতি শোক ও সম্মান জানাতে বন্ধ করে বসে আছে ? অর্চনা কিছু অনুমান করতে পারল না। কিন্তু এই প্রথম পরিচিত রাস্তায় পা দিয়েও তার হাঁটতে ভয় করল। ভাবল, একটা রিক্সা করবে ?

রিক্সাওলারা সব কই ? খুঁজে পেতে যদি বা পাওয়া যায় বাড়ি পৌঁছেই বারো আনা লাগবে। আছে ? সামর্থ্য আছে তার ?

অর্চনা পায়ে পায়ে হেঁটে শিবমন্দিরের কাছে পৌঁছল। চাতালের সেই আড্ডাবাজ ছোকরাগুলো নেই। অন্ধকারে সিগেরেটের লাল ফুলকি দেখা যাচ্ছে না, চিৎকার কিংবা অট্টহাসির শব্দও শোনা যাচ্ছে না। এতক্ষণ তবু কিছু লোকজনের মুখ দেখা যাচ্ছিল। বড় রাস্তা দিয়ে কিছু সাইকেল, দু'একটা রিক্সা যাতায়াত করছিল। কিন্তু এখন সামনে টানা দীর্ঘ নির্জন পথ ! একা একা এই পথ তাকে পার হতে হবে। হাঁটতে হবে ওই পোড়োজমিটার গা ঘেঁষে, আজ সকালেই যেখানে কিনা রক্তে মাখামাখি একটা তাজা শরীর খুন হয়ে পড়েছিল।

পারবে হাঁটতে ?

অর্চনা শক্ত সোজা দাঁড়িয়ে বুক ফুলিয়ে নিশ্বাস টানল। যেন চারপাশের মুক্ত বাতাস থেকে সাহস সঞ্চয় করল।

না পারার কি আছে। ভয়টা কিসের ! তার উপরে তো কারো রাগ আক্রোশ ঘৃণা নেই। সে তো কখনো ক্ষতি করে নি কারো। রাজনীতির দলাদলির সঙ্গেও তার আজন্ম সম্পর্ক নেই। জীবনে একবারও ভোট দিয়েছে কি দেয় নি মনেও করতে পারে না। কদাচিৎ ডাক তার বিভাগে স্ট্রাইকের ডাক উঠলে পোস্টমাস্টারের পরামর্শে আগেভাগেই ছুটি নিয়ে ঘরে বসে থাকে সে। তার মতো নিরীহ শান্ত ভদ্র মেয়েমানুষের পথ চলতে ভয় কি ! বিশেষ করে আবাল্য চেনাজান পরিচিত বাড়ির পথ—

অর্চনা পায়ে পায়ে হাঁটতে লাগল।

কোথায় কোন্ রবার কারখানায় বাইশ দিন স্ট্রাইক চলছে, তার জের টেনে কারখানার গেটে হাতাহাতি মারামারি হয়েছে, স্ট্রাইক ভাঙতে একটা মানুষ খুন হয়ে গেছে—এসবের সঙ্গে অর্চনার কি সম্পর্ক ! খুনখারাপির কথা তো প্রায়ই শোনা যায় আজকাল। তার জন্য অর্চনা কি রিক্সা করে বাড়ি ফিরতে পারে ! ফেরা সম্ভব !

চারপাশে সতর্ক সন্দিগ্ধ দৃষ্টি রেখে অর্চনা পথ হাঁটছে। পোড়োজমি থেকে শেয়ালের ডাক শোনা যাচ্ছে। মাথার উপর গাছের ডালে পাখিরা ডানা ঝাপটাচ্ছে। বনতুলসীর গায়ে জোনাকি জ্বলছে নিভছে। পথ হাঁটতে আজ অসম্ভব ক্লান্তি বোধ করছে অর্চনা। হাওড়া ব্রীজের উপরের অংশে উঠতে যেমন হয়, শরীরটা সেইরকম ভারি মনে হচ্ছে। দীর্ঘ টানা পথ শেষ হয়েও হচ্ছে না! ক্লান্ত শরীর নিয়ে অস্থির ছটফটে ভঙ্গিতে দ্রুত হেঁটে যাচ্ছে অর্চনা··· পথের অফুরান বাতাসও আজ তার ঘাড় গলা বুকের ঘাম শুষে নিতে পারছে না এবং মাঠ ঘাট জ্যোৎস্নায় ভেসে যাচ্ছে কি যাচ্ছে না আজ সে দিকে খেয়ালও করছে না।

আর এই প্রথম অর্চনার মনে হচ্ছে, পথের এতখানি নির্জনতা ভাল না! মোটেই ভাল না! মাঝে মাঝে মানুষের পায়ের শব্দ শোনা গেলে কিংবা আগেপিছে কারো হাসি গান কথার সুর বেজে উঠলে ভাল লাগত। তারা কেউ অর্চনার গায়ে এসে পড়বে না, পাশাপাশি হাঁটবে না, অনর্থক কথা বলে বিরক্তও করবে না, নিজের মতো দূরে দূরে হেঁটে যাবে, অর্চনা যাবে তার মতো—এইটুকু হলেই পথটা নিশ্চিন্তে পার হয়ে যেতে পারত সে!

······খুনের ঘটনা ক্রমশ পুরনো হয়ে আসতে লাগল, হৃতসাহস একটু একটু করে ফিরে পেয়ে অর্চনা যখন বুকের গভীরে পুনশ্চ সেই রাতজাগা পাখির করুণ অথচ সুমিষ্ট ঘুম-ঘুম ডাক শোনার জন্য প্রস্তুত হতে লাগল, ঠিক তখনই অতর্কিতে সেই দ্বিতীয় ঘটনা ঘটল।

কেউ অর্চনাকে পরিষ্কার করে কিছু বলল না তবু রাস্তায় পা দিয়েই ভয়ঙ্কর সংবাদের সবটুকু তার জানা হয়ে গেল। আর জানা-মাত্র সর্বাঙ্গ থর থর করে কেঁপে উঠল। শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেল। সকালের উজ্জ্বল রোদ বিবর্ণ হতে হতে সহসা গভীর কালো হয়ে গেল। অর্চনা দেখল পথ হাঁটতে তার পা টলছে, শরীর অবশ হয়ে আসছে এবং বুকের ভেতর একটা যন্ত্রণা ক্রমশ কান্নার রূপ পাচ্ছে! এ কি বিপজ্জনক, সাংঘাতিক সংবাদ! বার বার ভেবেও নিজের

মনকেই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না অর্চনা। পথেঘাটে আজকাল এমন হতে পারে! এমন হয়! আর অন্য শহরে অন্য রাস্তায় তো না, তারই নিত্য যাতায়াতের পথের ধারে, মিত্তিরদের ওই কাঠগোলায়……

না, খুন না। খুনের চেয়েও ভয়ঙ্কর। যে মানুষটা খুন হয় সে তো জ্বালাযন্ত্রণার হাত থেকে বেঁচেই যায়। মৃতের শরীরে তো কষ্ট থাকে না! কিন্তু এর যন্ত্রণা সারা জীবন স্থায়ী হয়ে দগ্ধে মারে, তিলে তিলে কষ্ট বাড়তে থাকে, ক্ষণে ক্ষণে মনে হয় সমস্ত দেহটা নষ্ট হয়ে গেল, অশুচি! ধর্ষিতা নারীর চেয়ে দুর্ভাগিনী আর কে আছে!

আতঙ্কে থরো থরো শরীর নিয়ে পথ হেঁটে স্টেশনে পৌঁছুল অর্চনা। যেন খবরটা শোনার পর থেকে মাথা তুলে তাকাতে পারছে না, যেন এই বর্বরতা গভীরভাবে লজ্জা দিচ্ছে তাকেও, ঘাড় মাথা নীচু করে নিঃশব্দে একপাশে দাঁড়িয়ে থাকল সে। প্রতিদিনের মতো প্ল্যাটফর্মে অনেক মানুষ। আপ ডাউন ট্রেন আসছে একসঙ্গে। তবু খুব একটা চঞ্চলতা নেই। ঘটনার আকস্মিকতায় এলাকার মানুষ যেন স্তব্ধ, স্তম্ভিত। সকলের মুখেচোখেই বিমূঢ় ভাব। হাঁটাচলায় ত্রস্ত শঙ্কিত ভঙ্গি! সকলেই কঠিন মুখে কিছু একটা যেন ভাবছে। অদূরেই মধুসূদনবাবু দাঁড়িয়ে আছে। শব্দ করে পান চিবুনো বহুদিনের অভ্যাস কিন্তু আজ চোয়ালদুটো স্থির, শক্ত। অর্চনা একবার তাকিয়েই মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে নিল। আজ আর কিছু জিজ্ঞেস করার নেই, কোনোকিছু জানার কৌতূহলও নেই। মেয়ে হয়ে এসব কথা কোনো পুরুষকে কেউ জিজ্ঞেস করতে পারে না। এ ব্যাপারে সামান্যতম কৌতূহলও রীতিমত অশোভন হয়ে ওঠে। তাছাড়া কি শোনার আছে তার! কি জানার আছে! বাড়ি থেকে হেঁটে এই দীর্ঘ পথ আসতে আসতেই তো সব জানা বোঝা হয়ে গেছে অর্চনার!……

মেয়েটা স্থানীয় হাসপাতালের নার্স। নতুন কাজে এসেছে। বছর বাইশের বেশী বয়স না। চণ্ডীতলার বাঁ দিকে মধুসূদন

যেখানে বাঁক নেয় সেই রাস্তায় সামান্য এগিয়ে গেলে একতলা ভাড়া বাড়ি। মা'র সঙ্গে থাকে মেয়েটি। গত কাল ডিউটি শেষ করে ফিরতে রাত হয়েছিল। পথঘাট নির্জন হয়ে এসেছিল তখন। রিক্সা নিয়েই ফিরছিল সে। বাঁকের মুখে পৌঁছতেই কারা রিক্সাওলার মুখটা চাদর ছুঁড়ে জড়িয়ে ফেলল। তারপর চারদিক থেকে কয়েকটা কালো হাত ঝাঁপিয়ে পড়ল মেয়েটির সর্বাঙ্গে। শক্ত একটা থাবার নিস্পেষণে মুখের শব্দ বন্ধ হয়ে গেল, নিশ্বাসের কষ্ট হওয়ায় মাথাটা বুকের কাছে ঝুলে পড়ল······

······তারপর কৃষ্ণপক্ষের রাত্রিশেষে ভোরের বিষণ্ণ আলোতে কাঠগোলার মিস্ত্রিমজুরেরা এসে আবিষ্কার করল সম্পূর্ণ নগ্ন অচৈতন্য এক নারীদেহ। তার গালে বুকে কোমরের মাংসে হিংস্রভাবে আঁচড়ানো কামড়ানোর দাগ, তার তলপেটে হাঁটুর কাছে জমাট বাঁধা রক্তরেখা। তার নরম ক্ষতবিক্ষত মুখমণ্ডলে অন্তহীন যন্ত্রণার চিহ্ন।

তারাই ধর্ষিতাকে পৌঁছে দিয়ে এল হাসপাতালে।

সেই মেয়েটিকে কখনো দেখেছে অথবা দেখে নি মনে করতে পারল না অর্চনা। কিন্তু কল্পনায় ছিমছাম সুন্দর একটি মুখ এঁকে নিল সে। ডিউটির শেষে ধবধবে সাদা য়ুনিফর্ম পরে সে ফিরছিল মায়ের কাছে। অতর্কিতে ছোঁ মেরে হিংস্র হাতের থাবাগুলো উঠিয়ে নিয়ে গেল নির্জন কাঠগোলায়। অসহায় সেই তরুণীর চিৎকার করার ক্ষমতা নেই বলে হাত পা ছুঁড়ছে, খোঁপা ভেঙ্গে চুলের রাশ ছড়িয়ে পড়ছে পিঠে, সেই বর্বরেরা এক এক করে তার শাড়ি শায়া ব্লাউজ খুলে নিচ্ছে, নখ ও দাঁত বসিয়ে দিচ্ছে শরীরের মাংসে, মুখে উৎকট মদের গন্ধ ছড়িয়ে সাপের মতো হিস্‌হিস্‌ হাসছে, মেয়েটার শরীর থেকে রক্ত, চোখ থেকে জল গড়িয়ে নামছে—সমস্ত দৃশ্যটা এইভাবে ভাবতেই অর্চনার সারা শরীর আতঙ্কে আবার থর থর করে কেঁপে উঠল! যেন তার নারীত্বের কোনো গভীর মূল থেকে একটা চাপা দীর্ঘ নিঃশব্দ আর্তনাদ উঠল। তার চারপাশে, ধাবমান ট্রেনের মধ্যে নিত্য যাত্রীদের ভিড়, ঠাসাঠাসি, গরম ঘাম কটুগন্ধ—কিন্তু কোনোকিছুই

আজ টের পেল না অর্চনা। দিনের প্রথম প্রহরেই এক অবসন্ন বিপর্যস্ত চেতনা নিয়ে সে অফিস করতে গেল।

......অনেক চেষ্টা করেও বিকেলের ট্রেনটা ধরে আগে ফিরতে পারল না। সেই ছ'টা বাইশই ধরতে হ'ল।

স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে পা রেখে এই প্রথম স্থির নিশ্চল কাঠের পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে পড়ল অর্চনা। কেমন ভয় ভয় চোখে তাকাল চারদিকে। আকাশে কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে। ছিন্ন মেঘের ফাঁকে ফাঁকে তারাগুলো ম্রিয়মাণ, অনুজ্জ্বল। ঝোড়ো বাতাসে প্ল্যাটফর্মের ধুলো উড়ছে, আলোগুলো কাঁপছে।

সামনে দীর্ঘ নির্জন পথ। আজ কি একা যেতে পারবে?

ওই পথের ধারে কারখানার সংরক্ষিত জমিতে শ্রমিক-মানুষ খুন হয়। ওই পথের ধারেই মিত্তিরদের কাঠগোলায় তরুণী মেয়ে ধর্ষিতা হয়। ওই পথেই ভাঙ্গা শিবমন্দিরের চাতালে শহরের নষ্টচরিত্র যুবকেরা সন্ধ্যা থেকে আকণ্ঠ মদ গিলে প্রকাশ্যে মাতলামি করে। পোড়োজমি আর কাঠগোলার পথঘাট তাদের চেয়ে আর কে বেশী চেনে! অর্চনা হাঁ করে শ্বাস টানল। সকালের মতো বুকের ভেতরে আবার কাঁপুনি শুরু হয়েছে। হাত পা কেমন অবশ হয়ে আসছে। এই শহরের দিনরাত্রিগুলো এখন যে এত ভয়ঙ্কর, জানা ছিল না তার। কখনো স্বপ্নেও ভাবে নি, তার যাতায়াতের পথ থেকে একটা নিরপরাধ নিষ্পাপ মেয়েকে ওইভাবে ছোঁ মেরে কেউ তুলে নিয়ে যেতে পারে—

সে নিজেও তো একজন মেয়ে। এখনও দেহে যৌবন আছে, মুখে লাবণ্যও আছে। আর শরীরের সমস্ত যন্ত্রণা সহ্য করেও অটুট অক্ষত রাখা আছে সেই গোপন সম্পদ, জ্যোৎস্নায় ভেসে যাওয়া রাত্রে শুধু অন্তহীন ভালবাসা এসে যা লুট করতে পারে। আজ কোন্ সাহসে এতটা পথ সে একা পার হবে?

না। এই ভয়ঙ্কর সময়ে কেউ একা পথ হাঁটতে পারে না। হাঁটা

উচিত না। একজন সঙ্গী চাই। বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য কোনো মানুষ। মানুষ ছাড়া এখন মানুষ পথ চলতে পারে না।

গলায় সমস্ত শক্তি তুলে এনে অর্চনা ডাকল, 'বটু মিস্ত্রি, ও বটু মিস্ত্রি! এই যে এদিকে! আমি অর্চনা, অর্চনা-দিদিভাই! তোমাকে ডাকছি বটু মিস্ত্রি—'

মাসিক বাংলাদেশ, ১৩৮১]

আহা, পটল না ত, যেন মর্তমান কলা! যেমন নধর তেমনি পুষ্ট। ধোয়ামোছা হালকা সবুজ রং আলোতে চিক চিক করছে। চালানি মাল বলে মনেই হয় না, যেন একটু আগেই তুলে এনেছে ধারেকাছের কোনো জমি থেকে। মস্ত বড় থাবায় ক'টা পটল ধরে রেখে সরু আঙুলে টিপছিলেন সীতানাথ। দাম শুনে মুঠো আলগা করলেন। গোলগাল লোকটা সুর তুলে চেঁচাচ্ছে, 'বাজারের সেরা মাল বাবু, তুলুন বাছুন দু'টাকা।' সীতানাথের ডাইনে বাঁয়ে তিন চার জন পটল বেছে ঝুড়িতে রাখছে। একটু নীচু গলায় বললেন, 'কাল ত দেড় টাকায় দিয়েছ। আজ আবার দাম চাপালে কেন হে!'

একজনের মাল ওজন করতে করতে দোকানী শব্দ করে হাসল, 'সে দিশি জিনিস বাবু, জলে চুবানো। একদিন ঘরে রাখলে পচে গলে ঘ্যাঁট হয়ে যাবে—'

আর কথা বললেন না সীতানাথ। সামান্য ঝুঁকেছিলেন, এবার সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। রোগা টিঙটিঙে শরীরটা অনেকের মাথা ছাড়িয়ে গেল। তাঁর মাথায় আধইঞ্চি ছোট করে ছাঁটা চুল পেকে সাদা হয়ে গেছে। ঘন ভুরু আর কণ্ঠা পর্যন্ত বুকের লোম সাদায়-কালোয় মেশানো। চোখে গোল ফ্রেমের চশমা—ডাঁটির একদিকে ফাটল ধরায় সুতো দিয়ে শক্ত করে জড়ানো। পাওয়ার খুব বেশী বলে বাইরে থেকে মনে হয় চোখদুটো ঠেলে উঠে বুঝি কাঁচের সঙ্গে লেগে আছে। ধুতিটা আধ ময়লা, হাঁটু পর্যন্ত। পাঞ্জাবিটা একটু ফর্সা কিন্তু ঘাড়ে ও বগলের দিকটায় অনেকগুলো ছেঁড়া সযত্নে সেলাই করা আছে। অনেক বয়স হয়েছে সীতানাথের। প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকতা থেকে অবসরই নিয়েছেন আজ সতেরো বছর। আর কবে যে এন্ট্রান্স পাশ করে ঢুকেছিলেন—মনেই করতে পারেন না!

এখন সন্ধ্যার মুখে বৈঠকখানা বাজারে ভিড় গিজ গিজ করছে। রাস্তার হু'পাশে সারি সারি অস্থায়ী দোকান। রাস্তার মাঝেও ডালা নামিয়ে বসে গেছে কেউ কেউ। শ্রাবণ শেষ হতে চলেছে। যত রাজ্যের আবর্জনা বৃষ্টির জলে ভিজে-গলে কাদা হয়ে থিক থিক করছে। সীতানাথের পায়ে বহু পুরনো রবারের জুতো। খুব সন্তর্পণে পা ফেলে এগুলেন তিনি।

না, পটল তিনি কেনেন নি। যারা কিনল, সীতানাথ সামান্য ঈর্ষা করলেন তাদের। মনে মনে বললেন, 'তোমাদের পয়সা খুব সস্তা হয়েছে হে! আর হু'দিন সবুর করতে পারলে না! এসব হ'ল গিয়ে তোমার পচনশীল জিনিস—ক'দিন চড়া দামে ধরে রাখবে ওরা! হু'দিন গেলেই ত সস্তায় পেতে হে!'

কিন্তু পটলগুলোর কথা তিনি ভুলতে পারলেন না। এমন টাটকা সরেস টোপা টোপা পটল তিনি অনেকদিন দেখেন নি। তেলে ডুবিয়ে ভাজলে মাখনের মত নরম হবে! আর যদি ভেতরের মালপত্তর খুঁচিয়ে বের করে মাছের পুর দিয়ে দোর্মা করা যায়! ভাবতে সীতানাথের জিভে জল এল। মনে পড়ল, এক বড়লোক বন্ধুর বাড়ির বিয়েতে ওই বস্তুটি প্রথম খেয়েছিলেন তিনি। তার কিছু পরে লাবণ্যকে বলেছিলেন। বারোঘরের একান্নবর্তী সংসার ছেড়ে তখন আলাদা বাসা করেছেন। ছেলে মেয়েরা ছোট ছোট। স্কুলে যায়। সীতানাথের কথা শুনে কৌতুকে চোখ উজ্জ্বল করে হেসেছিল লাবণ্য, 'যত বয়স বাড়ছে—লোভ তত বাড়ছে তোমার। কেবল খাই খাই—'

তারপর হাসি থামিয়ে গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে বলেছিল, 'কিন্তু আমি ত দোর্মা করতে জানিনে। বাপের বাড়িতে ওসব কি কখনো খেয়েছি না করেছি!'

বিকেলে বৌবাজার থেকে ছ'পয়সা দিয়ে একটা রান্নার বই কিনে এনেছিলেন সীতানাথ। লাবণ্য পড়তে জানে না। সীতানাথ পড়ে বুঝিয়েছিলেন, 'প্রথমে পটলগুলির হুই ধারের মাথা গোল করিয়া

কাটিয়া লইবে। ইহার পর সরু একটি শলাকা দিয়া...'

রান্নাটা খুব ভাল হয় নি। কিন্তু খরচ হয়েছিল অনেক। আর কখনো দোর্মা করতে বলেন নি সীতানাথ।

বাজারের এদিকটায় আলুর দোকান। হলুদ গোলাপের মত বড় বড় নৈনিতাল আলু। বকের মত লম্বা ঘাড়টা সামান্য ঝুঁকিয়ে সীতানাথ দেখলেন। এত বড় আলু কখনো তাঁর বাড়িতে যায় না। ছোট ছেলে সমীর ছাঁটাই হয়ে বসে আছে। সে-ই বাজার করে আজকাল। ফ্যাকাসে রঙের ছোট দেশী আলু কিনে আনে। সারা গায়ে ধুলোবালি লেগে থাকে। তার দর জানেন সীতানাথ। আর সাদায়-হলুদে মেশানো এই আলু, একটাতেই মুঠো ভরে যায়, এরও দর জানেন। অনেক তফাৎ। এখন সবক'টা আলুর দোকানেই বেশ ভিড় দেখে সীতানাথ অন্যদিকে চোখ ফেরালেন। ঝাঁকাভর্তি পুঁই ডাঁটা, ঝিঙে, ঢেঁড়স, কুমড়ো। কাঁচালঙ্কা ডাঁই করা। একটা বাচ্চা ছেলে চিলের মত চেঁচাচ্ছে, 'দশ পয়সায় চারটে বাবু, রস টসটসে কাগজী নেবু।' ধূসর রঙের অজস্র পেঁয়াজ ইলেকট্রিকের আলোতে জ্বল জ্বল করছে।

সীতানাথ আরও একটু এগিয়ে আসল বাজারের ভেতর ঢুকলেন। লম্বা ছাদঢাকা ঘরের নীচে সরু সরু গলি। দু'ধারে কোমরউঁচু সিমেণ্ট-বাঁধানো প্ল্যাটফর্ম। সারি সারি বাল্ব ঝুলছে। আলোর তলায় রকমারি পশরা সাজান। আর মানুষ, ভিড়, ঠেলাঠেলি। কে যেন জুতো সমেত পা মাড়িয়ে দিল। 'উঃ' করে উঠলেন। একটা দেহাতি লোক 'বুড়া বাবু মাপ কিজিয়ে!' বলে চলে গেল। একটু ফাঁকা জায়গা দেখে উঠে এলেন সীতানাথ। ঘোলাটে দৃষ্টি যথাসম্ভব তীক্ষ্ণ করে চারদিকে তাকালেন। কার দোকানে কি আছে দেখার চেষ্টা করলেন। মনোযোগ দিয়ে দেখলেন দোকানদারগুলোকেও।

ছেলে-ছোকরা দোকানদার কোনোদিনই পছন্দ করেন না সীতানাথ। ওদের ব্যবহার ভাল না, কথাবার্তা রুক্ষ রুক্ষ। সীতানাথের ভাল লাগে না। মেয়ে-দোকানদারগুলোকেও এড়িয়ে

চলেন তিনি। অধিকাংশ অবাঙালী। এই মোটকা চেহারা, পেট-পিঠ উদোম, মস্ত বড় এক একটা ভুঁড়ি নিয়ে বসে আছে যেন বাজারের মালিকিনী। জিনিসপত্র ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে একটু দেরি হ'লে ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে। যা হাতে তুলে মেপে দেবে তাই নিতে হবে। না নিলে নাকের পাটা ফুলিয়ে গাল দেবে। যেন বাড়ির জাঁহাবাজ বড়বউ চাকরকে ভাঁড়ার বুঝিয়ে দিচ্ছে। সীতানাথ পারতপক্ষে যান না ওদের কাছে।

বাজার করার ব্যাপারে তিনি খুব খুঁতখুঁতে। তাড়াহুড়ো করে কিছু করেন নি কোনোদিন। যখন স্কুলে যেতেন, সাতসকালে উঠে বাজারে চলে আসতেন। সেই যুবক-বয়সেও বুড়োদের মত সারা বাজার ঘুরপাক খেতেন কয়েকবার। জিনিসপত্র হাতে তুলে আঙুলে টিপে গন্ধ শুঁকে আলোতে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখে ষোলআনা খুশি হয়েই তবে দরদাম শুরু করতেন। এক জিনিসের জন্য সতেরো দোকান ঘুরতেন। সামান্য সস্তা অথচ ভাল জিনিসটা কোন্ কোণে কার ঝুড়িতে গা-ঢাকা দিয়ে আছে খুঁজে বের করবার জন্য ছটফট করতেন। হদিশ পেলে উজ্জ্বল মুখে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে ঝুঁকে পড়তেন। দাঁড়ি পাল্লা দেখে যতটা পারতেন ঝুলিয়ে ওজন নিতেন। ফাউটাউ কিছু বাগিয়ে নেবার চেষ্টাও করতেন। তারপর ধীরেসুস্থে জিনিস তুলতেন থলেতে। বাস্তবিক, তিনি ত আর দশটা-পাঁচটার কেরানী ছিলেন না যে, বাজারে এসেই 'অফিসের বেলা হয়ে গেল, কখন যে কি রান্না হবে' ভেবে দুশ্চিন্তায় মুখ কালো করে হুটোপাটি নষ্ট আলু পচা মাছ আর কানা বেগুন নিয়ে বাসায় দৌড়ুবেন! তাঁর স্কুল বসত এগারোটায়। খুব ভোরে উঠতেন তিনি। বাজারের জন্য অনেকখানি সময় হাতে রাখতেন। খুব দামী আর ভাল জিনিস তখনও কিনতে পারতেন না কিন্তু মরশুমের সস্তা যা কিছু কিনতেন লাবণ্য কখনও বলতে পারত না, 'এটা ভাল না, ওটায় পোকা, এই দেখ, এইখানটা পচে উঠেছে!' বরং মন খুলে এই একটা বিষয়েই সীতানাথের খুব প্রশংসা করত লাবণ্য। তাতে সীতানাথ যেন আরো উৎসাহ পেতেন।

এখন বুড়ো হয়েছেন। একটু ঘুরলেই ক্লান্ত হয়ে পড়েন। চোখের দৃষ্টিতে আর ধার নেই। দেখে-শুনে কিছু কিনতে পারেন না। সুযোগ বুঝে দোকানীরা ওজনেও ফাঁকি দেয়। এই নিয়ে বাড়ির বড় বউ সন্দেহ করে তাঁকে। তিনি নাকি ইচ্ছে করেই নষ্ট পচা জিনিস আনেন। ওজনে কম নিয়ে পয়সা মারেন। সেই পয়সায় বিড়ি কেনেন, চা খান, লুকিয়ে মুড়ি আলুর চপ খেতে যান। একদিন সাম্না-সাম্নি কথা কাটাকাটি হয়ে গেল। সীতানাথ রাগ করে বাজার করাই ছেড়ে দিলেন।

বৈঠকখানা বাজারে আজ অনেকদিন পরে আসছেন তিনি। চারদিকে ভাল করে তাকালেন। কয়েকটা মুখ চেনা চেনা মনে হচ্ছে। সীতানাথ একটু এগিয়ে বাজারের ঠিক মাঝামাঝি একটা বাঁধাকপির দোকানের সামনে দাঁড়ালেন। অসময়ের বাঁধাকপি, সেই সঙ্গে ডজনখানেক ফুলও আছে। ছাল চামড়া ছাড়ানো ন্যাড়া বাঁধাকপির পাণ্ডুর রং। ফুলগুলো শুকনো শুকনো, এখানে ওখানে পোকায়-খাওয়া কালো দাগ। তবু ঝুঁকে পড়লেন সীতানাথ। ভাবলেন, একটা বাঁধা কি ফুল নিয়ে তিনি যদি আজ ঘরে ফেরেন তাহলে বৌমারা কি খুশিই হবে! সমীরের বৌ-টা ছেলেমানুষ। এটা-ওটা খেতে ভালবাসে। তিনি ওকেই খিচুড়ি রাঁধতে বলবেন আজ। সেই সঙ্গে বাঁধাকপির তরকারি, ফুলকপির বড়া বেসনে ডুবিয়ে—। ছেলেরা অবশ্য সন্দেহ করবে। ভাববে, বুড়ো এত পয়সা পেল কোথায়। লুকিয়ে-চুরিয়ে ছেলে-টেলে পড়ায় নাকি। বড় বৌমাটা ত মূর্খ আর ঝগড়াটে। সে হয়ত বলেই বসবে, ‘ছেলেদের কারো পকেট হাতাল কিনা দেখ! যা নোলা—’

সীতানাথ দোকানের ওপর আরও একটু ঝুঁকলেন। দোকানী খুব নিস্পৃহ ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল, ‘নেবেন নাকি কিছু!’

সীতানাথ একটা বাঁধাকপিতে হাত রাখলেন। প্রৌঢ়-দোকানী তাঁর বেশভূষা দেখে আগের মতই নিরুত্তাপ গলায় বলল, ‘দু’টাকা কিলো। এক টাকা বারো আনা পর্যন্ত পাবেন—’

দাম শুনে সীতানাথ চমকালেন না। বাজার-করা ছাড়লেও বাজার-ঘোরা অভ্যাস আছে তাঁর। মধ্য কলকাতার অনেকগুলো বাজারের হালচাল দরপত্র তিনি জানেন। কপিটা হাতে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন। নাকের কাছে এনে জোরে শ্বাস টানলেন। সেই সুমিষ্ট গন্ধের কিছুই অবশিষ্ট নেই দেখে যেন বিরক্ত হয়ে নামিয়ে রাখলেন। একটা ফুলকপি তুলে নিলেন হাতে। খুব মোলায়েম ভঙ্গিতে আঙ্গুল বুলিয়ে যেন আদর করলেন। চেনা গন্ধটা একটু যেন পাওয়া যাচ্ছে। নৈনিতাল আলুর সঙ্গে ঘি গরম মশলা দিয়ে ডালনা করলে মন্দ লাগবে না। লাবণ্যর কথা মনে পড়ল। ফুলকপি ভাতে সেদ্ধ খেতে খুব ভালবাসত। নুন লঙ্কা দিয়ে সুন্দর করে মেখে বলত, 'আমার আর কিছুই চাই না। এই দিয়েই এক থালা ভাত খেয়ে ফেলতে পারি আমি!'

—'আহা-হা! অত টিপবেন না!' একসময় ছোঁ মেরে কপিটা তুলে নিল দোকানী, 'একি কাঁঠাল, না পাউরুটি!'

সীতানাথ অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে দাম জিজ্ঞেস করলেন। বড় সাইজের পেয়ারার মত কপিটা। দোকানী দাম বলল, সত্তর পয়সা। সীতানাথ জোরে জোরে মাথা নাড়লেন, 'বড় বেশি দাম বলছ হে! বউবাজারে এই ফুল চল্লিশ থেকে পঞ্চাশ—'

'চল্লিশ পয়সা! এই ফুল!' দোকানী অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে সীতা-নাথের মুখ দেখল, 'তাহলে ওখানেই নিন গে!'

সেই মুহূর্তে গৌরবর্ণ নাদুসনুদুস এক ভদ্রলোক এসে দাঁড়াল। গিলে করা পাঞ্জাবিতে সোনার বোতাম। পেছনে ঝাঁকামুটে। এসেই তাড়া দিল, 'কই হে মথুর, তিনটে ফুল আর দুটো বাঁধা দাও ত ভাল দেখে।' কড়কড়ে একটা দশ টাকার নোট বার করল ব্যাগ থেকে। সীতানাথ অবাক হয়ে লোকটাকে দেখলেন। শালা ছোটখাটো একটা রাক্ষস যেন। দর নেই দাম নেই, ওজনে কত মারছে খেয়াল নেই—পাঁচপাঁচটা দামী জিনিস ঝাঁকায় তুলে নিল। বলি, পিঁড়িতে কনে বসিয়ে বিয়ের বাজার সারতে এলে নাকি হে,

যে এত তাড়া! তারপর এই লোকটা কি করে, কত টাকা মাইনে পায়, ঘুষখোর বড় অফিসার-টফিসার হতে পারে, না হলে চোরাকারবার করে নিশ্চয়—ভাবতে ভাবতে অপেক্ষাকৃত পাতলা ভিড় ঠেলে আর একটা দোকানের কাছাকাছি এসে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন।

আহা, তরিতরকারির দোকান না ত, যেন গয়নার দোকান! খুব বেশি পাওয়ারের চশমার আড়ালে সীতানাথের ঘোলাটে চোখ লোভে আর তৃষ্ণায় চকচকে হয়ে উঠল। বড় বড় চারটে ঝাঁকা ভর্তি চার রকমের মাল। একটায় কড়াইশুঁটি—হালকা সবুজ। একটায় বিলেতি বেগুন—ফিকে লাল। একটায় দেশী বেগুন—ঘন কৃষ্ণ। আর একটাতে বড় বড় মাদ্রাজী হাঁসের ডিম—সাদা ধবধবে। ঝাঁকার মধ্যে সব চুঁড়ো বেঁধে সাজানো, আর পিরামিড-আকৃতি এই বিচিত্র বর্ণসমারোহের মাঝখানে ছেলেটা বসে আছে যেন রাজপুত্তুর! গুটি তিনেক ভারিক্কি গোছের লোক—কেউ কড়াইশুঁটি কিনল, কেউ বিলেতি বেগুন, সীতানাথ দাঁড়িয়ে দেখলেন। ওরা চলে গেলে ছেলেটা তাকাল তাঁর দিকে, 'আসুন দাদু, সব বাছাই মাল!'

সীতানাথ তাঁর কালো রোগা হাতে খুব যত্নের সঙ্গে একটা ঘন লাল টমেটো তুলে নিলেন। একটু শক্ত শক্ত ঠেকছে। কিন্তু বেশ তাজা, রং ধরেছে চমৎকার। গত শীতের পর, এমন জিনিস আর ছুঁয়ে দেখেন নি। 'এসব কোথাকার জিনিস হে খোকা? কোল্ড স্টোরেজের মাল বলে ত মনে হচ্ছে না! কি বললে? রাঁচির? ওখানে ত পাগলেরা থাকে শুনেছি! এসব ভাল ভাল জিনিস হয় নাকি ওখানে? এই শ্রাবণ ভাদ্র মাসে? দর কি? তিন টা-কা! এক কেজিতে ক'টা ধরে? আট থেকে দশ? তাহলে একটার দাম পড়ল গিয়ে তোমার—'

যেন সীতানাথ পুরনো আমলের মত ক্লাসে দাঁড়িয়ে অঙ্কের বোর্ড-ওয়ার্ক করছেন এমন ভঙ্গিতে নির্ভুল দাম কষে ফেললেন। তারপর হাত বাড়ালেন কড়াইশুঁটির দিকে, 'এগুলোও রাঁচির মাল

বুঝি ? আড়াই টাকা ? একটু বেশি বললে না ভাই !'

এমন সময় দু'জন খদ্দের এল। ছেলেটা ওদের সঙ্গে দরদস্তুর করতে করতে সীতানাথের ওপর নজর রাখল। আসলে সীতানাথকে সন্দেহ করছিল ও। মনে মনে বিরক্ত হচ্ছিল। এসব ধোয়া মোছা বাছাই জিনিস। এত ঘাঁটাঘাঁটির কি আছে? সীতানাথ ততক্ষণে ডিমে হাত দিয়েছেন। কানের কাছে ঝাঁকিয়ে আলোতে ধরে দেখবার চেষ্টা করছেন নষ্ট পচা কিনা। ডিমের ঝোলে কড়াইশুঁটি আর টমেটো দিলে কি পরিমাণ উপাদেয় হয়, ঠিক এইধরনের সুস্বাদু রান্না তিনি মেজ বৌমার বাপের বাড়িতে একবার খেয়েছিলেন কিনা, নাকি তাঁর নিজের মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে— মনে করবার চেষ্টা করলেন। মাসের শেষ দিক বলে এখন বাসায় ত খালি ডাল আর আলু কুমড়োর চচ্চড়ি। রাতের বেলায় রুটি গিলতে বমি আসে! একটু মাছের গন্ধ না হলে খেতে বড় কষ্ট হয় তাঁর। কিন্তু কে বোঝে! সমীরটা না হয় ছাঁটাই হয়ে বসে আছে। বাকি ছেলে দুটো ত খারাপ রোজগার করে না। একটু মাছ ডিম আনতে এমন কি আর পয়সা লাগে! কিন্তু হলে কি হবে, বউমারা সব মন্ত্র দিয়েছে কানে। বড় ভাবে, আমি কেন সব খরচ করে গুষ্টিসুদ্ধু গেলাই! ইচ্ছে হয় মেজ করুক। ওদিকে বউয়ের মন্ত্রে মেজটি তলে তলে আলাদা বাসার খোঁজ করছে। ছোটটা ত বেকার বাউণ্ডুলে। দিনরাত বাইরে বাইরে ঘোরে। সবাই এখন নিজের কথা ভাবে, নিজের নিজের সংসারের কথা। সীতানাথের কথা কেউ ভাবে না। পচা আলু কি নষ্ট আমের মত তিনি এখন সংসার থেকে বাতিল হয়ে গেছেন।

ডিমগুলোর দিকে লুব্ধ চোখে তাকালেন সীতানাথ। গোটা দুই যদি নিয়ে যান আজ, কেউ কি একটু পেঁয়াজ-বাটা দিয়ে শুকনো ঝোল করে দেবে তাঁকে ?

আর তখুনি খদ্দের দু'জনকে বিদেয় করে প্রায় মরিয়া হয়ে ডিমটা কেড়ে নিল ছেলেটা। রুক্ষ গলায় যেন ধমকে উঠল, 'আপনি কিছু নেবেন না, সরে পড়ুন দাদু—'

সীতানাথ খুব অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতে ছেলেটার দিকে তাকালেন। বাচ্চা হলে কি হয়, বদমাইসের ধাড়ি। মুখটা কেমন পাকা পাকা। চোখ দুটো যেন ধূর্ত শেয়াল। দিনরাত হাজার লোককে ঠকাচ্ছে। এখন কেমন বিড়ি ধরাচ্ছে দেখ—

কিন্তু সীতানাথ কোনো প্রতিবাদ করলেন না। অল্পকাল তাকিয়ে থেকে হাঁটতে শুরু করলেন। তাঁর বুকে কেমন একটা কষ্ট হচ্ছিল। লম্বা শরীরটা সামনের দিকে খুব বেশি ঝুঁকে পড়েছিল। শুকনো ঠোঁট নেড়ে বিড়বিড় করছিলেন তিনি। আমি ত এখন একটা ঢোঁড়া সাপ। যার যা খুশি তা ত বলবেই! এরা ত সব ঝানু বদমাস বাজারের ছেলে, ঘরের বৌরাই ত চোর বলে আমাকে। মিটমিটে শয়তান বলে। আমি নাকি লুকিয়ে রান্নাঘরে ঢুকে এটা ওটা খাই। ছেলেদের পকেট থেকে বিড়ি দেশলাই তুলে নিই। বড় ছেলে সব শুনেও চুপ করে থাকে। মেজ বৌমা ওর ছেলেমেয়েদের আমার কাছে ঘেঁষতে দেয় না। আমার গায়ে নাকি পচা চামড়ার গন্ধ। ওদের নাকি অসুখ করবে। মেজ ছেলেটা প্রায়ই ধমকের সুরে বলে, 'বসে না থেকে দু'চারটে বাচ্চা জুটিয়ে পড়ালে ত পারেন। দুটো পয়সা আসে সংসারে।'

অথচ আমার একটা শরীর ভেঙ্গে তোদের সব ক'টার জন্ম, পুষ্টি, বৃদ্ধি! তোদের জন্য সব খুইয়ে এখন আমি অকর্মা বুড়ো। এই বয়সে নতুন করে আমি আর কি করতে পারি। কি করা সম্ভব। তোদের সংসারের অভাব দুঃখ কষ্ট আমি বুঝি বলেই ত আধপেটা খেয়েও চুপ করে থাকি। আর ছাঁটাই-হয়ে-যাওয়া ছেলেটার জন্য আরো কষ্ট। বৌটার বাচ্চা হবে। দুই জা'র চাপে পড়ে দিনরাত ছটফট করে। সমীরটা পাগলের মত ঘুরে বেড়ায়। আমি সব দেখি। সব বুঝি।

সীতানাথ যত এগুচ্ছেন ভিড় তত বাড়ছে। মনটা একটু বিষণ্ন, ভারি ভারি। লাবণ্যর কথাও মনে পড়ছে। ত্রিশ বছর ঘর করার পর তিন দিনের জ্বরে কেমন সুন্দর চলে গেল। মরবার দিনও

কথা বলেছে। একটা টিনের কৌটায় ক'টা টাকা জমিয়ে রেখেছিল—সীতানাথকে দিয়ে গেছে। লাবণ্যর শ্রাদ্ধের সময় টাকা ক'টা চেয়ে নিল বড় বৌমা। একবার মেয়ের শ্বশুরবাড়ি গিয়েও ক'টা টাকা এনেছিলেন। তিনি চান নি। মেয়ে নিজেই দিয়েছিল গুঁজে। তাঁর টিনের বাক্সটায় যত্ন করে রেখেছিলেন। সেদিন সমীরকে দেবেন বলে খুঁজে আর পেলেন না। একটা পোস্টকার্ড যোগাড় করে রেখেছেন। মেয়েকে চিঠি লিখবেন তিনি। লিখবেন, 'তোমার দেওয়া টাকা কয়টি—'

একধরনের তীব্র আঁশটে গন্ধ নাকে এসে লাগল। সীতানাথ বুঝতে পারলেন তিনি মাছের বাজারে পৌঁছে গেছেন। একটু রাত হলেও চিৎকার-চেঁচামেচিতে মাছের বাজার জমজমাট। সীতানাথ দাঁড়িয়ে পড়লেন। গন্ধটা তাঁর ভাল লাগছে না। কেমন যেন গা ঘুলিয়ে উঠে পেটে পাক দিচ্ছে। নাইকুণ্ডলের কাছে চিনচিনে ব্যথা। সীতানাথ বুঝলেন, তাঁর খুব খিদে পেয়েছে!

বিকেলে বউমাদের সঙ্গে রাগারাগি হয়েছে বলে একটু চা-ও খাননি। সেই কোন্ সকালে ধানে-কাঁকড়ে মেশানো চারটে ভাত খেয়েছিলেন ছোলার ডাল আর ডাঁটাচচ্চড়ি দিয়ে। বিকেলে অনেকটা অসহায়ের মত বলেছিলেন, 'চারটি মুড়ি আছে বউমা, একটু আদা কুচিয়ে মেখে দেবে?'

বড় বউমার চুল বেঁধে দিচ্ছিল মেজটি। দু'জনকেই তিনি বলেছিলেন কথাটা। কিন্তু কেউ উত্তর করল না। ও-পাশ থেকে ছোট বউমা বলল, 'এ বেলা জলখাবারে মুড়ি নয় ত বাবা, রুটি আর কুমড়োর তরকারি। খাবেন?'

সীতানাথ ঘাড় নাড়লেন। তাঁর দাঁতের ব্যথা বেড়েছে। রাত্রে রুটি খেতে চোখে জল আসে। ডাল দিয়ে ভিজিয়ে নরম করে নেন। ডাল না থাকলে জলে ভিজিয়ে নেন। বাচ্চাদের জন্য সামান্য দুধ আসে। বুড়ো হয়ে সীতানাথও যে বাচ্চার সামিল, কেউ অনুভব করে না। এখন আর রুটি খেতে তাঁর ইচ্ছে নেই। ছোট বউমা সরে

গেলে তিনিও অভিমান করে সরে এলেন। ঘরে মুড়ি ছিল কিনা, ছিল ত তিন তিনটে ছেলে-বউ কেন গা করল না, ভাবলেন। আর না থাকলেই বা কি, সামনেই ত দোকান, ছেলেপুলেরা একদৌড়ে নিয়ে আসতে পারে, পয়সা ফেললে তিনিও নিয়ে আসতে পারেন। এমন কি হাতী ঘোড়া খেতে চেয়েছেন সীতানাথ! ছোট বউকে একটু ভাল মনে করতেন, এখন দেখছেন সব শেয়ালের এক রা—

পাঞ্জাবিটা গায়ে গলিয়ে বাইরে বেরুলেন। কে যেন চেঁচাল, 'এখন আবার যাচ্ছেন কোথায়! মেজ ঠাকুরপো এলেই চা হবে—'

বড় বউমার গলা। সীতানাথ শুনলেন না। রাস্তায় নামলেন।

এখন তিনি কি একবার মাছের বাজারটা ঘুরবেন? খুব একটা উৎসাহ বোধ করলেন না সীতানাথ। তাঁর ঘাড়ে গলায় ঘাম জমেছে। বুকের লোমে ঘাম জমে কুটকুট করছে। আঁশটে গন্ধে যেন বমি আসছে। নাভি বৃত্তে চিনচিনে ব্যথা।

সীতানাথ একপাশে সরে লম্বা ঘাড় উঁচু করলেন। ঘোলাটে দৃষ্টি যথাসাধ্য শান দিয়ে তাকালেন চারদিকে। দেখলেন, আহা, মাছ ত না, যেন গলানো রূপা! মাছওলা চেঁচাচ্ছে, 'বাবু দশটাকা, গঙ্গার বুকে পদ্মার ইলিশ, জলের দর দশ টাকা!' আর চকচকে পালিশ করা দশটাকার রূপোর পাত আকাশের চাঁদ হয়ে আলোতে যেন দুলে দুলে সাঁতার কাটছে! আর আচ্ছন্ন সীতানাথ গন্ধ পাচ্ছেন, যেন অনেক দূরে কোথাও কচি কলাপাতায় সরষেবাটা-মাখা ইলিশ ভাতে সেদ্ধ হচ্ছে। ঝোল থেকে উঠছে সোনামুখী কাঁচালঙ্কার গন্ধ। চমৎকার সেই গন্ধে জিভে জল এসে গেল সীতানাথের। বার কয়েক ঢোঁক গিলে তিনি তাকালেন ও-পাশে। আহা, বড় বড় গলদা চিংড়ি হাত পা ছড়িয়ে যেন শহর দেখতে এসেছে। ওই যে, মস্ত বড় একটা রুই মাছ কাটা হ'ল। লাল রক্তে মাছের সঙ্গে হোলি খেলছে মাছওলা। চেঁচাচ্ছে প্রাণপণে, 'এই যে বাবু খুন, বাবু খুন! আহা-হা, রক্তে ভাইস্যা গেল কইলকাত্তা!' মাছের পেট থেকে বেরুল মস্ত বড় একটা তেল, এ-ত বড় একটা ডিমের পাহাড়! খানিকটা

তেল কিংবা ডিম নেবার জন্য সীতানাথ ছটফট করে উঠলেন! কত দিন যে ডিমের বড়া খাননি তিনি!

আর তখন ছোটখাটো একটা ভিড় এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল তাঁর গায়ে। চাপে তাঁর দমবন্ধ হবার উপক্রম হ'ল। পিপাসায় তালু শুকিয়ে গেল। নাভিবৃত্তে ক্ষুধা চনচন করে উঠল। পা ছুটো অল্প কাঁপতে কাঁপতে যেন অবশ হয়ে আসতে লাগল। আর দাঁড়ালেন না সীতানাথ। নামতে শুরু করলেন। ছ'হাতে জোর করে ভিড় ঠেলে ঠেলে এলেন রাস্তায়। একটু দম নিয়ে বড় বড় পা ফেলে হ্যারিসন রোডের দিকে হাঁটতে শুরু করলেন। এ-পাশে ও-পাশে তাকাচ্ছিলেন তখনও। কিন্তু ঘরবাড়ি দোকানপাট সমেত মানুষজন কেমন যেন ঝাপসা লাগছিল। সীতানাথের মনে হচ্ছিল, তিনি আর হাঁটতে পারবেন না, এক্ষুনি টলে পড়ে যাবেন রাস্তায়।

তারপর খুব ব্যস্ত ভঙ্গিতে এক জায়গায় থেমে পড়লেন হঠাৎ। উজ্জ্বল মুখ করে চিঁড়ে দেখলেন। পরপর ক'টা লোক বস্তার মুখ খুলে দাঁড়িয়েছিল। সাদা ধবধবে চিঁড়েগুলো যুঁই ফুলের মত স্তূপাকার হয়ে আছে। কারোরটা ঈষৎ কালচে। সীতানাথ একটা বস্তা থেকে খানিকটা তুলে নিলেন হাতে। দাম জিজ্ঞেস করলেন।

'তিন টাকা যাট।' —লোকটা বলল।

'তেতো-টেতো হবে না ত হে!' —সীতানাথ সন্দেহ করলেন।

'না কর্তা! খেয়ে দেখুন না চারটি!'

সীতানাথ খপ করে চিঁড়ে ক'টা মুখে পুরলেন। চিবুতে গিয়ে মাড়ির দাঁত ব্যথায় ঝনঝন করে উঠল। চোয়ালছুটো শক্ত হয়ে ঠেলে উঠল। সীতানাথ মুখ বিকৃত করলেন।

লোকটা একদৃষ্টে তাকিয়েছিল। জিজ্ঞেস করল, 'কি হ'ল গো কত্তা!' সীতানাথ ঢোঁক গিলে বললেন, 'উহুঁ! তেমন সুবিধের না! কেমন যেন একটা গন্ধ লাগছে—'

আর একটা দোকানের দিকে এগুলেন, 'কি গো দোকানী, তোমারটা কি দর, কেমন মাল?' লোকটা অন্য খদ্দের নিয়ে ব্যস্ত

ছিল। ভিড়ের ফাঁকে হাত ঢুকিয়ে দিলেন সীতানাথ। একটু বেশী চিঁড়ে তুলে মুখে পুরলেন। তারপর লোকটা তেমন লক্ষ্য করল না দেখে আর দাঁড়ালেন না।

বড় বড় পা ফেলে এগিয়ে গেলেন আরো একটু।

একটা মাঝবয়সী গেঁয়ো ধরনের মেয়েমানুষ হাঁটু উঁচিয়ে বসে বড় ডালায় গুড় বিক্রি করছে। সীতানাথ ঝুঁকে সামান্য গুড় ভাঙলেন। দর জিজ্ঞেস করতে করতে মুখে দিয়েই বলে উঠলেন, 'আরে রামো। এ যে তালগুড়, আমি ভাবলাম খেজুরের—'

মেয়েমানুষটা বিরক্ত হয়ে বলল 'এখন বস্‌সা কালে খেজুরের রস কোথায় গো বাবা! বুড়া বয়সে আপনার সিতি বেভরম্ হয়েছে—'

সীতানাথ ততক্ষণে স্টেশন-মুখো হাঁটতে শুরু করেছেন।

এবার একটু জল খাবেন তিনি।

না, খুন করাটা আজকাল আর কঠিন কিছু না। মানুষ খুনের কথাই বলছি। খুব স্বাভাবিক হয়ে গেছে ব্যাপারটা। নিরীহ, মসৃণ, নিরুত্তাপ। দুর্গাপূজায় চালকুমড়ো বলির মত বা মুখে সাবানের ফেনা তুলে দাড়ি কাটার মত। ও নিয়ে কেউ আজকাল ভাবে না, দুশ্চিন্তা করে না। প্রতিদিন রাস্তা-ঘাটে হাটে-বাজারে কলে-কারখানায় নিঃশব্দে মানুষ খুন হয়ে যাচ্ছে। কখনো বোমায়, কখনো ছুরিতে, কখনো বা স্রেফ লাঠির পিটুনিতে। এর সঙ্গে সরকার-বাহাদুরের গুলিগোলা তো আছেই। রাস্তায় তরল রক্ত জমাট বাঁধার আগেই গাড়ির চাকায় বা পথচারীর পায়ে পায়ে শুকিয়ে ধুলো হয়ে উড়ে যাচ্ছে। হয়ত বাতাসে কোথাও একটু রক্তের গন্ধ থাকছে কিন্তু জীবিকার তাড়নায় মানুষের ধাবমান ব্যস্ততা তার দিকে একটুও লক্ষ্য রাখছে না। রাখার সময় নেই। মন নেই।

এই তো সেদিন। ভরদুপুরে ইউনিভার্সিটিতে গিয়েছিলাম এম-এ পরীক্ষার ফর্ম আনতে। বেরুবার মুখে ডানদিকের গলিতে কুরুক্ষেত্র। কে কোন্ পক্ষ জানি না, দুমদাম বোমা ফাটিয়ে চলেছে। বছর ষোলোর একটা ছেলে, বোধ করি ও-পক্ষের দিকে একটু এগিয়ে গিয়েছিল, একটা বোমা এসে সোজাসুজি বুকে ফাটল। ছেলেটা 'মাগো' বলে চেঁচিয়ে উঠে রাস্তায় গড়িয়ে পড়ল। ওর বুকটা ঝাঁঝরা হয়ে গিয়েছিল। নাকের মাংস উড়ে গিয়েছিল, থুতনির কাছে মস্তবড় একটা গর্ত হয়েছিল। দু'তিন মিনিট হাত পা দাপিয়ে ঠাণ্ডা শক্ত নিস্পন্দ হয়ে গেল। আমি দূর থেকেও বুঝতে পারলাম, ছেলেটা মরে গেল।

আবার সেদিন, ব্রহ্মানন্দ পার্কে বুঝি কাদের মিটিঙ ছিল। একটা মিছিল যাচ্ছিল পাড়া দিয়ে। হঠাৎ কারা লম্বা লম্বা লাঠি,

লোহার রড নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। একটু পরেই দেখলাম মাঝবয়সী একজন বেঁটেমানুষ, মনে হয় আমাদের মতই সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের, রাস্তায় কাৎ হয়ে পড়ে আছে। তার একমাথা কালো চুল রক্তে লাল হয়ে উঠেছে। অনেকক্ষণ পরে একটা এ্যাম্বুলেন্স এসে উঠিয়ে নিয়ে গেল। পরের দিন খবর পেলাম, সে বাঁচে নি। তাকে হত্যার প্রতিবাদে এই অঞ্চলে হরতাল হয়ে গেল।

এইসব দেখেশুনে আর প্রতিদিন কাগজে বা রেডিওতে পাইকারী হারে খুনের খবর শুনতে শুনতে ক্রমশ কেমন ধারণা হতে লাগল, বোধ হয় ইচ্ছে করলে আমিও একটা খুনটুন করে ফেলতে পারি— হাঁস-মুরগী, হরিণ-টরিণ না, মানুষ খুন!

অথচ ছেলেবেলা থেকে স্বভাবে-প্রকৃতিতে আমি খুব নিরীহ, নির্বিরোধী। কোনোরকম নিষ্ঠুরতা একেবারেই সহ্য করতে পারি না। একসময় আমাদের বাড়িতে কালীপূজো হ'ত। মধ্যরাত্রে ছোটখাটো একটা পাঁঠা বলি দেওয়া হ'ত। আমি কখনো সে দৃশ্য দেখতে পারতাম না। আমার বড়মামা মুর্গী খেতে ভালবাসে। কখনো আমাদের বাড়িতে এলে বাজার থেকে মুর্গী কিনে আনত। পুরনো ঘষা ব্লেড্ দিয়ে তার গলা কাটা হ'ত। মামা আমাকে ঠ্যাংদুটো টান করে ধরতে বলত। আমি কখনো রাজী হতাম না। তখন নলহাটীর যে পাড়াটায় আমরা থাকতাম তার একটু দূরেই ছিল ডোমপাড়া। মাঝে মাঝে শূয়োর তাড়া করে লাঠি দিয়ে পিটিয়ে মারত ওরা, তারপর বাঁশে বেঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে যেত। মৃত্যুমুখী শূয়োরটার তীব্র আর্তনাদ আমি ঘরে বসে শুনতে পেতাম। আমার বুকে কি রকম একটা কষ্ট হ'ত। চোখ ফেটে জল আসত। দু'তিনদিন ধরে সেই কষ্টটা আমার মনে ভারি পাথরের মত চেপে থাকত।

এই শহরে এসে আমি প্রথম যেদিন একটা বাচ্চা ছেলেকে ট্রামে চাপা পড়তে দেখলাম সেদিনও বুকের মধ্যে ছেলেবেলার সেই অদ্ভুত কষ্টটা অনুভব করেছিলাম। ছেলেটার মাথা থেঁৎলে গিয়ে ঘিলু বেরিয়ে পড়েছিল, হাতের আঙুলগুলো এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়েছিল।

ভয়ানক সেই দৃশ্য। আমি দেখতে চাই নি, তবু আমার চোখের সামনেই ঘটল বলে দেখতে বাধ্য হলাম। আমার সারা শরীর থর থর করে কেঁপে উঠল। সমস্ত গা ঘুলিয়ে গেল। আমার মাথা ঘুরতে লাগল। এরপর অনেক দিন সেই দৃশ্যটা ভুলতে পারলাম না। ভাত খেতে বসে তার কথা মনে হতে আমার সমস্ত খাওয়া মাটি হতে লাগল। ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখে আমি ঘেমে উঠতে লাগলাম।

তারপর আস্তে আস্তে এই শহর আমার কাছে পুরনো হয়ে গেল। আমি কত দেখলাম, কত শুনলাম। দেখতে দেখতে শুনতে শুনতে আমার মনের কোমল অনুভূতিগুলো একটু একটু করে মরে যেতে লাগল। আমিও ক্রমে ক্রমে কেমন নির্বিকার, নিষ্ঠুর, হিংস্র হয়ে উঠতে লাগলাম। এখন আমি এই কলকাতা শহরের অলিতে গলিতে, রাজপথে প্রায়ই মানুষ খুন হতে দেখি। আগের মত আমার বুক কাঁপে না, দৃষ্টি প্রখর হয় না, দু'হাতে মুখ ঢেকে পালিয়ে যাওয়ার প্রশ্নও ওঠে না। এ-পাশে বৌবাজারের মোড়ে গুলি-খাওয়া কোনো অফিস-ফেরৎ মানুষের মৃতদেহ কুঁকড়ে ছোট হয়ে পড়ে থাকে, ও-পাশে আমি কিছুটা বিমর্ষতা নিয়ে বৈঠকখানা বাজারে ঢুকি, কুঁচো চিংড়ি কি ট্যাংরার দরদাম করি, কই মাছের ঝোলে বেগুন না ফুলকপি কোন্‌টা যুৎসই ভাবতে থাকি। ছেলেবেলার সেই কষ্ট আর বুকের খাঁচায় ধাক্কা দেয় না। নিজের জীবন ও জীবিকার দায়ে আমি এখন আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়েছি।

কিন্তু এসব দৃশ্য আমার মনের অনেককিছু ভাঙচুর করলেও আমাকে ঠিক হত্যার জন্য প্রস্তুত করে তুলতে পারে নি। তার জন্য দায়ী আমাদের পাড়ারই সাম্প্রতিক একটা ঘটনা।

সেদিন বুধবার। আমি আর কালীদা অফিস-টাইমে বাস ধরার জন্য ছুটছিলাম। গলির মুখে পৌঁছানোর আগেই দুমদাম্ পটকা ফাটতে শুরু করল। একটা বোমা এত জোরে ফাটল যে আমার কানে তালা লেগে গেল। আশেপাশের কিছু দোকান ঝটপট বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। মানুষজন ছুটোছুটি শুরু করল। কালীদা আমার হাত টেনে

বলল, 'আর এগিয়ে কাজ নেই। ওই বারন্দায় একটু দাঁড়াই চল!'

এমনসময় আমাদের পাড়ার শিবু, মনোহর, কার্তিকেরা একটা মানুষকে টানতে টানতে নিয়ে এল। আমাদের সামনেই খোলা-রাস্তায় মনোহর একটা লোহার রড্ দিয়ে লোকটার মাথায় মারল। লোকটা হাত পা ছুঁড়ে প্রাণপণ চিৎকার করছিল। ভয়ে তার মুখ সাদা, চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছিল। রডের বাড়ি পড়তেই ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটল। ঘাড়টা একদিকে কাৎ হয়ে গেল। কার্তিক ওর হাতদুটো পিঠের দু'পাশে টেনে কোণাকুণি মুচড়ে রেখেছিল। ওর গাল বেয়ে দরদর করে রক্তের ধারা নামছিল। আমি আর কালীদা ভয়ে দেয়ালের সঙ্গে সেঁটে গিয়েছিলাম। আমার হৃদপিণ্ড দ্রুত-তালে লাফাচ্ছিল। একটু পরেই ভয়ানক ক্রুদ্ধ গলায় কি একটা বলে শিবু পকেট থেকে ছুরি টেনে বের করল। আহত লোকটা প্রাণপণ চিৎকার করে পা ছুঁড়তে চাইল। কিন্তু ততক্ষণে সেই ধারালো ছুরিটা আমূল বসে গেছে তার পেটে একবার নয়, তিন-চারবার। শিবুর হাত রক্তে ভিজে উঠেছে। চোখ জ্বল জ্বল করছে। একটু পিছিয়ে, আবার একটু এগিয়ে ডানদিকে সামান্য ঝুঁকে আরো একবার ছুরি চালাল সে। কার্তিক হাত-দুটো ছেড়ে দিতে লোকটা শব্দ করে রাস্তায় গড়িয়ে পড়ল। শিবুরা কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থেকে পাশের গলি দিয়ে ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল। যাওয়ার সময় বড়রাস্তার দিকে আরো দুটো বোমা ছুঁড়ে গেল। তার থেকে কিছু কুচিপাথর কাঁচের টুকরো ছিটকে আমাদের বারান্দায় এসে পড়ল। চোখ বাঁচানোর জন্য আমরা দু'হাতে মুখ ঢাকলাম।

মাত্র কয়েক মিনিটের মধ্যেই এতসব কাণ্ড ঘটে গেল। শিবুরা চলে যেতে ও-পাশের চায়ের দোকান থেকে এক ছোকরা এগিয়ে এসে ঝুঁকে-পড়ে কি যেন দেখল। তারপর চারপাশে একবার নজর বুলিয়ে নীচু হয়ে লোকটার পকেট থেকে একটা কলম টেনে নিয়ে আবার দোকানে ফিরে গেল। লোকটা তখনও বোধ হয় বেঁচে ছিল। কেননা মাঝে মাঝে ওর ডান পায়ের পাতা নড়ে উঠছিল। আমি

আর কালীদা নীচে নামলাম। রেশন-দোকানের বন্ধ-দরজা ফাঁক করে দু'চারজন এগিয়ে এল। একটু একটু করে ভিড় জমতে লাগল।

আমি সামনের দিকে এগুতেই কালীদা আমার হাত টেনে ধরল, 'ইডিয়ট কোথাকার! ওদিকে কোথায় যাচ্ছিস? এখুনি বড়ো-রকমের একটা গণ্ডগোল শুরু হবে। ট্রাম বাস বন্ধ হয়ে যাবে। শীগ্‌গির চল—'

আমি বললাম, 'লোকটা এখনও বেঁচে আছে।'

'থাকুক! তোর কি তাতে!' কালীদা আরো জোরে আমাকে ধমকাল, 'তোর ভাই না ভাগ্নে? না কি তুই একটা ডাক্তার? ওই একটা দু'নম্বর আসছে। চল্, চল্...'

একরকম টানতে টানতে বাস স্টপে নিয়ে গেল আমাকে। তারপর অভ্যাসমত ঠেলাঠেলি গুঁতোগুঁতি করে হ্যাণ্ডেলটা ধরামাত্র বাসটা ছেড়ে দিতে কে যেন পায়ের ওপর পা রাখল। আমি ঠেলে পা সরিয়ে দিতেই লোকটা কনুই দিয়ে কোমরে খোঁচা মারতে মারতে বলল, 'এক ইঞ্চি ঢুকুন ভাই, তা হলেই হয়ে যাবে। প্লিজ—'

একটা তরতাজা জোয়ান মানুষকে চোখের সামনে খুন হতে দেখে আমার স্নায়ুগুলো কেমন অবশ হয়ে গিয়েছিল। এর আগে এমন স্পষ্ট করে প্রত্যক্ষভাবে কাউকে খুন হতে দেখি নি, খুনীকেও না। তখনও আমার বুক কাঁপছিল, কপালের শিরাগুলো দপদপ করছিল। খোঁচা খেয়েও আমি প্রতিবাদ করলাম না। সাধ্যমত সরে যাওয়ার চেষ্টা করলাম।

সেদিন অফিসে পৌঁছুতে পনেরো মিনিট দেরি হ'ল। সেকেণ্ড অফিসারের রুক্ষ দৃষ্টির সামনে হাজিরা-খাতায় সই করে ফিরে এসে কালীদা অসন্তুষ্ট মুখে বলল, 'শালা এমন শকুনের মত চেয়ে থাকে, হাড়পিত্তি জ্বলে যায়। সময় যেন ওর বাপের সম্পত্তি, আমরা সিঁধ কেটে চুরি করছি।' তারপর একটু থেমে রুমাল দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে পাশের অবনী ঘোষালকে বলল, 'হ'ত না

লেট্‌। এই শালা ভিস্থুটার জন্য। রাস্তায় একটা মার্ডার কেস দেখে হাঁ করে দাঁড়িয়ে পড়ল।'

অবনী ভুরু কুঁচকে বলল, 'কিসের মার্ডার?'

'কে জানে! পার্টি-ফার্টির ব্যাপার হতে পারে। বিকেলে জানা যাবে।'

'মেয়েছেলে নেই ত?' অবনী চাপা গলায় খিক খিক করে হাসল। কালীদা বিড়ি ধরিয়ে বলল, 'আশ্চর্য কি!' তারপর আমার দিকে ঘুরে বলল, 'রাস্তাঘাটে অমন খুন রোজই হচ্ছে! খবর্দার, হাঁ করে দেখতে যাবি নে। পুলিশ এসে তোকেই টেনে তুলবে!'

আমি কিছু না বলে ঘাড়-নীচু করে ফাইল টানলাম। কালীদার কথাবার্তা শুনে আমার খুব অবাক লাগছিল। একটা জলজ্যান্ত মানুষ প্রকাশ্য দিবালোকে খুন হয়ে রাস্তায় গড়িয়ে পড়ল, চোখের সামনে তা দেখে কালীদা একটুও বিচলিত হ'ল না। অবনী ঘোষাল তা নিয়ে কেমন রসিকতা করল। যেন মানুষ না, একটা বেড়াল কি কুকুর গাড়িচাপা পড়েছে, একনজর দেখার সময় নেই কারো, যদি বা দেখল, নাকে রুমাল চেপে বিচ্ছিরি রকমের মুখ করে ট্রামবাসের দিকে দৌড়ে গেল। এই বাংলাদেশে, এই কলকাতা শহরে মানুষের প্রাণ কি এখন হাঁস মুর্গী কুকুর বেড়ালের চেয়েও সস্তা হয়ে গেল! সমস্ত ব্যাপারটা ভাবতেই আমার কেমন খারাপ লাগল, রাগ হ'ল। পুরনো দিনের সেই কষ্টের অনুভূতিটা আর নেই, থাকলে নিশ্চয়ই অসম্ভব কষ্টও হ'ত। অফিসের কাজ করতে করতে সারাক্ষণ সেই খুন-হয়ে-যাওয়া মানুষটার রোগা কালোমত শরীরটা চোখে ভাসল। সেই হাতপায়ের খিঁচুনি, সেই অবিরাম তরল রক্তের ফিনকি, সেই চাপা অস্ফুট গোঙানির সঙ্গে চোখদুটো ঠেলে বেরিয়ে আসা…! প্রকাশ্য দিবালোকে বড়রাস্তার ধারে একদঙ্গল মানুষের চোখের সামনে সুস্থ সবল একটা মানুষ খুন হয়ে গেল অথচ রেশনের লাইন পুরোপুরি ভাঙল না, মোড়ের পানবিড়ির দোকানের বিক্রিবাট্টা বন্ধ হ'ল

না, ও-পাশে তৃপ্তি হোটেলে যে-মানুষগুলো ভাতের থালা নিয়ে বসে ছিল তাদের অনেকেই চেয়ার ছেড়ে উঠল না! আমি আর কালীদা কেমন নিশ্চিন্তে বাস ধরার জন্য ছুটে গেলাম। অথচ লোকটার শরীরে তখনও প্রাণ ছিল, তখুনি একজন ডাক্তার ডাকলে বা একটা এ্যাম্বুলেন্স আনিয়ে হাসপাতালে পাঠালে হয়ত বেঁচে যেত। কিন্তু সে-ব্যবস্থা করার জন্য কেউ উদ্যোগী হ'ল না, উপরন্তু চায়ের দোকানের ছোকরাটা এসে কলমটা সুন্দর হাতিয়ে নিয়ে গেল!

আমি কালীদার দিকে তাকালাম। এক মনে কাজ করে চলেছে। একটু আগের হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি ওর মনে কোনো ক্রিয়া করছে বলে বোধ হ'ল না। আসলে কালীদা রোদজল-খাওয়া পুরনো কাঠের মত পুরোপুরি সীজনড্ হয়ে গেছে। আমার চেয়ে বছর দশেকের বড় সে। আমার চেয়ে অনেক বেশী দেখেছে।

বিকেলে বাসায় ফিরতেই কল্যাণী চোখ বড় বড় করে বলল, 'সকালে এ পাড়ায় একটা—'

বললাম, 'নিজের চোখেই দেখে গেছি। লুঙ্গিটা দাও।'

'বাবুল গিয়েছিল দেখতে। ফিরে এসে ছেলের সে কি মন খারাপ। চোখে জল টলটল করছে।'

'ছোট আছে, তাই। বড় হলে আর করবে না। যাও, চা করো গে!'

একটু পরে কালীদা এল। ওর হাতে বাজারের থলে। চা খেতে খেতে বলল, 'সকালে পুলিশ একরাউণ্ড ঘুরে গেছে। আবার একটু পরে আসবে।'

'কাওকে ধরেছে?'

'কাকে ধরবে?'

'কেন? শিবুদের অনেকেই ত দেখেছে—'

'কেউ নাম করবে না। প্রাণের মায়া নেই? আর নাম করলেই ওদের তুলে নিয়ে যাবে নাকি? হুঁ!'

'তাই বলে—'

'থাম্। গাঁড়লের মত কোথাও শিবুদের নাম করে বসিস না। চোখ চেয়ে সব দেখবি বাট্ নেভার ওপেন মাউথ্। বুঝলি ?'

'বুঝেছি।'

'তবু ত ভিড়বিড় করিস। তাই বলতে আসা। চল, বাজারটা ঘুরে আসি।'

কালীদার মুখেই শুনলাম, নিহত ব্যক্তির নাম অরুণাভ। কোনো একটা রাজনৈতিক দলের সদস্য। তাকে খুন করার পেছনেও নাকি রাজনীতি আছে। শিবুরা দীর্ঘকাল ধরে এ-পাড়ার একজন প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার আশ্রয়পুষ্ট। কর্মটা নিশ্চয়ই কর্তার ইচ্ছেতেই হয়েছে। কিন্তু কার্যকারণ যাই থাকুক, আসল কথা, আজ প্রকাশ্য দিবালোকে তরতাজা একটা মানুষ আমার চোখের সামনে খুন হয়েছে।

পরের দিন অফিস যাওয়ার মুখে আমি সেই জায়গাটা দেখলাম। কাল এইসময় টকটকে লাল রক্তস্রোতে জায়গাটুকু ডুবে গিয়েছিল। এখন চিহ্নমাত্র নেই। শক্ত কালো পীচের উপর গাড়ির চাকার বরফি কাটা দাগ, পুরনো সিগেরেটের বাক্স, ছেঁড়া ন্যাকড়া। তবু স্থানটুকু পার হবার সময় আমার শিরদাঁড়ায় ঠাণ্ডা তরল কিছু শির শির করে উঠল। আমি অন্যদিকে চোখ ফিরিয়ে নিলাম।

তার পরের দিন, ওই জায়গাটুকু আমি দেখব না, দেখতে রাজি নই, দেখতে আমার ভাল লাগে না ভাবতে ভাবতে কাছাকাছি এসেই চোখ বড় বড় করে তাকাতে বাধ্য হলাম। আর সেদিনও আমার শিরদাঁড়া কেঁপে উঠল, হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল। আমি যেন নিহত সেই মানুষটাকে পড়ে থাকতে দেখলাম ; তার মাথা দিয়ে, পেট দিয়ে গলগল করে রক্ত বেরুচ্ছে, ডান পায়ের পাতা অল্প অল্প নড়ছে, ঠিকরে-বেরিয়ে-আসা চোখদুটো আধবোঁজা, হাঁ-করা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে খানিকটা জিভ ঝুলে আছে।

তার পরের দিন রাগ করে, তীক্ষ্ণ চোখে সোজাসুজি সেই স্থানটুকুর দিকে তাকিয়ে ভ্রুকুটি করতে করতে অফিসে চলে গেলাম।

আমি হাতের মুঠো শক্ত করে রেখেছিলাম। দাঁতে দাঁত ঘষে জোরে শ্বাস টানছিলাম। পিঠের হাড় যাতে শির শির না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখছিলাম।

চতুর্থদিনও ওইভাবেই মোকাবেলা করব ঠিক করে এগিয়ে যেতে সেই স্থানটুকু জুড়ে কর্পোরেশনের ময়লা-ফেলা গাড়ি দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলাম এবং তাতে আমি খুব স্বস্তি অনুভব করলাম। এর দিন দুই পরে প্রবল একটা অট্টহাসি শুনে চমকে উঠে দেখলাম—শিবু! যে কিনা ধারালো ছুরিটা পর পর অরুণাভের পেটে ঢুকিয়ে দিয়েছিল! একটু ঢ্যাঙা শক্তপোক্ত চেহারা। চুলগুলো কায়দা-মাফিক ছোট করে ছাঁটা। কপালের ডানদিকে আধইঞ্চি পরিমাণ কাটা দাগ, চোঙা প্যাণ্ট, নাইলনের ডোরাকাটা গেঞ্জি। পানের দোকানটার সামনে দাঁড়িয়েছিল, সঙ্গে মনোহর, কার্তিক। কি একটা কথায় হেসে উঠেছে। হাসিটা যেন মেঝেতে একখণ্ড লোহা গড়িয়ে দেওয়ার মত। কঠিন, কর্কশ, কর্ণভেদী। আমি ভয় পেলাম। আমার মনে হ'ল, ওই হাসিটা গড়াতে গড়াতে ক্রমশ উঁচু হয়ে সেই স্থানটুকুতে গিয়ে স্থির হ'ল, একেবারে নিষ্কম্প স্থির, যেন একটা স্তম্ভের মত—যেখানে মাত্র ক'দিন আগে ওই মানুষটা খুন হয়েছিল।

আমি ফিসফিস করে বললাম, 'কালীদা, ওই যে শিবু!'

'দেখেছি।' কালীদা চাপাগলায় বলল, 'চেঁচানোর কি আছে? চুপচাপ চল্।'

ওই পানের দোকানটায় কালীদা রোজ পান খায়, বিড়ি নেয়। আজও গিয়ে দাঁড়াল। কার্তিক একপাশে একটু সরে গেল। শিবু সিগেরেটের প্যাকেট খুলতে লাগল। খুব সামনে থেকে আমি শিবুর মুখ দেখলাম। গেঞ্জির ফাঁক দিয়ে বুকের ঘন কালো লোম দেখলাম। হাতের কব্জি, কব্জিতে বাঁধা সোনালি ব্যাণ্ডের রিস্টওয়াচ দেখলাম।

এর আগে এত সামনাসামনি, প্রায় স্পর্শের মধ্যে, আমি কোনো

খুনী দেখি নি। একেবারে দেখি নি বললে অবশ্য ভুল হবে। ছোট বেলায় নলহাটিতে থাকার সময় একজন বাঁদর-মারা দেখেছিলাম। হাতে বন্দুক নিয়ে ঘুরে বেড়াত। কালো কুচকুচে রঙ। মাথায় কদম ছাঁট চুল। খাকি রঙের প্যান্ট আর নীল হাফশার্ট পরনে। একদিন আমাদের স্কুলের সামনে মস্ত বড় বটগাছটায় একটা বাঁদরকে তাক্ করে গুলি করেছিল। বাঁদরটা চিৎকার করতে করতে ডাল ধরে অনেকক্ষণ ঝুলে ছিল। ওর পিঠ থেকে টপটপ করে রক্ত ঝরে পড়ছিল। তারপর রাস্তার ধুলোবালিতে পড়ে গিয়েছিল। লোকটা দাঁত বের করে হাসছিল। হেডমাস্টারমশাই ওকে খুব বকেছিলেন। আমার ঢিল মেরে লোকটার মাথা ফাটিয়ে দিতে ইচ্ছে করছিল। বাঁদরটার ছটফটানি দেখে চোখ ফেটে জল আসছিল। পাথরের মত ভারি সেই কষ্টটা বুকের মধ্যে চেপে বসেছিল।

এরপর একজন মানুষ-খুনীও দেখেছিলাম। আমাদের পাড়াতেই লোকটা থাকত। পুরনো রঙচটা একটা সাইকেলের সামনে-পেছনে একরাশ ঝোলা, ছোট ট্রাঙ্ক, কাগজের বাক্স ঝুলিয়ে রাস্তায় ঘুরে বেড়াত। নানারকম টোটকা ওষুধ, দাঁতের মাজন, ধূপকাঠি, শনির পাঁচালী, লক্ষ্মীর ব্রতকথা বিক্রি করত। খুব রোগা নিরীহ মানুষটা কিন্তু গলাটা ছিল খরখরে, মোটা ও ভাঙা। অনেকদূর থেকে ওর ডাক শোনা যেত। আমরা কখনো-কখনো ওর কাছ থেকে তানসেনের গুলি কিনতাম। ওই মানুষটা নাকি গলাটিপে বউ খুন করেছিল। সকালে পুলিশ এসে কোমরে দড়ি পরিয়ে ওকে থানায় নিয়ে গেল। আমরা পেছনে পেছনে গেলাম। লোকটার একমুখ দাড়িগোঁফ, উস্কোখুস্কো চুল, সামনের দুটো দাঁত না থাকায় জিভের কিছু অংশ ঠেলে বেরিয়ে আসতে চায়, কুঁজো হয়ে এমন অদ্ভুতভাবে হাঁটছিল যে আমার নাকে-দড়ি-বাঁধা ভালুকের কথা মনে পড়ছিল। এই লোকটা খুনী। লোকটা ওর বউ খুন করেছে। দড়ি-বাঁধা না থাকলে ও হয়ত তখুনি ছুটে পালিয়ে যেত। আর খুনীরা একবার পালালে আবার ঘুরে ফিরে ঠিক

নাকি মানুষ খুন করে। খুনের নেশা মদের নেশার মত, একবার ধরলে আর ছাড়ানো যায় না। লোকটার দিকে তাকিয়ে আমি ভয় পাচ্ছিলাম। কোমরে বাঁধা দড়িটা পুলিশদুটো শক্ত হাতে ধরে আছে কিনা বার বার লক্ষ্য করছিলাম।

লোকটা ওর বউকে কেন খুন করেছিল, আমি মাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। বাবা বলেছিল, 'অভাবের তাড়নায়, বুঝলে টুকুর মা, অভাবের তাড়নায় মাথা ঠিক রাখতে পারে নি। ঘরে এক ডজন কাচ্চাবাচ্চা, আর আয় বলতে ত ওই দাঁতের মাজন বিক্রি!' কথাটা আমার বিশ্বাস হয়েছিল। কেননা আমি লক্ষ্য করেছিলাম, মাসের শেষদিকে মা কোনো কিছু আনতে বললে বাবাও দারুণ রেগে যেত। এই নিয়ে মা-বাবার ঝগড়া-ঝাটি শুরু হয়ে যেত। আর ঝগড়ার মুখে মা খুব রেগে বলতে থাকত, 'জানি, জানি, আমি মরলেই তোমার শান্তি। তোমার চাল ডাল কাপড়ের একটা খরচ কমে। কোনোদিন গায়ে কেরোসিন ঢেলে ঠিক মরব আমি!' বাবাও সমান তালে রেগে চোখমুখ লাল করে বলত, 'মর, মর, তাই মর। মরলে হাড়ে বাতাস লাগে আমার। কেরোসিন ঢেলে না মরতে পারো, আমিই দেব একদিন কুপিয়ে।' এসব কথায় আগে তেমন ভয় করত না, কিন্তু সেই লোকটা বউ খুন করার পর খুব ভয় পেতে শুরু করলাম। আমি খুব শক্ত ধারালো চোখে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতাম। তার হাঁটাচলা লক্ষ্য করতাম। রান্নাঘরে বঁটিটা কোথায় আছে, এক্ষুনি আমি সেটা লুকিয়ে ফেলব কিনা ভাবতে ভাবতে ভয়ে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতাম। বাবার মুখটা তখন ওই খুনী মানুষটার মতই মনে হত।

কিন্তু সেই মানুষটাকে আমি ত আর চোখের সামনে খুন করতে দেখি নি। খুনের সঙ্গে খুনীকে মিলিয়ে সামনাসামনি দেখার অভিজ্ঞতা আমার এই প্রথম। এখন, আমার খুব কাছাকাছি দাঁড়িয়ে আছে ওই খুনীটা। ঠোঁটে সিগেরেট চেপে কায়দা করে দেশলাই জ্বালছে। দড়ি দিয়ে বাঁধা নয়, হাতে হাতকড়াও নেই। একেবারে মুক্ত,

স্বাধীন! ক'দিন আগেই তরতাজা একটা মানুষের পেটে ছুরি চালিয়েছে, আর এখন অজস্র মানুষের চোখের উপর টানটান সোজা দাঁড়িয়ে পানের খিলি মুখে পুরছে, পিক ফেলতে ফেলতে হা হা অট্টহাসিতে পাড়া কাঁপিয়ে তুলছে। আমি আগের মত স্কুলের ছাত্র হলে নিশ্চয়ই দৌড়ে পালাতাম। কিন্তু এখন ভয় পাওয়া চলে না। আমি খুব অবাক হয়ে শিবুর মুখ দেখতে লাগলাম। চারদিকের জীবনযাত্রা একইরকম চলছে। রেশনের দোকানে লম্বা লাইন। তৃপ্তি হোটেলের টেবিলে সাজানো ভাতের থালা। পীচের রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া, টানা-রিক্সা। চায়ের দোকানের সেই ছোকরা থলেভর্তি বাজার করে ফিরছে। কালীদা বিড়ি ধরিয়ে পানের বোঁটায় চুণ নিচ্ছে। নিহত মানুষটার রক্তের দাগ এখন আর কোথাও অবশিষ্ট নেই। তার খুনী শতচক্ষুর সামনে সদর্পে দাঁড়িয়ে আছে।

তার পরের দিনও আমি শিবুকে দেখলাম। চায়ের দোকানের সামনে রাস্তার উপর যে-বেঞ্চিটা পাতা থাকে, তাতে পা তুলে বসে চা খাচ্ছে। সঙ্গে সেই কার্তিক। আমি অনেকক্ষণ ধরে ওকে দেখতে দেখতে গেলাম। ওর হাতের শক্ত কব্জি ও মোটা আঙুল-গুলোর দিকে তাকিয়ে সেদিনের খুন করার দৃশ্যটা আবার মনে পড়ল। ওই শক্ত চওড়া হাতে চকচকে ধারালো ছুরিটা মুঠো করে ধরেছিল। হাতের গুলিগুলো তখন পাকিয়ে উঠেছিল, চোখদুটো জ্বল জ্বল করছিল। সামান্য পিছিয়ে ডানদিকে একটু ঝুঁকে বাঁকা করে ছুরিটা আমূল গেঁথে দিয়ে একপাক ঘুরিয়ে টেনে নিয়েছিল। তারপর আবার গেঁথে দিয়েছিল। ওর শরীরটা দেখলেই বোঝা যায় অসম্ভব শক্তি রাখে ও। একসময় বউবাজারে নাকি ব্যায়াম করত। এখন চুরি ছিনতাই লুটপাট করে। কখনো জ্যান্ত মানুষ খুন। প্রবল চাপা উত্তেজনা নিয়ে আমি শিবুর পেশীবহুল হাতের শক্ত কব্জি দেখতে দেখতে বাসস্টপে গেলাম।

তারপর আরো ক'দিন শিবুকে ওইভাবে প্রকাশ্য রাস্তায় ঘুরে ফিরে চা খেতে, গল্প করতে বা আঙুলে চাবির রিং ঘুরিয়ে শিস্

দিতে দেখলাম। জলজ্যান্ত একটা মানুষ খুন করার কোনো চিহ্ন, কোনো বিকার নেই ওর মুখে। বরং আমাদের চেয়ে অনেক বেশী নিরুদ্বিগ্ন খোসমেজাজি। যেন মানুষ খুন করা ওর কাছে খুবই সহজ স্বাভাবিক ব্যাপার, অনেকটা পাখি পাখালি মারার মতই!

……একদিন পুলিশের একটা কালোভ্যান গলির মুখে এসে দাঁড়াল। খাকি জামার পুলিশ রাইফেল উঁচিয়ে ভুপদাপ করে নামল। আমি কালীদাকে বললাম, 'ওরা নিশ্চয়ই শিবুকে ধরবে!'

আমার মনে তখনও ক্ষীণ বিশ্বাস ছিল—দেশটা বোধ করি পুরোপুরি মগের মুল্লুক হয়ে ওঠে নি। সরকারের থানা পুলিশ আইন আদালত একেবারে হয়ত ভেঙ্গে পড়ে নি। একজন খুনী প্রকাশ্যে বুক ফুলিয়ে বেশীদিন শিস্ দিয়ে গান গেয়ে ঘুরে বেড়াতে পারে না।

কিন্তু আমার কথা শুনে কালীদা থমথমে মুখে বলে উঠল, 'কচু ধরবে! ওরাই হয় ত পুলিশ ডেকে এনেছে পাড়ায়। কাদের ধরবে বিকেলে শুনতে পাবি।'

শুনলাম। সন্ধ্যার মুখে ঘরে ঢুকতেই কল্যাণী বলল, 'শুনেছ, মায়াদির ছেলেটাকে ধরে নিয়ে গেছে?'

'সমীরণকে?'

'হ্যাঁ। আরো অনেককে ধরেছে। শেষটায় মায়াদির ঘরে এসে—'

মায়াদি বিধবা মানুষ। কর্পোরেশনের স্কুলে কাজ করেন। সমীরণ এই বছরই হায়ার সেকেণ্ডারি পাশ করে কলেজে ঢুকেছে। ছিপছিপে ফ্যাকাসে চেহারা। কথায়বার্তায় নম্র, ভদ্র। মাঝে মাঝে মায়াদি আমার কাছে অঙ্ক বোঝার জন্য পাঠিয়ে দেন। ঘরে এসে ভাসা ভাসা চোখ নিয়ে মাথা নীচু করে বসে থাকে সমীরণ। প্রয়োজনের বেশী একটা কথাও বলে না। ওকে কেন পুলিশ ধরল? ওই শান্ত, নিরীহ ছেলেটি কি অপরাধ করতে পারে? মায়াদি অবশ্য রাজনীতি করেন। এই পাড়ায় মেয়েদের কি একটা সমিতি আছে, মায়াদি তার সম্পাদিকা। মাঝে মাঝে চাঁদা তোলেন, মিটিঙ করেন, মিছিল নিয়ে যান। কল্যাণীকেও কিছুদিন টানাটানি

করেছিলেন। আমার আপত্তি থাকায় দলে টানতে পারেন নি। তাহলে মায়ের অপরাধেই কি ছেলে ধরা পড়ল? শুনলাম মায়াদিকেও পুলিশগুলো খুব অপমান করে গেছে। বিকেলের দিকে কল্যাণী গিয়েছিল, ছেলের জন্য সারাদিন কেঁদে কেঁদে মায়াদির চোখ নাকি ফুলে উঠেছে।

পরের দিন গলির মুখে শিবুকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমার খুব রাগ হয়ে গেল। শুধু শিবুর উপরে নয়, এই দেশ কাল সময় এবং তার সঙ্গে ওই চায়ের দোকান পানের দোকানের মালিকগুলোর উপরেও। ওরা কেন খুনীটাকে চা বানিয়ে দেয়, পান বানিয়ে দেয়? হেসে হেসে গল্প করে, খাতির করে? দিনে দিনে আমরা কোথায় নেমে যাচ্ছি—

আমার রক্তের মধ্যে একটু একটু করে হিংস্রতা সঞ্চারিত হয়। আমি তীক্ষ্ণ ধারালো চোখে শিবুর মুখটা দেখতে থাকি। শিবু আঙুলে চাবির রিং ঘোরাতে ঘোরাতে শিস্ দেয়।

দাড়ি কাটতে বসে ক্ষুরটা আমি শক্ত মুঠিতে চেপে ধরি। ঘষা-আয়নায় মুখ ভাল দেখা যায় না। তার উপর সাবানটাও ফুরিয়েছে। অভাবে একটুকরো কাপড়-কাচা সাবান গালে ঘষে খুব সতর্ক হয়ে ক্ষুর টানছি। হঠাৎ কি হ'ল, ক্ষুরটা মুঠো করে ধরে আয়নায় নিজের মুখ দেখলাম। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ালাম। তারপর শিবু যেমন করে ছুরিটা ধরেছিল সেইভাবে ধরে একটু পিছিয়ে ডান দিকে ঝুঁকে আবার সামনে এগিয়ে ক্ষুরটা কোথাও গেঁথে দেওয়ার ভঙ্গি করলাম। এইসময় ঘষা-আয়নায় আমার চোখ জ্বল জ্বল করছিল। কপালের নীল শিরাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। দাঁতে দাঁত চাপা ছিল।

কি একটা কাজে ঘরে ঢুকে কল্যাণী অবাক হয়ে বলল, 'ও কি গো!'

আমি চমকে উঠলাম, 'কেন? কি হ'ল?'

'অমন মারমুখী চেহারা করেছ যে?'

'মারমুখী !'

'হ্যাঁ। মনে হচ্ছিল এক্ষুনি আয়নার বুকে ক্ষুরটা বসিয়ে দেবে।'

'ও! তা ইয়ে, দেখ, আয়নাটা আর চলছে না। পাল্টানো দরকার।'

'বহুবার বলেছি।'

'আমিও বহুবার শুনেছি। কিন্তু অফিসের সেই লোন্‌টা শোধ না হওয়া পর্যন্ত—'

'জলে মুখ দেখে চুল বাঁধব! চমৎকার দেখা যায় কিন্তু। তুমিও এক গামলা জল নিয়ে দাড়ি কাটতে পার।'

খুব নিরুত্তাপ শীতল গলায় কথা শেষ করে কল্যাণী কলতলায় চলে গেল। আমি আলো ও বাতাসের যথেষ্ট অভাবযুক্ত ঘরে বর্ষাকালীন একপ্রকার স্যাঁৎস্যাতে গন্ধ শুঁকতে শুঁকতে কল্যাণীর একমাথা চুল, পিঠ ও কোমর দেখলাম। এইসময় ওর পিঠের অনাবৃত অংশে ক্ষুরটা বসিয়ে দিলে কি হয়, কল্যাণী চিৎকার করে লোক জড়ো করবে অথবা স্তব্ধ বোবা বিস্ময়ে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবে, ভাবতে ভাবতে আবার দাড়ি কাটায় মন দিলাম। মাথার উপর কড়িবড়গার ফাঁকে দুটো পায়রা এসে বসল। ফরফর করল। পা দিয়ে আঁচড়ে খড়কুটোর সঙ্গে একদলা মরচেধরা তারের জাল ফেলল। কিছু আমার মাথায় পড়ল, কিছু ঘষা আয়নাটার উপর। আমি হঠাৎ রেগে গিয়ে 'ধুত্তুরি, শালা পায়রার নিকুচি করি' বলে সাবানের টুকরোটা ছুঁড়ে মারলাম। কোথাও লাগল না, পায়রাদুটোও গেল না। বসে বকবকম্ শুরু করল।

ওরা সহজে যায় না। ওইখানেই স্থায়ীভাবে বাসা বেঁধেছে। পুরনো জীর্ণ বাড়ি। ঘরেবাইরে সর্বত্র পায়রার বাসা। দরজা বন্ধ করলে ঘুলঘুলি দিয়ে ঢোকে। ঘুলঘুলিতে বস্তা গুঁজে দিলে ঠুকরে ছিঁড়ে দেয়, মাথা দিয়ে গুঁতিয়ে রাস্তা পরিষ্কার করে নেয়। বাবুলের জন্য আমি ওদের প্রতি খুব নিষ্ঠুর হতে পারি না। বাবুল ওদের ভাত গম খেতে দেয়। মুখে একরকম চুক্ চুক্ শব্দ করে আদর

জানায়। কল্যাণীও পুরনো সংস্কারের বশে পায়রাকে লক্ষ্মী মনে করে। ফলে ওদের উৎপাত যথেষ্ট বিরক্তির সঙ্গে সহ্য করে, তাড়ায় না।

নিক্ষিপ্ত সাবানের টুকরো ঘাড়ে এসে পড়তেই আমি ক্রুদ্ধ চোখে পায়রাদুটোর দিকে তাকিয়ে থাকলাম। ওরা ডানা ঝাপটে স্থান বদল করে গুছিয়ে বসল।

সেদিন অফিস যাওয়ার পথে শিবুকে দেখি চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে বসে পোড়ানো ভুট্টা কামড়ে কামড়ে খাচ্ছে। ওর বুকের ঘন কালো লোম বাতাসে কাঁপছে। ভুট্টায় কামড় দেওয়ার সময় মস্ত হাঁ করছে। ওর ধারালো দাঁত, জিভ ও মাড়ি দেখা যাচ্ছে। দৃশ্যটা আমার কাছে কেমন অদ্ভুত মনে হ'ল। যেন একটা লোমশ জন্তু নরম কোনো পাখি কি খরগোশ শিকার করেছে, তারপর এখন খুশি হয়ে পা ছড়িয়ে বসে দুই থাবায় ছিঁড়ে ছিঁড়ে তার মাংস খাচ্ছে। শিবুকে ওইভাবে দেখে আমার রক্তের মধ্যে কেমন একটা দাপাদাপি শুরু হয়ে যায়। হাতের মুঠো শক্ত হয়ে উঠতে থাকে। চোখ জ্বালা করে। কপালের শিরা দপদপ করতে থাকে। ইচ্ছে হয় পাগলের মতো চিৎকার করে সবাইকে শুনিয়ে বলে উঠি, 'আহা দেখ দেখ, কি মজা! দেশে এখন আর আইন নেই, শৃঙ্খলা নেই। পুরোপুরি মগের মুল্লুক। এখন এ দেশে এইসময় খুনীরা রাস্তায় পা ছড়িয়ে বসে নিশ্চিন্ত আলস্যে ভুট্টা খায়। এখন এ দেশে এই সময় তুমিও তোমার প্রাণ যা চায় তাই করতে পার। ইচ্ছে করলে প্রকাশ্য দিবালোকে পুরুষ কি নারী খুন করে কলের জলে হাতের রক্ত ধুয়ে বড়রাস্তায় দাঁড়িয়ে চুলে পরিপাটি চিরুনী চালাতে চালাতে শিস দিয়ে গান গাইতে পার!'

সেইদিনই বাসে একটা লোক পায়ের উপর পা রেখে উঠবার চেষ্টা করতেই আমি মরিয়া হয়ে হাঁটু দিয়ে এমন গুঁতো মারলাম যে হ্যাণ্ডেল থেকে হাত ফসকে তৎক্ষণাৎ রাস্তায় ছিটকে পড়ল। পাশের কে একজন বলে উঠল, 'ঠিক করেছেন দাদা। শালা পেছনের বাসটা চোখে দেখছে না।'

কালীদা কিন্তু গম্ভীর হয়ে বলল, 'রানিং বাসে অমন করে ঠেলে দিলি যে?'

আমি অসহিষ্ণু গলায় বললাম, 'কি হয়েছে তাতে?'

'আর একটু হলে মুখ থুবড়ে পড়ত। হাত পা ভাঙতে পারত!'

'ধু-স!'

'ধুস্ না, সেদিন ওইভাবে একটা লোক ট্রামের তলায় চলে গেল!'

'যাক্। এমন বাদুড়-ঝোলা হয়ে যাতায়াত করলে দু'চারজন মাঝে মাঝে মরবেই। একদিন আমিও মরতে পারি। তুমিও পার—'

'হুঁ' বলে কালীদা চুপ করে গেল। কিন্তু পাশের সেই সহযাত্রীটি বলে উঠল, 'এ দেশে বাঁচামরায় তফাৎটা কি মশাই? যে কোনো দিন যে কোনো মুহূর্তে আমরা মরে যেতে পারি। গুলিগোলা বোমাটোমা ত আছেই, তাছাড়া সেদিন হাওড়া স্টেশনে দেখি, দশ নম্বর বাসটা থামতে না থামতে হাজার খানেক লোক ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর! কি, না বাস নেই অনেকক্ষণ, আগে উঠে জায়গা নিতে হবে। ভেতরের লোকগুলো তখনও নামে নি। এক বুড়ী দরজার কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল, ঠেলা খেয়ে উল্টে পড়ল। কি বলব, তার বুকের উপর দিয়ে দশ বারোটা লোক ছুটে গেল সীট দখলের জন্য। বুড়ীটাকে বাস থেকে যখন নামানো হ'ল তখন ছালচামড়া উঠে গেছে, ঠোঁটের কস্ বেয়ে রক্ত গড়াচ্ছে! বুঝলেন, আমরা আর মানুষ থাকছি না। জানোয়ার হয়ে উঠছি!'

আমি বা কালীদা কিছু বলার আগেই অন্য একজন চেঁচিয়ে বলল, 'হচ্ছিই ত জানোয়ার। এই শালা গবমেণ্টই আমাদের জানোয়ার বানিয়ে ছাড়ছে। কেন, বাস বাড়াতে পারে না? ট্রাম বাড়াতে পারে না? দু'বেলা পেট পুরে ভাত খেতে ত ভুলেই গেছি, একটু হাত পা মেলে অফিসে যাব, তার পর্যন্ত ব্যবস্থা নেই! যত জোচ্চুরের রাজত্ব!'

সেই সহযাত্রী আর কোনো জবাব দিল না। রাজনীতি এসে পড়লে রাস্তাঘাটে আজকাল কেউ মুখ খুলতে চায় না। কে জানে,

কে কোন্ দলের। কথায়-কথায় এখুনি হয়ত ছুরি বেরিয়ে পড়বে, বোমা ফাটতে শুরু করবে। তখন নিজের জান নিয়ে টানাটানি। আমরা ছাপোষা গৃহস্থ মানুষ, বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে সংসার করি। ঝুট-ঝামেলা এড়িয়ে নিরাপদে অফিসে পৌঁছুতে চাই।

কিন্তু অফিসে পৌঁছে পাখার তলায় বসে শরীরের ঘাম শুকিয়ে ওঠার পর সেই লোকটার কথা ভেবে সত্যিসত্যি আমি লজ্জিত হলাম। রানিং বাসে ও-ভাবে ঠেলে দেওয়া উচিত হয় নি। রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে যেতে পারত, তারপর পেছনের কোনো গাড়ির তলায়। ভাবতেও শিউড়ে উঠলাম। আমিও একটা খুনী হয়ে উঠছি? ওই শিবুর মত? কিংবা খুনী না হই বড় বেশী অসহিষ্ণু আর অধৈর্য হয়ে উঠছি। একা নয়, আমরা সবাই। আমাদের সহনশীলতা শূন্যের কোঠায় পৌঁছে গেছে। বাইরে মানুষদের আমরা সহ্য করতে পারি না, ঘরে স্ত্রীকেও। স্বার্থে কেউ এতটুকু আঘাত করলে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠি। মনটা এভাবে তৈরী হতে থাকলে জানোয়ারের সঙ্গে তফাৎ কি থাকবে? কিংবা আমাদের সত্যিসত্যি হয়ত কিছু করার নেই। আমরা সবাই কোনো অদৃশ্য একটা শক্তি বা পরিবেশের হাতে খেলার পুতুল। আমরা ইচ্ছে করলেই আমাদের সহিষ্ণুতা, সৌজন্য, পরোপকার-বৃত্তিগুলো বাঁচিয়ে রাখতে পারি না। যেমন আজই, ইচ্ছে করলেও ওই লোকটাকে বাসে ওঠার জন্য আমি সাহায্য করতে পারতাম না, কেননা বাসে একটা আস্ত পা দূরে থাক একটা আঙ্গুল রাখারও জায়গা ছিল না। এ অবস্থায় লোকটা যেমন আমার পায়ের উপর জুতোসমেত পা তুলতে বাধ্য, আমিও তেমনি আত্মরক্ষার তাগিদে ওকে ঠেলে দিতে বাধ্য। সমস্ত ব্যাপারটাই বাধ্যতা-মূলক এবং কোনোটাই আমাদের ইচ্ছের বশীভূত না। আমরা যে দিন-দিন অমানুষ হয়ে উঠছি, সে আমাদের ইচ্ছের বিরুদ্ধেই।

এইভাবে বিষয়টা ভেবে আমি একটু স্বস্তি অনুভব করলাম। লোকটার কাছে মনে মনে অপরাধী হয়ে উঠছিলাম। সে বোঝাও নামল। আমি পকেটে হাত দিয়ে বিড়ির খোঁজ করলাম।

পরের দিন অফিস যাওয়ার সময় শিবুকে দেখতে পেলাম না। কিন্তু ফেরার পথে গলির মুখে একটা জীপগাড়িতে শিবু মনোহর কার্তিকদের বসে থাকতে দেখলাম। সম্ভবত কোথাও বেরুনোর জন্য তৈরি হচ্ছে। চায়ের দোকানের সেই ছোকরা গ্লাসে করে ওদের চা দিয়ে আসছে। শিবু সামনের সীটে বসে আধখানা শরীর বাইরে ঝুলিয়ে রেখে কার্তিক না মনোহরকে কি যেন বলছে। আমি রাস্তাটুকু পার হয়ে আসছিলাম হঠাৎ প্রবলভাবে চমকে উঠলাম। সেই হাসিটা! তীব্র, কর্কশ, কর্ণভেদী। ঘূর্ণ্যমান পাথরের চাকায় ছুরি কাঁচি শান দেওয়ার মত। সেদিনের মতই আমার মনে হ'ল, হাসিটা যেন গড়িয়ে গড়িয়ে উঁচু হয়ে উঠল, তারপর একটা স্তম্ভের আকৃতি নিয়ে সেই স্থানটুকুতে স্থির হয়ে দাঁড়াল—যেখানে মাত্র ক'দিন আগে ওই মানুষটা খুন হয়েছে। তারপর প্রবল শব্দে ফেটে গিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল।

আমার মনে হ'ল, সামনেই কোথাও বোমা ফাটছে। তার পাথরের কুচি, কাঁচের টুকরো সবেগে ছুটে এসে আমার চোখেমুখে লাগছে। আমি আত্মরক্ষার ভঙ্গিতে খুব দ্রুত হাসিটা পার হয়ে গেলাম।

ঘরে ঢুকতেই আর এক কাণ্ড। কল্যাণী ছুটে এল চোখমুখ লাল করে। মনে হ'ল একটু আগেই অনেকক্ষণ ধরে কেঁদেছে। আমি বললাম—'কি ব্যাপার? বাবুল কই?'

কল্যাণী বলল, 'গলিতেই আছে। তুমি কিছু শোন নি?'

'না। কি হয়েছে?'

'সমীরণকে ওরা মেরে ফেলেছে।'

'মেরে ফেলেছে?'

'হ্যাঁ। থানার লক্‌আপে। লাঠি দিয়ে পিটিয়ে।'

'কি বলছ তুমি?'

'হ্যাঁ গো। পাড়ার অনেকেই থানায় গেছে। মায়াদিও ছুটে যাচ্ছিল। রাস্তায় অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। আমি গিয়েছিলাম ও-বাড়ি।'

বলতে বলতে কল্যাণী আবার কেঁদে ফেলল। বাড়িতে আসা যাওয়ার ফলে সমীরণের উপর ওর একটু মায়া পড়ে গিয়েছিল। সমীরণও ওর অনুগত ছিল। শুধু লাঠি দিয়ে পিটিয়ে সেই ছেলেটাকে ওরা কি সত্যি মেরে ফেলেছে ?

কি বলব বুঝতে পারলাম না। কথা হারিয়ে স্তব্ধ বিস্ময়ে কল্যাণীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমার হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসতে লাগল। স্নায়ুগুলো অবশ হয়ে গেল। মাথার ভিতর একটা তীব্র যন্ত্রণা। অনেকদিন পরে বুকের মধ্যে সেই পুরনো কষ্টটা ফিরে এল। দলা পাকানো কান্না শ্বাসনালী চেপে ধরল।

কিন্তু সে কয়েকমুহূর্তের জন্য। তারপরই আমার চোখদুটো জ্বলে উঠল। হাতপায়ের পেশী যেন লোহার মত শক্ত হয়ে গেল। রক্তের মধ্যে দ্রুততালে কিসের একটা বাজনা বাজতে শুরু করল। আমি আমার চারিদিকে শিবুর সেই কর্কশ কর্ণভেদী হাসিটা শুনতে পেলাম। সমীরণের মুখটা মনে করে আমি এমনভাবে থাবা উঁচু করে তুললাম, যেন আমার হাতেও লম্বা আর ধারালো কোনো অস্ত্র আছে।

সেই রাত্রেই কি কারণে কড়িকাঠের পায়রাদুটো ফরফর করতে শুরু করল। অন্ধকারে একটা স্থানচ্যুত হয়ে ঘরময় ডানা ঝাপটিয়ে উড়ে বেড়াতে লাগল। কখনো বাক্সের উপর আছাড় খেয়ে পড়ল, কখনো বিছানার উপর। আমার ঘুম আসছিল না। আমি খুব রেগে উঠলাম। পায়রাদুটোকে জন্মের মত কিছু শিক্ষা দেওয়ার কথা চিন্তা করলাম।

উঠে অন্ধকারেই একটা খবরের কাগজ খুঁজে লম্বা করে পাকিয়ে নিলাম। তারপর বালিশের তলা থেকে দেশলাই বের করে ধরালাম। কাগজটা জ্বলে উঠতে সমস্ত ঘর আলো হয়ে গেল। পায়রাটা কোথায় বসেছে আমি লক্ষ্য করলাম।

কিন্তু জ্বলন্ত মশালের মত কাগজটা উঁচু করতেই কল্যাণী আমার হাত চেপে ধরল, 'এ কি করছ তুমি!'

আমি বললাম, 'ছাড়। পায়রাদুটো বড় জ্বালাচ্ছে।'

'তাই বলে তুমি ওদের পুড়িয়ে মারবে? ওরা এমন কি শত্রুতা করেছে তোমার? ছি, ছি—'বলতে বলতে ভয়ে উত্তেজনায় হাঁপাতে লাগল কল্যাণী। এক অদ্ভুত শীতল দৃষ্টি মেলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। আমি সেই দৃষ্টি বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারলাম না। হাত ছাড়িয়ে কাগজটা ঘরের এককোণে ফেলে নিভিয়ে দিলাম। তারপর আবার নিঃশব্দে এসে বাবুলের পাশে শুয়ে পড়লাম।

অনেকক্ষণ পরে কল্যাণী বলল, 'তোমার কি হয়েছে বল ত?'

আমি বললাম, 'শত্রু চিনতে ভুল হয়ে যাচ্ছে। পাখিরা নয়, পাখিরা বেঁচে থাকুক—'

কি নাম তোমার ?

ফিকে হলুদ অথবা হালকা সবুজরঙের একটা শাড়ি পরে চুপ করে এককোণায় বসে থাক। প্রফেসরের জন্য নির্দিষ্ট প্ল্যাটফর্মের গা-লাগা বেঞ্চিটায় না। তার পরেরটায়, ডানদিকের কোণা ঘেঁষে। তোমার আগে-পিছে কম করে আরো পঁচিশটা মেয়ের মুখ জেগে থাকে। নানা রঙের শাড়ি, চুল, খোঁপা। খাতা-পত্র রাখার ফাইল-ব্যাগই বা কতরকম। আমরা, ছেলেরা যারা অধ্যাপকের দিকে মুখ করে বসি, চোখ ধাঁধিয়ে যায়। একসঙ্গে এতগুলো মেয়ে, রোল নাম্বার গুনে নবব্‌ইয়ের কোঠায়, তাদের চুলের গন্ধ, শাড়ির গন্ধ, স্নো-পাউডার এসেন্সের গন্ধ আর ঠোঁটের হাসি, টুকরো টুকরো কথার তরঙ্গ, উঠা-বসা অথবা ঘাড়-মাথা ঘুরিয়ে এর ওর তার সঙ্গে গল্প করার কায়দা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করি। বাতাসে ভেসে-আসা নানারকম গন্ধের ঘ্রাণ টানি। অধ্যাপকের ডাইনে-বাঁয়ে, কিছু-বা সামনের দিকে তোমরা ময়ূরের মত পেখম ছড়িয়ে রামধনুর রঙ নিয়ে ছড়িয়ে থাক। আমরা, ছেলেরা একপাশে। ডাইনে-বাঁয়ে অথবা সামনের দিকে, যেদিকেই তাকাই না কেন তোমাদের উপস্থিতি আমাদের দৃষ্টিকে সজাগ তীক্ষ্ণ আর লজ্জা-লজ্জা একটা অনুভূতিতে নরম নম্র করে রাখে। তোমরা নদীর মত আমাদের বালির চরটাকে তিনদিক দিয়ে ঘিরে রাখ। একটা দিক শুধু খোলা থাকে। টানা লম্বা বারান্দার দিকটা। ঘরে ঢুকবার দরজাগুলো বারান্দার দিকে। বড় বড় তিনটে দরজা দিয়ে তোমরা ক্লাসে আস, আমরা ক্লাসে আসি। তোমরা ক্লাসে ঢুকতে ঢুকতে আড়চোখে আমাদের একবার দেখে নাও, আমরা ক্লাসে ঢুকতে ঢুকতে সোজাসুজি তাকিয়ে একবার তোমাদের দেখে নিই। কখনও তোমরা পরিচিত কোনো ছেলেকে দেখে, তার দিকে তাকিয়ে

অল্প একটু হাস, কখনও আমরাও। হাসি, কথা বলি, পড়াশুনা কেমন চলছে খোঁজখবর নিতে গিয়ে 'ও লাইব্রেরিতে নিয়মিত যাতা-য়াত করে, আমি করি না' ভেবে একজন আরেকজনকে ঈর্ষা করি। তারপর অধ্যাপক এসে গেলে হুড়মুড় করে যে যার জায়গায় গিয়ে বসি। তখন তিনদিকে তোমরা, একদিকে আমরা। তিন ভাগ জল আর একভাগ মাটির মত আমরা তোমাদের উচ্ছ্বাস কলরব আর চটুলতা থেকে নির্বাসিত হয়ে একপ্রান্তে পড়ে থাকি। অধ্যাপক খাতা খুলে তারিখ লিখবার আগে গোটা ক্লাসের দিকে একবার নজর বুলিয়ে নেন। তাঁর উজ্জ্বল দৃষ্টি বেশ কয়েক সেকেণ্ড ধরে একরাশ মেয়ের মুখ, মাথা আর চুলের ঢেউগুলোর উপর ঘুরে বেড়ায়! তারপর আস্তে আস্তে, ক্রমশ দ্রুততালে রোলকল করতে শুরু করেন।

কি নাম তোমার? এখনও জানি না। জানার সুযোগ ঘটেনি, কিন্তু রোলনাম্বারটা আমার জানা আছে। প্রথম দিন খাতায় টুকে রেখেছিলাম, এখন মুখস্থ হয়ে গেছে। তোমার নাম জানি না, রোল নাম্বার ফিফ্‌টি থ্রী। একদিন যেমন অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে কখন তুমি 'প্রেজেন্ট প্লীজ' বলবে শোনার আশায় মুখের দিকে চেয়ে থেকে রোল নাম্বারটা জেনে নিয়েছি, তেমনি মনোযোগে এখন প্রতিদিন তোমাকে দেখি। সপ্তাহে যে ক'দিন ক্লাস হয়, যে ক'দিন তুমি ক্লাসে উপস্থিত থাক, খুঁটিয়ে দেখতে ভুল করি না। দেখতে আমার ভাল লাগে। শুধু ভাল, আর কিছু না।

অধ্যাপকের ডানদিকে একটা বেঞ্চ বাদ দিয়ে দুই নম্বরের এক কোণায় তুমি বসে থাক। প্রতিদিনের জন্য ওই জায়গাটা তোমার বাঁধা হয়ে গেছে। ওই বিশেষ জায়গাটি ছাড়া তোমাকে অন্য কোথাও কোনোদিন আমি বসতে দেখলাম না। অধ্যাপকের মুখোমুখি তিনটে বেঞ্চ বাদ দিয়ে আমি বসি। তোমার মতই একটি নির্দিষ্ট জায়গা আমি পছন্দ করে নিয়েছি। তুমি যেমন তোমার জায়গা ছেড়ে একচুলও নড়ো না, আমিও তেমনি। এই বিশেষ জায়গাটুকু দখল করতে পারলে আমি যে তোমাকে স্পষ্ট দেখতে পাই, সে কারণে

ততটা নয়, যতখানি ওই স্থানটুকুর ওপরে মায়া পড়ে গেছে বলে। লক্ষ্য করে দেখেছি, আমার বন্ধু-বান্ধবের অনেকেই, তোমার বান্ধবীদের অধিকাংশ, প্রথমদিন যে জায়গাটিতে বসেছিলে, সবসময় চেষ্টা করো সেখানেই বসার জন্য। স্থানের অদল-বদল হলে আমার-তোমার পড়া শুনতে কি নোট নিতে ইচ্ছে করে না, অস্বস্তিতে ক্লাসের ঘণ্টাগুলো বিস্বাদ হয়ে ওঠে। এমন কেন হয়, নিজেকে বিশ্লেষণ করে ভাবতে গিয়ে বুঝেছি, আমরা পশুপাখি কি যাযাবরশ্রেণীর কেউ নই, মানুষ। গতির চেয়ে স্থিতির ভাগ আমাদের রক্তে বেশি। প্রতি ঋতুতে বাসা বদল কি সংসার বদল আমাদের সংস্কারের অনুকূল নয়। কি ক্লাসে, কি ট্রামে বাসে ট্রেণের কামরায় অথবা বৃহত্তর জীবনের ক্ষেত্রে আমরা যে স্থানটুকু একবার মন থেকে মনোনীত করি, সেখানেই চিরদিনের জন্য শিকড় গেড়ে বসতে চাই। সহজে আর নড়তে ইচ্ছে করে না। কেউ নড়াতে এলে, স্থানান্তরিত করার ষড়যন্ত্র করলে তার উপর বিরক্ত হই, রাগ করি, সময়বিশেষে মামলা-মোকদ্দমা-খুনোখুনি পর্যন্ত।

ক্লাসের যে বেঞ্চের যে জায়গাটুকুতে আমি বসি, সেখান থেকে তোমার সবকিছু অতি সহজেই দেখে নেওয়া যায়। সামনে আরো গোটা দুই বেঞ্চ এবং দশ বারোটি মাথা থাকলেও তোমাদের বেঞ্চটা কোণাকুণি থাকায়, দেখতে অসুবিধা হয় না। তোমার সঙ্গে আরো তিনজন মেয়েকে দেখতে হয়। তোমার পাশেই বসে ওরা। তোমার দিকে চোখ রাখতে গেলে ওদের মুখগুলো এড়ানো যায় না। সমুদ্রের বালুবেলায় ঝিনুকের পাশে শামুকের মত ওরাও ভাসতে থাকে। কিন্তু তোমার মুখ সমুদ্রের ঝিনুক না। অত সস্তা বাজে একটা জিনিসের সঙ্গে আমি তার তুলনা দিতে চাই নে। সমুদ্রকেই যদি টানতে হয় তা'হলে বলব, তোমার মুখটা প্রবালের মত। সমুদ্রের অনেক নীচে যেখানে অস্থিরতা চঞ্চলতা অথবা এলোমেলো উচ্ছলতা কিছুই নেই, কেবল গভীর প্রশান্তি, অপরূপ নৈঃশব্দ, সেখানে একটিমাত্র বড় সাইজের প্রবাল যেমন ঐশ্বর্য আর সৌন্দর্যের বাণী বুকে ভরে রেখে বিষণ্ন মনে আলোর দিন

গোনে, তুমি, তোমার মুখখানাও তেমনি। সমুদ্রগভীরের সেই সাতরাজার ধন এক মানিক প্রবালটির মত। ডুবুরী ছাড়া কেউ তার খোঁজ পায় না। মূল্য বোঝে কেবল পাকা জহুরীরাই। তোমার মুখ আমি ছাড়া এমনভাবে আর কেউ কোনোদিন আবিষ্কার করেনি। তোমার মুখে কত ঐশ্বর্য কত বিষণ্ণতা আমি ছাড়া কেউ অনুভব করে নি। আমি যে সাহিত্যিক, ডুবুরী এবং জহুরী একসঙ্গে দুই-ই। এক-জনের মুখের দিকে চেয়ে, দিনের পর দিন গভীর আগ্রহে অপরিসীম মমতায় দেখে দেখে যদি তার মন, মনের ঐশ্বর্য আর বিষণ্ণতার স্বরূপ-টুকু ধরে না ফেলতে পারলাম, তবে কলম হাতে লিখব কি!

হ্যাঁ, তোমার মুখে পাশাপাশি দুটো রূপই আমি দেখেছি। মুখের আয়নায় মনের। ঐশ্বর্য আর বিষণ্ণতা, আনন্দ এবং ক্লান্তি তোমার মুখের রেখায় রেখায় কেমন সুন্দর ছায়া ফেলেছে। তোমার শরীরটা পাতলা গড়নের, এত পাতলা যে তাকে রোগাই বলা যায়। রোগা এবং লম্বা। মাথায় একটু বেশী লম্বা হওয়ার ফলে তোমাকে আরো বেশী রোগা দেখায়। গায়ের রংটা কিন্তু আশ্চর্য রকমের ফর্সা। এত ফর্সা যে পর্যাপ্ত রক্ত থাকলে আমি দুধে-আলতা রং বলতে পারতাম। কিন্তু তত বেশী রক্ত নেই বলে ফর্সা রঙের উপর কেমন একটা হলদেটে ভাব আলগা হয়ে লেগে আছে। চিবুক ঠোঁট কি নাকের চেয়ে চোখ দুটো বেশী সুন্দর, গভীর টানা টানা। তার চেয়েও বেশী চুলগুলো। কালো মেঘের মত একমাথা চুল এলোমেলো হয়ে পিঠের উপর ছড়িয়ে থাকে। খোঁপা বাঁধার কি রিবন-ক্লিপ এঁটে যত্ন করে বেণী তৈরি করার দরকার হয় না। আদিম অসংলগ্ন অবস্থায় তারা আরো বেশী সুন্দর দেখায়, কেমন অনায়াস অকৃত্রিম। অথচ সবকিছু মিলিয়ে তোমার সুন্দর মুখখানা কেমন বিষণ্ণ মনে হয়। যেন কতই না ক্লান্তি। তোমার উজ্জ্বল চোখ-জোড়ার কোলে ফর্সা চামড়ায় কালি-মার ছায়া, ডান গালে ঠোঁটের কাছাকাছি বড় রকমের কালো একটা তিল। ফর্সা রোগা মুখে ওই কালির ছায়া, কালো তিলের আবির্ভাব, খুবই বেমানান। দুইয়ে মিলে এবং বয়সের জন্য একটা কাঠিন্যের

ভাব ফুটে ওঠায়, তোমার মুখের অন্তরঙ্গ সৌন্দর্য একটু ক্ষুণ্ন না হয়ে পারেনি। পরিবর্তে কোমল বিষণ্নতার একটা আভা সেখানে ছল ছল করছে। চোখের কালিতে গভীর কালো তিলটির কোলে সে বিষণ্নতা যেন ছুঁয়ে দেখা যায়, ক্লান্তিটুকু মেপে নিতে অসুবিধা হয় না। মনে হয়, পর পর তিন রাত তুমি ঘুমোতে পারনি, খেতে বসতে কি হাত পা ছড়িয়ে কোথাও শুয়ে একটু বিশ্রাম করার সুযোগ পাওনি। তোমাকে তবু জোর করে ধরে নিয়ে আসা হয়েছে, হাসিতে গানে উচ্ছ্বসিত এক উৎসবের আঙিনায় ধরেবেঁধে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। তোমার চোখেমুখে জীবন-উপভোগের আনন্দ এবং দীপ্তি, অথচ রাত্রি জাগরণের ক্লান্তিতে, উৎসবের সবটুকু রস সুস্থ মনে পান করতে না পারার বিষণ্নতায় স্তিমিত,-ম্লান। প্রাণধারণের গ্লানির লজ্জায় একটু বা বিকৃত। যেন এমন একটা প্রবাল সমুদ্র-গর্ভে দীর্ঘদিন যা পড়ে আছে এবং অযত্নে অবহেলায় পড়ে থাকার জন্য যার শান্তশ্রী-দীপ্তির উপর অপরিচ্ছন্নতার ঘোলাটে ছায়া নেমেছে।

তোমার মুখে ওই বিষণ্নতার ছাপটুকু দেখেই ধারণা করে নিয়েছিলাম, তুমি বড়োলোকের মেয়ে নও, সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারেরই একজন। নিম্ন মধ্যবিত্ত হলেও আশ্চর্যের কিছু নেই। পাশাপাশি আরো দু'দশজন মেয়ের বেশভূষা চালচলন আচারব্যবহার খুঁটিয়ে দেখার পর, তোমার অবস্থা সম্পর্কে আরো নিঃসন্দেহ হয়েছি। তোমার পাশে গা ঘেঁষে চশমা-চোখে মোটামত যে মেয়েটা বসে থাকে, তার কথাই ধর না কেন। কত রকমের শাড়ি পরে আসে রোজ। কানে হাতে সোনার গয়না, মণিবন্ধে দামী ঘড়ি। স্নো পাউডার রুজ লিপ্‌-স্টিকের ঘন প্রলেপে মুখটা সুন্দর হতে গিয়ে বিশ্রী, আর্থিক স্বচ্ছলতার গর্বে উদ্ধত। ওর মত অনেকেরই, অধিকাংশ মেয়েরই মুখসমেত গোটা শরীর সৌন্দর্যের চেয়ে স্বচ্ছলতার পরিচয় বহন করে বেশী, নম্র মাধুর্যের চেয়ে অনমিত অহঙ্কারের। অথচ তুমি, তোমার মুখসমেত গোটা শরীর, অবাক হয়ে দেখেছি, অহঙ্কারের কোনো চিহ্নই ধারণ করে রাখেনি কোথাও। আর কি নিয়েই বা অহঙ্কার করবে! সাকুল্যে

তোমার দুটি শাড়ি আছে। ভাল দু'খানা শাড়ি, হলুদ আর ফিকে সবুজ রঙের, যা পরে ক্লাসে আসা যায়, বাইরে কোথাও বেরুনো চলে। শাড়ির নীচে ব্লাউজ, তাও সাধারণ দামের সস্তা ছিটের। হাতে দু'গাছা চুড়ি কি একটা আংটি কিছু নেই। ফর্সা কানের লতা দুটো একজোড়া সোনার রিং-এর অভাবে সত্যি বড় ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। যে-ফাইলটায় খাতাপত্র নিয়ে তুমি ক্লাসে আস, কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাতে তারা বারোআনায় বিকোয়। তুমি ছাড়া এত সস্তা বাজে ফাইল আর কোনো মেয়ে ব্যবহার করে না। ঐশ্বর্য বলতে সম্বল কেবল একখানা ঘড়ি। ফর্সা সরু বাঁ হাতের মণিবন্ধে ছোট্ট লেডিস্ ঘড়িটা সাদা দেয়ালের গায়ে বাচ্চা টিকটিকির মাথার মত ঝুলে থাকে আর টিকটিক করে। বিলাসিতার চিহ্ন বলে মনে হয় না, কেন না ঘড়িটা পুরনো না হলেও খুব উজ্জ্বল না, বোধ হয় দামেও সস্তা। শাড়ি আর ব্লাউজের মত ওটাও তোমার একান্ত প্রয়োজনীয়-বস্তু দেখলেই বোঝা যায়। তোমার ফর্সা সরু হাতে ঘড়িটা কিন্তু মানিয়েছে বেশ! সারা গায়ের সবরকম অলঙ্কারের অভাব ওই একটা জিনিষেই পূরণ হয়ে গেছে, উপরন্তু তোমাকে ঘিরে গাম্ভীর্যের গভীরতার পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছে। তোমার মুখ দেখতে গিয়ে অনেকদিন আমি কেবল তোমার হাত দেখি। অধ্যাপকের নোট নেবার জন্য তোমার ডানহাতের আঙ্গুলগুলো যখন ব্যস্ত হয়ে খাতার উপর নড়ে-চড়ে বেড়ায়, তখন বাঁ হাতটা থাকে গালের অর্ধেক জুড়ে। হাতের তেলোতে গালটা নামিয়ে রেখে কনুয়ের উপর ভর দিয়ে তুমি ডানদিকে একটু ঝুঁকে থাক। ফলে সেই হাতটা, আঙ্গুলগুলো, আর সরু ফর্সা কব্জিতে ঘড়িটা আমি স্পষ্ট দেখতে পাই। আর দশজন মেয়ের মধ্যে থাকলেও আমার চোখে তখন তুমি আলাদা, বিচ্ছিন্ন দূরতর এক দ্বীপ। সেখানে দারুচিনি বনানীর ফাঁকে নির্জনতা আছে, সেই নির্জনতায় তুমি নিঃসঙ্গ করুণ একাকিনী। চুপ করে নতমুখে কেমন সুন্দর বসে আছ। নিজের হৃদপিণ্ডের সঙ্গে ঘড়ির মোলায়েম শব্দ মিলিয়ে জীবনের চলমানতার অর্থ খুঁজে বেড়াচ্ছ।

ক্লাস থেকে অধ্যাপক চলে যাবার পর অনেকেই যে যার জায়গা ছেড়ে উঠে পড়ে। কি ছেলেরা, কি মেয়েরা। এক ঘণ্টা মুখ বুজে বসে থাকা, বিশেষ করে এই বয়সে, দেহের সর্বাঙ্গে যৌবন যখন কলকল করছে, সত্যি বড় যন্ত্রণার। এখন একটু ফাঁক পেয়ে সবাই মুখর। হাসি, কথাবার্তা, ঠাট্টা-ইয়ার্কি আর বই-খাতা টানাটানি শুরু হয়ে গেছে। এইমাত্র যে অধ্যাপক লেক্‌চার শেষ করে বেরিয়ে গেলেন তাঁর অসাধারণ পাণ্ডিত্য থাকা সত্ত্বেও একেবারে পড়াতে পারেন না, গুছিয়ে কিছু বলতে গিয়ে হাঁফিয়ে ওঠেন, ওঁর ক্লাস করার চেয়ে 'ভার্সিটির লনে বসে আড্ডা মেরে সময় কাটানো যে ঢের আরামের রেখা, মিনতি, কৃষ্ণার কাছে বিমল, শান্তনু আর রোল নাম্বার ওয়ান্ এ-কথা যথেষ্ট জোরের সঙ্গে প্রমাণ করছে এবং পরীক্ষার আগে অধ্যাপকের লেখা বইগুলো পড়ে নিলেই যে কাজ হাঁসিল হয়ে যাবে সেই আশ্বাসও দিয়ে রাখছে। আমার পেছনের বেঞ্চির চুল-স্যাম্পু-করা ছেলেটি খুব ইংরেজি বই দেখে। চার্লি চ্যাপলিনের নতুন বই কোথায় কোন হলে শুরু হয়েছে এবং এই কারেন্ট বইটায় চ্যাপলিনের প্রতিভার কেমন আশ্চর্য পরিণতি লক্ষ্য করা গেছে, সে সম্পর্কে গভীর আলোচনার সূত্রপাত করে পাশের গেঁয়ো-টাইপের ছেলেটিকে চিত্র-জগৎ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করছে। ও-পাশের স্নলেখা চেঁচিয়ে হাসছে আর পাশের মেয়েটি মুখ গম্ভীর করে কড়া চোখে ওর দিকে তাকিয়ে হাসিটাকে শাসন করছে। একসঙ্গে অনেকগুলো সিগেরেটের ধোঁয়া ঘরের বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। এখন আর ছোট নই আমরা, স্কুল কি কলেজের ছাত্রও নই, অধ্যাপক হতে চলেছি, আত্ম-স্বাতন্ত্র্য আর ব্যক্তি-স্বাধীনতার অর্থ বুঝেছি, আমাদের সেই উপলব্ধির বাহক হয়ে সিগেরেটের ধোঁয়া মেয়েদের উপর দিয়ে ভেসে বাইরের দিকে চলে যাচ্ছে। আমি চুপ করে বসে সব দেখছি, সব শুনছি। আর তুমি, কি যেন নাম তোমার, এখন কি করছ ?

লক্ষ্য করেছি ক্লাসে তুমি চুপচাপই থাক। হাসি-ঠাট্টা দূরে থাক,

জোরে চেঁচিয়ে কারো সঙ্গে কথা বলতে পর্যন্ত শুনলাম না কখনও। নিজের জায়গাটুকু ছেড়ে এ-পাশের বারান্দায় কি ও-পাশের এক ঝাঁক প্রজাপতির মত মেয়েদের মেলায় গিয়ে দাঁড়াতে দেখলাম না। অধ্যাপক বেরিয়ে গেলে গালের উপর থেকে হাতখানা টেনে নিয়ে সোজা হয়ে বস। মন দিয়ে নোট নেবার সময় সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়েছিলে বলে বুকের আঁচল সামান্য এলোমেলো হয়েছিল, এখন গুছিয়ে ঠিক করে নাও। তারপর পাশের মোটামত চশমাচোখে মেয়েটির সঙ্গে অল্প হেসে ঘাড় দুলিয়ে দু'একটা কথা বলে চুপ করে যাও। ক্লাসে ঢুকবার সময় ম্যানুস্ক্রিপ্ট-লাইব্রেরি থেকে চামড়া-বাঁধানো কালো রঙের যে বইটা ইস্যু করে এনেছিলে, খুলে পড়তে আরম্ভ কর। ভাল না লাগলে চুপ করে টানা গভীর চোখদুটো মেলে ধরে তুমি তোমার ঘড়িটার দিকে চেয়ে থাক। ঘড়িটার প্রতি তোমার অসীম মমতা, আমি বুঝতে পারি। অনুজ্জ্বল অমসৃণ কম-দামি ছোট্ট ঘড়ি, কি এমন রহস্য আছে তাতে, এত কি দেখ। সময়, না জীবন, না কি বয়স? অনেক সময় দিয়ে দিয়ে ঘড়িটার বয়স হয়েছে, আয়ু ফুরিয়ে আসছে, হৃদপিণ্ডের ধুকপুক শব্দে ক্লান্তি বিষণ্ণতা নৈরাশ্য। আর বেশীদিন ধরে রাখা যাবে না, হয় নষ্ট হয়ে যাবে, নয়ত ফেলে দিতে হবে, ওর দিকে চেয়ে ভাব নাকি এইসব? তোমারও বয়স হয়েছে, জন্ম-মুহূর্ত থেকে অনেক সময় পার করে যৌবনের মাঝ-কোঠায় পৌঁছে গেছ, এখন যৌবনের আয়ু ফুরিয়ে আসার ভয় ধরে গেছে, ফুরিয়ে গেলে এই শরীরটাও বাসি পচা ফুল-ফলের মত ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যাবে, নিজের সম্পর্কে এমন ভয়ানক কোনো চিন্তা তোমার মনে স্থান পায় নাকি? তুমি তোমার ঘড়ির দিকে ক্লান্ত বিষণ্ণ চোখ মেলে যখন চেয়ে থাক, আমি তোমার মুখ দেখি। ঘড়িটার দিকে চেয়ে তুমি এত কি ভাব আমি তোমার মুখের দিকে চেয়ে তাই ভাবি।

ক্লাসের একটিমাত্র মেয়ের সঙ্গে তোমার ভাব আছে। তোমার

উল্টোদিকে ও বসে। প্রায়ই ওকে দেখি তোমার কাছে উঠে আসতে। পাশে বসে আদর করে মেয়েটি তোমার গলা জড়িয়ে ধরে। অত উচ্ছ্বসিত না হলেও এইসময় তোমার পাতলা নরম ঠোঁট-দুটোতে মিষ্টি হাসির রেখা ফুটে ওঠে। একমাত্র এই মেয়েটির সঙ্গেই প্রাণ খুলে মন মেলে দু'চারটে কথা বলতে, একটু হাসি ঠাট্টা ইয়ার্কি দিতে তোমার আপত্তি দেখা যায় না। হয় দু'জন পাশাপাশি বাড়িতে থাক, নয়ত এক কলেজে একসঙ্গে চার বছর পড়ে পাশ করেছ। চেহারা চালচলন দেখে ওকে তোমার মতই কোনো নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে বলে মনে হয়। তা না হলে এত সহজে তোমরা দুটিতে মিশে যেতে, এমন অন্তরঙ্গ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠতে পারতে না। এ-পাশে আরো কত মেয়েই ও আছে, পারো কি ওদের সঙ্গে ?

একদিন দেখলাম, তুমি নিজেই মেয়েটির বেঞ্চির দিকে এগিয়ে গেলে। অধ্যাপক গাঙ্গুলির ক্লাস ছিল। অসুস্থতার জন্য আসতে পারেননি। বারোটার ক্লাস হবে না বলে অফিস থেকে নোটিশ এসেছে। ছেলেরা অনেকেই বাইরে চলে গেল, সঙ্গে কিছু মেয়ে। ক্লাসের গণ্ডগোল স্তিমিত। ক্যান্টিনে অথবা নীচের লনে গিয়ে গোল হয়ে পা ছড়িয়ে বসে আড্ডা জমিয়েছে। ক্লাসটা এখন ফাঁকা-ফাঁকা। আমি ভেবেছিলাম ওই মেয়েটিই তোমার কাছে উঠে আসবে, যেমন প্রায়ই আসে। কিন্তু না, আজ তোমাকে আমি ওর দিকে এগিয়ে যেতে দেখলাম। হাঁটার সময় তোমার শিরদাঁড়া একটু বেঁকে সামনের দিকে ঝুঁকে থাকে এবং অনেকখানি জায়গা নিয়ে পা ফেলে একটু তাড়াতাড়ি হাঁট বলে তোমার গতির মধ্যে একটা অস্থির ব্যস্ততা লক্ষ্য করা যায়। যেন কি একটা জরুরী কাজ ফেলে এসেছ, এক্ষুনি আবার ফিরে যেতে হবে সেখানে, একমাত্র হাঁটার সময়ই একথা তোমার বুঝি মনে পড়ে যায়, অন্যসময় কেমন ধীর স্থির অনাসক্ত।

'কাল আসিসনি কেন রে ?'

তুমি মেয়েটির কাছে গিয়ে গা ঘেঁসে দাঁড়িয়েছ। ক্লাস এখন যথেষ্ট ফাঁকা থাকায় এবং অন্য যারা আছে তারাও বিশেষ কথাবার্তা

বলছে না বলে তোমার গলার স্বর স্পষ্ট শুনতে পেলাম। আমি তোমার দিকে একদৃষ্টে চেয়েছিলাম। ওই মেয়েটি কাল ক্লাসে আসেনি, আজ কখন এসেছে, চুপচাপ মুখ কালো করে বসে আছে লক্ষ্য করিনি। তুমি ওর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে আমি ওকে দেখতে পেলাম। মেয়েটি মুখ তুলে অল্প একটু হেসে বলল, 'এমনি আসিনি।'

'অসুখ করেছিল?'

'নাঃ।'

'তবে? হেড অফ দি ডিপার্টমেণ্ট এসেছিল নিশ্চয়ই?'

'ধেৎ!'

মেয়েটির সিঁথিতে সরু সিঁদুরের রেখা ছিল। ওর বিয়ে হয়ে গেছে, দু'এক বছর নয়, গাল গলা চিবুক কি বুকের দিকে তাকিয়ে দেখলে মনে হয়, বেশ কিছু দিন। তোমার পাশে গিয়ে বসার পর ও যখন তোমার গলা জড়িয়ে গালে গাল ঠেকিয়ে হেসে গল্প করতে শুরু করত, তখন ওর চুলের ভাঁজে সিঁদুরের মিহি রেখা আবিষ্কার করে কেন জানি আমার মনে হয়েছিল, ও ওর স্বামীর সঙ্গে বিশেষ থাকে না। ভদ্রলোক নানা কাজে বাইরে বাইরে ঘুরে বেড়ায়, নয়ত অন্য রাজ্যে কাজ করে। মেয়েটি এখানে কার কাছে থাকে, বাবা, মা অথবা ভাইয়ের কাছে, ভেবে ঠিক করতে পারিনি অবশ্য। এখন তোমার কথা শুনে বুঝলাম, আমার অনুমান মিথ্যে নয়। মেয়েটির স্বামী বাইরে, কলকাতা থেকে বেশ কিছুটা দূরে মাইথনে কাজ করে। ও হয়ত শ্বশুরবাড়ি থেকেই পড়াশুনা চালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। তোমার জিজ্ঞাসার উত্তরে অল্প হেসে নীচু গলায় কি যেন বলল শুনতে পেলাম না। আমি তোমার কথা এবং মুখের দিকে চোখ রেখেছিলাম।

'এসেই চলে গেলেন, আহারে!' মেয়েটির চিবুকে দুটো আঙুল ছুঁইয়ে সমবেদনা জানানোর ভঙ্গি করে তুমি হেসে উঠলে। ও রাগ করে তোমার আঙুলদুটো সরিয়ে দিল। তুমি ওর পাশে বসে ডান হাত দিয়ে কোমর জড়িয়ে ধরলে। মেয়েটি আজ কিন্তু হাত ছাড়িয়ে

নিয়ে সরে বসার চেষ্টা করল, তুমি সরতে দিলে না। ফের কি একটা বলে জোরে খিলখিল করে হেসে উঠলে।

আমি চমকে উঠলাম। এত জোরে তোমাকে কোনোদিন হাসতে দেখিনি। হাসিটা আমার কানে নতুন শোনাল। এমন জোরে চটুল ভঙ্গিতে কোনোদিন কথা বলতে শুনিনি, কথা বলার ভঙ্গিটা আমার কানে নতুন হয়ে বাজল। আমি অবাক হতে গিয়ে বিষণ্ণ হলাম। মুখখানা গম্ভীর এবং চোখদুটো অসম্ভব রকমের ছুঁচলো করে তোমার দিকে তাকালাম। হাসি আর কথাগুলোর সূত্র ধরে তোমার মনের ভেতরটা পর্যন্ত দেখে নিতে চাইলাম। আর যা দেখলাম তাতে রাগ অথবা বিরক্তির বদলে তোমার প্রতি আশ্চর্য এক মমতায় আমার মনের আকাশ ছলছল করে উঠল। সিঁদুরহীন চওড়া কপাল, ঘন কালো চুলের মাঝখানে উজ্জ্বল সাদা ধবধবে সিঁথি, তোমার চোখের কোলে কালি, প্রবালের মত সুন্দর মিষ্টি মুখে ক্লান্তির ছায়া, আমার চোখে পড়ল। তোমার হাসি এবং টুকরো কথার আয়নায় আমি একজন চিরন্তন মানবীকে খুঁজে পেলাম। রক্তমাংসের একজন মেয়ে-মানুষকে, যার লোভ আছে, তৃষ্ণা আছে, কাম এবং কামনা দুই-ই আছে। এবং সবকিছুর উপরে সমস্ত কিছুর গভীরে ছোট্ট ভীরু হৃদ-পিণ্ডে একটিমাত্র স্বপ্নাশা তিরতির করে কাঁপছে, পাখি-পাখালিরাও ঘর পায়, বনের পশুরাও, আমি কি পাব না? তোমার হাসি আর কথার মধ্যে আমি তোমার হৃদপিণ্ডের শব্দ শুনলাম। কেমন নিবিড় ঔৎসুক্য নিয়ে এখন তুমি মেয়েটির মুখের দিকে চেয়ে আছ। ওর মুখের রেখায় চোখের তারায় নতুন কোনো অর্থ খুঁজে বেড়াচ্ছ। যেন স্বামী আসার পর একরাতের সহবাসেই ও অনেক পাল্টে গেছে, তুমি অবাক হয়ে এখন একজন নতুন পরিতৃপ্ত সঙ্গিনীকে দেখছ।

কিন্তু ওর স্বামী আর ঘর-সংসারের খবর শুনে তোমার লাভ কি। মনে মনে ওকে ঈর্ষা করে মুখে-চোখে অসম্ভব একটা খুশির জোয়ার টেনে আনতে তোমার কি ভাল লাগে? বুকের নরম ভীরু হৃদপিণ্ডে ব্যথা বাজে না, দুঃখ যন্ত্রণা হয় না? না কি মনটা সবকিছুর

জন্য তৈরি করে রেখেছ! সবরকম অবস্থার মুখোমুখি হবার জন্য? মধ্যবিত্ত ঘরের মানুষ আমরা, চুলচেরা বিচারে কোনো ঘরেরই না, মুক্ত আকাশের তলে আশ্রয়হীন শিকড়হীন কতগুলো ক্লান্তির সমষ্টি। ক্লান্তি আর যন্ত্রণার বোধ মূল্যবান ছুটো অলঙ্কারের মত আমাদের ভেঙে-পড়া শরীর কেমন সুন্দরভাবে বেষ্টন করে আছে! একশ্রেণীর পাগলকে যন্ত্রণা দিলে আনন্দ পায়, ক্রমে সুস্থ হয়ে ওঠে। আমরাও তুঃখকে কি আনন্দ করে নিতে চাইছি। আবার সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উঠব বলে এত বিস্বাদ বেদনার বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছি! তোমার মুখে যে ক্লান্তি, যে বিষণ্ণতা, তুমি কি তাকে প্রসন্ন চিত্তে গ্রহণ করে আনন্দে উদ্ভাসিত হতে চাইছ? তা না হলে এই ঈর্ষা এবং লোভের মুহূর্তেও তোমাকে এত সুন্দর দেখাচ্ছে কেন! গভীর ঔৎসুক্য ভরা তোমার চোখছুটি কি আশ্চর্য উজ্জ্বল! চোখের অতলে অভাব ও নৈরাশ্যের বেদনা ছলছল্ করছে তার রূপটুকুই বা কেমন মমতা-নরম! নিজের মনকে শাসন করে শান্ত রাখার অদ্ভুত ক্ষমতা আছে তোমার, বুঝতে পারলাম এবং এই প্রথম তোমার দিকে চেয়ে থেকে আমি তোমার জীবনের ইতিহাস রচনা করার ভরসা পেলাম। একই মুখে আনন্দ এবং ক্লান্তি, দীপ্তি আর বিষণ্ণতা পাশাপাশি কেমন সুন্দর শোভা পায়, তার কারণ খুঁজতে ব্যস্ত হলাম।

হ্যাঁ, আমার বিশ্বাস, সকাল বেলায় তুমি কোনো একটা করপোরেশনের স্কুলে মাষ্টারি কর। মাইনে পাও সামান্য। সকাল পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে নিজের হাতে এক কাপ চা করে, কোনো দিন রাতের বাসি শুকনো রুটি, অভাবে ছু'পয়সা দামের এক-খানা বিস্কুট দাঁতে কেটে, চা-টুকু খেয়ে রওনা হয়ে পড়। বাড়ি থেকে স্কুল বেশ কিছুটা দূরে, তোমার মত সাধারণ গরীব ঘরের মেয়ের পক্ষে রোজ রোজ ট্রামে কি বাসে পয়সা খরচ করা সম্ভব না বলে তোমাকে হেঁটেই যেতে হয় এবং ফিরতেও। মাষ্টারি ছাড়া সকাল বেলায় আর কোনো কাজ তুমি করতে পারতে না, তেমন ভদ্র সম্মানজনক কাজ জোটানো তোমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। স্কুল ছুটি হতে

হতে দশটা বেজে যায়। আবার ঘরে ফিরতে হয়। তারপর স্নান খাওয়া সারতে যতটুকু সময়। বারোটার অনেক আগেই সবকিছু সেরেস্থরে কর্ণওয়ালিস স্ট্রিট ধরে আবার হাঁটতে শুরু কর। ঠিক সময়মত ক্লাসে এসে পৌঁছে যাও। নিজে চাকরি করে পড়ার খরচ চালাতে হয় তোমাকে। এখন থেকে না, স্কুল ফাইনাল পাশ করার পর যখন তুমি কলেজে ঢুকেছিলে, চাকরিতেও তখন। তা না হলে তোমার কলেজে পড়াই হত না। ইউনিভারসিটিতে ত নয়ই। আজকের দিনে আমরা, মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষেরা দু মুঠো খেয়ে পরে বাঁচতে পারিনে। মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দুটো বেশি পয়সা রোজগারের ফিকিরে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে হয়। আমাদের সংসারে ছেলেরাই যোগ্যমত শিক্ষা পায় না, কচি বয়সে কলেজ থেকে ছাঁটাই হয়ে পার্কে রোয়াকে আড্ডা জমিয়ে বিড়ি টেনে গোল্লায় যায়। মেয়েদের পড়াশুনা শিখিয়ে বিদুষী করে তোলার প্রশ্ন রীতিমত বিলাসিতা ছাড়া কি! তুমি চাকরি না পেলে, নিজের রোজগারের টাকায় পড়ার খরচ চালানোর ব্যবস্থা না করতে পারলে, তোমার কলেজে আসা হত না। আর দশজন মেয়ের মত চিরকাল সংসারের জালে বন্দী হয়ে থাকতে, অভাবে অনটনে শুকিয়ে মৃতকল্প হয়ে যেতে, তারপর একদিন হারিয়ে। তুমি সাহসী মেয়ে, মনের জোর আছে, তোমার মুখেচোখে কঠিন প্রতিজ্ঞার চিহ্ন আমি গভীর মনোযোগ দিয়ে লক্ষ্য করেছি। আর দশজন সাধারণ মেয়ের মত তাই তুমি হারিয়ে যেতে চাওনি। নিত্য প্রাণধারণের গ্লানির মধ্যে বাস করেও গ্লানির আবর্জনা দু'হাতে ঠেলে সরিয়ে কেমন সুন্দর আর উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠতে চাইছ। তোমার এই অগ্রগতির পথ খুব সহজ ছিল না, এখনও নেই। তোমার মুখে বিষণ্ণতার সঙ্গে কাঠিন্যের ছাপ দেখে আমি তা বুঝতে পারি।

তোমার বাবা কেরাণি ছিলেন, বড় জোর আপার গ্রেডের। এখন রিটায়ার করে বাড়িতে বসে আছেন। পেনসন যা পান তাতে বাড়ি ভাড়া আর দুধের দাম শোধ হয়, এর বেশী কিছু না, হওয়াও

সম্ভব না। তোমার ভাই বোন মা সবাই আছে। এক ভাই স্কুলে পড়ে, তুমি তাকে চোখে চোখে রেখেছ, পড়াশুনায় সাধ্যমত সাহায্য করে চলেছ, আসছে বছর ও হয়ত কলেজে ঢুকতে পারবে। ওর পড়ার খরচ তোমাকেই দিতে হয়। সংসারের খরচও অনেক। তোমার মাইনের একটা মোটা অংশ চাল ডাল আর কয়লা কিনতেই ফুরিয়ে যায়। তারপর নিজের পড়ার খরচ। বই পত্র খাঁতা পেন্সিল কলেজের বেতন, কম কি! অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করার পর এই নিয়ে বাড়িতে নিশ্চয়ই কথা উঠেছিল। বাবা মনে মনে যতখানি খুশি হয়েছিলেন, তুমি এম-এ পড়তে চাইছ শুনে ঠিক ততখানি গম্ভীর।

'আর বেশীদূর এগুনো কি ভাল, বিশেষ করে আমাদের যা অবস্থা!' মিনমিনে গলায় তিনি আপত্তি তুলেছিলেন। তুমি কান দাও নি। আস্তে আস্তে যথেষ্ট বিনয়ের সঙ্গে জবাব দিয়েছিলে, 'দুটো বছর ত, দেখতে দেখতে কেটে যাবে!'

তোমার বাবা বলেছিলেন, 'তা হয়ত যাবে, কিন্তু খরচপত্রের দিকটা—'

'এমন কিছু বেশী না। যা পাচ্ছি, কুলিয়ে যাবে।'

'তার চেয়ে আমি বলছিলাম কি', তোমার বাবা অনেকক্ষণ চিন্তা করে তোমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, 'এবার দেখেশুনে একটা হাইস্কুলে ঢুকে পড় বরং, অনার্স গ্র্যাজুয়েটদের স্কেল এখন ত ভালই করেছে শুনেছি—'

'হ্যাঁ, একশ ত্রিশ থেকে শুরু হচ্ছে, সব নিয়ে পৌনে দু'শ টাকার মত পাওয়া যায়—'

'কম কি! কিছু টাকা হাতে আসবে। আমি ত জমাতে পারলাম না কিছুই, তুইও যদি না পারিস তবে, সংসারের জন্য বলছি না আমি, তোর বিয়ের—'

'সে হবে'খন, আগে এম-এ-টা পাশ করে আসি।'

তোমার বিয়ের কথা আজ কেন, সেই ষোল বছর বয়স থেকেই শুনে আসছ বোধ হয়। বার তিনেক দেখানোও হয়ে গেছে। একবার

আশীর্বাদ পর্যন্ত হয়ে গিয়েছিল। বিয়ে ভেঙে গেছে। গোলমাল লেগেছিল তোমার রূপ কি গুণ নিয়ে না, টাকা পয়সা নিয়ে। সেসব কথা তোমার মনে আছে বলে বিয়ের প্রসঙ্গ উঠলে এখন সঙ্কোচ কি লজ্জা পাওয়ার পরিবর্তে বিরক্ত হও। তিক্ত বিস্বাদ একটা অনুভূতিতে সারা মন ছেয়ে যায়। এম-এ পড়ার জন্য তুমি যে এত জিদ ধরেছিলে, কে জানে তার মূলে ওই তিক্ত বিস্বাদ অনুভূতির কোনো ক্রিয়া আছে কিনা। এরপর তোমার বাবা অবশ্য আর আপত্তি করেন না। বাবাকে চুপ করে যেতে দেখে মা-ও সাহস পান না বিরূপ কিছু বলে তোমার প্রতিপক্ষ সাজবার। তবে আমার অনুমান, মনে মনে তিনিও খুশি নেই। ঘরের মেয়ে চিরকাল বাইরে বাইরে কাটাক, স্কুল কলেজ আর চাকরি নিয়ে মেতে থাকুক, কোনো মা তা পছন্দ করেন না। চাকরি করে টাকা এনে দিয়ে তুমি সংসারের ফুটোফাটা নৌকাটা কোনোরকমে ভাসিয়ে রেখেছ, এটুকু বোঝার পরেও কৃতজ্ঞতার চেয়ে তোমার উপর বিতৃষ্ণা তাঁর অনেক বেশি। এতদিনে তোমার যদি বিয়ে হয়ে যেত, তাহলে খুশি হতেন তিনি। মেয়েকে সুখী সংসারী দেখে যেতে পারলে সব মা-ই খুশি হ'ন। বিশেষ করে, তিনি যে-যুগের মানুষ, স্ত্রী-শিক্ষা স্ত্রী-স্বাধীনতা সে-যুগের অভিধানে তেমন ঠাঁই পায়নি। তোমার মা'র কাছে আজ যদি তোমার চাকরি এবং কলেজে পড়া দু'চোখের বিষ হয়ে থাকে, তবে তাঁকে অকৃতজ্ঞ ভেবে নিজে যেন ছোট হয়ে যেও না।

আমি জানি, মা'র সঙ্গে প্রায়ই তোমার মন কষাকষি চলে। যেমন আমার বাড়িতে চলে চাকরি-করা দিদির সঙ্গে মা'র। হ্যাঁ, এ কথা গোপন করে লাভ নেই। স্কুল থেকে দশটায় ফিরে এসে, বাসি কাপড়জামা সাবানে কেচে রোদে দিয়ে স্নান সেরে যখন তুমি রান্নাঘরে এসে দাঁড়াও, মা কথা বলেন না, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে হাতের কাজ সারতে ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। তুমি চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে তাড়া দাও, 'কলেজের সময় হয়ে গেছে মা।'

তারপর রান্নাঘরের কোণা থেকে একটা পিঁড়ি টেনে হাঁটু

ভেঙে গোল হয়ে বস। হাতের কাছে জলের কলসি থাকলে গ্লাসে জল গড়িয়ে নাও, না থাকলে ছোট বোনকে ডেকে হুকুম কর। তোমার গলার স্বরে ব্যস্ততা এবং রূঢ়তা দুই-ই একসঙ্গে বেজে ওঠে। মা বিরক্ত হ'ন। চোখদুটো খুব ছোট করে তোমার মুখ দেখেন। তারপর নিস্পৃহ নিরাসক্তভাবে ভাতের থালা এগিয়ে দেন। তিনি ইচ্ছে করেই ভাত দিতে দেরি করেন। এভাবে দেরি করলে তুমি সময়মত ক্লাসে পৌঁছুতে পারবে না, না পারলে তোমার পড়াশুনার ক্ষতি হবে, দু'চার দশদিন এমন ক্ষতি হ'লে একদিন বাধ্য হয়েই কলেজে যাওয়া বন্ধ করবে, মা খুশি হয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচবেন, এই ধরণের একটা গূঢ় ইচ্ছা সম্ভবত তাঁর মনের মধ্যে পাক খায়। তোমার তাড়াহুড়োর উত্তরে তাই তিনি তেমন সজাগ হয়ে ওঠেন না। ইচ্ছা করেই দেরি করেন। আর যত দেরি করেন, তুমি তত অধৈর্য হয়ে ঘন ঘন ঘড়ি দেখ। হ্যাঁ, এই ঘড়িটাই। সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ার সময় কিনেছিলে। সময় মেপে তোমাকে পথ চলতে, স্কুলে যাওয়া-আসা করতে হয়, তারপর কলেজে। একটা ঘড়ির দরকার ছিল খুব। একবছর চাকরি করে কিছু টাকা জমিয়ে ঘড়িটা তুমি কিনেছ। সব টাকা দিয়ে উঠতে পারনি, বাকিটা আরো এক বছর ধরে চুক্তিমত শোধ করেছ। এই ঘড়ি কেনা নিয়েও বাড়িতে মন-কষাকষি চলেছিল। বাবা খুশি হননি, মা রাগ করেছিলেন এবং মুখে কিছু বলতে না পারার দরুণ রাগটা দীর্ঘদিন মনে চেপে রেখেছিলেন। এমন কি তোমার ছোট ভাই, যাকে তুমি সবচেয়ে বেশি ভালবাস, সে পর্যন্ত কি না তোমাকে ঈর্ষা করেছিল। তুমি অবশ্য রাগারাগি করনি। নিজের প্রয়োজনের কথাটাই দৃঢ়ভাবে মনে করিয়ে দিয়েছিলে। বাবা অস্বীকার করতে পারেননি, কিন্তু মা? মনে হয় এখনও তিনি ঠিক সহ্য করে নিতে পারেন নি। তাঁর কাছে নতুন ঘড়িটা উচ্ছৃঙ্খল বিলাসিতার চিহ্ন হয়ে থেকে গেছে। ভাতের গ্রাস মুখে তুলতে তুলতে তুমি যখন ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকাও, মা তোমার মুখ দেখেন। অপ্রসন্ন ঘরঘরে গলায় বিরক্তি

প্রকাশ করে বলেন, 'একটু আস্তে খা না বাপু, অত তাড়াতাড়ির কি আছে! মাছের ঝোলটা এখনও হয় নি!'

'সময় নেই।' তুমি ছোট্ট করে জবাব দিয়ে জলের গ্লাস টেনে নাও।

'খুব সময় আছে।' মা তোমাকে ধমক দেন, 'সবকিছু ঘড়ি ধরে করতে গেলে কি চলে? রয়ে বসে কাজ করাই ত সংসারের নিয়ম জানি।'

হ্যাঁ, তোমার মা তাই জানেন। তিনি এ যুগের মানুষ নন, বিগত কালের। সে যুগে ঘড়ি মেনে মানুষ চলত না, ঘড়িই ভয়ে ভয়ে মানুষকে মেনে চলত। কিন্তু তুমি ত সেই ঢিলেঢালা যুগ অনেক আগেই পার হয়ে এসেছ। তুমি এসেছ, আমিও এসেছি। তুমি আমি আমরা কেউই ইচ্ছে করলেও আর সে যুগে ফিরে যেতে পারি না। এখন যে জোয়ারের স্রোতে আমরা ভাসছি তাতে বেগ যেমন প্রবল, আবর্জনাও অনেক। রয়ে বসে কিছু করার উপায় নেই, সাঁতার কেটে সন্তর্পণে অথচ দ্রুতবেগে এগুতে হবে। সময় আমাদের ফাঁকি দিয়ে চলে যাচ্ছে, আর বাধ্য নয় আমাদের, আমরা সময়কে যদি না ধরতে পারি, উল্টে আজ তাকে বাধ্য না করতে পারি, পিছিয়ে পড়ব। সেই অন্ধকার অতীতের গুহা আমাদের টেনে নিয়ে পাথর চাপা দিয়ে রাখবে। বাঁচতে চাইলেও আর বাঁচতে পারব না, দম বন্ধ হয়ে মারা যাব। অতীতের মাটিচাপা পড়ে ফসিল বনে যাব!

না, তা আর হয় না। তুমি চাও না, আমিও চাই না এমনভাবে পিছিয়ে পড়তে, হারিয়ে যেতে। হলামই বা বিত্তহীন মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়ে, তাই বলে এক টুকরো স্বপ্ন কি আর বুকে পুষে রাখিনে! একটুখানি আশা? কিন্তু এতসব কথা তোমার মা জানেন না। জানার কথাও নয়। তাড়াহুড়ো করে কিছু খেয়ে, কিছু না খেয়ে, ফেলে ছড়িয়ে যখন তুমি রান্নাঘর থেকে উঠে হাত ধোয়ার জন্য বাইরে চলে আস, মা রাগ করতে গিয়ে মনে মনে দুঃখ পান। তোমার ভাতের থালার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে চাপা

একটা দীর্ঘশ্বাস গোপন করেন। তুমি তা শুনতে পাও না, কোনোদিন শোননি। ততক্ষণে সেই বাজে সস্তা ফাইলটায় বই খাতা ভরে তুমি রাস্তায় নেমে এসেছ। ক্লাসের সময় হয়ে গেছে। ঘড়ির কাঁটা স্থির হয়ে নেই।

জোরে জোরে হাঁটা তোমার অভ্যাস। ফর্সা রোগা লম্বা শরীর নিয়ে তুমি এমনভাবে হাঁটতে শুরু কর, মনে হয় প্রিয়জন কেউ মৃত্যু-শয্যায়, এখুনি গিয়ে হাজির না হতে পারলে আর দেখাই হবে না! ক্লাসে পৌঁছে যাবার পরেও তোমার হাতে বেশ কিছু সময় থাকে। নির্দিষ্ট জায়গাটুকু দখল করে তুমি আরেকবার ঘড়ি দেখ। তারপর ফাইলের মধ্যে গুঁজে-রাখা ছোট্ট নীলরঙের রুমাল বের করে ঘাড়গলার ঘাম মুছতে শুরু কর। অনেকখানি পথ তোমাকে হেঁটে আসতে হয়েছে। ফলে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত। প্রবালের মত মিষ্টি উজ্জ্বল মুখের ভাঁজে ভাঁজে ঘামের বিন্দুগুলো চিক্ চিক্ করছে। বড় সাইজের গোলাপি রঙের একটা পদ্মফুলের উপর শীতের সকালে ফোঁটায় ফোঁটায় শিশির জমে থাকলে যেমন দেখায়। এই সময়টায় তোমাকে সবচেয়ে বেশী ক্লান্ত, বিষণ্ণ দেখায়। চোখের কোলে কালির রেখা ঘামে ভিজে স্পষ্ট প্রকট হয়ে ওঠে, ডান গালে চিবুকের কাছে কালো তিলটা বিশ্রী রকমের বিবর্ণ দেখায়। মাথার উপর পাখা ঘুরছে। বাতাসে তোমার চুল, শাড়ির আঁচল কাঁপছে। ঘামটুকু আস্তে আস্তে শুকিয়ে যাবে। যতক্ষণ না শুকোয়, মুখখানা সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে সকালবেলাকার দীপ্তিপ্রসন্নতা ফিরে না পায়, তোমার দিকে চেয়ে থাকতে ভাল লাগে না আমার। তোমার ক্লান্তি যেন আমাকেও স্পর্শ করে। অবসন্ন আর দুর্বল করে তোলে আমার চেতনা। আমি ভয় পাই ভয়ে ভয়ে তোমার দিকে চেয়ে থেকে ভাবি, আগের চেয়ে অনেক শরীর খারাপ হয়েছে তোমার, বেশি রোগা হয়ে যাচ্ছ দিনকে দিন, ক্লান্তি আর বিষণ্ণতা হিংসুটে থাবা মেলে তোমার সুন্দর মুখটা নষ্ট করে ফেলতে চাইছে, এরপর তুমি কি ভেঙে পড়বে, হারিয়ে যাবে?

পর পর তিনদিন দেখলাম তুমি ক্লাসে এলে না। সিক্‌সথ্ ইয়ার শেষ হ'তে চলল, আর ক'দিনই বা ক্লাস হবে। কোর্স শেষ করার জন্য তাড়াহুড়ো শুরু হয়েছে। এখন প্রতিটি ঘণ্টা মোস্ট ইম্‌পরটেণ্ট। তোমাকে অনুপস্থিত দেখে আমি অবাক হতে গিয়ে ভয় পেলাম, সেই পুরনো ভয়টা আমাকে গ্রাস করল। আর বিরক্ত হয়ে দেখলাম, অন্য একটা মেয়ে তোমার জায়গা দখল করে বসেছে। খুব ফর্সা, রূপে রঙে ঝলোমলো পেছনের বেঞ্চির সেই আড্ডাবাজ মেয়েটা। গল্প করার জন্য প্রফেসর পি. এন. বি. ওকে একদিন মিষ্টি করে ধমকে দিয়েছিলেন। ও তোমার জায়গায় কেন বসবে, হঠাৎ ভাল মেয়ে হয়ে এতখানি এগিয়ে বসার সখ কেন হ'ল, ওর কড়া মেক্ আপ দেওয়া মুখটার দিকে চেয়ে আমি ভাবতে চাইলাম। আর মনে মনে ওকে আমি ঈর্ষা করলাম, মনে মনে ভেংচি কেটে বিদ্রূপ করলাম। যে জায়গাটুকুর দিকে চোখ মেললেই প্রত্যহ আমি তোমাকে দেখতে পাই, হলুদরঙের শাড়িতে জড়ানো তোমার ক্লান্ত অথচ দীপ্ত যৌবনের একটি মুখ একখণ্ড প্রবালের মত আমার চোখের আয়নায় ঝক্‌মক্ করে ওঠে, সেখানে অন্য কেউ বসলে আমি সহ্য করব কি করে?

প্রথম দিন ভেবেছিলাম, স্কুলের কাজে আটকা পড়েছ। আজ মাসের এক তারিখ। মাইনেপত্র নিয়ে বাড়ি পৌঁছতে দেরি হয়ে গেছে। তারপর সংসারের নানা ঝামেলা। ঘরে বাইরে অনেকেই আজকের দিনটির জন্য হাত পেতে বসে আছে। নানারকমের দাবি-দাওয়া হিসাব-পত্র মিটিয়ে ক্লাসে আসার আর সময় করে উঠতে পারনি। দ্বিতীয় দিন মনে হ'ল, অসুস্থ হয়ে পড়েছ। জ্বরজারি অথবা পেটব্যথা গোছের কিছু। এমনিতে যথেষ্ট রোগা তুমি, গায়ে তেমন রক্ত নেই, দুর্বল অশক্ত। হঠাৎ ছোটখাটো কোনো অসুখ বেঁধে যাওয়া বিচিত্র নয়। তারপর তৃতীয় দিনও যখন তোমাকে ক্লাসে দেখলাম না, মন খারাপ করে ভাবলাম অসুখ নিশ্চয়ই বেড়েছে। তা না হলে ক্লাস কামাই করার মেয়ে ত তুমি নও, কোনোদিন করেছ বলে মনেও পড়ে না। দেড় বছরের উপর ক্লাস হয়ে গেল, প্রতিদিন

তোমাকে হাজির দেখেছি। ওই বিশেষ জায়গাটিতে বসে থেকে অধ্যাপকের নোট নিতে কি ম্যানুস্ক্রিপ্ট লাইব্রেরি থেকে ইস্যু-করা বইয়ের পাতা উল্টাতে দেখেছি। অসুখ-বিসুখ ধরণের একটা কিছু গুরুতর কারণ না ঘটলে তুমি এমনভাবে আচমকা ডুব মারবে কেন? মনের মধ্যে যে ভয়টা ছিল, তাকে আমি চাপা দিয়ে রাখলাম। অন্য কারণ আমি ভাবতে চাইলাম না। সংসারের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা তোমাকে প্রতিজ্ঞা থেকে বিচ্যুত করেছে, সাহসের যে উজ্জ্বলদীপ্তি নিয়ে ক্লান্তি এবং যন্ত্রণাকে তুমি আনন্দে উদ্ভাসিত করতে চেয়েছিলে, এখন ভয় পেয়ে সেই চিন্তার জগৎ থেকে নির্বাসিত হয়েছ, ভাবতে আমার খারাপ লাগল। শরীরটা একটু ভাল হলে আবার তুমি ঠিক সময়মত ক্লাসে পৌঁছে যাবে, ভেবে মনে মনে সান্ত্বনা সংগ্রহ করলাম। আর যে মেয়েটা অনধিকারিণীর মত তোমার জায়গা দখল করে বসেছে, তিন দিনের দিন থেকে তাকে আমি ঘৃণা করতে শুরু করলাম। ঘৃণা এবং করুণা।

একবার ভাবলাম ওই বিবাহিতা মেয়েটির কাছে তোমার খোঁজ নিই। ওর সঙ্গে তোমার খুবই ভাব। তিনদিন ক্লাসে আসছ না দেখে মেয়েটি রোজ তোমার প্রক্সি দিয়ে পার্সেন্টেজ্ ম্যানেজ করে যাচ্ছে। ওকে জিজ্ঞেস করলে মন্দ হয় না। আলাপ অবশ্য নেই, ক্লাসের কোনো মেয়ের সঙ্গেই ত নেই। কিন্তু তাতে কি! এখন আর স্কুল কলেজের ছাত্র নেই, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাসের ছাত্রছাত্রী, 'আপনার সঙ্গে পরিচিত হওয়ার ইচ্ছা' অথবা 'আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব ভাবছি'—বলে যদি কোনো মেয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াই অবাক হলেও রাগ করবে না নিশ্চয়ই। কিন্তু পারলাম না। তুমি যদি আমার মনের প্রতিমা না হয়ে অন্য কেউ হতে, আর আমি যদি অমন একটা মিষ্টি ক্ষুধা বুকে পুষে রেখে প্রতিদিন তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে না থাকতাম, তবে এমন নির্লজ্জ লজ্জা এসে আমার পথ রোধ করে দাঁড়াত না। আমি অনায়াসে তোমার সম্পর্কে যে-কোনো খবর সংগ্রহ করে নিতে পারতাম। তাছাড়া মনে ভয় ছিল।

যদি এমন কিছু শুনি যাতে আমার ভয়টা আরো বেড়ে যায়, তোমার প্রবালের মত স্নিগ্ধ মুখ ভেঙ্গে পড়ার আর হারিয়ে যাওয়ার ক্লান্তিতে কলঙ্কিত বলে মনে হয়, তাহলে আমার দিনরাতের মুহূর্তগুলোও কি ঠাণ্ডা বিস্বাদ তিক্ততায় ভরে উঠবে না ?

কিন্তু না, তুমি আমাকে বাঁচিয়েছ। তুমি তোমাকে বাঁচিয়েছ। তোমার মনের সুন্দর ইচ্ছাগুলোকে কুৎসিত একটা আত্মহত্যার হাত থেকে রক্ষা করেছ। তোমার মুখের পাশাপাশি দুটি রূপ, তার একটাও যে মিথ্যে নয়, দুঃসহ ক্লান্তিকে তুমি যে আনন্দ দিয়ে ঢেকে দিতে চাইছ, আজ স্পষ্ট করে বুঝতে পারলাম। মুগ্ধ শ্রদ্ধার দৃষ্টি দিয়ে আমি তোমাকে অভিনন্দিত করলাম। সেই বিবাহিতা মেয়েটি তাড়াতাড়ি তোমার দিকে এগিয়ে এল। তোমার ঘামে ভেজা মুখের দিকে চেয়ে থেকে জিজ্ঞেস করল, 'এ ক'দিন আসিস নি কেন রে ?'

ওর কণ্ঠে দরদ ছিল, ভালবাসার স্পর্শ ছিল। তুমি একদিন ওকে ঈর্ষা করেছিলে, ওর ঘরসংসারস্বামীপুত্র সব আছে, তোমার কিছু নেই, হয়ত হবে না কোনোদিন, ভেবে নিজের ঈর্ষার আগুনে নিজেই পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিলে। আর যত পুড়ছিলে, দুঃখ পাচ্ছিলে তার অনেক বেশি। 'আমার মনটা কেমন ছোট হয়ে যাচ্ছে, কেমন নীচ ইতর একটা মেয়েমানুষ হয়ে যাচ্ছি আমি, একজন সুখে আছে শুনলে তাকে কিনা আমি হিংসা করি'—ভেবে নিজের মনে নিজেই লজ্জা পাচ্ছিলে। মনে মনে ওর কাছে হয়ত ক্ষমা চাইছিলে। এখন পাশে বসে যখন তোমার খোঁজখবর নিতে শুরু করল, তুমি ওকে পরম আত্মীয়ার মত গ্রহণ করলে। যেমনভাবে সরে গিয়ে ওর বসার জায়গা করে দিলে, উজ্জ্বল গভীর চোখজোড়া একান্ত নির্ভরতায় ওর দিকে মেলে ধরলে, মনে হ'ল, তোমার সব জ্বালা-যন্ত্রণার কথা খুলে বলার মত একজন সখী তুমি পেয়ে গেছ। ওর কাছে সবকিছু তোমার খুলে বলা দরকার। না বললে শান্তি নেই।

'না, অসুখ-বিসুখ কিছু না।' তুমি শুরু করলে।

'আমি কিন্তু তাই ভেবেছিলাম।' মেয়েটি এতদিনে যেন নিশ্চিন্ত হ'ল।

'আমার পার্সেণ্টেজগুলো—'

'সব ঠিক আছে। তুই এ ক'দিন ছিলি কোথায় তাহলে?'

'আসানসোলে এক কাকা থাকেন, বেড়াতে গেছলাম।'

'ক্লাস কামাই করে, হঠাৎ?'

তুমি চোখদুটো নামিয়ে নিলে। চোখের কোলে ঘামে-ভেজা কালির ছাপ। মুখের কাঠিন্যে গাম্ভীর্যের গাঢ়তা, 'অনেকদিন আগে একবার যেতে বলেছিলেন, হঠাৎ কি মনে হ'ল রোববার দিন রওনা হয়ে পড়লাম।'

'শুধুই বেড়াতে?'

'উঁহু, কিছু টাকার জন্য। চার মাসের মাইনে বাকি পড়ে গেছে, না দিলে নাম থাকবে না।'

তুমি বললে। আর মেয়েটি আচমকা চুপ করে গেল। তোমার আকস্মিক অন্তর্ধানের পেছনে সম্ভবত চড়ারঙের কোনো রোমান্স খুঁজতে চেয়েছিল ও। মেয়ে-দেখানো জাতীয় কোন সুখবর। ওর সুন্দর গোলগাল মুখখানায় চাপাহাসির রেখা ফুটে উঠেছিল। ক্লাসের বেতন বাকি পড়েছে, রোজগার করার পরেও সে টাকা তুমি নিয়মিত জমা দিয়ে উঠতে পারোনি, একমাস দু'মাস করে এখন চারমাসে আটচল্লিশ টাকার ধাক্কায় ঠেকেছে, এবার না দিলে নাম কাটা যাবে, অভাব দারিদ্র্যের এমন রূঢ় কাহিনী শোনার জন্য তৈরি ছিল না মেয়েটি। আচমকা চুপ করে গিয়ে তোমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। তুমি অল্প একটু হেসে ঘাড় নেড়ে ওর দুশ্চিন্তা শান্ত করার জন্য ছোট্ট করে শুধু বললে, 'আজ মাইনে দিয়ে এলুম।'

মেয়েটির গম্ভীর মুখ প্রসন্ন হ'ল। তোমার বিষণ্ন মুখে ক্লান্তির ছায়া গাঢ় হ'ল। আমি তোমার স্নিগ্ধ বিস্তৃত চোখের মণিতে মনের একটা কঠিন ইচ্ছা দপ্ দপ্ করে জ্বলতে দেখে খুশি হলাম। মুখের রেখায় ক্লান্তি, অথচ চোখের মণিতে কি আশ্চর্য দীপ্তি, অবাক হয়ে ভাবছিলাম। তারপর আচমকা, একান্তই আচমকা তোমার হাতের দিকে আমার নজর পড়ল। দেখলাম, বাঁ-হাতের মণিবন্ধে টিকটিকির

মাথার মত ছোট্ট ঘড়িটা নেই। সরু ফর্সা হাতের সেই বিশেষ জায়গাটুকু সাদা হয়ে আছে। ইট-চাপা ঘাসের মত এক ধরনের হলুদ বিবর্ণতা তোমার কব্জিটা ঘিরে রেখেছে। বুঝলাম, তুমি মিথ্যে কথা বলেছ, আত্মসম্মান বাঁচানোর জন্য মধ্যবিত্ত পরিবারের সেই চিরন্তন মিথ্যার জালে জড়িয়ে পড়েছ, অসত্যকে আশ্রয় করেছ। কলেজের মাইনে দিতে গিয়ে তোমার সবচেয়ে প্রিয় মমতার বস্তুটি হাতছাড়া হয়ে গেছে। মুখ ফুটে সে কথা বলতে না পারার যন্ত্রণায় সঙ্কুচিত হয়ে এখন তুমি কেমন শব্দহীন হয়ে গেছ !

আমার কান্না পেল হঠাৎ। তোমার মুখ চোখ সরু ফর্সা হাতখানা আর হলুদ শাড়িতে জড়ানো রোগামত শরীরটার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে কান্না পেল ভীষণ। কান্নাটা বুকের মধ্যে পাক খেতে লাগল। কিন্তু একই সঙ্গে বুকের মধ্যে আবার সুখের এক আশ্চর্য অনুভূতিও ছড়িয়ে পড়ল। তোমার সাহসে আমিও সাহসী নির্ভয় হলাম।

তোমার চোখের মণিতে এখনও যে দীপ্তি জ্বলজ্বল করছে, বুঝলাম, এ সহজে নিভে যাওয়ার নয়, নয় সহজে হারাবার।

বাসুদেব এবং ইত্যাদি

সকালে উঠে কাজের সন্ধানে শহরে যাচ্ছিল বাসুদেব। তার গ্রাম থেকে শহর ক্রোশ দুই দূরে। কাঁচা রাস্তা ধরে অনেকটা হাঁটার পর পীচের রাস্তা পাওয়া যায়। এই রাস্তা সোজা তাকে নিয়ে যায় শহরে। গাঁয়ের মথুরবাবুরা বাসে যাতায়াত করেন, কখনো সাইকেল-রিক্সায়। জমিজমা ছাড়াও একখানা বাস, কয়েকটা রিক্সা আছে মথুরবাবুদের। দু'খানা পা ছাড়া বাসুর কিছু নেই। সে হেঁটেই মুনিষ খাটতে যায়। সূর্য ওঠার অনেক আগে হাঁটতে হাঁটতে সে যখন শহরের মাঝামাঝি পৌঁছায়—তখন মথুরবাবুদের লাল বাস ধুলো উড়িয়ে তাকে অতিক্রম করে। বাসু অল্প সরে গিয়ে নিশ্বাসে ধুলো টেনে খুক খুক করে কাসে। তারপর আপন মনে গর গর করে, 'হ, হ! শালো ছুইট্ছে ছাখো—খেপা মুষের পারা। যাবি উল্টিন্, বুঝবি তখুন!' কিন্তু বাস কোনোদিন উল্টায় না। বাসু শহরে পৌঁছে দেখে, মিত্তির-দের পেট্রোল-পাম্পে বাস ঠিক দাঁড়িয়ে আছে। এখান থেকে তেল ভরে থানার সামনে গিয়ে লাইন দেবে। তারপর প্যাসেঞ্জার নিয়ে ছুটবে মামুদবাজার হয়ে সিউড়ি। বাসটার দিকে তাকিয়ে ঈর্ষায় আবার গর গর করে বাসু, 'ইস, শালো কখুন পৌঁছিন্ গেল্ছে। আমি শালো হাঁটছি তো হাঁটছিই—'

দু'দিন কাজে বেরুতে পারেনি বাসু। গত বুধবার শহরের এক বাড়িতে মিস্ত্রিকে ইটের যোগান দিতে গিয়ে গোটা ইট ভেঙে আধ-খানা পায়ে পড়ে। বুড়ো-আঙুল ছেঁচে গিয়ে জখম হয়। যন্ত্রণায় সে আঁ আঁ করে ওঠে। মুর্শিদাবাদী মিস্ত্রি তাকে ধমকায়, 'কুথাকার বুড়বাক্ বটে হে তুমি! আ-পোড়া ছাল্লট ইট উঠায়ে আনছ? তুমার পায়ে না পড়লে আমার পায়ে পড়ত যি! লজর রেখে কাজ কর!'

যেন দোষটা ইটের না, বাসুরই! টকটকে পোড়া ইট জলে ভিজে লোহার মতো শক্ত হয়। কর্ণি দিয়ে কাটা যায় না, বাগুলি ধরতে হয় মিস্ত্রিকে। সে ইট ভেঙে পড়ার ভয় নেই। কিন্তু আধ-পোড়া-ইট জলে ভিজলে ভেতরে গলে গিয়ে নরম হয়। হাতে ধরে তুলতে গেলে মাঝামাঝি ভেঙে পড়ে। এ ইটে মিস্ত্রি কাজ করতে চায় না। বাসু এতদিন মুনিষ খাটছে, আজও পোড়া-ইট আ-পোড়া ইট চিনল না। কেমন মুনিষ সে? লজ্জা ঢাকার জন্য বাসু রাগ বাড়িয়ে বলে, 'না হে মিস্তিরি, তেমুন চোট লাগে নাই! পা-ট টেনে লিলম যি, খাড়া হয়ে পড়তে পারল কই!'

বলে বটে কিন্তু যন্ত্রণায় তার মাঝারি-গড়নের লম্বা কালো শরীর মোচড় খায়। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এসে ইট-ডোবানো ঘোলা জলের চৌবাচ্চায় ডান পা-টা ডুবিয়ে রাখে। একটু যেন আরাম হয়। 'চাকা' অর্থাৎ সূর্য না-ডোবা পর্যন্ত বাসু কাজ করে।

গাঁয়ে ফেরার পথে পা আর চলে না। বুড়ো আঙুলের ব্যথা কনকনিয়ে হাঁটু পর্যন্ত উঠে আসে। শরীরের ডানদিকটা টনটন করে। রক্তের দাগ নেই কোথাও, তবু বাসুদেবের মনে হয় তার ডান পায়ের পাতার হাড়গোড় থেঁৎলে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে।

বউ মাটির সরায় চুনহলুদ গরম করে। তারপর পুরু করে প্রলেপ দিতে দিতে বলে, 'কেমুন আক্কেল তুমার? জখমী পা-ট লিয়ে এতখানি পথ হেঁটে এলে?'

গরমে ছ্যাঁকা খেয়ে বাসু ডান পা-টা টানাটানি করে, আর বলে, 'কিসে আসব তবে? হালিকপ্তা করে?' হালিকপ্তা অর্থে হেলিকপ্টার। হালে শব্দটা শিখেছে বাসু। তাদের গাঁয়ের দক্ষিণে ক'ক্রোশ হেঁটে গেলে পানাগড়। সেখানে প্রায়ই ওই যন্ত্রটা নামে। নামার সময় খুব নীচু হয়ে গাঁয়ের গাছপালা ছুঁয়ে উড়ে যায়। বাউড়িবাগ দীডোমপাড়ার নেংটা রোগা কালো বাচ্চাগুলো ধুলো-বালি-মাখা ঘাড়মাথা আকাশে তুলে মাঠঘাট ভেঙে পেছনে পেছনে দৌড়ায়। এ-সময় দু'হাত তুলে ভিক্ষেও চায় ওরা। গাঁয়ে যুদ্ধফেরৎ

পা-কাটা লোক আছে একজন। এখন চা-তেলেভাজার দোকান করে। সে বলেছে, যুদ্ধের সময় এরোপ্লেন উড়ে গেলে গাঁয়ের বুকে লজেন্স, বিস্কুট, সিগ্রেটের প্যাকেট ছড়িয়ে যেত। বাচ্চারা সে গল্প শুনেছে। এখন যুদ্ধ নেই তবু কালো কুচ্ছিত নেংটা বাচ্চারা রক্তহীন ফ্যাকাসে হাত আকাশে পেতে 'হালিকপ্তা, হালিকপ্তা' বলে চেঁচায় এবং কিছু প্রত্যাশা করে।

চোটলাগা পা নিয়ে পুরো দু'দিন ঘরে শুয়ে কাটিয়ে দিল বাসু। হাঁটা-চলার ক্ষমতা ছিল না। বউটা গোবর কুড়িয়ে ঘুঁটে দিয়েছিল। বিক্রি করে কিছু চাল কিনল। বাচ্চাগুলো পুকুর থেকে শামুক-গুগলি তুলে আনল, পাথরে ঠুকে খোলা ভেঙে ঝিনুকের শাঁস বের করল, ভাঙা শিবমন্দিরের আনাচ-কানাচ থেকে শাকপাতা যোগাড় করল। এ-সব খেয়ে দু'দিন কাটিয়ে তিনদিনের দিন গা ঝাড়া দিয়ে উঠল বাসুদেব। না বেরুলে আর চলে না।

এখন ভরা বর্ষাকাল তবু বৃষ্টির নামগন্ধ নেই। খরায় পুকুর শুকিয়ে কাঠ, মাঠঘাট ফেটে চৌচির। মথুরবাবুরা ক'টা খেতে জলসেচ করে বীজধান লাগিয়েছিল—সূর্যের দাউদাউ আগুনে ঝলসে গেছে। এবার ফসলের আশা বিশেষ নেই। ফলে গত বছরের ধান-চাল কোথায় অদৃশ্য হচ্ছে। বাজার ঘুরে আড়াই-তিনটাকার কম চাল পাওয়া যায় না। ডাল চিনি কেরোসিনের অবস্থাও তাই। চাষের কাজ বন্ধ থাকায় গাঁয়ের গরীব মুচি বাউড়ি ডোম কাহারের ঘরে রীতিমতো হাহাকার। গাঁ ছেড়ে তারা শহরের দিকে ছড়িয়ে পড়ছে মুনিষখাটার জন্য। মেয়ে-বউরাও যাচ্ছে। ফলে শহরে মুনিষ-কামিনের ভিড়। সকাল-সকাল না গেলে কাজ পাওয়া যায় না। এখানেওখানে ঘুরে খালি হাতে ফিরতে হয়। নয়ত কোনো বাবুর ঘরে আধা-মজুরিতে দিনভর মাটি কাটতে হয়, খোয়া ভাঙতে হয়।

বাসুদেব যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি হাঁটছিল, আর মাঝে মাঝে আকাশে তাকিয়ে সূর্যের অবস্থান লক্ষ্য করছিল। ওই সূর্যই তাদের ঘড়ি, তার আনাগোনা দেখেই সময় নির্ণয় করে তারা। সকালে কাজে

লাগে, দুপুরে খেতে যায়, বিকেলে কাজ বন্ধ করে মজুরির জন্য হাত পাতে। বাসু ঘুম থেকে উঠে পুব আকাশপানে একঝলক তাকিয়েই বুঝেছিল—দেরি হয়ে গেছে। হনহন করে না হাঁটলে কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা নেই। আধখানা ধুতির ওপর ছেঁড়া ময়লা গামছাখানা জড়িয়ে খালি গায়েই মাঠে নেমে পড়েছিল সে আলে আলে গিয়ে পীচের রাস্তায় উঠবে।

পায়ের ব্যথা এখনো সারেনি। হাঁটতে গেলেই খচ্ খচ্ করে লাগছে। বুড়ো আঙুলের নখটা কেমন কালো হয়ে উঠেছে। দু'দিন বাদে উঠে যাবে বোধ হয়। আজ ভারা বেয়ে মাচায় উঠে কোনো কাজ করতে পারবে না বাসু, কুয়োতেও নামতে পারবে না। বসে বসে খোয়া ভাঙতে পারলেই ভালো। অথবা মিহি জাল পেতে বালি চালা। কিন্তু মুনিষ কি তার মনের মতো কাজ পায় কোনো-দিন? মর বাঁচো শালো, বাবু যিটো বুলবে সিটোই তুমাকে করতে হবে!

শহরে ঢুকে রীতিমতো খোঁড়াতে শুরু করল বাসু। ডানপায়ের পাতা ফুলে উঠেছে, পা ফেলতে কষ্ট হচ্ছে। এই খোঁড়া পা নিয়ে কি করে আজ মুনিষ খাটবে সে? বাবুরা টের পেলে রাখতেই চাইবে না! নগদ পয়সা ফেলে ষোলো আনার ওপর আঠারো আনা কাজ চায় তারা। কানা-খোঁড়া দুব্লা লোক তাদের পছন্দ নয়! শক্ত-সমর্থ জোয়ান মরদ কিংবা তরতাজা মেয়েমানুষ চাই। বাসু এটা জানে। সে ঠাট্টা করে বলে, 'বুঝলি বউ, আমরা মুনিষগুলান্ হলাম গে বিয়ের কনের পারা। কনের যেমুন গড়নপিটন মজবুত চাই, মাথায় থুকা থুকা চুল চাই, মুখট চাঁদের পারা চাই, তবে বউ করে লিয়ে যাবে ঘরকে—আমাদেরও তেমনি গায়েগতরে মাস থাকা চাই, হাতের কব্জিগুলান্ চওড়া-চওড়া চাই, চোখের লজরট পরিষ্কার চাই, তবে না বাবুরা পয়সা দিয়ে কাজে লাগাবেক। হাড়-জিরজির কাঠির পারা শরীল দেখলেই হেঁকে বুলবেক, 'ভাগ্ শালো, তু কি কাম করবি! এক টিন্ বালি তুলতেই হেঁদিন্ যাবি, কি হবে রেখে তুকে?'

কখনো কখনো মঙ্গলার হাটের গরু ছাগলের সঙ্গে নিজেদের তুলনা করে বাসু। রবিবারে রবিবারে হাট বসে মঙ্গলায়। চতুর্দিক থেকে গরু ছাগল মোষ আসে বিক্রির জন্য। খদ্দেররা গরুর দাঁত দেখে, ছাগলের পেটের চামড়া টেনে, মোষের শিঙ্ ঘষে শরীর স্বাস্থ্য বয়স পরীক্ষা করে। তারপর দরদাম করে পয়সা মিটিয়ে দড়ি টানতে টানতে নিয়ে যায়। হাড্ডিসার ক্যাংলা গরু-ছাগলগুলো পড়ে থাকে—কেউ কেনে না। মুনিষের বেলাতেও বাবুদের পছন্দটাই আসল কথা। তা বিয়ের কনে বল কিংবা মঙ্গলার হাটের গরু-ছাগল—পছন্দের জন্য তোমাকে দাঁড়াতেই হবে বাবুদের দৃষ্টির সামনে। বাবুরা দেখে-শুনে বহাল করবে। যেখানে মানুষ বেশি কাজ কম—সেখানে কানা খোঁড়া দুর্বল লোক রাখবেই বা কেন! তুমি কিসে কানা হলে, কিসে দুব্‌লা হলে তার খোঁজে বাবুদের দরকার কি!

এইসময় গাঁয়ের লখাই বাউড়ির কথা মনে পড়ে গেল বাসুর। ভরা বয়সের জোয়ান ছোকরা। লম্বাচওড়া মজবুত শরীর। হাতেপায়ে মাংসের ডেলা গুলি পাকিয়ে উঠেছিল। চওড়া বাঁক কাঁধে ফেলে পঁচিশ-দু'গুণে পঞ্চাশটা ইট বইতে পারত এক খেপে। এক ইঞ্চি মোটা লোহার রড্ একটানে বাঁকা করে দিত। কোদালের এক চোটে একতাল মাটি উঠে আসত 'ধত্তি' অর্থাৎ ধরিত্রীর বুক থেকে। তার রোদেঘামে চকচক-করা মাংসপেশীগুলোর দিকে তাকিয়ে বাবুরা বলত, 'হ! শরীল করেছিস বটে তু! কাজ করিয়ে সুখ আছে তুকে দিয়ে।' ছাদ ঢালাই করতে বসে খুঁতখুঁতে ঝানু মিস্ত্রীও বলে উঠত, 'ই মসলা কে মাখছে গো! লখা না-কি? আহা মাখম আসছে গো, মাখম! বাবুর ছাদ হবে লোহার পারা।'

তখন লখার দাম কত, আদর কত!

গাঁয়ের মথুরবাবু ডেকে বলতেন, 'বড় মোষদুটোর হাল নামাব মাঠে। তুই কাল কাজে লাগবি লখা।'

লখা বলত, 'না বাবু, মাপ দেবেন। শহরে ফুরনের কাজ লিয়ে রেখেছি। আগুতে শেষ করতে হবে।'

'তবে পরশু লাগিস।'

'সি বাবু এখুন বুলব না। কাল রেতে শহর থেকে ঘুরে এসে বুলব।'

শহরে ঢুকলে বাবুরা ওকে নিয়ে টানাটানি করত। বাজারের আড়ৎদার গুপী সাহা বলত, 'লখা, এখানে লাগ। আলুর বস্তা এসেছে অনেক। ওজন করে গুদামে তুলতে হবে। মজুরি যা পাস পাবি, আলু পাবি আধসের।'

মহিম কন্‌ট্রাকটরের লোক ছুটে আসত সাইকেল নিয়ে, 'চল লখা, বাবু ডাকছে। ইলেকট্রিক-অফিসের ছাদঢালাই আছে আজ...'

গুপী সাহা তাকে ধমকে উঠত, 'ইস্, ডাকলেই হ'ল! আমার এখানে লেগে গেছে ও। নে লখা, বিড়ি নে, চা খেয়ে নে। নিয়ে লাগ—'

মজুরি তো সেই একই! কিন্তু লখার কাছ থেকে কাজ পাওয়া যায় দ্বিগুণ। সবাই লখাকে ডাকে। বাসু সঙ্গে থাকলে কেউ তার দিকে ফিরেও তাকায় না। লখার তুলনায় তার শরীর স্বাস্থ্য তো তেমন মজবুত না। বাঁকে বিশটার বেশি ইট তুলতে পারে না সে। আড়াই-মণী আলুর বস্তা কাঁধে ফেলে একা একা গুদামের সিঁড়ি ভাঙতে পারে না। বেল্‌চা ঘুরিয়ে ওলটপালট করে ঢালাইয়ের মসলা মাখতে গেলে একটুপরেই হাত অবশ হয়ে আসে। বালি-সিমেণ্ট-পাথরে মিশ খায় না। মিস্ত্রি গালাগাল দিয়ে ওঠে, 'কোথাকার উজবুক বেল্‌চা ধরেছে হে! ছাড়, ছাড়, ছেড়ে গরুর খড় কাটো গে ঘরে বসে।'

তা সেই লখা-ই একদিন কাজ না পেয়ে শহর থেকে ঘুরে ঘুরে আসতে লাগল। বাবুরা তার দিকে ফিরেও তাকাল না। গাঁয়ের মথুরবাবু চোখ উল্টে বললেন, 'তোকে দিয়ে কি কাজ হবে লখা? তুই তো এখন মড়ার সামিল!'

লখা বলল, 'কেনে বাবু, বাঁ হাতট তো রয়েছে। হাল ধরতে পারব, ধান পুঁততে পারব।'

মথুরবাবু শব্দ করে হাসলেন, 'আরে রাম কহো! বাঁ হাতে কি কাজ হয় কোনো?'

লখা বলল, 'গাঁয়ের মাথা বটে আপুনি। আপুনি কাজ না দিলে কে দিবেক? মানুষটো আমি না খেয়ে মরে যাব এজ্ঞে।'

মথুরবাবু হাসিটা ছোট করে আনলেন, 'আমি কি কাজ দেবার মালিক? কাজ দেন ভগবান, আর যে যার কপালে খায়।'

মহিম কনট্রাকটরের কাজ করতে গিয়ে ডানহাতখানা গিয়েছে তার। একটা লম্বা চৌকো বীম্ তৈরির জন্য লোহার মুখগুলো বাঁকা করছিল সে। কোন ফাঁকে একটা ছিটকে সটান ডানহাতের তালুতে ঢুকে যায়। পুরনো জং-ধরা লোহা। হাত ফুটো হয়ে গল গল করে রক্ত ঝরতে থাকে। লখা মুখ বিকৃত করে বাঁ হাত দিয়ে চেপে ধরে ক্ষতমুখ। কে একজন কাছের পানের দোকান থেকে এক খাবলা চুন চেয়ে আনে। তা দিয়ে হাতটা ছেঁড়া ন্যাকড়ায় বেঁধে দেওয়া হয়। একটুপরেই রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যায়।

কিন্তু রাতের দিকে হাত ফুলে ঢোল। সর্বাঙ্গ কাঁপিয়ে জ্বর আসে। গাছপাতার রসে কাজ হয় না। শিবমন্দিরের ফুল এবং সাহাপুরের পীরের দরগার জলপড়াও বৃথা যায়। হাত পচতে থাকে, জ্বর বাড়তে থাকে। শেষপর্যন্ত অচৈতন্য লখাকে বাঁশের খাটিয়ায় তুলে শহরের হাসপাতালে আনতে হয়। সেখান থেকে মাস তিনেক পরে ছাড়া পায় লখাই। কিন্তু তখন তার অন্য রূপ। চোখদুটো গর্তে ঢুকে গেছে—বুকের পাঁজরা গোনা যায়। তার ওপর ডান হাতটা কনুই থেকে বাদ। বাকি অংশ কাঁধের সঙ্গে আলগাভাবে ঝুলছে। মহিম কনট্রাকটর দুঃখ করে বলেন, 'বুনো মোষ ছিলি, এখন যে চামচিকে হয়ে গেলি রে! চেনাই যায় না। আহা, চুক্‌চুক্‌।'

লখাই বলে, 'কাজ দ্যান বাবু।'

মহিম বলেন, 'কি কাজ করবি? এই শরীরে?'

লখাই বলে, 'যেমুন দিবেন। কিছু একটা তো করতে হবে এজ্ঞে! লইলে এ শরীলটও যে থাকবেক নাই!'

মহিম গম্ভীর হয়ে বলেন, 'আজ কাজ নেই। কাল আসিস, দেখব।'

লখা বলে, 'আজ কি খাব বাবু? এদ্দিন হাসপাতালে ছিলম, উয়ারাই চাট্টি চাট্টি দিয়েছে…'

মহিম এবার বিরক্ত হয়ে বলেন, 'তোদের খাবার আবার ভাবনা! পুকুরে শামুক-গুগলি আছে, মাঠে ব্যাঙের ছাতা ইঁদুর আছে। ঢোঁড়া সাপও তো খাস তোরা। খাস না? এ সবের জন্য তো পয়সা লাগে না রে! বেশ মজা তোদের!'

লখা ফিরে আসে। আর যায় না এখন বাজারের আড়ত থেকে কিছু কিছু আলুপটল কিনে আনে লখাই। গাঁয়ের হাটতলায় বসে বিক্রি করে। একহাতে দাঁড়িপাল্লা ধরে ওজন ঠিক করতে অনেক সময় লাগে তার। ব্যস্ত খদ্দেররা তার কাছে যায় না। চেনাজানা মানুষেরা কিছু কিছু কেনে। যেদিন সেটুকুও হয় না, সেদিন নষ্ট-হয়ে-আসা ক'টা আলুপটল সেদ্ধ করে খেয়ে চুপচাপ শুয়ে থাকে। বাসু খোঁজখবর নিতে গেলে দুঃখ করে বলে, 'বেইমান, যত জায়গায় যত বাবু দেখিস—সব শালোরা বেইমান! তুর গায়েগতরে বল থাকলে মিঠামিঠা কথায় ভুলায়ে কাজ আদায় করে লিবেক, একট বিড়ি, এক গেলাস চা, কি এক সিকি বেশি দিয়ে বাড়তি একঘণ্টা খাটায়ে লিবেক। গতরে বল না থাকলে, বুড়ো-হাবড়া হয়ে গেলে কুন্থু শালো ফিরেও তাকাবেক নাই। তুই তো এখুনো কাজকাম করিস বাবুদের ঘরে, হাত-পা-শরীল বাঁচায়ে করিস। শালোদের মিঠামিঠা বাতে ভুলিস না। মুনিষদের শরীলটই সব—ইয়ার বেশি আর কিছু নাই রে!'

লখাই বলে. বলতে বলতে ওর চোখ কখনো রাগেবিদ্বেষে জ্বল-জ্বল করে, কখনো পচামাছের চোখের মতো ঘোলাটে হয়ে ওঠে। ওর কাটাহাতের ঝুলন্ত মাংসপিণ্ড উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপতে থাকে। মাঝে মাঝে কথাগুলো জড়িয়ে যায়। লখাকে একটা বিড়ি দিয়ে উঠে আসে বাসু। কথাগুলো মনে মনে নাড়াচাড়া করতে করতে ঘরে ফেরে।

একবর্ণও তো মিথ্যে বলে না লখাই। মুনিষ-কামিন-মাহিন্দারের

জীবনে সবই সত্যি। সাংঘাতিকভাবে সত্যি। লখা নিজেই তো তার জ্বলন্ত উদাহরণ। বাসু নিজেও বিশ্বাস করে না বাবুদের। এক একটা বাবুকে তার এক একটা ঠগী বলে মনে হয়। বিশেষ করে বাবুরা যখন ন্যাকা ন্যাকা গলায় বলে, 'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানছিস কেন রে বাসু। পয়সা নিচ্ছিস—একটু দরদ দিয়ে কাজ কর বাবা।' তখন বাসুর হাসি পায়। হাসি পায় ওই দরদের কথা শুনে। পয়সা দিচ্ছ, গতরে খেটে উসুল দিচ্ছি। এর মধ্যে দরদের কথা কেন! কিসের দরদ? কার জন্য দরদ? তোমার বাড়ি হবে, বাগান হবে, গুদামবোঝাই আলু থাকবে, চিনি থাকবে—আমার তাতে কি! আমার মাথা ফাটল, পা ভাঙল, বুকে চোট লাগল—দেখতে আসবে তুমি? ও সব দরদফরদ কিছু লয় বাবু!

এইসময় নিজের পা নিয়ে বড় দুশ্চিন্তা হয় বাসুর। আরো বেশি খোঁড়াতে শুরু করেছে সে। কাল রাত্রে তো এমন ব্যথা ছিল না। সকালেও টের পায়নি কিছু। এখন একটু হাঁটাহাঁটিতেই টনটনিয়ে উঠছে কেন এত? পা-টা যদি না সারে, যদি চিরকাল এমন খুঁড়িয়ে চলতে হয় তাকে, অথবা যদি লখার মতো হাঁটু থেকে কেটে বাদ দিতে হয়—ভাবতেও শিউরে ওঠে বাসু! দাঁড়িয়ে পড়ে ডান পা-টা সামনে বাড়িয়ে ধরে নীচু হয়ে দেখে। একটু যেন ফোলা ফোলা লাগছে। আজ আবার চুনহলুদ লাগাতে হবে গরম করে।

বাসু পেট্রল পাম্প ছাড়াতে না ছাড়াতে তার সামনে দিয়েই দু'জন কামিন পার হয়ে যায়। বয়স বেশি না। কালো সতেজ ডাঁটালো শরীর। যেতে যেতে বাসুর দিকে ক'বার তাকিয়ে যায়। বাসু ভালো করে চিনতে পারে না। হয়ত আগে কোথাও কাজ করেছে একসঙ্গে, হয়ত বালি তুলেছে নদীর বুক থেকে, কিংবা পুকুর কেটেছে সরকারবাবুদের। চেনা চেনা লাগছে—তাই তাকিয়ে গেল।

কিন্তু ওরা এগিয়ে যেতেই বাসু উদ্বিগ্ন হয়ে আরো জোরে জোরে পা ফেলে। কাজের জায়গাগুলোতে ওদের আগে গিয়ে ঢুঁ মারা চাই। ওরা তার প্রতিদ্বন্দ্বী। বাবুরা মেয়েমানুষ দেখলে পুরুষ বেশি রাখতে

চায় না। একে কামিনের মজুরি আট আনা কম, তার ওপর কোনো কোনো বাবুর কামিনদের দিকে একটু আলাদা টান তো আছেই! কামিনের মজুরি আট আনা কম কেন, দিনভর খেটে সে তিন টাকা পেলে তার বউ আড়াই টাকা পাবে কেন - এ নিয়ে বাসু মাঝে মাঝে চিন্তা করে। বাবুরা অবশ্য যুক্তি দেখায়, 'উয়ারা বিটিছেল্যা বটে যে। ভারি ভারি কাজ করতে লারবেক। লরম শরীল লরম দেখে কাজ দিতে হবেক! মুনিষের সমান মজুরি দিলে পোষাবেক কেনে!' বাবুরা বলে কিন্তু মানে না। সব রকম কাজই করায় কামিন দিয়ে। ঢালাইয়ের মসলা মাখায়, লোহা বাঁকা করায়, পাথর ভাঙায়। আট ঘণ্টা সমানে মুনিষের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে খাটে ওরা। অথচ মজুরি আট আনা কম! বাবুদের তাই কামিন বড় পছন্দ। পয়সার দিকে লাভ, চোখের দিকে সুখ। ভরযুবতী মেয়েমানুষ, অন্নের টানে বেরিয়ে এসেছে গাঁ-ঘর থেকে, পরনে খাটো কাপড়, না সায়া না ব্লাউজ, ঝুঁকে পড়ে যখন মসলার কড়াই তোলে—বাবুদের চোখের দৃষ্টি উসখুস করে। বাসু টের পায়। কম দিন তো মুনিষ খাটছে না সে। সেই কবে থেকে বাপের সঙ্গে পায়ে পায়ে মুনিষ খাটতে যেত শহরে। বাচ্চা বলে মোটে দশ আনা মজুরি পেত তখন। বাপের ছিল পাঁচসিকে, মা খাটত এক টাকায়। সেই তখন থেকেই বাবুদের স্বভাব-চরিত্রের সঙ্গে জানাশোনা। এখন চোখের দিকে তাকালেই বুঝতে পারে বাবুর দৃষ্টি কাজের দিকে না কামিনের দিকে। অকারণেই গলা খাঁকারি দিয়ে বলে ওঠে, 'হেই, হেই, অত ঝুঁকিস না, হড়কে যাবি!' আসলে সতর্ক করে দেয় কামিনকে। বুকের আঁচল ভালো করে টানতে বলে।

কিন্তু সবাই কি আর সতর্ক হয়? পয়সার লোভ বড় লোভ। অভাবী ঘরের হা-পিত্যেশ করা মানুষের কাছে তো বটেই। বাবুরা টোপ ফেললে হাঁ করে গিলে নেয় কেউ কেউ। দু'চারদিন ফুর্তিফার্তা করে। তারপর বাবুদের শখ মিটলে মিস্ত্রিদের হাতে। শেষ কালে খারাপ অসুখ বাঁধিয়ে হাতে-পায়ে নুলো হয়ে ভিক্ষে করা। বাসু কত

দেখেছে এমন। তাদের গাঁয়ের গোপালের বোন বাসিনীই তো প্রথমে মথুরবাবুদের তারপর মহিম কনট্রাকটরের মিস্ত্রিগুলোর মুখের খাবার হয়ে এখন চোষা আমআঁটির মতো শরীর নিয়ে দুর্গাপুরের বাজারে গিয়ে ঘর বেঁধেছে। এতদিনে মরেছে কি বেঁচেছে কেউ খবর রাখে না। বাসিনীর কথা উঠলে গোপালের চোখে এখনো আগুন জ্বলে। হাতের আঙুলগুলো শক্ত হয়ে যায়। গাঁয়ের বাবুদের কতটা দোষ, তার বোনেরই বা কতটা দোষ—এখনো স্থির করতে পারে না বলেই যেন কঠিন দৃষ্টিতে চুপ করে তাকিয়ে থাকে। কিন্তু কাজের জায়গায় কোনো কমবয়েসী কামিনকে কখনও একটু বেসামাল হতে দেখলে দাঁতে দাঁত চেপে চাপাগলায় ধমকে ওঠে, 'এই-ও, মরণপাখা গজিন্‌ছে তুর! দুদিন বাদে ভাগাড়কে যাবি. শ্যাল শকুনে ছিঁড়ে খাবে! খেয়াল রাখিস!' এ সব দেখেশুনেই বাসু তার বউকে শহরে আসতে দিতে চায় না। বলে, 'গাঁয়ে থেকে খেতেখামারে কাম কর তুই। চেনাজানা মানুষ বটে সবাই। লজর রাখবেক। মথুরবাবুদের ঘরকেও যাবিনে একা একা! বাবুদের দিষ্টি ভালো লয়, আমি ছুটকাল থেকেই জানি!'

তা বাসুর বৌ এখন আর কোথাও দিনভর কাজ করতে পারে না। বাচ্চাকাচ্চা ঘরসংসার নিয়ে বেসামাল। চাষের সময় ক'দিন জোর করে মাঠে নামে। কাদাজলে দাঁড়িয়ে ধান পোঁতে, হেমন্তে ধান কেটে বাবুদের খামারে তুলে দেয়। অন্য সময় শাকপাতা কুঁচোমাছ শামুক-গুগলির ধান্দায় ঘোরে।

বাসু হাঁটতে হাঁটতে কামিন দু'জনকে লক্ষ্য করে। কোন্‌দিকে যায়? তার কাজের থানে গিয়ে গতর দেখিয়ে মুচকি হেসে দাঁড়িন্ যাবে না তো? বাসু জোরে জোরে পা ফেলে ওদের পার হয়ে যায়। আগে গিয়ে দাঁড়াতে হবে তাকে। খোঁড়া মানুষটাকে একপাশে কাৎ হয়ে কোলা-ব্যাঙের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটতে দেখে কামিন দু'জন হেসে উঠে নিজেদের মধ্যে কি যেন বলাবলি করে। বাসু গ্রাহ্য করে না। পুরনো কাজের জায়গায় এসে থমকে দাঁড়ায়। দু'দিন আগে

এখান থেকেই পা থেঁৎলে ফিরে গিয়েছিল সে। বাড়ি তৈরির কাজ হচ্ছে। জানালা বরাবর দেয়াল গাঁথা দেখে গিয়েছিল বাসু। এখন বাঁশ-পাটায় জানালার ফোকড়গুলো ঢেকে লিণ্টেল ঢালাই করা হয়ে গেছে। নতুন ঢালাইয়ের সিমেণ্ট ভোরের রোদ্দুরে চকচক করছে। কষ্ট হলেও আর খুঁড়িয়ে হাঁটে না বাসু : যেন পরিপূর্ণ সুস্থ মানুষ, হাতেপায়ে কোথাও কোনো খুঁৎ নেই, এমনভাবে দাপিয়ে পা ফেলে বালির স্তূপের উপর দাঁড়ায়। ছাতামাথায় বাবু দাঁড়িয়ে আছে—খোঁড়ানোর কোনো উপায় নেই তার। বাবু আছে, মিস্ত্রিও আছে দু'জন, কিন্তু কাজের কোনো তোড়জোড় নেই দেখে বাসুর মুখ শুকিয়ে ওঠে। পিটপিট করে চারদিকে তাকায় সে। কই, মুনিষ-কামিনরা কই? মাচা বাঁধা হচ্ছে না কেন? চৌবাচ্চায় ইঁট ভেজানো নেই কেন? বাসু বালিতে আরও পা ডোবায়, বিশেষ করে চোট-লাগা পা-টা। নরম বালির তলায় ব্যথার পা-টা যেন একটু আরাম পায়। কাৎ হয়ে মিস্ত্রির দিকে তাকায়। টাকমাথা লুঙ্গি-পরা মিস্ত্রিটা বলে, 'কেনে এলে হে? কাজ বন্ধ ইখানে—'

শুনে বাসু হাঁ করে দম টানে, 'কেনে? বন্ধ কেনে?'

মিস্ত্রি বলে, 'বাবু সিমেণ্টের লেগে ঘুরে এল। বাজারে সিমেণ্ট নাই—কিসে কাজ হবে?'

বাসু বলে, 'তা, তুমাদের গাঁথনির কাজ না থাক, অন্য কাজ তো আছে। খোয়া ভাঙতে হবে না? বালি চালতে হবে না? মেঝের গত্তো মাটি ভরাট করতে হবে না?'

বাবু ঘুরে তাকায় এতক্ষণে। পায়ের ব্যথায় বাঁদিকে কাত হয়ে গিয়েছিল বাসু, টানটান হয়ে দাঁড়ায়। বলে, 'কাজ নাই কুনো?'

বাবু ঘাড় নাড়ে, 'নেই! কাল আসিস।'

বাসু আঙুল তুলে লিণ্টেল দেখিয়ে বলে, 'জল দিতে হবেক নাই? লতুন ঢালাই বটে বাবু, জল না দিলে ফেটে যাবেক যে!'

বাসুর কথা শুনে বাবু হাসে, 'ফাটবে কি ফাটবে না, আমি বুঝি না? নতুন বাড়ি করাচ্ছি? দেখ হে মিস্তিরি, মায়ের চেয়ে কেমন

নাসীর দরদ বেশি।'

মিস্ত্রি দু'জন কথা বলে না, বাসুর দিকে তাকিয়ে হাসে। বাসু যেন লজ্জা পেয়ে যায়। মাথা নামিয়ে বলে, 'না বাবু, জানবেন না কেনে! আপনারা লিখাপড়া-জানা পণ্ডিতমানুষ বটেন। সকলই জানেন এজ্ঞে—'

বাবু দৃষ্টি তীক্ষ্ণ করে বাসুর মুখ দেখে। কথাগুলো আন্তরিক না শ্লেষ, বোঝার চেষ্টা করে। আর বাসু করুণ নজরে দেখে, বছর দশ-বারোর একটা ছেলে টিনে জল টেনে আনছে পুকুর থেকে। জলের ভারে তার ছোট শরীর একদিকে বেঁকে গেছে, চোখ ঠেলে আসছে, ঠোঁটের ফাঁকে জিব্ বেরিয়ে পড়েছে। বাসু বুঝতে পারে, লিণ্টেলে জল দেওয়ার জন্য বাচ্চাটাকে বহাল করেছে বাবু। দিনভর কাজ করবে। কিন্তু নাবালক বলে মজুরি পাবে অর্ধেক—অর্থাৎ দেড়টাকা।

বাসু বালি থেকে পা তুলতে থাকে। এতক্ষণ ঠাণ্ডায় ছিল, ব্যথাটা তেমন মালুম হচ্ছিল না। ওপরে টেনে তুলতেই বাতাসের স্পর্শ পায়। নখের ডগা থেকে হাঁটু পর্যন্ত চনচনিয়ে ওঠে। বাসু মুখ বিকৃত করে বলে, 'তাহলে যাই বাবু। অন্য কুথাও দেখি…'

বাবু কিছু বলে না। বলার কি গরজ। বাসুরা এল কি গেল, কি এসে যায় তাতে। এখন সিমেণ্ট আক্রা, চুন আক্রা, ইট আক্রা, কিন্তু মুনিষ কামিন সস্তা। কাজে হাত দিতে না দিতে সার বেঁধে ছুটে আসে সব! গাঁ-ঘরের কচি মেয়ে থেকে বউ বাচ্চা জোয়ান মরদ বুড়োবুড়ী। যেন বাড়িঘর নয়, লঙ্গরখানা খোলা হ'ল। এসেই ঘ্যানঘ্যান শুরু করে। কাজ নাই কুন? কাজ? তখন দলের মধ্যে থেকে দেখে-শুনে পছন্দ করে নিলেই হ'ল। বাসু রাস্তায় নেমে আবার সূর্য দেখল। চারপাশে তাকিয়ে গাছপালা বাড়িঘরের মাথার রোদের উজ্জ্বলতা পরখ করল। বেলা অনেক হয়ে গেল। যার যেখানে কাজে লাগার কথা লেগে গেছে—বাসুর জন্য কেউ কি রেখেছে কোনো কাজ!

এইসময় মিস্ত্রিদুটোর ওপরও রাগ হয়ে গেল বাসুর। ওরা ইচ্ছে

করলেই বাবুকে বলে কাজে লাগিয়ে দিতে পারত বাসুকে। বলতে পারত, 'বাবু, বালি ক'টা চালিন্ রাখুন, ইটগুলান্ বয়া করান, ভারা-ট বেঁধে রাখুন…'

বললে বাবু কি অমত করত? বাসু তো জানে, মিস্ত্রিদের কথা বাবুরা কত শোনে। মিস্ত্রি যদি বলে, 'এ ইটে কাজ হবে না বাবু, নুটুবাবুদের ইট লিয়ে আসুন—' বাবু তৎক্ষণাৎ নুটুবাবুর ভাঁটায় ছোটে। মিস্ত্রি যদি বলে, 'এ মোটা বালি কেনে আনালেন বাবু? শঙ্করাকে বলে ছান মাঝারিট দিবেক।' বাবু তখন শঙ্করাকে খোঁজে। মহিমবাবুর মতো ঝানু কিছু কনট্রাকটর ছাড়া সব বাবু তো জানে না, নুটুবাবুর সঙ্গে, শঙ্করার সঙ্গে তলে তলে একটা ব্যবস্থা আছে মিস্ত্রিদের। টাকায় পাঁচ পয়সা কমিশন পায় তারা। তার ওপরই ইটের পোড়া আ-পোড়া, বালির মিহি-মোটা নির্ভর করে। তা এই মিস্ত্রিরা ইচ্ছে করলে মুনিষকামিনের কাজও দিতে পারে। বাবুকে যদি বলে, 'আজ দু'জনা বাড়তি কামিন চাই বাবু, লইলে কাজে ঢিলা পড়বেক।' বাবুরা অমনি ঘাড় কাত করে বলে, 'নিয়ে নাও! কাজে ঢিলা দিলে চলবে না!' আবার মিস্ত্রি যদি বলে, 'এ মুনিষটকে ছাড়াইন্ ছান তো বাবু! ভারি আবাগু বটে, এক বুললে আরেক শুনছে, কাজের কুন যুৎ নাই!' অমনি বাবু একবেলার অধেক মজুরি মিটিয়ে বিদায় করে তাকে। বাসু সবই জানে। এ কারণে মিস্ত্রিদের চটিয়ে কোনো কাজ করে না সে। চাইবামাত্র খুঁট থেকে বিড়ি বের করে দেয়। চা আনতে বললে দৌড়ে দোকানে যায়। বাবুরা সব-সময় তো থাকে না কাজের জায়গায়। দেখে-শুনে দায়িত্ব নিয়ে মিস্ত্রিরাই অনেকসময় সবকিছু করে। তারা মুনিষ নয়, তাদের মজুরিও বেশি। বাসুরা তাদের খুব একটা আপনজন ভাবে না। মনে মনে ঈর্ষা করে, ভয়ে ভয়ে খাতিরও করে।

তা ওই টাকমাথা মিস্ত্রিটাকেও তো কম করে আধ ডজন বিড়ি খাইয়েছে সে এই ক'দিনে। পরিবর্তে তার জন্য বাবুকে কি একটু বলতে পারত না? ওই বাচ্চাটাকে লাগিয়েছে। কে জানে, টাকায়

ক'পয়সা আদায় করবে ওর কাছ থেকে। মিস্ত্রিকে টাকায় ছ'আনা কবুল করে নিজেও অনেকবার কাজে লেগেছে বাসু।

খেলার মাঠের ধারে মহিম কনট্রাকটরের কাজ হচ্ছিল। একটা বড় কোল্ড স্টোরেজ তৈরির কাজ। খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সেখানে যায় বাসু। বলে, 'বাবু, কাজ নাই কুন?'

মহিমবাবুর লোক মেজাজ দেখায়, 'কোথাকার লাটসাহেব বটে হে? বেলা ন'টায় কাজে লাগতে এলে!'

বাসু বলে, 'না বাবু, ন'টা বাজে নাই এখুনো।

'বাজে নাই? কি করে জানলি? ক'টা ঘড়ি পরেছিস হাতে?'

বাসু কষ্টের হাসি হাসে, 'মুনিষ বটে বাবু, প্যাটে ভাত জুটে না ঘড়ি কুথাকে পাব? ওই—ওটই আমাদের ঘড়ি বটে।' ঘামে-ভেজা ক্লিষ্ট মুখখানা উঁচু করে প্রকাণ্ড কাঁসার থালার মতো টকটকে সূর্যটা দেখিয়ে দেয় বাসু। তারপর করুণ গলায় মিনতি করে, 'আপুনাদের এতবড় কাজ চলছে বাবু, স্থান কেনে কুথাও লাগিন্! সব কাজই তো জানি আজ্ঞে আমি।'

মহিমবাবুর লোক বলে, 'মজুরি লাগবে না? বিনে পয়সায় খাটবি? তবে লাগ—লেগে যা!'

তার কথা শুনে কারা যেন খিলখিল করে হেসে ওঠে। মেয়েমানুষের গলা। বাসু ঘুরে তাকায়। রাস্তার সেই কামিনদুটো। এখানে এসে লেগেছে। মাথায় মসলার কড়াই নিয়ে ভারায় ওঠার আগে দাঁড়িয়ে পড়ে বাসুকে দেখে হাসছে। বাসুর মাথাটা হঠাৎ গরম হয়ে ওঠে! একে তো ওরা কাজ পেয়েছে, বাসু পায়নি, সকাল থেকে ঘুরে ঘুরে নাজেহাল, তপ্ত ভাদুরে রোদে তার চাঁদি গরম, পিঠের চামড়া পুড়ে যাচ্ছে, ব্যথায় পা টনটন করছে, তার ওপর মহিমবাবুর লোকটার ওই রসিকতা, মেয়েমানুষদুটোর এই হাসি।

বাসু প্রায় খিঁচিয়ে ওঠে, 'হাসছ কেনে তুমরা? এঁ্যা? হাসির কি হ'ল? আমি কি সঙের নাচ নাচতে এলম?'

বাসুর ধমক খেয়ে কামিনদুটো চুপ করে যায়। ফোলা ফোলা

মুখ করে বাসুকে দেখে। তারপর একজন বলে, 'মরণ! তুমাকে দেখে হাসব কেনে। আমরা হাসছি ওই—ওট দেখে।'

বাসু চোখ তুলে ওপরের দিকে তাকায়। মাচার ওপর রাখা মিস্ত্রিদের কারো একটা জামা বাতাসে উড়ে বাঁশের ডগায় আটকে পতপত করে উড়ছে। মিস্ত্রি ঝুঁকে পড়ে গজকাঠি দিয়ে সেটা টেনে আনার চেষ্টা করছে তার মুখে 'হ-হ-হ-হ' অদ্ভুত শব্দ করছে। এটা হাসির কোনো ব্যাপার না, কোনো মুনিষ হাসছেও না, কিন্তু কামিনছুটোর হাসি দেখ, যেন মঙ্গলার হাটে রঙচঙে জামা-পরা নাচুনে বাঁদরের বিয়ে-সাদির খেল্ দেখছে ওরা। বাসুর তেমন বিশ্বাস হয় না। চোখ ছোট করে আবার সে কমবয়েসি কামিনছুটোর ডাগর কালো মুখ দেখে। তারপর রাস্তায় নেমে পড়ে। হাসি-মস্করা দেখলে তো দিন যাবে না তার, কাজ চাই। যে কোনো একটা কাজ। ওরা কাজ পেয়েছে, দিনশেষে মজুরি পাবে, পেটে ভাত পড়বে, খুশিতে তাই খিলখিলিয়ে হাসছে—বাসুর কেন তা ভালো লাগবে! উপোসি মানুষ কি রঙ্গ-তামাসা দেখতে যায়?

বাসু হাঁটে। পায়ের ব্যথা বাড়ে। পিঠের চামড়া পুড়তে থাকে। পেটটা পাক খায়। সকাল থেকে এক গেলাস চা-ও জোটেনি আজ। কোথাও কাজে লাগলে এতক্ষণে একটু চা খেত বাসু। সঙ্গে পাঁচ পয়সার একটা নানখাটাই বিস্কুট। খেয়ে বিড়ি ধরাত।

বাসু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আড়তে যায়। কাজ নেই। দু'জন লেগে পড়েছে। একজন শুকনো মুখে আলুর বস্তার ওপর বসে আছে। সম্ভবত ও-বেলা কাজ পাওয়ার আশা পেয়েছে। আরো ক'জন শুকনো মুখে এদিকে ওদিকে ঘোরাঘুরি করছে। তাদের মধ্যে গাঁয়ের কার্তিককে যেন দেখতে পায় বাসু। এককালে বিঘা চার জমি ছিল। নিজের জমি নিজের হাতে চাষ করত। এখন জমিটা মথুরবাবুর পেটে গেছে। কার্তিক মুনিষ খাটে। সম্ভবত কাজ পায়নি। কেমন মনমরা হয়ে হেঁটে যাচ্ছে। বাসু তাকে ডাকল না। কি হবে ডেকে? এখন যে যার নিজের ধান্ধায় ঘুরছে। কার কষ্ট কে দেখে!

কোথায় যেন মাইক বাজছে। হিন্দীগানের সুর আর ঝমঝমাঝম বাজনার রেশ পাওয়া যাচ্ছে। বিয়েটিয়ে, না-কি বাবুরা থেটার-কেটার করবে? বাসু উৎসুক হয়। কাজ পাওয়া যেতে পারে তাহলে। সূর্য এখন অনেক দূর উঠে এসেছে। বাসু এখন ডুবন্ত মানুষ, খড়-কুটো যাই ভেসে যাক ধরবার জন্য হাত বাড়ায়। শুধু তো নিজের পেট না, ঘরে বউবাচ্চারা চালের জন্য হাঁ করে বসে থাকবে। কাল সারাদিন বলতে গেলে আধপেটা খেয়ে আছে সবাই। আজ ফেরার পথে চাল কিনলে রাতে হাঁড়ি চাপবে—

বাসু শব্দ অনুসরণ করে এগুতে থাকে। এ-বাঁক নিলে মনে হয় ও-গলি থেকে আসছে, ও-গলিতে ঢুকলে মনে হয় পেছনে কোথায় ফেলে এল। বাসু পরিষ্কার বুঝতে পারে না। আসলে কানেও একটু খাটো সে। শেষ পর্যন্ত একটা খোলামেলা মাঠের কাছে পৌঁছে যায় বাসু। চারদিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে এটা দুর্গামন্দিরের মাঠ। একবার ভারা বেঁধে কাজ করে গেছে ওই মন্দিরে; আর একবার এসেছিল কুয়ো ঝালাতে। মন্দিরের পাশেই বাচ্চাদের স্কুল। মাইকের চোঙটা স্কুলের ছাদের ওপর। বারান্দায় সতরঞ্চি বিছিয়ে ক'জন ছোকরাগোছের বাবু গ্রামোফোন বাজাচ্ছে আর সিগ্রেট ফুঁকছে। তাদের কারো পরনে পাজামা, কারো সরু প্যাণ্ট, রঙবেরঙের জামা, ঝাকড়া-মাকড়া চুল, লম্বা লম্বা জুলপি।

হতাশ হয় বাসু। ঘামে ভেজা মুখখানা আরো চুপসে যায়। এখানে কি কাজ হবে! কি কাজ হতে পারে? বাসু তবু খোঁড়া-পা সোজা করে বারান্দার কাছাকাছি যায়। এসেছে যখন একবার জিজ্ঞেস না করে কি ফিরে যাবে? ভিখিরি তো নয়, হাত পেতে কাঁদুনি গেয়ে ভিক্ষা চাইছে না তো কারো কাছে! গতরে খেটে কাজ করবে, চাকা ডুবলে পরিশ্রমের পয়সা বুঝে নিয়ে ঘরে ফিরবে। জিজ্ঞেস করতে দোষ কি!

বাসু কিছুটা মরিয়া হয়েই বারান্দার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ডাকে, 'বাবু!' কেউ সাড়া দেয় না। বাতাসে সিগ্রেটের ধোঁয়া ওড়ে,

নিমগাছের ডালে কাক ডাকে, স্কুলের ছাদে মাইকের চোঙা থেকে ঝমঝমাঝম বাজনার তাণ্ডব চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। ছোকরাবাবুদের কেউ গ্রামোফোনে দম দেয়, কেউ দেশলাই ঠুকে মেঝেতে তাল দেয়, কেউ আধশোয়া হয়ে সরু ঠোঁটে শিস্ বাজায়। বাসুর পা টনটন করে, মাথা ঝিমঝিম করে, পেটের পাকস্থলীতে মোচড় দেয়। বাসু আবার ডাকে, 'বাবু—'

যে শিস্ দিচ্ছিল সে ঘাড় কাত করে তাকায়। বিরক্তিতে তার কপাল-ভুরু কুঁচকে ওঠে, চোখে রাগের লক্ষণ ফোটে। যেন একটা লোম-ওঠা ঘেয়ো কুকুর উঠে এসেছে গান-বাজনার আসরে। এখুনি পাছায় একটা শট্ ঝাড়তে পারলে ঠিক হয়! কিন্তু সে আধশোয়া, কষ্ট করে উঠবে না! এমন কি, কিছু বলার অবসরও নেই। সে ঠোঁট সরু করে শিস্ বাজাচ্ছে! বাসু তার দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে বলে, 'বাবু কাজ আছে কুন? আমি মুনিষ খাটি এজ্ঞে…'

তবু সে কিছু বলে না, ভুরু কুঁচকে তাকিয়ে তাকিয়ে শিস বাজায় আর মাথা দোলায়। এই দোলানিটা গানের তাল না বাসুর প্রশ্নের উত্তর—বাসু বুঝতে পারে না। আর কিছু জিজ্ঞেস করতেও সাহস হয় না বাসুর। এসব ছোকরাবাবুদের মতিগতি ভালো না। কথায় কথায় রেগে ওঠে। চড় চাপড় কষিয়ে দেয়। গতবার এক কালীপুজোর প্যাণ্ডেল বাঁধতে গিয়ে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে বাসু। ওদের সে এখন ভয়ে ভয়ে এড়িয়ে চলে। সিঁড়ি থেকে বাসু নেমে আসে।

তখন কে ডাকে, 'এই শালা…'

বাসুর হৃদপিণ্ড দপ্ দপ্ করে। ডাকে কেন? কাজ আছে? বাসু আশানিরাশায় দুলতে দুলতে শুকনো মুখখানা ঘুরিয়ে ধরে।

'কাজ করবি? লাগ শালা, লেগে যা।' সেই শিস্-দেওয়া বাবুটিই এবার উঠে বসে হুকুম করে, 'ইট নিয়ে আয়। এনে জড়ো কর ওই নিমতলায়।'

বাসুর নুয়ে-পড়া শরীরটায় হঠাৎ যেন বলের সঞ্চার হয়। মুখটা

চকচক করে ওঠে। মাথা ঘুরিয়ে চারদিকে তাকায়, 'ইট কুথা বাবু?'

'ওই বাড়ির ধারে আছে, নিয়ে আয়।'

বাসু কোমর থেকে গামছা খোলে। কাপড়টা হাঁটুর ওপর আরো অনেকখানি তুলে কোমরে গোঁজে। তারপর ইটের সন্ধানে যায়। তার পায়ের ব্যথা যেন অনেক কম মনে হয় এখন। কাজ পাওয়ার কোনো আশাই ছিল না, তবু যা-হোক একটা কাজ তো পাওয়া গেল। দু'চার বাঁক ইট বয়ে পয়সা চাইবে বাবুদের কাছে। একটু চা খাবে।

একটা বাড়ির দেয়াল-ঘেঁষে থাকে থাকে ইট দেখে বাসু ঘুরে আসে। বলে, 'বাবু বাঁক নাই? বাঁক?'

কেউ শোনে না।

'বাবু একট ঝুড়ি টুড়ি?'

'ধেৎ শালা!' কে যেন ধমকে ওঠে, 'তখন থেকে ঘ্যানঘ্যান শুরু করেছে! বাঁক-ফাঁক নাই, হাতে করে আনতে পারিস আন, না তো কেটে পড়, অন্য লোক লাগাব আমরা।'

বাসু আর কথা বলে না। শঙ্কিতভাবে চারদিকে তাকিয়ে দেখে অন্য লোক হাজির আছে কিনা! না থাকলেও এসে যেতে কতক্ষণ! বাসু আবার বাড়িটার দিকে এগিয়ে যায়। তার কি? বাঁক হলে বিশ-পঁচিশটা ইট আসত একসঙ্গে। তাড়াতাড়ি কাজ হত। এখন সে হাতে ঝুলিয়ে দুটো দুটো করে ইট বইবে সারাদিন! বাবুরা বসে বসে গান বাজাক, সিগেরেট গিলুক, তাল ঠুকুক! দিনের শেষে বাসু পুরো মজুরিটা পেলেই হ'ল—

কিন্তু ইটে হাত দিয়ে বাসুর মুখ কালো হয়ে ওঠে। চিমনি-ভাঁটায় পোড়ানো বালিমাটির কাঁকরমেশানো খরখরে ধারালো ইট। জলে ভিজলে ওপরের বালিকাঁকর ঝরে গিয়ে নরম হয়, শুকনো অবস্থায় তুলতে গেলে মুনিষের কড়া শক্ত আঙুলের ডগাও ঘষা খেয়ে-খেয়ে ফেটে যায়, রক্ত ঝরে। বাসু ইটে হাত দিয়ে অল্পকাল চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। আর বাঁক কিংবা ঝুড়ি চাইতে যাওয়ার সাহস

হয় না। যা মেজাজ বাবুদের! যদি তাড়িয়ে দেয়! আবার লখার কথাও মনে পড়ে, 'শরীল বাঁচায়ে কাজ করবি, মুনিষের শরীলটই সব।' কিন্তু সবসময় কি বাঁচানো যায়? যখন কাজ কম, মুনিষ বেশী, তখন দু'দশদিন পরের ভাবনার চেয়ে সেদিনের পেটের ভাবনাই কি বড় হয়ে ওঠে না! বাসু নীচু হয়ে হাতে ইট তোলে।

আর তখনই কি হয়, বাড়ির ভেতর থেকে মোটা মাঝবয়েসি একটা লোক ছুটে এসে কঁ্যাক করে বাসুর ঘাড় চেপে ধরে, 'শালা! ইট কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস? কার হুকুমে ছুঁয়েছিস আমার ইট?'

বাসুর দু'হাত থেকে দুটো ইট পড়ে গিয়ে ভেঙে যায়। কিছু বুঝতে পারে না সে। ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে বলে, 'বাবুরা যি বুললে!'

'কোন্ বাবুরা?'

বাসু মাথা ঘোরাতে পারে না। লোকটা তখনও লম্বা-আঙুলে শক্ত করে ধরে রেখেছে তার ঘাড়। কণ্ঠনালীতে চাপ পড়ে দম আটকে আসছে। বাসু হাতটা পিঠের দিকে ঘুরিয়ে বারান্দা দেখায়। বলে, 'হুই বাবুরা। ঘাড়ট ছাড়ুন আজ্ঞে, ছেড়ে শুধিন্ আসুন!'

'হুঁ, চল দেখি।'

ঘাড়ে হাত রেখেই বাসুকে প্রায় ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে আসে লোকটা। বাসু আগে আগে হোঁচট খেতে খেতে আসে। তার পায়ের ব্যথা আরো বেড়ে যায়। ঘাড়ের শিরাগুলো দপদপ করে। লজ্জায় অপমানে বুকের ভেতরটা মোচড় খায়। চোখ ফেটে জল আসে।

বারান্দার কাছে এসে বাসু প্রায় কাঁদকাঁদ হয়, 'বাবু—'

বাবুরা গান-বাজনায় মত্ত, তেমন খেয়াল করে না। ঘাড়-ধরা লম্বা মোটাসোটা মানুষটা চেঁচিয়ে বলে, 'তোমরা এই শালাকে ইট নিতে বলেছ?'

একজন একপলক তাকিয়ে জবাব দেয়, 'বলেছি। দিয়ে দিন!'

লোকটা এবার বাসুর ঘাড় ছেড়ে দেয়। বিরক্ত হয়ে নিজের মনেই গজগজ করে, 'তা তোমরা যখন বলেছ, দিতে হবে। না দিলে

কি পাড়ায় বাস করতে পারব আমি! কিন্তু যা দেই তা যে আর ফেরৎ আসে না ভাই…'

সেই শিস্ দেওয়া ছোকরাবাবুটি চোখ তুলে কটমট করে তাকায়, 'দেখে-শুনে ফেরৎ নিয়ে গেলেই পারেন। আমরা তো কিছু খেয়ে ফেলি না! এখন যান, ইট দিয়ে দিন।'

মানুষটা তবু কিছুক্ষণ দাঁড়ায়। কি যেন ভাবে। তারপর মিনমিন করে বলে, 'বিকেলে মিটিঙের জন্য তো তক্তপোশ চেয়েছ একখানা। আবার ইট দিয়ে কি হবে?'

'শহীদ বেদী হবে!'

'অ!' ইটের মালিকের মুখ লম্বা হয়ে ঝুলে পড়ে। আর কিছু বলে না সে। আস্তে আস্তে নিজের বাড়ির দিকে ফিরে যায়। বাসুও যায় পেছনে পেছনে। দরজার কাছে এসে লোকটা ঘুরে দাঁড়িয়ে চোখ পাকিয়ে চিৎকার করে ওঠে, 'দুটো ইট ভেঙেছিস, আর যদি একটাও ভাঙে, আমি ইট দিয়ে ঠুকে মাথা ভাঙব তোর! খুব মজা পেয়ে গেছিস শালা। স্বাধীনতা! রজত জয়ন্তী! আমার বাপের পিণ্ডি। মগের মুলুক!'

এ চিৎকারের অর্থ বাসু বুঝতে পারে না! বাঁ-হাত দিয়ে ঘাড়ের চামড়া ঘষতে ঘষতে বলে, 'না বাবু, ভাঙবে কেনে! আমি সাবধানে লিয়ে যাব—' মানুষটা আর কিছু বলে না। ঘরে ঢুকে সশব্দে দরজা বন্ধ করে। বাসু অবাক হয়ে তার কাণ্ডকারখানা দেখে।

সূর্য মাথার ওপর না-আসা পর্যন্ত বাসু হাতে ঝুলিয়ে ইট এনে নিমতলায় জড়ো করে। খিদেয় তার পেটের মাংস কুঁচকে যায়। জিভের ডগা শুকিয়ে আসে। পায়ের ব্যথা শরীরের ডানদিকটা অবশ করে আনে। তার ওপর যা ভয় করেছিল বাসু, খরখরে বালি-ইট বয়ে বয়ে হাতের দশটা আঙুলের ডগা সাদাটে, চামড়া ক্ষয়ে গেছে, নীচে লাল রক্তের আভা দেখা যায়। ইটে আর হাত ছোঁয়াতে পারে না বাসু—ডগাগুলো জ্বালা করে, কষ্ট হয়। বাবুরা গানবাজনার যন্ত্রপাতি স্কুলঘরে ঢুকিয়ে তালা দিয়ে খেতে গেছে। ফিরবার নাম

নেই। বাস্থকে কেউ জলখাবারের পয়সাও দিয়ে যায়নি। ইট বওয়া হয়ে গেলে আর কি করবে সে কথাও বলে যায়নি। বাস্থ নিম-তলায় বসে গামছা দিয়ে মুখ মোছে। বাইরে দুপুরের খররৌদ্র ঝাঁ-ঝাঁ করে। একটুও বাতাস নেই কোথাও। বাবুরা না-আসা পর্যন্ত ওই বারান্দায় শুয়ে একটু গড়িয়ে নেবে কিনা ভাবে। কিন্তু সাহস হয় না। বাস্থ গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে বসে বসে ঝিমোয়।

'এই শালো!'

চোখ দুটো কি বুজে এসেছিল বাস্থর? ঠিক জানে না। তবে বাবুরা দু'চারজন আবার কখন ফিরেছে, একেবারে টের পায়নি সে। ধড়ফড় করে উঠে দাঁড়ায়। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে চোখ কচলায়।

'ঘুমুচ্ছিলি শালো পড়ে পড়ে!'

বাস্থ মিনমিন করে, 'না বাবু ঘুমুই নাই। এট্টু বসেছিলম ঠাণ্ডাতে।'

একজন বাস্থর নকল করে ধমকায়, 'বসেছিলম ঠাণ্ডাতে! শালো বসে থাকার জন্য পয়সা দিয়ে লোক রেখেছি আমরা!'

বাস্থ বলে, 'আজ্ঞে, ইটগুলান্ এনেছি। আর কি করতে হবেক বলে যান নাই তো কেউ।'

'বলার কি আছে! ও-বাড়ি থেকে শাবল আন। গর্ত খোঁড়। বাঁশ পোঁত। শহীদ-বেদী বানা—'

বাস্থ ভয়ে ভয়ে তাকায়। শহীদ-বেদী কি বস্তু সে জানে না। কখনো দেখে নি, কোনোদিন বানায়নি। তাছাড়া এসব বানানো তো মিস্ত্রির কাজ! সে কি করবে? ইটগুলোর দিকে তাকিয়ে বলে, 'বাবু মিস্তিরি আসবেক নাই?'

ছোকরাবাবু বলে, 'মিস্ত্রি? মিস্ত্রি দিয়ে কি হবে? তুই থাক-থাক করে ইট সাজিয়ে দে। আমরা সাদা চাদরে ঢেকে দেব।'

বাস্থ ব্যাপারটা বুঝতে পারে। বাবুদের নতুন বাড়িতে যেমন তুলসীমঞ্চ হয় তেমনি একটাকিছু হবে। চৌকো করে ইট সাজাতে

হবে আগে, তারপর চওড়া অংশ ক্রমশ কমিয়ে ওপরের দিকটা চূড়োর মতো করতে হবে।

বাসু বলে, 'কুন্ ঠাঁই হবে বাবু?'

'ওই নিমগাছের গুঁড়ি ঘেঁষে। লাগ তাড়াতাড়ি—'

বাসু আবার হাতে হাতে ইট সরায়। সব ইট সরিয়ে নিমগাছের গুঁড়িটা পরিষ্কার করে আবার একটা একটা করে মাপমতো ইট সাজাতে থাকে। খরখরে ইটের ঘষা খেয়ে দশ আঙুলের ডগা থেকে এবার রক্ত চুইয়ে পড়ে। সমস্ত শরীরে যন্ত্রণা ছড়িয়ে যায়। এমন রাক্ষুসে ধারালো ইট জীবনে দেখেনি বাসু। যন্ত্রণায় কখনো বাঁ হাত গামছায় চেপে ধরে, কখনো ডানহাত। লাল ইটের গায়ে বাসুর কালো শরীরের লাল রক্তের ছোপ লাগে। একটার পর একটা ইট সাজিয়ে চূড়ো বেঁধে বাবুদের জন্য শহীদ বেদী তৈরি করতে থাকে বাসু। মাইকে গান চালু হয় আবার। ঝমঝমাঝম বাজনা বাজে। ঝিমধরা তপ্তদুপুর বিকট যান্ত্রিক শব্দের আঘাতে স্পন্দিত হয়।

অভুক্ত তৃষ্ণার্ত বাসুর কানে কিছু ঢোকে না। সে প্রতি ইটে দশ আঙুলের কোনো-না-কোনো-একটার রক্তের অস্পষ্ট টিপ পরিয়ে শহীদবেদী বানায়। তার মুখ যন্ত্রণায় ক্রমশ বেঁকে যেতে থাকে।

সব কাজ শেষ হলে ক্ষতবিক্ষত ডানহাতখানা শূন্যে পেতে মজুরি চায় বাসু। গানের মত্ততার মধ্যে বাবুরা ভ্রূক্ষেপ করে না। একটু অপেক্ষা করে বাসু আবার বলে, 'আর তো কুন কাজ নাই বাবু! মজুরিট ত্থান আজ্ঞে, ঘর যাই!'

ডাকাডাকিতে বিরক্ত হয়ে সেই ঢ্যাঙা শিস্‌-দেওয়া বাবুটিই প্যান্টের পকেট থেকে দুটো টাকা বের করে ছুঁড়ে দেয় বাসুর দিকে, 'এই নে, শালো!'

বাসুর কালো মুখ আরো কালো হয়, 'বাবু, আর এক টাকা ত্থান!'

'আবার কি!' একসঙ্গে দু'জন ধমকে ওঠে!

বাসু বলে, 'আজ্ঞে তিনটাকা মজুরি বটে যি আমাদের!'

'সে দিনভর কাজ করলে। তুই শালা লেগেছিস নটায়, দুপুরে

ঘুমিয়েছিস আড়াই ঘণ্টা, এখন বাজে সাড়ে তিনটা, ঠিক দিয়েছি। যা, ভাগ্ !'

বাসু তবু বলে, 'না বাবু! দুপুরে খেতে যাই নাই আমি! সে হিসেবটা ধরুন!'

শুনে তিনচারজন ঘুরে তাকায় বাসুর দিকে। সেই ভয়ঙ্কর ধারালো দৃষ্টির সামনে বাসু প্রথমটা কুঁকড়ে ছোট হয়ে যায়। পরমুহূর্তে তার পায়ের ব্যথা টনটন করে, হাতের দশ আঙুলের ডগা জ্বালা করে, শূন্য পাকস্থলী প্রচণ্ড বেগে মোচড় খায়। তার মনে পড়ে, এখন দুর্ভিক্ষের অবস্থা, দু'টাকায় এক কে. জি চালও পাওয়া যায় না, ঘরে বউবাচ্চাসহ চারটে উপোসি মুখ ভাতের জন্য হাঁ করে বসে আছে। তাছাড়া আজ কাজ পেয়েছে বলে কাল পাবে তারও কোনো নিশ্চয়তা নেই। একদিনের রোজগারে এখন তিনদিন ঘরগুষ্টি আটা-গোলা খেয়ে প্রাণ বাঁচাতে হয়। মাইকের গানবাজনার শব্দ ছাপিয়ে বাসু প্রাণপণে আর্তকণ্ঠে চিৎকার করে ওঠে, 'না, বাবু না! গরীবের পয়সাটো মারবেন না!'

শোনামাত্র সব বাবু একসঙ্গে একদৃষ্টে তাকায়। রেকর্ড বদলের জন্য মাইক থেমে গিয়ে দুর্গামন্দিরের মাঠ নিস্তব্ধ হয়। পড়ন্ত দুপুরের খররৌদ্রে বাতাসের কাঁপন লাগে। নিমগাছের ডালপালা দুলতে থাকে।

লম্বা ঢ্যাঙা বেঁটে কালো ফর্সা বাবুরা একসঙ্গে ধমকে ওঠে, 'গরীবের পয়সা! খুব যে বুকনি ঝাড়ছিস্ রে শালো? একচড়ে রা বন্ধ করে দেব! জানে বাঁচতে চাস তো পালা শীগ্গির—'

বাসু হাঁ করে শ্বাস টানে। তার জ্বর এসে গেছে। সারা গা গরম। নিশ্বাসে গরম ভাপ বেরুচ্ছে, কপালের শিরাগুলো দপ্দপ্ করছে। ঘোলাটে আচ্ছন্ন চোখে সে মারমুখী বাবুদের দিকে তাকায়। আর কিছু বলার সাহস হয় না। একা, বড় একা সে! বাবুরা সাত আট জন। দশ-বিশজন মুনিষকামিন থাকলে জোট বেঁধে হৈ-হৈ করে উঠতে পারত। ঘিরে ধরতে পারত বাবুদের। আদায়

করে নিতে পারত ন্যায্য পাওনা। একা সে কি করবে? একা মানুষের কোনো শক্তি নেই, সাহস নেই। পায়ে পায়ে তাকে পিছু হটতে হয়।

জ্বরতপ্ত ক্লান্ত বিষণ্ণ বাসু রাস্তায় নেমে পড়ে। আর তখনই মাইকে নতুন রেকর্ড বেজে ওঠে। হিন্দী গানের প্রমত্ত সুর আর কর্কশ ঝমঝমাঝম বাজনায় দিকদিগন্ত প্রকাম্পিত হয়। বাসুর মাথায় আগুন জ্বলতে শুরু করে। চোখের দৃষ্টি হিংস্র হয়ে ওঠে। চতুষ্পার্শ্বে ভাসমান গমগমে ভয়ঙ্কর শব্দের বৃত্তের মধ্যে ক্রুদ্ধভাবে পা ফেলে সে এগুতে থাকে। যেন শব্দটা তাকে তাড়া করে! যেন সেও দাঁতে নখে ছিঁড়ে তাকে কুটিকুটি করতে চায়!

হতভাগ্য বাসু জানে না, আর একটুপরেই তার হাতেগড়া শহীদ-বেদী দামিচাদরে মুড়ে ফুল ও আলোকমালায় সাজিয়ে মাল্যদান করে বাবুরা স্বাধীনতার পঁচিশবছরপূর্তির রজত-জয়ন্তী-উৎসব শুরু করবে!

কালু ডোমের কথা শুনে সান্যালবাবু অবাক হয়ে গেলেন, 'ব'লিস কিরে? পারবি না তুই?'

কালু ডোম তেলহীন রুক্ষ লালচে একরাশ চুলসমেত মোটা মাথা এদিকওদিক ঝাঁকিয়ে বলল, 'না বাবু, লারব।'

সান্যাল বললেন, 'পয়সা পাবি। প্রতি এক'শতে তিন টাকা।'

কালু বলল, 'তিন কেনে, দশ দিলেও লারব।'

সান্যালবাবু রেগে উঠলেন, 'তোর খুব তেল হয়েছে দেখছি! সরকারি কাজে অবহেলা করিস! হারামজাদা, নচ্ছার—'

কালু ডোম ঘাড়মাথা সোজা করে সান্যালবাবুর গোলগাল ফর্সা মুখ দেখল। তারপর গম্ভীর খংখরে গলায় বলে উঠল, 'গাল দিছেন কেনে বাবু? আমি তো গোলাম লই কারো! সরকারি আপিসের বেতন তো খাই না বাবু—

শুনে প্রচারদপ্তরের মনোহর সান্যাল স্তম্ভিত হলেন। গরুর জাবর কাটার মত শব্দ করে পান চিবুচ্ছিলেন তিনি—বন্ধ হয়ে গেল। ক্রুদ্ধ চোখে তাকালেন কালু ডোমের ভাঙাচোরা কালো কুৎসিত মুখটার দিকে। কালু ডোম এমনভাবে কথা বলতে পারে—বলার সাহস রাখে—যেন বিশ্বাসই করতে পারলেন না।

অথচ কালু ডোমের কাজই হ'ল এই ছোট মফস্বল শহরের সর্বত্র ঘুরে ঘুরে ঢোল পিটিয়ে কিছু ঘোষণা করা, রকমারি পোস্টার চিটানো, হ্যাণ্ডবিল বিলি করা, মেলায় বা হাটে একতাড়া ঘুঙুর পায়ে বেঁধে রঙবেরঙের ঢলঢলে জামা পরে বিড়ি বা চানাচুরের বিজ্ঞাপন প্রচার করা।

এখন বয়সে প্রৌঢ় হয়েছে কালু ডোম। শরীরের মজবুত মাংসে ভাঙচুর শুরু হয়েছে, গালের চামড়া ঝুলে পড়েছে, হাতের কব্জিতেও

আর তেমন জোর নেই। এখন ঘুঙুর পায়ে মাটি কাঁপিয়ে ধুলো উড়িয়ে আর নাচানাচি করতে পারে না। কিন্তু আর সব কাজই নিষ্ঠার সঙ্গে চালিয়ে যায়।

ডোমের ঘরের ছেলে কালুর ময়লা-ফেলার কাজে, মাটি কাটার কাজে অথবা বাবুদের হাতেপায়ে ধরে একটা রিক্সা অথবা দু'এক বিঘা জমি ভাগে নিয়ে চাষের কাজে লেগে পড়াই স্বাভাবিক ছিল। তার পরিবর্তে এই বিচিত্র পেশা। এখন অন্য কাজে মন বসে না!

কালুর যখন সবে গোঁফের রেখা দেখা দিয়েছে তখনই শহরে তাঁবুর সিনেমা চালু হ'ল। শহরের উঠতি বড়োলোক কুণ্ডুবাবুরা নিজেদের জমিতে ত্রিপল খাটিয়ে মেসিনপত্র বসিয়ে ছবি দেখানোর ব্যবসা শুরু করলেন। কালুর বাবা গদাধর ডোম কুণ্ডুবাবুদের বাড়িতে মুনিষ খাটত। কালু যেত তার সঙ্গে। বাবুদের বড় পছন্দ হল কমবয়েসি ডাঁটালো শরীর কালুকে। ডেকে বললেন, 'তোকে মুনিষ খাটতে হবে না কালু। এক কাজ কর তুই, সিনেমার পোস্টার চিটিয়ে বেড়া দেয়ালময়। চার আনা মজুরি পাবি, বিনি পয়সায় সিনেমাও দেখতে পাবি!'

মজুরির চেয়ে সিনেমা দেখার লোভ তখন বেশি—কালু এক কথাতেই রাজি হয়ে গেল। সেই তখন থেকে শুরু।

রঙবেরঙের পোস্টার আসত কলকাতা থেকে। বাবুরাও কিছু ছাপিয়ে নিতেন। কাঁধে বাঁশের মই, মইয়ের ডগায় ভাঁজ-করা পোস্টার, হাতে আঠার টিন ঝুলিয়ে সাতসকালে কালু বেরিয়ে পড়ত ঘর থেকে।

তারপর শহর ঘুরে পাকা-দেয়াল, বটগাছের মোটা গুঁড়ি, ঢালু-হয়ে-নামা টিনের চালা—এসব দেখে পরিপাটি করে পোস্টার চিটিয়ে দিত। গাঁ-ঘরের মানুষ রাস্তায় জড়ো হয়ে অবাকচোখে তাকিয়ে থাকত। কেউ কেউ বলত, 'ইবারে কি বই বটে গো তুমাদের টকীতে?'

কালু বলত, 'সবুর! এখুনি দেখতে পাবে! পোস্টারট লাগাতে দাও আগুতে—'

বলে মাটিতে মই নামিয়ে একটা রঙীন ছাপানো পোস্টার উল্টো করে তুলে নিত হাতে। নামধাম মানুষ দেখতে পেত না। মাটিতে সমান জায়গা দেখে সাবধানে বিছিয়ে আঠা লাগাতে শুরু করত। তখনও মানুষ বুঝতে পারত না কি বই, কি বৃত্তান্ত! তারা অধৈর্য হয়ে বলত, 'নামট বল কেনে গো তুমি! শুনে লেই—'

কালু গম্ভীর হয়ে জবাব দিত, 'অত ছটফটানি কেনে? পাবে! এখুনি দেখতে পাবে! টুগ্‌চি দাঁড়িন্ যাও।' বলত আর আস্তে আস্তে মোলায়েম করে আঠা ঘষত! তারপর দুই প্রান্ত দুই হাতে তুলে উঁচু করে শূন্যে ঝুলিয়ে দিয়ে বলত, 'লাও, ইবারে পড়ে লাও—'

এ একরকম লুকোচুরি খেলা! কিন্তু কালুর ভাল লাগত। সে এমনকিছু বহন করে নিয়ে যাচ্ছে—যার জন্য মানুষের আগ্রহ আছে, ব্যাকুলতা আছে—এটা বুঝতে পেরে বিশেষ গর্ব বোধ করত এবং মানুষের জিজ্ঞাসা ও কৌতূহলকে যথাসম্ভব জিইয়ে রাখার চেষ্টা করত! এ-কারণে পোস্টারগুলো কখনই সোজা করে মইয়ে ঝুলিয়ে রাখত না সে, আর লোকজনের সামনে উল্টো করে পেতে অনেকক্ষণ ধরে আঠা লাগাত। টকী-ঘরে যে নতুন বইটা এল, অথবা কাল কি পরশুই এসে যাবে—তার প্রথম ঘোষক তো সে-ই! সে-ই তো শহরশুদ্ধ সবাইকে জানিয়ে দিচ্ছে সে কথা। এ কি কম গৌরবের কাজ! গেঁয়ো হাটুরে লোকজনকে সামনে দাঁড় করিয়ে তপ্ত চায়ের গ্লাসে রয়ে বসে চুমুক দেওয়ার মত এই গৌরবটুকুও ধীরেসুস্থে উপভোগ করতে ভালবাসত কালু। শহরে তাঁবুর সিনেমা হলটাই এক প্রকাণ্ড বিস্ময়, তার উপর এই রঙবেরঙের চমৎকার পোস্টার! মফস্বল শহরের অনেক মানুষ যারা আগে কখনো সিনেমা দেখে নি—তারা তাঁবুর বাঁশের খুঁটিগুলোকেও মনে করত আশ্চর্য জিনিস! যেন গান বাজনার ছোঁয়া পেয়ে ওদের রূপ বদল হয়েছে। ওরাও পর্দার ছায়া-ছবির অঙ্গ হয়ে গেছে! কালুকেও সেই দৃষ্টিতেই দেখত তারা। যেন

সবাক্ চলমান চলচ্চিত্রের একজন কেউ। মনে মনে বড় ঈর্ষাও করত। রোজ সিনেমা দেখতে ওর তো - ার পয়সা লাগে না! কি অসম্ভব ভাগ্যবান মানুষ! কালো বেঁটে শরীর নিয়ে মইয়ের উপর দাঁড়িয়ে কালু যখন দেয়ালে পোস্টার চিটাত—মানুষ হাঁ করে শুধু পোস্টারের ছবি আর লেখাই দেখত না, কালুকেও দেখত! সিনেমা-বিষয়ে কালুর সঙ্গে দু'একটা কথা বলার জন্য উসখুস করত। যেন সিনেমার যাবতীয় খবরাখবর কালুর জানা হয়ে গেছে! সবাইকে সে সব বুঝিয়ে দিতে পারে।

মইয়ের ডগায় পোস্টার ঝুলিয়ে হাটতলায় গিয়ে দাঁড়ালে বড় মুদীর দোকানের নকুল সাউ ডেকে বলত, 'এই কালু, একট আমার দুকানে চিটিন্ দিয়ে যা কেনে। জবর বাহারে ছবি আছে ইবারে!'

কালু দাঁড়িয়ে পড়ে নকুলের দোকান-ঘং ভাল করে পরীক্ষা করে জবাব দিত, 'উঁহু', চিটাব কুথা? ঘরের ভিতরকে ই জিনিস দিবার লয়। বাবুরা বকবেক!'

হাটতলার পরান ডেকে বলত, 'ও কালু, ইদিক পানে একবারটি এস কেনে। খানিক চা খেয়ে যাও!'

চা ফুলুরী তেলেভাজার দোকান তার। ঘরের মাটির দেয়াল মোটামুটি মসৃণ। কালুকে আধকাপ চা খাইয়ে একটা বড় রঙিন পোস্টার আদায় করে নিত। রকমারি পোস্টারে তার দোকানের ভেতর ও বাইরের দিক ভরে উঠেছিল। বিক্রিও বেড়ে গিয়েছিল।

কুণ্ডুবাবুর হলের ম্যানেজার মাঝে মাঝে সাইকেল নিয়ে তদন্তে বের হ'ত। পোস্টারগুলো কালু ডোম ঠিক মত লাগায়, নাকি ঘরে জমিয়ে রেখে সের দরে বিক্রি করে দেয়—তার হিসাব নিত। চারদিক ঘুরে দেখে-শুনে খুশি হয়ে এসে বাবুদের বলত, 'কালু খুব কাজের আছে বাবু। ফাঁকি দেয় না।'

সেই ম্যানেজারই একদিন কালুকে ডেকে বলল, 'করেছিস কি! স্কুলের দেয়ালে পোস্টারগুলো সব উল্টো করে লাগিয়ে বসে আছিস!'

উল্টো করে! কালু পিট পিট করে তাকিয়ে ঘাড়মাথা চুলকাল।

যেন বিষম লজ্জা পেয়েছে এমন ভাব। আসলে কালু ডোম লেখাপড়া জানে না তো। পোস্টারে ছবি থাকলে তার ধড় মুণ্ডু দেখে সোজা উল্টো ঠিক করে। কিন্তু বাবুরা শহরের প্রেসে যে পোস্টার ছাপায়—তাতে তো ছবি থাকে না। বড় বড় অক্ষরে শুধু নামধাম লেখা। কালুর কাছে এ পোস্টারের কোনো আকর্ষণ নেই। এগুলোর উল্টোসোজাও সবসময় চিনে উঠতে পারে না।

ম্যানেজার বলল, 'এরকম গোলমাল করলে তোর চাকরি চলে যাবে কালু। আমি নিজে দেখে এলাম, পোস্টার দেখে লোক হাসছে—'

লজ্জায় কালুর মাথাটা আরো নুয়ে পড়ল।

ম্যানেজার তাকে বুদ্ধি দিল, 'এক কাজ কর কালু, দু'পয়সা দিয়ে বর্ণপরিচয় কিনে নিয়ে যা একখানা। অ আ ক খ মুখস্থ কর—'

কালু বলল, 'হ বাবু, কথাট ভাল বলেছেন। আমি আজই লিয়ে যাব একট কিনে—'

ডোমের ঘরের ছেলে কালু। বই কি জিনিস সে দূরে থাক তার বাপ ঠাকুরদাও কখনো ছুঁয়ে দেখেনি। জন্মের পর থেকে একপাল শুয়োর তাড়িয়ে, মাঠেমাঠে ধান খুঁটে, নাগাডোবায় কুঁচোমাছ ধরে বড় হয় তারা। তারপর মুনিষমাহিন্দারধাঙড় হয়ে জীবন শেষ করে।

কিন্তু কালু ডোমের কথা আলাদা। সে মুনিষ না, মাহিন্দার না, মিউনিসিপ্যালিটির ময়লা ফেলার গাড়িও ঠেলে না। তার কাজের জাত আলাদা। ধরন আলাদা। ফেরার পথে সে সত্যি সত্যি একখানা বর্ণপরিচয় কিনে ঘরে এল।

বই দেখে কালুর বুড়ো বাপের চোখ কপালে উঠল। উঠোনে জল ঢেলে কাদা তৈরি করে সে তার নিজের মাটির ঘরখানার জোড়া-তালির কাজ করছিল। তার হাঁটু পর্যন্ত থিকথিকে কাদা, বুকে মুখে মাথার পাকা চুলে কাদার ছিটে। ছেলের উপর এখন আর খুশি নয় সে। এত বড় হ'ল—মুনিষ খাটলে দিনে মজুরি পেত পাঁচ সিকে। রিক্সা টানলেও একটাকা পাঁচসিকে রোজগার হত। তার জায়গায় কিনা সে চার-ছ'আনা পয়সার জন্ত দিনভর মইকাঁধে রোদ

বৃষ্টিতে টো টো করে ঘুরে বেড়ায়। অনেক রাত পর্যন্ত সিনেমা হলের তাঁবুতে পড়ে থাকে। কোনো কোনো দিন বাড়িও ফেরে না। এমন ছেলে ঘরে থাকল কি না থাকল বাপের কি।

কালুর বাপ কাদায় পা ডুবিয়ে খরদৃষ্টিতে কালুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'লবাবপুত্তুর, কুথা থেকে এলে হে?' কালু উত্তর দেয় না। ঘরের পাশে কাঁঠালগাছটার গুড়িতে ঠেস দিয়ে বসে পাতলা বইটা নাড়াচাড়া করে। কালুর বাপ বলে, 'ওট কি বটে? তুদের টকীর বই?'

কালু বাপের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ে। কিছু বলে না।

কালুর বাপ রেগে যায়, 'আয় কেনে। উঠে আয় শালো—জল লিয়ে আয় পোখুর থেকে। বই লিয়ে কি কাম তুর?'

তখন কালু বলে, 'ইট পড়তে হবে।'

'পড়তে হবে।' কালুর বাপ হাঁ করে দম টানে, 'পড়তে জানিস তু?'

'শিখে লিব।'

'শিখে লিবি?' কালুর বাপ যেন কিছু বুঝতে পারে না। কাদা-মাখা পা টেনে টেনে কালুর কাছে এসে দাঁড়ায়। নীচু হয়ে বই দেখে। তারপর চিৎকার করে ওঠে, 'বই লিয়ে লবাবি করতে এলি শালো ঘরকে। বাবু হঁন্‌ছিস। লিখাপড়া শিখবি। আমি শালো বুড়ো বাপ মুনিষ খেটে তুকে ভাত গেলাব—'

কালু বিরক্ত হয়ে উঠে পড়ে। তারপর ঘর ছেড়ে সোজা রাস্তায় নামে। ও-পাশে একটা ভাঙাচোরা বাড়ি আছে। মানুষজন কেউ থাকে না। সেখানে বসে বইটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে কালু। অ আ ক খ তাকে শিখতেই হবে! এটা মানসম্মানের প্রশ্ন। উল্টো করে পোস্টার লাগালে শুধু বাবুরা না, শহরসুদ্ধ লোক কি বলবে কালুকে। তার খাতিরটাতির যা-কিছু সব ধুলোয় লুটিয়ে পড়বে না? লোকে হাসবে না তার দিকে চেয়ে?

কিন্তু একা একা পড়া যায় না। অক্ষর চিনতে পারে না কালু। সিনেমার গেটকীপার বিশুকে গিয়ে ধরে।

বিশুর বিদ্যা ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত। তাতে কালু ডোমের গুরু হতে বাধা নেই কোনো। সে মুখখানা বেশ ভারিক্কিগোছের করে বলে, 'হ। শিখাইন্ দিব! বাংলা কেনে তুকে ইংরেজিও শিখাইন্ দিব! একট খাতা আর রুল পেন্সিল কিনে লিয়ে আয় তু!'

কালু পেন্সিল কেনে। কিন্তু খাতা কেনে না। সিনেমার রকমারি বাতিল বিজ্ঞাপনের পেছনের সাদা অংশে লেখা লিখতে শুরু করে। বিশু বলে, 'হ, হ, কলম ধরেছে ছাখ! যেন পাচন লিয়ে গরু ডাকাতে ছুটল! ই ভাবে ধর, ই ভাবে—'

তারপর ক'দিন যেতে না যেতে বিশু দিব্যি খুশি হয়ে বলে, 'হ, হইন্‌ছে! সোন্দর হইন্‌ছে! ইস্‌কুলকে গেলে পণ্ডিত হতি তু! ডুমের ঘরের ব্যাটা ডুমপণ্ডিত!'

ডোমের ঘরের ছেলে ভরা বয়সে মুনিষ না খেটে টেড়ি বাগিয়ে পাৎলুন পরে বই খাতা পেন্সিল নিয়ে লেখাপড়া শিখছে— এমন অত্যাশ্চর্য অভাবনীয় সংবাদ শুনেই সম্ভবত কালুর বাবা মনঃকষ্টে বেশিদিন বাঁচল না। তার শোকে মড়াকান্না কাঁদতে কাঁদতে কালুর মা পাড়াসুদ্ধ সবাইকে জানিয়ে দিল, তার বেটাট বাবু হঁইন্‌ছে। বাবুদের পারা পুষাক পইরছে, বাবুদের পারা লিখাপড়া শিখছে! উ শালো বেদোর বেটাটর লেগেই বাপট অকালে মইর্যে গেল। যুয়ান বেটা ঘরকে থাকতে বুড়াকালে বাপ মুনিষ খাটতে যায়, এমুন কে দেখেছে! কে শুনেছে! উয়াকে তুমরা ই পাড়ায় ঢুকতে দিও না গো!

বাপ মরার পর কালু ডোমের মতিগতির কিছু পরিবর্তন ঘটল। দিনরাত চব্বিশঘন্টা সিনেমা-হলের আশেপাশে ঘুর ঘুর না করে সে বাবুদের বলে কয়ে মিউনিসিপ্যালিটিতে একটা কাজ নিল। বাড়ি বাড়ি ট্যাক্স বাকির নোটিশ পৌঁছে দেওয়ার কাজ। আর তার সঙ্গে রকমারি ঘোষণার কাজ। বাবুরা লিখে দিত কাগজে। বারকয়েক পড়ে কালু ডোম মুখস্থের মত করে ফেলত। তারপর একটা ঢোল কাঁধে ঝুলিয়ে চৌরাস্তা বা তেরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে হেঁকে বলত,

'শুনুন মশয়রা, শুনুন বাবুরা—' বলে বার দুই ঢোলে কাঠির বাড়ি দিত। তাকাত চারদিকে। আশেপাশের লোকজন উৎসুক হয়ে উঠেছে দেখলে কালু ডোম বলত, 'ভাল করে শুনে লেন আজ্ঞে, মিনসিপাল আপিসে কলেরা এসেছেন—'

বলেই আধ হাত জিব্ কাটত কালু ডোম। ভুল শুধরে বলত, 'কলেরা লয় বাবু, কলেরার টীকা এসেছেন। কাল সকাল থেকে দেওয়া হবেন। আপনারা লিয়ে আসবেন দয়া করেএ-এ!'

শহরের কেরানিবাবুরা থলে হাতে বাজারে যেতে যেতে বলত, 'শালা, যেমন মিউনিসিপ্যালিটি তার তেমন পাবলিসিটি অফিসার!'

শুনে রাগ করা দূরে থাক, কালু বেশ খুশি হয়েই ক'পা এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করত, 'কি অপিসার বুললেন বাবু? আবার বলুন কেনে শুনি—'

বার দুই শুনে কথাটা সে মুখস্থ করে ফেলেছিল। তারপর এসে জিজ্ঞেস করেছিল বিশুকে, 'কথাটর মানেট কি বটে বুঝিন্ দাও দিকিন।'

বিশুর বিদ্যায় কুলোয় নি। কুলোবার কথাও নয়। তবু গুরু হয়ে শিষ্যের কাছে হার মানবে কেন সে! অনেকক্ষণ ভেবেচিন্তে জবাব দিয়েছিল, 'বাবুরা বুললে তুকে? হাসতে হাসতে বুললে? না রাগ-রাগ মুখ করে বুললে? হাসতে হাসতে? হুঁ! কথাট ভাল লয় কালু! পাবলিসিটি হ'ল গে তুর ফোর টুয়েন্টি। তুকে চারশ বিশ বুলে গেল বাবুরা—'

শুনে কালুর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল।

এরপর থেকে কালুকে কেউ পাবলিসিটি অফিসার বললে খুব রেগে যেত সে। মুখচোখ কালো করে বলত, 'কেনে বাবু? ঠাট্টা কেনে করছেন? আমি কি ক্ষেতি করেছি আপনার?'

বাবুরা বলত, 'ঠাট্টা করব কেন। ভালই তো বলছি তোকে। অফিসার বল'ছি—'

কালু বলত, 'না বাবু! ওসব হতে চাই না আমি। আমি ডুম

বটে, ডুমের ঘরের বেটা কালু ডুম! তাই বুলবেন বাবু আমাকে—'

কালু ডোমের বয়স বাড়তে লাগল। শহরও বাড়তে লাগল একটু একটু করে। তাঁবুর সিনেমা উঠে পাকা সিনেমা হ'ল। রাস্তার মোড়ে মোড়ে আলো জ্বলল। বড় বড় দোকানপাট হ'ল। সরকারি অফিসের সংখ্যা বাড়ল। হোটেল রেস্টুরেন্ট বাড়ল।

কালু ডোমের তখন পোয়া-বারো। সবাই ডাকে তাকে। সে না হলে কোনো কাজই হয় না। হাটতলায় বিড়ির বড় কারখানা খুলেছে নিতাই দাস। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন কারিগর ঘাড়মাথা ছুলিয়ে গানের সুর ভাঁজতে ভাঁজতে বিড়ি বাঁধে! তাড়া তাড়া বিড়ি সেঁকা হয় উনুনে। বউয়ের নামে নিতাই তার নাম দিয়েছে 'মোহিনী বিড়ি।' কালুকে ডাকে সে, 'বিড়িট চালু করতে হবেক কালু! এই হ্যাণ্ড-বিলগুলান লিয়ে যা, চাদ্দিকের হাটে বিলি করবি, দেয়ালে দেয়ালে চিটিন্ দিবি! পাঁচ হাজার ছাপা করালাম। হাজারে তুই এক টাকা পাবি—'

কালু বলে, 'না বাবু, এক টাকায় হবেক নাই—'

নিতাই বলে, 'বিড়ি দিবরে! রোজ একতাড়া বিড়ি দিব খেতে—'

কালু বলে, 'ধুঁয়াতে কি পেট ভরবেক! আর চার আনা বাড়াইন্ ছ্যান—'

নিতাই দাস একমুহূর্ত ভাবে—তারপর রাজি হয়ে যায়। কালু ডোম বড় বিশ্বাসী। একটা হ্যাণ্ডবিলও নষ্ট করবে না সে। তাড়া বেঁধে ফেলে দেবে না খানাডোবায়। ওজন দরে বেচে দেবে না মুদির দোকানে। তাকে চার আনা বাড়তি দিলে ক্ষতি নেই কোনো।

তারপর কালুকে ক'দিন দেখা যায় শহরের আশেপাশের গাঁ-গুলোতে, হাটবারের ভিড়ে হাটের মাঝখানে দাঁড়িয়ে 'মোহিনী বিড়ি'র হ্যাণ্ডবিল বিলি করছে আর গলার রগ্ ফুলিয়ে মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে উঠছে, 'হ হ, খেয়ে দেখুন! তালগুড়ের পারা মিঠা বিড়ি, আফিঙের পারা লেশা ধরায়!'

সঙ্গে মস্ত বড় ব্যাগে বিড়ি বোঝাই একটা লোক দিয়েছে

নিতাই দাস। হাট শেষ হওয়ার আগে ব্যাগ খালি হয়ে যায়। ক'মাসের মধ্যেই নিতাইয়ের 'মোহিনী বিড়ি' প্রায় সমস্ত জেলাকে মোহিত করে।

বিড়ির কাজ শেষ হতে না হতে চানাচুর কোম্পানীর লোক ডেকে পাঠায় কালুকে। সামনেই জেলার সবচেয়ে বড় মেলা, বড়-বাগানের মেলা। দেশ দেশান্তর থেকে লোক আসে মেলায়। ম্যাজিক, সার্কাস, মরণকুয়ো থেকে গরু ছাগল ভেড়া হাঁস মুরগী বেচাকেনার হাট বসে। হপ্তা দুই লোকে লোকারণ্য হয়ে থাকে। মেলা কমিটির বাবুরা কালুকে ডাকে। মেলা আরম্ভের পোস্টার চিটিয়ে বেড়াতে হয় শহরে, রেলস্টেশনে, বাসে, ট্রেনে। কালুর তখন নাওয়া-খাওয়ার সময় থাকে না। শুধু পোস্টারে তো কাজ হয় না। গাঁ-ঘরের ক'জন লোক কালু ডোমের মত শিক্ষিত—যে পোস্টার পড়ে সব বুঝে ফেলবে! অথচ তারা না এলে মেলা হয় না। ধানকাটার শেষে হাতে কিছু কাঁচাপয়সা জমেছে তাদের—তারা দল বেঁধে এলে তবে না মেলার কেনাকাটা জমে উঠবে। গাঁয়ে গাঁয়ে ঘুরে কালু ডোমকে ঢোল পিটিয়ে হাঁক দিয়ে বলতে হয়, 'গাঁয়ের মানুষ শুনে লাও' গো তুমরা, ইবারের মেলার পারা মেলা আর কুনবার হয় নাই। ইবার সারকাসে হাতী আসবেক চারট, বাঘ আসবেক পাঁচট, আর আসবেক জলের হাতী—কুনবার দেখ নাই তুমরা। দলে দলে চলে যেও হে! দেরি করো না, দেরি করলেই ফুরিন্ যাবে—'

গাঁয়ের মানুষ চারদিক থেকে এসে ছেঁকে ধরে কালুকে, 'আর কি আসবে? সেই মরণ কুয়াট? আগুনের খেলাট? আসবে না? লাচের আসর বসবে না? আলকাপ্ হবে না? কবির লড়াই হবে না? বাজি ফুটবে না?'

কালু ডোম আবার ঢোলে কাঠি দেয়, 'হবে! সব হবে! দলে দলে চলে যেও তুমরা—'

বাচ্চারা হৈ হৈ করতে করতে কালু ডোমের পেছনে পেছনে যায়।

পুকুরঘাটে জল ভরতে বাসন মাজতে গিয়ে গাঁয়ের বৌ-ঝিরা তাড়াতাড়ি উঠে এসে ঘোমটা টেনে উঁকিঝুঁকি মারে।

পেছনে একপাল উলঙ্গ হাড্ডিসার বাচ্চাসহ ঢোল কাঁধে কালু ডোম কাঁচারাস্তার ধুলো উড়িয়ে এমনভাবে হেলে দুলে দুলকি চালে পথ হাঁটে যেন সৈন্যসামন্ত নিয়ে গ্রাম জয় করে ফিরে যাচ্ছে সে।

মেলায় সবাই নিজের নিজের পণ্যের প্রচার চায়। কালু ডোমকে ডাকাডাকি করে সবাই। এ সময় চড়া মজুরি হাঁকে কালু। এত দিনে বিয়েসাদি করে ঘর-সংসার করার পর সে পয়সা চিনেছে! মেলায় নিজের খরচ আছে। বউটাকে আনতে হবে মেলায়—জিনিস-পত্র কেনার পয়সা দিতে হবে তাকে। তার খরচ আছে। বছরে এক বার মেলা—এইসময়ই যা রোজগার হয় কালুর। সেই রোজগারে সে জামাকাপড় করে, বউকে শাড়ি দেয়, দু'একটা রূপোর গয়নাও। প্রতিদিনের বাঁধা মজুরিতে এইসময় সে কাজ করে না! মেলায় এক একদিনে তার দর ওঠে পাঁচ টাকা পর্যন্ত।

নতুন চানাচুর কোম্পানী মেলার ক'দিন কিনে রাখে কালু ডোমকে। রঙবেরঙের পোষাক দেয়, পায়ে বাঁধার ঘুঙুর দেয়, মাথায় হলুদ রঙের পাগড়ি দেয়। বিচিত্র বর্ণে সজ্জিত কালু ডোম বিকেলের জমজমাট মেলায় ভর-পেট পচুই গিলে নেশায় লাল-চোখে উন্মত্তের মত নেচে নেচে বেড়ায়, আর কোথাও কোথাও হঠাৎ দাঁড়িয়ে গিয়ে মুখে একটা টিনের চোঙা ধরে মেলার সহস্রকণ্ঠের কলরব ছাপিয়ে প্রাণপণ শক্তিতে চেঁচিয়ে ওঠে, 'হেই, হেই, হুর্‌র্‌র্‌র্! অন্নদার চানাচুর্‌র্! টক ঝাল নুন মিষ্টি, সবার সেরা আজব ছিষ্টি! আড়াই মনী বস্তা, দামে ভারি সস্তা! মেলায় আছে দুকান, বাবু কিনে লিয়ে যান্। হেই, হেই, হু র্ র্ র্ র্—'

কালু ডোমের প্রচার কৌশলে অন্নদার চানাচুর হু হু করে বিক্রি হতে থাকে।

এখন আর বড়বাগানের মেলা হয় না। মেলা-কমিটির দল-বাজিতে বন্ধ হয়েছে। শহর বাড়তে বাড়তে মেলার জমিজমা গ্রাস

করেছে। যেখানে তাঁবু খাটিয়ে সার্কাস বসত এখন সেখানে কুণ্ডু বাবুদের নতুন ধানকল!

কিন্তু কালু ডোমের তাতে কোনো ক্ষতি হয় নি। একটা ছেড়ে দু'টো সিনেমা হল চালু হয়েছে এখন শহরে। বড় বড় হোটেল হয়েছে ক'টা। চার পাঁচটা পাউরুটির কারখানা হয়েছে। কালু ডোম সারাদিনই মই কাঁধে পোস্টার লাগিয়ে বেড়ায়। কখনো বা কোর্টের সামনে বটতলায় দাঁড়িয়ে মুখে চোঙা ধরে নিজস্ব বক্তৃতার ঢঙে সকলকে জানায়, মামলা-মোকদ্দমা করতে হলে ঠাণ্ডা মাথায় করাই উচিত। আর মাথা ঠাণ্ডা থাকে কিসে? না, পেট ঠাণ্ডা থাকলেই। পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। সেই জ্বালাতে জ্বলে অষ্টাঙ্গ! সাক্ষী দিতে গেলে বেবাক গোলমাল হয়ে যায়। খালি পেট থেকে গোপনকথা উকীলমোক্তাররা টেনে বার করে নেয়। অতএব পেট ঠাণ্ডা করুন! পেটের খোল খালি রাখবেন না, ভরাট করুন। আর তা যদি করতেই হয় তাহলে চলে যান ওই চৌরাস্তার ধারে 'মহামায়া হোটেলে—'

বলে আর দড়িবাঁধা চোঙটা ডান কাঁধে ঝুলিয়ে দিয়ে বাঁ কাঁধের ঢোল তুলে ডুগ্ ডুগ্ করে বাড়ি দেয় কালু ডোম। কখনো বাজাতে বাজাতে সম্প্রতি-দেখা সিনেমার কোনো নায়কের ঢঙে দু'পাক নেচেও দেয়। মামলা করতে আসা গ্রাম-গ্রামান্তরের লোকগুলো 'মহামায়া হোটেলে'র খোঁজ করে।

এখন শহরে সরকারি অফিসের সংখ্যাও বেড়েছে। তার মধ্যে নতুন অফিস হয়েছে একটা—প্রচার অফিস। রকমারি পোস্টার আসে সেখানে। কালু ডোমের ডাক পড়ে। টাক মাথা সান্যাল বাবু কালু ডোমকে সব বুঝিয়ে চুক্তি করে নেন। কালু কাঁধে মই হাতে আঠার টিন ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়ে। কোনো পোস্টার সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে, কোনোটা দেশের সংহতি রক্ষার, কোনোটা উৎপাদন বাড়ানোর। কখনো শুধু বর্ণালী লেখা, কখনো বা ছবি থাকে সঙ্গে। কালু ডোম যত্ন করে পোস্টারগুলো লাগায়। সরকারি

বাবুরা মজুরী ভাল দেয়—শুধু এ কারণে নয়। কালু তার নিজের সামান্য বিদ্যেবুদ্ধি দিয়ে যেন এইসব পোস্টারের অন্য-একধরণের গুরুত্ব অনুভব করে। তার মনে হয়—এগুলো পড়লে মানুষের ভাল হবে, উপকার হবে। মানুষ জাতধর্ম নিয়ে কাটাকাটি করবে না, ক্ষেতেখামারে ফসল বেড়ে উঠবে—অন্নাভাব দূর হবে। দেয়ালের সবচেয়ে ভাল জায়গা বেছে নিয়ে সে পোস্টারগুলো এমনভাবে চিটিয়ে দেয়—যাতে বাতাসে উঠে না যায় বা অল্প জলেই খুলে না পড়ে। তারপর মই থেকে নেমে এসে স্থান-নির্বাচন ঠিক হয়েছে কিনা, অর্থাৎ যাতায়াতের পথে মানুষ সহজেই পোস্টারটা দেখতে পাচ্ছে কিনা, পরীক্ষা করে দেখে খুশী হয়ে সামনের দিকে হাঁটতে থাকে। এই সময় তার কালো ধ্যাবড়া মুখটা বেশ মর্যাদাসম্পন্ন দেখায়। যেন একটা গুরুভার কাজের মহান দায়িত্ব পালন করে বেড়াচ্ছে সে।

এই কালু ডোমই একদিন সান্যালবাবুর মুখের উপর বলে বসল, সে সরকারি গোলাম নয়, সরকারি পোস্টার সে লাগাতে পারবে না। শতকরা তিন কেন দশ টাকা মজুরি দিলেও না। শুনে সান্যালবাবু স্তম্ভিত হলেন। কিন্তু কালু ডোম তাঁর রাগ গ্রাহ্যই করল না। অফিসের সবাইকে অবাক করে দিয়ে ধীর পদক্ষেপে বাইরে চলে এল। তার বুকের ভেতরটা জ্বালা করছিল, চোয়ালদুটো শক্ত দেখাচ্ছিল, চোখের দৃষ্টি দপ্ দপ্ করছিল। কালু ডোমকে এমন ভাবে রেগে উঠতে এর আগে কেউ কখনো দেখেনি। প্রচার-অফিসের সামনে চায়ের দোকানের নাড়ু সাহা তার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল। ডেকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'কি হ'ল হে কালু? হন্ হন্ করে চললে কুথা? লতুন সিনেমার খবরট বলে যাও খানিক!' কালু জবাব দেয়নি। ফিরে তাকায় নি পর্যন্ত।

কালু এখন বয়সে প্রৌঢ়। তার ছেলের বয়সই সতেরো আঠারো। নতুন সিনেমাহলটায় বলেকয়ে একটা কাজ যোগাড় করে দিয়েছে ছেলেকে। নিজে আছে কুণ্ডুবাবুর সিনেমায়। এখন আর পায়ে ঘুঙুর বাঁধে না কালু, মুখে চোঙা ধরে বক্তৃতা করে না। বিড়ি বা

চানাচুরের হাণ্ডবিল বিলির কাজেও দেখা যায় না তাকে। ছেলে কাজে ঢোকার পর কালু একটু সুখী একটু আয়েসী হয়ে উঠেছে। সিনেমাহলের ম্যানেজার একখানা টর্চ দিয়েছে তাকে। রাত্রে সেটা নিয়ে অন্ধকার ঘরে নীচুক্লাসের টিকিটের নাম্বার ধরে লোক বসায় কালু। দিনের বেলায় হাল্কা বাঁশের মইখানা কাঁধে নিয়ে পোস্টার মারতে বেরোয়। এ কাজে এখন কষ্ট হয় কালুর, ছেড়ে দিতে ইচ্ছে হয়। কিন্তু বাবুরা ছাড়ে না! তার মতো এমন খাঁটি মানুষ পাওয়া তো সোজা নয়—যার হাতে একতাড়া পোস্টার তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়!

কালুর দেখাদেখি কালুর ছেলেও আজকাল পোস্টার মারে। কিন্তু সে সব সিনেমার বা সরকারি প্রচারদপ্তরের ছাপানো পোস্টার নয়। লালকালিতে হাতে লেখা পোস্টার। সুন্দর গোটা গোটা অক্ষরে লেখা। ক্বচিৎ একটা মানুষের হাত কি মশাল আঁকা থাকে এককোণে। কালু ডোমের ছেলে কোত্থেকে যেন প্রায়ই এরকম পোস্টার নিয়ে আসে—কালুর আঠার টিন থেকে আঠা নেয়, বাঁশের মইটাও নেয় কখনো কখনো। ডোমপাড়ার আরো দুটি উঠতি বয়সের ছোকরা সঙ্গী হয়েছে তার—তাদের নিয়ে স্কুলের গায়ে, হাসপাতালের গায়ে, সিনেমাহলের দেয়ালে মেরে বেড়ায়।

কালু পিট পিট করে তাকিয়ে দেখে, পোস্টারে লেখা আছে রকমারি দাবিদাওয়ার কথা। যেমন, সিনেমা কর্মচারিদের বেতন বাড়াতে হবে, মিউনিসিপ্যালিটির ধাঙড়দের চাকরি স্থায়ী করতে হবে, রিক্সাপ্রতি জমার হার কমাতে হবে, মুনিষদের মজুরি বাড়াতে হবে, ইত্যাদি। ডোমপাড়ায় এক-দেড়শ পরিবারের বাস। তাদের ঘরের মেয়েমরদরা হয় মিউনিসিপ্যালিটিতে ধাঙড়ঝাড়ুদারের কাজ করে, না হয় মুনিষ খাটে। রিক্সাও চালায় ত্রিশ-চল্লিশ জন। জমার রিক্সা। মালিকের কাছ থেকে দিনপ্রতি দেড় দুই টাকার চুক্তিতে চেয়ে আনতে হয়। তারপর সওয়ারী হোক বা না হোক জমার টাকা দিতেই হয় রোজ সন্ধ্যায়। না দিলে রিক্সা কেড়ে অন্যকে জমা দিয়ে দেয় বাবুরা।

কালুর সতেরো বছরের ছেলে হারু ডোম, সোনা ডোমের ছেলে হীরা ডোম আর নয়ন ডোমের ভাই বিষ্টু ডোম— এই তিনজনে মিলে পাড়ায় দল গড়েছে। রাতের দিকে প্রায়ই ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়ায় ওরা। একএকদিন ধাঙ্গড়ঝাড়ুদারেরা কাজে যায় না. রিক্সাওলারা রিক্সা চালায় না। সবাই মিলে মিছিল বের করে—তার আগে ডোম-পাড়ার মানুষদের সঙ্গে হাত পা ছুঁড়ে চিৎকার করতে করতে যায় ওই তিন ছোঁড়া—হারু হীরা আর বিষ্টু ডোম।

কালুকে যেমন বকত কালু ডোমের বাবা, কালুও তেমনি বকে হারুকে, 'ই সব করে কি হবেক ? পয়সা আসবেক ?'

হারু বলে, 'আসবেক ! তবে এখন লয়, ক'দিন পরে !'

'কেনে ? ক'দিন পরে কেনে ?'

হারু বলে, 'আরো দু'চার বার মিছিল লিয়ে যেতে হবেক, কাজে বন্ধ দিতে হবেক. ধম্মোঘট হাঁকতে হবেক—তবে না বেঁকা বাবুরা সিধা হবেক ! এত সুজায় কি হয় ? ইট একরকম লড়াই বটে !'

শুনে কালু ডোমের চক্ষু স্থির হয়। তার হাতে প্রথম বর্ণপরিচয় বই দেখে তার বাপের যেমন হয়েছিল—কালুরও এখন সেই অবস্থা। বলে কি ছেলেটা ! লড়াই বটে ! কার সঙ্গে লড়াই ? কেমন লড়াই ? কালু পিটপিট করে তাকিয়ে থেকে তার বাপের মতই চিৎকার করে ওঠে, 'হারামজাদা, শুয়োর ! বাবুদের হাতেপায়ে ধরে কাজে ঢুকালাম তুকে। তু এখন বাবুদের সিনেমাহল বন্ধ করার লেগে ফন্দি আঁটিস। বাবুদের নামে গালমন্দ করে পোস্টার মারিস ! বাবুরা লাথি মেরে তাড়িন্ দেবে তুকে—'

সতেরো বছরের কালো কুচকুচে জোয়ান ছেলে হারু বলে, 'অত সুজা লয় ! তুমাদের কালের দিন এখন আর নাই গো। অনেক পালট হয়েছে…'

পালট যে হয়েছে কালু ডোম তা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারে। এখন শহরের চারদিকে তাকালেই কেমন অবাক হয়ে যায় সে। রকমারি পোস্টারে ছেয়ে গেছে দেয়ালগুলো। বাবুরা নিজের হাতে

আঠার টিন ঝুলিয়ে পোস্টার লাগায়। তুলি নিয়ে রং নিয়ে বসে বসে দেয়ালে লেখে। কথায় কথায় শহরের হাটতলায় মিটিঙ হয়, মিছিল হয়। ডোমপাড়ার ধাঙ্গড়েরা মিউনিসিপাল অফিস ঘেরাও করে বসে থাকে। এখানে ওখানে চারি দকেই লালপতাকা পত পত করে ওড়ে!

একদিন রাতের বেলায় ঘরে ফিরে কালু দেখে ডোমপাড়ায় উৎসব শুরু হয়েছে। দুটো মশাল জ্বলছে বড় বড়। মরদগুলো ঢোল বাজাচ্ছে, মেয়েগুলো হাসাহাসি ঢলাঢলি করছে। এক হাঁড়ি পচুই এসেছে বিষ্টুর রিক্সা করে, আরো দু'হাঁড়ি আনতে গেছে। আকণ্ঠ পচুই গিলে কেউ নাচছে ধেই ধেই করে, কেউ গলা ছেড়ে গান ধরে দিয়েছে, 'আমার সুখের ঘরের চাবিট কুথা হারিন্ গেল হে এ এ।' তার পাশে তিনটে ধাড়ি শুয়োর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কালু ডোম পায়ে পায়ে এসে দাঁড়াল। একজনকে জিজ্ঞেস করল ব্যাপারটা। সে জানাল, তিন দিন ধর্মঘট চালানোর পর আজ থেকে মিউনিসিপালিটির ধাঙ্গড়ঝাড়ুদারদের মজুরি বাড়ল হপ্তাপ্রতি দেড় টাকা। তারই জন্য......

শুনে কালু ডোমের চোখ চক চক করে উঠল। ছেলেটা তো মিথ্যে বলে নি তাহলে!

পরের দিন কুণ্ডুবাবুর বড় ছেলেকে গিয়ে ধরে বসল কালু, 'বাবু, অনেক দিন কাজকাম করলাম আমি! বেতনট ইবার বাড়াইন্ দ্যান—' কুণ্ডুবাবু এখন বুড়ো হয়েছেন। তার ছেলেরা বড় হয়ে উঠেছে। ব্যবসাপত্তর তারাই এখন দেখাশুনা করে। কালুর কথা শুনে বড়ছেলের গোলগাল মুখ গম্ভীর হ'ল, 'তোর গায়েও বাতাস লেগেছে দেখছি! তা তুই একা? না দল বেঁধে এসেছিস?'

কালু বলল. 'না বাবু, একাই এসেছি।'

শুনে নিবারণ কুণ্ডু কিছু ভাবল। এদিকওদিক তাকাল দু'চার বার। তারপর বলল, 'বাড়াব তোর মাইনে। কিন্তু এখন নয়, ভোটের পরে। ক'দিন পরেই তো ভোট! তা, তোকে একটা কাজ করতে হবে কালু—'

কালু ডোম স্বভাবমত পিট পিট করে তাকাল, 'আজ্ঞে, কি কাজ?'

নিবারণ কুণ্ডু বলল, 'তোদের ডোমপাড়ায় এখন খুব গোলমাল দেখছি—শালারা কেউ কেউ মিছিল-মিটিং-ধন্মঘট করছে। মনে হয় এবার ভোট ভাগাভাগি হবে।'

কালু বলল, 'তা হতে পারে!'

'উঁহু। তা হতে দেওয়া যাবে না। সেটাই দেখতে হবে তোকে। লোকগুলোকে বুঝিয়েসুজিয়ে ভোটের ঘরে আনতে হবে। তুই কতটা কি পারিস···দেখেশুনে মাইনে বাড়াব তোর।'

কালু বলল, 'আচ্ছা বাবু, আমি দেখব।'

কিন্তু ডোমপাড়ায় তখন অন্য হাওয়া বইছে। কালু ডোমের কথা কে শুনবে? তাছাড়া শত্রু তো তার ঘরেই···তারই ছেলে! কিছু বলতে গেলে কালকেউটের মত ফোঁস করে ওঠে। জোয়ান বয়সের রক্তের গরম···মানবে কেন বাপের কথা! বয়সকালে কালু নিজে কি শুনেছে? তবু পিতৃত্বের অধিকার বজায় রাখতে কালু ডোম চোখ রাঙিয়ে বলে, 'তুদের মরণপাখা গজাইন্‌ছে! মরবি ইবারে সব। বাবুদের ঘরকে কাজকাম করে, বাবুদের খেয়ে পরে বাবুদের ক্ষেতি করিস! পাপ লাগছে তুদের গায়ে! ই পাপে তুদের ভরাডুবি হবেক।'

কালু ডোমের ছেলে একমাথা ঝাকড়া চুল দুলিয়ে জবাব দেয়, 'পাপ? কিসের পাপ বটে? বাবুদের ঘরকে যেয়ে ভিখ্ মেঙে খাই আমরা? গতরে খাটি, পয়সা দেয়। খাটুনির দাম বটে সি-ট! তবে বাঁধা পড়লম কিসে? মুদের যাতে ভাল হবে তাই করব আমরা! লোকগুলানকে ভুল বুঝাবে না তুমি! ভুল বুঝালে ভাল হবেক না, বলে দিলম!'

কালু ডোম কিছু বলে না। চুপচাপ থাকে। বাপ হয়ে ছেলের বিরুদ্ধে সে লড়ে কি করে?

ভোটের ঠিক আগে-আগেই ডোমপাড়ার ধাঙড়েরা আবার কাজ

বন্ধ করে। মিউনিসিপ্যালিটি অচল হয়ে যায়। শহরের রিক্সা ইউনিয়নের ডাকে রিক্সা বন্ধ হয়। ডোমপাড়ার চল্লিশজন রিক্সাচালক মালিকের ঘরে রিক্সা জমা না দিয়ে পাড়ায় এনে পাকুড় গাছতলায় জড়ো করে রাখে। কথায় কথায় তাদের হাত থেকে রিক্সা কেড়ে নিয়ে রুটি মারা চলবে না···এই তাদের দাবি। চল্লিশটা রিক্সার হ্যাণ্ডেলে কাঠির ডগায় চল্লিশটা লাল কাগজের লাল পতাকা উড়তে থাকে।

কালু ডোম বলে, 'বাবু, ইবারে গতিক খারাপ। এক-ট ভোটও হবে না বাবু আপনাদের।'

'হবে না? একটাও না?'

নিবারণ কুণ্ডুদের মুখ শক্ত হয়, 'তোর ছেলেটাই তো এক নম্বর পাণ্ডা হয়ে উঠেছে! উস্‌কাচ্ছে সবাইকে! খবর রাখি আমরা···'

কালু ডোম হাত জোড় করে বলে, 'বাবু, উয়ার উপর রাগ করবেন না। ছেলেমানুষ বটে। বয়স হলে শুধরিন্ যাবে।'

'উঁহুঁ, শুধরাবে না। এ জিনিস শুধরাবার নয়। লালের বিষ রক্তে ঢুকেছে। দগদগে ঘা হয়ে ফুটবে···'

শুনে কালু ডোম আঁতকে ওঠে, 'কিসের বিষ বললেন বাবু?'

নিবারণ কুণ্ডু দাঁতে দাঁত চেপে বলে, 'লালপার্টির বিষ। কমিউনিস্ট হয়ে উঠেছে শালারা। আচ্ছা দেখছি···'

কালু ডোম মনমরা হয়ে ফিরে আসে। সে কিছু বুঝতে পারে না। দলে মিশে কাজ তো সে কোনোদিন করে নি। একা একা মই কাঁধে আঠার টিন নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে। সঙ সেজে চোঙা ফুঁকে নাচন কোঁদন করেছে। দল-গড়ার আর দলাদলির তাৎপর্য সে তো বুঝে ওঠার সময় পায় নি।

ফিরে এসে পাড়ার ছেলেদের ডেকে বলে, 'রিক্‌সাগুলান বাবুদের দিয়ে আয়!'

ওরা রুখে ওঠে, 'কেনে? ই কথা কেনে?'

কালু ডোম বলে, 'তুদের গাড়ি তো লয়। পরের জিনিস কেনে আটকিন্ রাখবি তুরা?'

'বাবুরা কেনে কথায়কথায় গাড়ি কেড়ে লিবে? আমরা খাব কি? কেনে ওদের হয়ে কথা বুলছ তুমি? ই তুমার কেমন ব্যাভার?'

কালু ডোম বোঝাতে পারে না ওদের। কেউ শোনে না তার কথা। ডোমপাড়ার পাঁচজনের জমা বাকি ছিল বলে দু'দিন আগে পাঁচজনেরই গাড়ি কেড়ে নিয়েছে বাবুরা। একজন মুখে মুখে তর্ক করেছিল বলে মেরে হাত পা ভেঙ্গে দিয়েছে। ডোমপাড়ার দক্ষিণ-অংশে গেলে এখনো তার গোঙানি শোনা যায়। চুণ হলুদের পুরু প্রলেপ তার সর্বাঙ্গে।

জমার হার না কমালে, পুরনো দেনা শোধের সময় না দিলে তারা কেউ রিক্সা ছাড়বে না। সার বেঁধে পড়ে থাকবে পাকুড়তলায়।

আর ভোট? ইবারে এ পাড়া থেকে একটা ভোটও যাবে না বাবুদের বাক্সে। বিশটা পচুইয়ের হাঁড়ি নামিয়ে দিয়ে গেলেও না। নেশা করলেও নেশা তাদের কাটতে শুরু করেছে।

কাজে কাজেই পুলিশ এল।

বাবুদের রিক্সা উদ্ধার তাদের প্রথম উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় উদ্দেশ্য ভোটের আগে ডোমপাড়ার মানুষগুলোর রক্ত থেকে লালের বিষ ঝেড়ে দেওয়া।

পাড়ার কুকুরগুলো ডেকে উঠতেই ঘরে ঘরে মানুষ সজাগ হ'ল। বাইরে বেরুবার চেষ্টা করল কেউ কেউ। লাঠি উঁচিয়ে পুলিশ তেড়ে গেল। তারপর ঘণ্টা দুই ধরে চলল আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কাজ।

মিউনিসিপালিটিতে ধাঙ্গড়-ধর্মঘটের আগে আগে ছিল যারা তারা মাথা ফাটিয়ে হাত পা ভেঙ্গে জালঢাকা কালোগাড়িতে উঠল। যারা রিক্সা এনে আটক করেছিল সেই চল্লিশটা মানুষের অধিকাংশ ডোমপাড়ার লাল কাঁকুরে মাটিতে বেশকিছু রক্ত জমা রেখে হাজতে গেল।

টর্চের আলো ফেলে পুলিশ ঢুকল কালুডোমের ঘরে। পুলিশের আঁচ পেয়ে তার ছেলে বাইরে বেরিয়ে ছিল—তারপর আর খোঁজ নেই। পুলিশ ঘরের মধ্যে আঠার টিন বাঁশের মই দেখে কালুর

মাথায় জোরে একটা লাঠির বাড়ি মেরে বলল, 'শালা, এই ঘরেই সব পোস্টার লেখা হয়, মিটিং হয়, ষড়্ পাকানো হয়। এটা একটা ঘাঁটি।'

কালু ডোমের মাথার উপরঅংশ কাটে নি, কিন্তু ফুলে উঠেছিল। চোখে অন্ধকার দেখছিল সে। তবু হাতজোড় করে বলার চেষ্টা করল, 'না বাবু—ইসব আমার জিনিস বটে। আমার কাজই পোস্টার মারা, বাবুদের পোস্টার—'

কিন্তু স্পষ্ট করে গুছিয়ে বলতে পারল না, তার আগেই 'শালা আমাদের সঙ্গে চালাকি করা হচ্ছে' বলে একজন বুটজুতোসমেত একটা লাথি মারল কালুর পেটে। কালু ডোম পড়ে গিয়ে জ্ঞান হারাল। কালুর বউ চিৎকার করে উঠতে গিয়ে দেখল গলা দিয়ে স্বর বেরুচ্ছে না, সারা গা ঠক ঠক করে কাঁপছে—দাঁতে দাঁত লেগে আসছে! সকালে জ্ঞান হবার পর কালু ডোম পাড়ার এখানে ওখানে জমাট রক্ত দেখল। কুকুরগুলো চেটে খাচ্ছে। কাকগুলো উড়াউড়ি করছে। শুয়োরগুলো ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দে কুকুরগুলোর মুখ দেখছে। গা ঘেঁষে দাঁড়াতে সাহস পাচ্ছে না। সমস্ত পাড়া কাটাছেঁড়া, ছিন্নভিন্ন, হতচকিত, রুদ্ধবাক্। কেউ কাঁদছে না, এখানেওখানে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডা নির্জীব কঠিন দৃষ্টিতে পরস্পরের মুখ দেখছে। তাদের মাথার উপর দু'তিনটে খোড়ো-ঘরের দগ্ধ কঙ্কাল থেকে তখনও অল্প অল্প ধোঁয়া উঠছে। বাতাসে কালো পোড়া খড়কুটো উড়ে বেড়াচ্ছে।

নীরবতা ভেঙে কালু ডোম চিৎকার করে উঠল, 'আমার বেটা? বেটাট কুথা? দেখেছ তুমরা উয়াকে?'

যারা দেখেছে তাদের একজন বলল, 'মরে নাই। গাড়িতে তুলে লিয়ে গেছে। হুই পাকুড়তলায় দেখ, উয়ারই রক্ত হবেক—'

যেখানে সার সার রিক্সা দাঁড় করানো ছিল কালু ডোম সেদিকে ছুটে গেল। কিন্তু অনেক রক্তের মধ্যে কোন্‌টা তার ছেলের রক্ত চিনতে পারল না।

কুণ্ডুবাবুদের বাড়ি ছুটে গেল কালু, 'বাবু, আমার বেটা—'

নিবারণবাবু সোনার ফ্রেমের চশমার ফাঁকে তাকাল ভুরু কুঁচকে, 'কি হয়েছে তোর ছেলের?'

'ধরে লিয়ে গেছে বাবু! মাথাট ফাটিন্ দিয়েছে—'

'দিয়েছে? কি আশ্চর্য!'

নিবারণবাবু যেন হাসছে মিট মিট করে। কালু ডোমের চোখ ছলছল করছে।

'ঘরে যা। ভোটের পরে ছেড়ে দিতে বলব!'

'না বাবু! দুব্‌লা শরীল বটে ওর, চোট খেয়েছে, হাজতে মরে থাকবেক বাবু—'

'মরে থাকবে? উঁহু, অত সহজে মরে না ওরা! তোর ভাবনা নেই। ঘরে যা, ভোটের পর আসিস—'

কালু ডোম প্রায় কেঁদে উঠল, 'না বাবু, এমুন বুলবেন না! সারা জীবন আপনার কাজ করলম আমি! আমার কথাট রাখেন—'

নিবারণবাবু হাসল, 'তুই খুব ভাল কালু! তোর মত মানুষ হয় না! কিন্তু তোর ছেলেটা আস্ত শয়তান একটা—'

শুনে কালু ডোমের চোখের জল শুকিয়ে গেল। বুকটা কেমন জ্বালা করে উঠল। যেন এতক্ষণে বুঝতে পারল, ডোমপাড়ায় পুলিশ ঢোকানোর মূলে এই বাবুদের হাত আছে। এরাই ষড়যন্ত্র করে ঘর পুড়িয়েছে তাদের, মাথা ফাটিয়েছে, রক্ত ঝরিয়েছে। নিবারণ দাঁত বার করে হাসছে, সেদিকে তাকিয়ে কালু ডোমের হঠাৎ কেমন ইচ্ছে হ'ল চিৎকার করে বলে, 'হ বাবু, বয়স-দোষে ছেলেট গোঁয়ার খানিক হয়েছে বটে, কিন্তু শয়তান হয় নাই। সি বটে আপনারা! আপনারা!'

কিন্তু বলল না, ফিরে এল নিঃশব্দে।

তার ক'দিন পরেই প্রচার-অফিস থেকে সান্যালবাবু ডেকে পাঠালেন কালুকে। একতাড়া পোস্টার দেখিয়ে বললেন, 'খুব জরুরী। আজ থেকেই লেগে যা কালু—'

কালু তাকাল পোস্টারগুলোর দিকে। সিনেমার পোস্টারের মত বড়সড় রঙচঙে। কালো কাগজের উপর জ্বলজ্বলে হলুদ অক্ষরে লেখা,

হিংস্রতা বর্জন করুন, বেঁচে থাকুন বাঁচতে দিন

কালু বানান করে করে পড়ল শব্দগুলো। অর্থ বোঝার চেষ্টা করল। তারপর কি মনে করে সান্যালবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ইসব কে ছাপা করাল বাবু? কুথা ছাপা হ'ল?'

সান্যাল বললেন, 'কলকাতায়। সরকারি পোস্টার, সরকার ছাপিয়েছে।'

'কেনে ছাপা করাল?'

'কেন? দেখছিস না চাদ্দিকে কেমন কাটাকাটি মারামারি! জোতদার খুন হচ্ছে, পুলিশ খুন হচ্ছে!'

কালু মুহূর্তকাল ভাবল। হাত রাখল মাথার উপর।

পুলিশের লাঠি খেয়ে ফুলেছিল। এখনো ব্যথা মরে নি। আঙুল দিয়ে জায়গাটা ঘষতে ঘষতে বলল, 'বাবু, আমাদের পাড়ায় সেদিন পুলিশ ঢুকল। কতজনার ঘর পুড়ল, হাত পা ভাঙ্গল, মাথা ফাটল! ডোমপাড়ার মাটি মানুষের রক্তে ভিজে গেল—শুনেন নাই বাবু?'

সান্যাল গম্ভীর হয়ে বললেন, 'শুনেছি।'

'ই কাজ যারা করল—তারা তো সরকারের খাকিপুষাকপরা তকমা-অাঁটা খাস লোক বাবু? লয়?'

সান্যাল বললেন, 'হ্যাঁ!'

তখন কালু ডোম আবার ক্ষণকাল নিঃশব্দ থেকে আশ্চর্য গম্ভীর গলায় বলল, 'তবে বাবু উয়াদেরকেই ডাকুন! ওই পুলিশগুলানকে! ডেকে বলুন ই পোস্টারগুলান্ উয়ারাই চিটাইন্ দিক। সিটই ভাল দেখাবেক। আমার বেটা এখুনো জেলহাজত থেকে ছাড়া পায় নাই বাবু। উয়ার মাথার ঘা-ট এখুনো শুখায় নাই, এখুনো রক্ত ঝরছে—'

বলে স্তম্ভিত সান্যালবাবুর রাগভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করে রাস্তায় নেমে পড়ল কালু ডোম। আর পিছন ফিরে তাকালও না।

[শারদীয় উত্তরযুগ, ১৩৭৯]

দরদামের গল্প

হাওড়া ব্রীজের ফুটপাতে অথবা শেয়ালদা স্টেশনের মোড়ে রাস্তার দু'পাশে আলো অন্ধকারে বসে যারা জিনিষপত্র বিক্রি করে, এখন তাদের সঙ্গে পারতপক্ষে আমি দরদাম করি না। করতে গেলে নিজেরই কেমন সঙ্কোচ হয়। সেই রোগা-পাতলা শ্যামবর্ণ চাষী-বউটির মুখ মনে পড়ে। কথাগুলো কানে বাজে। নিজেকে অপরাধী মনে হয়।

অথচ এইসব সস্তার বাজারে অনেকক্ষণ ধরে দরদাম করে জিনিষ কেনা আমার অভ্যাস। সন্ধ্যার মুখে থলি হাতে এই বাজারেই আমি ঘোরাফেরা করি। লাউ কুমড়ো কচুশাক, দেশী-বেগুন মেটে-আলু কি আধখানা নারকেল কিনে ঘরে ফিরি। ঠিকমত দর কষাকষি করে কিনতে পারলে যে-কোনো বাজারের চেয়ে সস্তা পড়ে।

আমি ঘোর সংসারী মানুষ। তিনটে বাচ্চা, বউ নিয়ে আমার পাঁচজনের সংসার। মাস গেলে সামান্য যা বেতন পাই তাতে এখন 'নুন আনতে পান্তা ফুরায়' বলাটাও অত্যুক্তি, অবস্থা একেকদিন এমন হয় যে, নুন ও পান্তা কোনোটাই জোটানো যায় না। কাজেই এই শহরের কোথায় কখন কোন্ জিনিষটা সস্তায় পাওয়া যায় আমাকে তার ধান্ধায় ঘুরতে হয়। অফিসে বসে যদি শুনতে পাই, শ্যামবাজারের মোড়ে মুশুরির ডাল এখনও চার টাকায় পাওয়া যাচ্ছে, কিংবা গড়িয়াহাটায় কণ্ট্রোল দরে তাঁতের শাড়িকাপড়, ধারদেনা করেও কিনবার জন্য ছুটি। যা পাওয়া যাচ্ছে এখুনি না কিনলে কাল কি পাওয়া যাবে? ওই দামে?

নেহাৎ দায়ে না ঠেকলে ট্রামেবাসে ভাড়া দিই না। বিশেষত বাঘমার্কা সরকারি বাসে। ভাড়া বাড়ানোর পর থেকে ওদের উপর যেন জাতক্রোধ জন্মেছে। কণ্ডাক্টর চাইলে, এমনভাবে ঘাড় নাড়ি যার 'হয়ে গেছে', 'হয় নি' কিংবা 'হতে যাচ্ছে' যে-কোনো অর্থই

হতে পারে। এরকম মিথ্যাচারে বিশেষ লজ্জিতও হই না। বরং ভাড়া না দিতে পারলে একধরণের আনন্দ হয়। সরকারি একটা যন্ত্রের উপর ছোটখাটো একটা আঘাত দেওয়া গেল ভেবে মেজাজটা খুশি হয়ে ওঠে। আসলে আইনমাফিক ভাড়া গুনে শহর ঘুরে সস্তার জিনিষ কিনতে গেলে জিনিষ আর সস্তা থাকে না। লাভের গুড় পিঁপড়েয় কি, ঝাঁক বেঁধে কাকে খেয়ে যায়।

দোষ হলে দোষ, গুণ হলে গুণ—আত্মরক্ষার জন্য আমি এখন হাড়ে হাড়ে হিসেবি। আগে কমদামের সিগেরেট খেতাম—এখন বিড়ি খাই। পাড়ার চেনা দোকানে লজ্জায় প্রথমটা কিনতে পারি নি। বলেছি, 'ওসব ছেড়ে দিয়েছি ভাই।' এখন দশটা পয়সা ছুঁড়ে বেশ জোর গলাতেই বলি, 'বিড়ি দাও কান্তদা, লাল সুতোর কড়া বিড়ি।'

দেশলাই জ্বালি না। কাগজ পাকিয়ে উনুনে ধরাই। রান্নার সময় বউটা গজ্ গজ্ করে। কিন্তু মেয়েমানুষের কথায় কান দিই না। দিলে সংসার চালানো যায় না। সাত পয়সার দেশলাই বারো পয়সা হয়েছে। তাও অর্ধেক জ্বলে, অর্ধেক নষ্ট হয়। হিসেব করলে দাম চব্বিশ পয়সা। কথায় কথায় কি এখন কাঠি ঠোকা যায়? তাহলে সিগেরেট ছেড়ে বিড়িতে লাভ কি থাকল?

আমি এখন পায়ে পায়ে হিসেব করে পথ চলি। একটা গেঞ্জি একটা আণ্ডারপ্যাণ্ট সাতদিন পরি, ঘামে ময়লায় কুটকুটালে জলে কাচি। রবিবারের আগে সাবান ছোঁয়াই না। চুলে একদিন অন্তর তেল দিই, মাসে একবার চটিজোড়া পালিশ করাই। দাড়ি কাটার ব্যাপারে একটু শৌখীন ছিলাম, এখন নেই। গাল জুড়ে খোঁচা খোঁচা হয়ে থাকল কি না-থাকল তাতে কোন্ শালার কি, এর জন্য প্রমোশন আটকাচ্ছে না তো আমার, কিংবা মোলায়েম মুখ করে প্রেম করতেও যাচ্ছি নে কারো সঙ্গে…কাজেই সাতদিনে একদিন কাটি, ব্লেডের খরচ কমাই। সেদিন ছোট ছেলেটা পুরনো একটা দুধের কৌটো ঠক ঠক করে দেয়ালে ঠুকছিল বলে টেনে একচড়

কষিয়েছি, 'জানিসনা হারামজাদা, পঞ্চাশ পয়সা দাম এটার? বিক্রি করলে হাফ কেজি কুমড়ো হবে!'

কি একটা 'ওয়েসিস'-জাতের মাথায়-মাখার তেলের বাড়াবাড়ি বিজ্ঞাপন দেখে বউটা সেদিন লোভে পড়ে বলেছিল, 'আনবে একটা?' আমি ধমকে দিয়েছি। কুঁজোর আবার চিৎ হয়ে শোয়ার শখ! তিন ছেলের মা, বুক-পিঠ শুকিয়ে একাকার, গায়ে হাত ঠেকালে মনে হয় চৌকাঠে ঠোক্কর খেলাম, কোনোকালে যৌবন ছিল কি ছিল না হড়প্পার মতো খোঁড়াখুঁড়ির ব্যাপার এখন…বলে কিনা অমুক তেল চাই! তিন কেজি চাল হয় ওর দামে!

আমি খুব জোরেই ধমকে দিয়েছি, 'ওসব বিলাসিতা ছাড়ো। ইচ্ছে হয়তো মাটি ঘষো'গে মাথায়। রাস্তায় অনেক মাটি খুঁড়ে বের করেছে সি-এম-ডি-এ। মাটিতে চুল ভাল থাকে।'

এর আগে একদিন বুঝি এককৌটো দামি পাউডার চেয়েছিল। সেদিনও ওইরকম মেজাজ নিয়ে কি একটা বলেছিলাম। সম্ভবত উনুনের ছাই মাখতে। কেননা ছাইটা এন্টিসেপটিক্। মাখলে ঘামাচি হয় না, শরীরস্বাস্থ্য ভাল থাকে!

ইদানীং আমার কথাবার্তা ওইরকমই হয়েছে। খরখরে, কাটা কাটা। বউটা তো আর পুরনো আমলের মত ষোলোআনা ক্রীতদাসী না, সইতে পারে না সবসময়। ফলে গর্‌গর্ করে, রোঁয়া ফোলায়, কান্নাকাটি করে, জিনিষপত্র ভাঙতে চায়। সংসারে তুমুল অশান্তি হয়।

আমিও ওষুধ জানি। না খেয়ে অফিসে চলে যাই। সারাদিন টুকিটাকি এটাওটা খেয়ে সন্ধ্যায় এমন মুখ করে ফিরি, যেন খিদেয় শরীর কাহিল, শব্দ ফুটছে না গলা দিয়ে, সোজা দাঁড়াতেও বিষম কষ্ট। ওতেই কাজ হয়। বউটা ভিজে বেড়ালের মত মিনমিন করে, 'এসো, খেয়ে নাও! না খেলে কি শরীর টেঁকে। আমি এমন কি বলেছি যে তুমি বাড়া ভাত ঠেলে চলে গেলে……'

সন্ধি হয়। অধিকন্তু একবেলা চালের খরচ বাঁচে। আমি খাইনি

বলে বউটাও না। ফলে এক ঢিলে দুই পাখি।

ইদানীং বাড়ি থেকে বেরুনোর সময় ঝোলা কাঁধে রাখি। তার মধ্যে বাজারের থলে। যেতে আসতে কখন কোন্ জিনিষটা পাওয়া যায়, কোনটা উধাও, ঠিক কি। সবসময় তৈরী থাকলে ঠকতে হয় না। সেই সেবার, অফিস-ফেরৎ হঠাৎ শুনলাম, সারাদিন লোড্-শেডিং-এ হিমঘর অচল, বরফের আকাল, পচনের ভয়ে আড়তের যত ইলিশ বৈঠকখানায় এসে গেছে। ছুটতে ছুটতে গিয়ে দেখি, আহা, সত্যি ইলিশ, কত ইলিশ! হ্যাজাক আলোর নীচে মনে হচ্ছে যেন গলানো রূপোর বালতি উল্টে গেছে। রূপোর পদ্মফুল চকচক করছে। ষোলো টাকার মাছ আট টাকা। মাসের প্রথম দিক, পকেটে কিছু পয়সা ছিল···তবু কিনতে পারলাম না। নিই কিসে? দড়ি বেঁধে ট্রামেবাসে উঠলে ঘাড় ধরে নামিয়ে দেবে। বর্ষার দিনে ছাতা নিলেই তেড়ে আসে। এমন সস্তার মাছ, ঝাল, ঝোল, কলাপাতায় সর্ষে বাঁটা, আহা, জিভে জল এসে যায়···কিনা ছেড়ে দিয়ে আসতে হ'ল!

সংসারে সে বড় কষ্টের দিন। যেন প্রিয়জনকে রেখে এলাম শ্মশানে এমন ভেজাভেজা করুণ গলায় বউকে খবরটা দিতেই তার চোয়ালের হাড় ঠেলে উঠল, চোখের পাতা টানটান হয়ে গেল, 'আহা কতদিন খাইনি! যদি আনতে!'

আমি রুষ্ট হয়ে বললাম, 'যদি রুমালটাও দিতে!'

বউটার চোখে প্রায় জল এসে গেল, 'তোমার হাতের কাছেই তো রেখেছিলাম···

'কাল থেকে নীল ঝোলাটা দেবে, সঙ্গে বাজারের থলে। এই শালার শহরে কোন্ দরে কোথায় কখন যে কি পাওয়া যায়···'

ঠিক নেই! কিছ্ছু ঠিক নেই! কখন যে কি পাওয়া যায়, কি অদৃশ্য হয়, কার দরদাম কি দাঁড়ায়, কিছু ঠিক নেই। যেন রাজ্য জুড়ে ম্যাজিকের খেলা চলছে। এই কলকাতা শহর যেন তার মেইন্ স্টেজ। ময়দানের কাছাকাছি কোথাও বিশালদেহ এক ম্যাজিসিয়ান, চুম্‌কি বসানো ঢিলেঢালা আলখাল্লা গায়ে, মাথায় জরির টুপি, পায়ে

বুটিদার নাগরা জুতো, টান টান দাঁড়িয়ে হাত তুলে ,চিৎকার করে বলছে, 'লেডিজ এণ্ড জেণ্টেলম্যান, এই দেখুন···আমার হাতের খাবার দিকে ভাল করে তাকিয়ে দেখুন···কি দেখছেন ?'

'টিন, একটা টিন !'

'কিসের টিন ?'

'আমরা পড়তে পারছি না, আপনি বলুন।'

'বেবিফুডের। দেখছেন না, টলটলে বাচ্চার মুখ ?'

'চিনতে পারছি না। অমন বাচ্চা যে আমাদের ঘরে নেই !'

'না থাক, ছবি দেখুন, টিন দেখুন। এই আপনাদের চোখের সামনে খাবার উপর নাচাচ্ছি, এই লোফালুফি করছি। দেখুন, ভাল করে দেখুন। আছে ?. এবার ? এখন আছে ? ভাল করে দেখুন···'

'যাচ্চলে। কোথায় ? হে ম্যাজিসিয়ান, টিন কোথায় গেল ?'

'ভ্যানিশ্‌ড্‌ !'

'ভ্যানিশ্‌ড্‌ ?'

'হ্যাঁ। ওই যে মোটা ভারি কালোপর্দা দেখছেন, তার পেছনে। যদি বলেন, আবার আনতে পারি।'

'আনুন, আবার আনুন, এনে দেখান।'

'উঁহু ভাইসাব, ফোকটসে হোবে না। ফোকটসে শালা কই কাম হোতা নেহি, পয়সা ফেকো, রূপেয়া ফেকো ! বাচ্চালোক জোরসে হাত্তালি লাগাও···'

বাঃ, চমৎকার হে ম্যাজিসিয়ান ! এই ছিল, এই নেই, আবার এই এসে গেল ! দোকানে দোকানে বেবিফুডের পিরামিড্‌। শিশুর পুষ্ট মুখ স্বর্গের হাসি হাসছে। তুলতুলে গালের পাহাড়ে কত মাংস ! আহা, কাদের ঘরের শিশু ওরা ?

না, বেবিফুডে দরকার নেই। সে একসময় ছিল হন্যে হয়ে ঘুরেছি। এখন আমার ছোটটারই বয়স আড়াই। দিব্যি ভাত খায়, রুটি খায়, লাউ-কুমড়োর চচ্চড়ি, কচুবাটা মূলোর শাক বেগুন-পোড়া খায়। বেবিফুড্‌ দূরে থাক, আমি এখন ঘরের দুধই বন্ধ করে দিয়েছি।

ঞেক জলের মত টলটলে দুধ পয়সা দিয়ে কত কেনা যায়। তুমি বলতে পারো হে ম্যাজিসিয়ান, পাউরুটি কোথায় গেল? আমার বাচ্চাটা দারুণ ভালবাসে। সকালে বিকালে একটু ছিঁড়ে না দিলে কেঁদে-কেটে বাড়ি মাথায় করে।……পাউরুটি কোথায় গেল?

ঠিক এই!

এখন সকাল থেকে সন্ধ্যা, গভীর রাত পর্যন্ত কেবল এই এক ধান্দা। কোথায় গেল, কোথায় আছে, কোথায় আসবে, কত দাম দাঁড়াবে। সংসারের দরকারি জিনিষপত্র আর তার দরদাম ছাড়া এখন মাথায় কিছু ঢোকে না। গল্প না, গান না, সিনেমা না, এমন কি দেয়ালে দেয়ালে সাঁটা উদোম ন্যাংটা মেয়েছেলের বিজ্ঞাপনও না! আগে অফিস-পাড়ায় নাটক হলে কার্ড যোগাড় করে দেখতে যেতাম। রাস্তার স্টলে দাঁড়িয়ে দু'একটা সাপ্তাহিকের পাতা উল্টাতাম। এখন সব বিস্বাদ, বিরক্তিকর, অর্থহীন। এখন দিনরাত শুধু এক ভাবনা, এক চিন্তা, এক গল্প। ট্রামে-বাসে, অফিসে-বাড়িতে, হাটে-বাজারে গলির মুখে, রকে-বারান্দায়, চায়ের দোকানে সর্বত্র সকলের সঙ্গে ওই এক আলাপ।

অফিসে ফাইল ঘাঁটতে ঘাঁটতে শুনি কেউ বলছে, 'এইবেলা চিনি কিছু স্টক করে রাখুন দাদা। সাড়ে-ছয় হয়েছে। পূজোর মুখে আটে গিয়ে ঠেকবে।'

কেউ বা, 'নুনও কিছু কিনে রাখুন ভাই। আরেক দফা দাম বাড়ল বলে।'

গলির মুখে কালী মাস্টার বলে, 'কয়লা কিনলুম ভাই। আপনিও কিছু কিনে রাখুন। শুনছি ক'দিন মাল আসবে না। যাহোক দুটো ফুটিয়ে তো খেতে হবে। বনমানুষের মতো কাঁচা তো আর খাওয়া যায় না।'

বিড়ির দোকানের কান্ত বলে, 'কেরোসিন খুঁজছিলেন? মল্লিকের দোকানে এসেছে। লম্বা লাইন। টিন নিয়ে চলে যান ছুটে।'

ঘরে ঢুকতেই বউ গজ গজ করে, 'লণ্ড্রীতে আর ইস্ত্রি করানো

যাবে না। একটা পাঞ্জাবি বলে কিনা ত্রিশ পয়সা। কতদিন বলেছি ইলেকট্রিকের না পারো একটা লোহার কেনো। কাচতে যদি পারি, ইস্ত্রিও পারব।'

আমি শালা কত কিনি, কত রাখি, কত জায়গায় লাইন মারি, ছুটোছুটি করি! এত পয়সাই বা পাই কোথায়? পকেটে ওই তো ব্যাঙের আধুলি, এটা ধরলে ওটা লেজ তুলে পালায়, ওটা ধরলে এটা দড়ি ছেঁড়ে। কোন্‌দিক সামলাই।

সারাদিন মাথায় দরদামের পোকা কিলবিল করে। রকমারি সংসারি জিনিষপত্রের ভাবনায় শরীরমন অস্থির-অস্থির হয়। তারপর রাতে শুয়েও নিস্তার নেই। ওই এক চিন্তা। কাল কি খাব, কি আনব, কি পাব, কি পাব না, কোথায় কোন্ বাজারে গেলে সস্তায় পাব......

এই সব ভাবতে ভাবতে ঘুমোই। ঘুমোতে ঘুমোতে আবার এই-সবই স্বপ্ন দেখি।

কখনো মনে হয়, আমার সামনে একটা উঁচু খাড়া পাহাড়। পাহাড়ের উপর থেকে ঝর ঝর করে ঝর্ণা নামছে। খালি জল পড়ছে না, জলের সঙ্গে সতেজ জীবন্ত মাছও লাফিয়ে লাফিয়ে নামছে। আমি ঝাঁপিয়ে পড়ে দু'হাতে একটা টেনে তুললাম। মাছটা ছটফট করছে। অথচ শক্ত হাতে কোলের কাছে টেনে আনতেই দেখলাম, মরে গেছে। বরফের মতো ঠাণ্ডা শরীর। মুখ দিয়ে ফেনা গড়াচ্ছে। পচা দুর্গন্ধে জায়গাটা ভরে উঠেছে। আমি টাটকা ভেবে মাছটার শরীরে কামড় বসাতে গিয়েছিলাম। এখন রাগে দুঃখে ছুঁড়ে দিতেই পচা-গলা শরীর খণ্ড খণ্ড হয়ে চারদিকে ছিটকে গেল। পেছন থেকে কে যেন ধমক দিল আমাকে, 'রাজ্যের পচামাছ সস্তায় কিনে আনো তুমি। দেখতে পাও না? কানা?'

অবিকল আমার বউয়ের গলা!

ঘাড় ফেরাতেই ঘুমটা ভেঙে গেল।

কখনো দেখি: আলোয় ঝলমল করা পরিষ্কার প্রশস্ত রাস্তা দিয়ে

বিরাট চৌকো একটা পাউরুটি, ওজনে প্রায় বিশ পাউণ্ড, চমৎকার রাজকীয় পোষাক পরে গড়িয়ে গড়িয়ে চলে যাচ্ছে। তার বুকের উপর উঁচু মিনারের মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে ঘন সোনালী রঙের একটা পাউডারের কৌটো। তাকে ঘিরে, সিনেমার বিজ্ঞাপনে যেমন দেখায়, ঘুমের ঘোর-লাগা মায়া-জড়ানো রঙ-বেরঙের ফুলের বেষ্টনী। হালকা-ভাবে ফুলগুলো গড়িয়ে যাচ্ছে, রাজকীয় পোষাক পরা পাউরুটিটা গড়িয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কি আশ্চর্য, মিনারের মতো উঁচু পাউডারের কৌটোটা পড়ে যাচ্ছে না। যেন সার্কাসের খেলা। তারের উপর দিয়ে গাঢ় হলুদ রঙের কাঠের ড্রামটা গড়িয়ে যাচ্ছে, কিন্তু গোলাপী আঁটোসাঁটো পোষাকের খর্বাকৃতি মেয়েটা তার উপর ব্যালান্স রেখে চমৎকার দাঁড়িয়ে থাকছে।

আমি লোভীর মত ছুটে ধরতে চাইলাম। কে যেন বাধা দিল। কে? জরির টুপি মাথায়, জরির পোষাক গায়ে, সবুজ বুটিদার নাগরা পরা বিশালদেহ একটা মানুষ। পথ আটকে সামনে দাঁড়াল। মড়ার খুলির মতো মুখে সাদা দাঁত বের করে হাসল। তারপর লম্বা হাতের থাবা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'রূপেয়া ফেকো! রূপেয়া।'

আমি ক্রুদ্ধ হয়ে পকেট থেকে একটা টাকা ছুঁড়লাম। মাটিতে পড়ে কাগজের নোট্‌টা ধাতব সিকি হয়ে গেল। আবার ছুঁড়লাম আবার সিকি হয়ে গেল। আমি বিরক্ত হয়ে এ-পকেট ও-পকেট খুঁজে আরো ক'টা টাকা ছুঁড়ে দিলাম। মাটিতে পড়তেই সবগুলো ছোটোখাটো গোলাকার সিকি হয়ে গড়াতে লাগল। গড়াতে গড়াতে সেই দৈত্যের মতো লোকটার কাছে পৌঁছোনো মাত্র সে নাগরা জুতো সমেত একটা পা আধখানা তুলে সব চাপা দিয়ে ফেলল। 'এটা কি হচ্ছে, ইয়ার্কি নাকি?' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'আমার টাকা কোথায় গেল?' 'টাকা! টাকা কোথায়!' লোকটা দাঁতে দাঁত বাজিয়ে শব্দ করে হাসল, 'রূপেয়া তো সোব পয়সা হোয়ে গেল!' তারপর শূন্যে হাত ঝাঁকিয়ে একটা ডুগডুগি এনে শব্দ করে বাজাতে বাজাতে বিকট চিৎকার করে বলল, 'বাবু ছাখো! বিবি ছাখো! ময়দানমে

মাদারিকা খেল্ ছাখো ! রূপেয়া ক্যায়সে পয়সা বন্ যাতা ছাখো…’

লোকটার ধাপ্পাবাজিতে রাগে দুঃখে অপমানে আমি আকাশ ফাটিয়ে চেঁচাতে চাইলাম। গলা দিয়ে স্বর বেরুলো না। গোঁ গোঁ শব্দ শুনে বউ ধাক্কা মেরে জাগাল, ‘ওঠ। ওঠ শীগ্‌গির ! তোমায় বোবায় ধরেছে।’

এইসব এবং এইরকম আরো কিছু স্বপ্ন আমি প্রায়ই দেখি। আসলে সারাদিন জিনিসপত্র দরদামের পেছনে ছুটোছুটি করে মাথার কোষগুলো উত্তপ্ত অবসন্ন হয়ে থাকে বলে যত রাজ্যের উদ্ভট স্বপ্নেরা ভিড় করে। জেগে গেলে মনে থাকে না। মনে থাকলেও অর্থ পরিষ্কার হয় না।

তবে টাকার সিকি হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা আমি বুঝি। ট্রামে বাসে প্রায়ই শুনি তার কথা। এখন টাকা আর টাকা নেই, তার দাম পঁচিশ পয়সায় ঠেকেছে। টাকা দিলে এখন পঁচিশ পয়সার জিনিষ আনা যায় ঘরে। দিনে দিনে দর আরো নামবে। নামতে নামতে একটা টাকা কোন্‌দিন একটা নয়া পয়সা হয়ে যাবে। তখন একটা বিড়িও কেনা যাবে না তা দিয়ে। কোথায় কোন্‌দেশে এমন কাণ্ড নাকি একসময় হয়েছে—

ভাবলে শরীর আরো ঠাণ্ডা হয়ে আসে। বুকের মধ্যে ভয় গুড় গুড় করে ! হয় নাকি এরকম ! এখানেও হবে ? তাহলে আমার কি হবে ! আমার সংসারের কি হবে ! কি দিয়ে আর তখন কি কিনব আমি ! আমার মাইনের কাগুজে টাকার তখন তো দাম থাকবে না কিছু ! আর সঞ্চয় বলতে, সোনাদানা জমি-জমা না, ঘরে আছে তো ডজন খানেক রূপোর টাকা—

সে টাকার দাম অবশ্য কমছে না। কমবে না কোনোদিন। ভরি খানেক রূপো ভরা আছে একেকটাতে। রূপোর দাম যত বাড়ছে সেই টাকার দামও তত ! আমি একবার বউবাজারে খোঁজ করেছিলাম, একটাকায় আঠারো টাকা দেবে বলেছে—

সিঁদুর-লেপা সেসব টাকা নাকি ‘যাত্রা’র টাকা। দশমীর দিন

দুর্গার পায়ে ঠেকিয়ে বাক্সে ভরেছিলেন আমার পিতামহী। মা-ও দু'একটা রেখেছিলেন। সে টাকা গৃহলক্ষ্মী। খরচ করতে নেই। তবু মাসের শেষে দু'একবার হাতানোর চেষ্টা করেছিলাম। বউটা সন্দেহ করে বাক্স থেকে অন্য কোথাও সরিয়ে ফেলেছে। কিছুতেই আর পাত্তা করতে পারছি নে!

পুরনো রঙ-চটা সেই বাক্সেই পোকায়-খাওয়া একটা বেনারসী, বাণ্ডিল কিছু দলিল-পত্র, কাঁসার ভারি কয়েকটা থালাগ্লাসের সঙ্গে একটা হিসেবের খাতাও সযত্নে রাখা আছে। বাবার নিজের হাতে লেখা বাড়ির বড় বড় কিছু ক্রিয়াকর্মের হিসাব। বউ কখনো ডালা খুললে খাতাখানা নিয়ে নাড়াচাড়া করি। পাতাগুলো লাল হয়ে গেছে, কালির দাগ অস্পষ্ট। তবু বেশ পড়া যায়। আমার অন্নপ্রাশনের হিসাব আছে তাতে—

সন ১৩৪০, ১৫ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার।

আমার প্রথম পুত্র শ্রীমান মধুসূদন ঘোষালের শুভ অন্নপ্রাশনের ফর্দ—

সরু চাউল	১/	—৮৲
মুগের ডাল	/০	—১।০
মিহি ময়দা	/।০	—১৶
গব্যঘৃত	/৫	—৯৲
সর্ষপ তৈল	/।০	—৫৶
আলু	/॥০	—১।৶......

.........পড়তে পড়তে মাথা ঝিম ঝিম করে। বউটাতো রীতিমত হাঁ হয়ে যায়। বাপ-মা'র কত আদরের ছিলাম আমি, আমার মুখে ভাতে কত লোক খাওয়ানো হয়েছিল, কত ঘটা হয়েছিল—এসব ভুলে ড্যাবা ড্যাবা চোখে বলে ওঠে, 'একমন চাল আট টাকা? আধমন আলু একটাকা দু'আনা? বলো কি? এত সস্তা ছিল! হ্যাঁগো, এত সস্তা!'

'এত সস্তা!' আমি একটা দীর্ঘশ্বা[illegible] পুরনো দামি দলিলের

মতো সযত্নে খাতাখানা তুলে রাখি। বাবাকে আমার সুখী মানুষ বলে মনে হয়। অসম্ভব সুখী! আমার বুকে ঈর্ষা টলটল করে!

এক পয়সা সের বেগুন এখন তো স্বপ্ন! আড়াই টাকা কেজির বেগুন দু'টাকায় পাওয়া যায় কিনা তার জন্য আমি বাজার ফুটপাত রাস্তা হাওড়া এবং শিয়ালদহ স্টেশন চষে বেড়াই!

শহরের পাকা-পোক্ত শান-বাঁধানো বাজারগুলোতে বড় একটা ঢুকি না। ঢুকতে সাহস হয় না। ওখানে বেদীর উপর আলোর নীচে যারা বসে তারা কথায় কথায় বড় অবজ্ঞা করে, মেজাজ দেখায়। যেন আমি গাঁটের কড়ি গুনে কিছু কিনতে আসি নি, চোরাইমাল ব্যাগে ভরে বেচতে গিয়েছি ওদের কাছে! ওই বাজারে ঢুকলেই মন-মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে ওঠে। রাগী একটা এ্যালসেশিয়ানের মতো গরগর করি, 'এই চিম্সানো পটল তিনটাকা? বলো কি হে?'

দোকানদার বাবু বাবু, গায়ে গেঞ্জি, হাতের কব্জিতে একটা ঘড়িও আছে, কটমট করে বলে, 'সকালে তো সাড়ে তিন গেছে, এখন বেলা হয়ে গেছে তাই—'

আমার রাগ আরও বাড়ে, 'গেলেই হ'ল! পটলের কি মড়ক লেগেছে দেশে! ওই তো বাইরে দেখে এলুম আড়াই—'

'রাস্তার পটল?' দোকানদার ঠোঁট উল্টে চোখ কুঁচকে আমায় যেন ভেংচি কাটে, 'তাহলে রাস্তা থেকেই কিনুন গে, এখানে ঘাঁটা-ঘাঁটির দরকার কি!'

অবিকল এইরকম ভাষা আলুওলা বলে, মাছওলা বলে, মাংসওলা বলে। যেন দরদাম করাটা অপরাধ। যেন হাতে তুলে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে জিনিষ বাছাই করাটা বেআইনী। যেন জিনিষের দাম বেড়েছে বলে ভালমন্দ দেখে কেনার অধিকারও হারিয়েছি।

আসলে, আমি বুঝে গেছি, এখন ওটা হ'ল উঁচুজাতের বাজার। আমার পোষাক-আষাক, মাইনে-কড়ি বা কেনাকাটার ক্ষমতা ওই বাজারের উপযুক্ত না। আমি ষোলো টাকা কেজির মাছ, তিন টাকার পটল, আড়াই টাকার বেগুন কিনতে পারি না। যারা পারে তারা

এখন ওই বাজারের আদরের মানুষ।

আমি ছাপোষা কেরানি। ফুটপাতে, রাস্তায় অথবা হাওড়া ব্রীজের উপর যারা জিনিসপত্র নিয়ে বসে তাদের কাছে কেনাকাটা করি। গাঁ-ঘরের চাষীমানুষ তারা। ক্ষেত থেকে শাকসব্জি, পুকুর থেকে মাছ কাঁকড়া ঝিনুক, বাড়ির উঠোন থেকে লাউ কুমড়ো পেঁপে তুলে আনে। হিমঘরের ঠাণ্ডা বাসি মাল বেচে না। জলে ডুবিয়ে রেখে ওজন বাড়ায় না, রং করে মানুষও ঠকায় না। পাকা উঁচু বাজারের মতো ওরা এখনও এত ছলাকলা চতুরালি শেখেনি।

এই বাজারে ঘুরলে জিনিসপত্র সস্তায় পাওয়া যায়। যতক্ষণ খুশী দরদাম করা চলে। পাল্লা ঝুঁকিয়ে ওজন নেওয়া যায়। এবং দরদামে না পোষালে গালিগালাজও করা যায়। এই বাজারে এলে ছেঁড়া ফাটা জামা আর পকেটের সামান্য পয়সাতেও নিজেকে এখনও বেশ বাবু-বাবু বলেই মনে হয়!

কালো কালো অর্ধউলঙ্গ মানুষ। ট্রেন ধরে গ্রাম থেকে আসে। বেচাকেনার শেষে রাতের দিকে ঘরে ফিরে যায় অথবা ফুটপাতে রাত কাটিয়ে দেয়।

অধিকাংশই চাষীঘরের মেয়ে বউ বিধবা। নানা মাপের, নানা বয়সের। রকমারি জিনিষের সঙ্গে কোলের বাচ্চাও বয়ে আনে কেউ। প্রকাশ্য রাজপথে উদোম শরীরে শুইয়ে রাখে শিশুকে। তার প্রায় গা ঘেঁষেই ট্রাম চলে যায়। সস্তার বাজার বলে ভিড় বেশী। সন্ধ্যা-বেলা আমার মতো হাজার মানুষ হুমড়ি খেয়ে পড়ে এখানে। গায়ে গায়ে ধাক্কাধাক্কি ঠেলাঠেলি করে জিনিস কিনতে হয়। গোলমালের মধ্যে দরাদরি করতে হয় গলা ফাটিয়ে, 'কি গো মাসী, তোমার ডুমুর নাকি? ভাগা কত? বলো কি, পনেরো পয়সা! তুমি দেখছি মাসী, ডুমুর বেচেই বাড়ি তুলবে গাঁয়ে! পাঁচ পয়সায় দাও এক ভাগা—'

'না গো বাবু, না।' গলায় তুলসীর মালা প্রৌঢ়া বিধবা মেয়ে মানুষটি বলে। রাগ করে না, মেজাজ দেখায় না, অবজ্ঞায় উল্টে দেয়

না ঠোঁট। বরং আমিই সতেজে ধমকে উঠি তাকে, 'কেন, দেবে না কেন শুনি? কমটা কি বললাম? এর বেশি দাম হয় নাকি ওর! দাও, তুলে দাও দু'ভাগা—' বলতে বলতে আমি নিজেই ডুমুরে হাত লাগাই। দুটো ভাগা এক করে তুলে ফেলতে চাই থলিতে। যেন জিনিসগুলো আমারই, ওর কাছে জিম্মায় ছিল, এখন সম্মতি ছাড়াই তুলে নিতে পারি!

এইভাবে ফুটপাতে আমি জিনিস কিনি। কখনো ডুমুর, কখনো চালতা, কখনো কলার থোড় মোচা, দিশি পটল, রাঙা আলু ঢেঁকিশাক। এই বাজারটা আছে বলে এখনো খেতে বসে দু' একটা তরিতরকারির মুখ দেখি!

কিন্তু একদিন বেওয়ারিশ এই রাস্তার বাজারে দরকষাকষি করতে গিয়েই ঠোক্কর খেলাম। বাচ্চা-কোলে চাষীঘরের একজন কমবয়েসী বউমানুষ খুব নরম ভদ্র গলায় যেন একটা চড় কষাল আমার মধ্যবিত্ত গালে। আমি খুব আশ্চর্য হয়ে ওর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

গুটিকয়েক চালতা, কিছু কাঁচাহলুদ আর কিছু শাপলা নিয়ে সিনেমা হলটার একপাশে বসেছিল বউটি। তার শরীরের একাংশে আলো পড়েছে, অন্য অংশে অন্ধকার। তবু বোঝা যায়, পঁচিশের বেশি বয়স না। শীর্ণ রোগা শ্যামবর্ণ দেহ। মুখটা গোল ছাঁদের। নাকটা মোটা। কপালে মেটে সিঁদুরের দাগ, হাতে লোহার চুড়ি। খাটো, গামছার মতো জালিজালি, একটা রঙিন ডুরে শাড়ি পরনে। হাঁটু ভাঁজ করে খদ্দেরের আশায় বসেছিল। কালো ন্যাংটা বাচ্চাটা আধখানা শরীর রাস্তায় আধখানা শরীর বউটার কোলে রেখে চিৎ হয়ে শুয়েছিল। ঠিক ঘুমুচ্ছিল না, মাঝে মাঝে মাটিতে ওর কচিপায়ের দাপাদাপি লক্ষ্য করা যাচ্ছিল।

ঝুঁকে পড়ে শাপলার দর করছিলাম। বেশ পুষ্ট শাপলা, ডগার ফুলগুলো আধফোটা হয়েছে, দেহটা কচি আছে। ডালে দেওয়া যাবে, মশলা ছিটিয়ে চচ্চড়ির মতোও হতে পারে। গোলাকার একটা

আঁটির মধ্যে ঠিক কতগুলো শাপলা একত্রে বাঁধা আছে অথবা রুগ্ন পচা ভজাল কিছু আছে কিনা খুঁটিয়ে দেখে সন্তুষ্ট হয়ে বললাম, 'কত করে দিচ্ছ গো, মেয়ে?'

বউটা মুখ তুলে আমাকে একপলক দেখে বলল, 'চার আনা আঁটি বাবু।'

স্বভাবমতো আঁৎকে ওঠার ভান করলাম, 'এ্যাঁ! বলো কি! এই কটা শাপলা পঁ-চি-শ পয়সা! গলা-কাটা দাম বলছ যে গো মেয়ে!'

বউটা মুখখানা তুলে রেখেই বলল, 'গলা-কাটা দাম হ'ল, বাবু?'

'হ'ল না?' রুষ্ট বিরক্ত ভঙ্গিতে আমি প্রায় ধমকে উঠলাম, 'গরু ছাগলের খাবার এসব! চার আনা দিয়ে শাপলা কিনে মানুষে খায়?'

'খায় না?' বউটা শুকনো মুখে একটু যেন হাসল, 'আমাদের গাঁয়ে কত মানুষ শাপলা খেয়ে আছে। আমিও দুপুরে ক'টা সেদ্ধ করে খেয়ে এসেছি বাবু। আমার এই বাচ্চাটাও—'

শোনামাত্র থমকে গেলাম। এ-রকম উত্তরের জন্য তো তৈরি ছিলাম না! আমার যেন হঠাৎই মনে পড়ল, দেশ জুড়ে এখন আকাল। মানুষ অনাহারে মরছে। বুনো কচু, শাপলা, গাছের পাতা ঘাস খেয়ে জীবন বাঁচাতে চাইছে। একহাতা খিচুড়ির জন্য লঙ্গরখানায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা রোদে জলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ধুঁকছে! ভাত হোক রুটি হোক আমি তো এখনো দু'বেলা কিছু খেতে পাই! এখনো পাতের ধারে শাপলা কিংবা ডুমুরের একটাকিছু তরকারিও সাজানো থাকে—

লজ্জা পেয়ে বললাম, 'তা, ইয়ে, দু'আঁটি ত্রিশ পয়সায় দাও তুমি—'

বউটা ঘাড় নাড়ল, 'না বাবু, আর পাঁচটা পয়সা দিও।'—'না, না, আর না।' আমি বলে উঠলাম। একটু থেমে, বাচ্চাটাকে ঠেলে কোল থেকে নামিয়ে বেশ পরিষ্কার গলায় বউটা বলল, 'নাগো বাবু, আমাদের জিনিস নিয়ে অত দামাদামি করো না তোমরা, আমরা গাঁয়ের গরীবগুর্বো মানুষ বাবু। পেটের দায়ে গাছের ফল কুড়িয়ে, পুকুরের

শাপলা তুলে শহরে বেচতে এয়েছি। দুটো পয়সা পেলে চাল কিনে বাচ্চাটাকে ভাত দেব। দু'দিন ও ভাতের মুখ দেখে নি গো বাবু—'

বলতে বলতে বউটা আমার থলে টেনে দু'আঁটি শাপলা গুছিয়ে ভরে দিতে লাগল। বাচ্চাটা কোল-ছাড়া হয়ে কাঁদতে শুরু করল। তাকে কি একটা বলে ধমক দিয়ে আবার আমার মুখের দিকে সোজাসুজি তাকাল, 'গাঁয়ে এখন চাল পাই না বাবু, সরষের তেল চোখেও দেখি না, কেরাছিন বিনা আঁধারে থাকি। এসব কোথায় গেল বাবু? পারেন, এসবের দাম কমাতে পারেন? বড় বড় দোকানে দাম তো বাঁধা, লিষ্টিতে দাম ছাপা থাকে, টিকিটে দাম লিখে ঝুলিয়ে রাখে। পারেন? দরাদরি করে একপয়সা কমাতে পারেন বাবু? আমরা না-খাওয়া গরীব মানুষ, আমাদের সঙ্গে অত দরদাম করলে আমরা যে আর বাঁচি না বাবু—'

থলিটা হাতে ধরিয়ে পয়সার জন্য হাত পাতল বউটি। আমি আর একটা কথাও না বলে দাম মিটিয়ে দ্রুত পালিয়ে এলাম ওর কাছ থেকে। আমার মাথার ভেতরটা কেমন ঝিমঝিম করছিল। বুকের ভেতর একটা অসহায় রাগ, কষ্ট। নিজেকে কেমন অপরাধী, দুর্বল, কাপুরুষ মনে হচ্ছিল।

ওই নিরক্ষর গ্রাম্য সরল চাষীঘরের বউটা কি বলতে কি বলেছে, সে কি জানে? সে কি এসব কথার অর্থ বোঝে!

ও না জানুক, না বুঝুক—আমি তো জানি। আমি অফিস করি, কাগজ পড়ি, বাজারে বাজারে ঘুরি, আমার তো সব জানার কথা। ছ'টাকার সরষের তেল বারোটাকা হয়ে গেল, আটআনার কেরোসিন একটাকা হ'ল, এক প্যাকেট গুঁড়ো সাবান, একটা বাল্ব, একটা টুথপেস্ট, একটা ব্লেড দাম বেড়ে ডবল হয়ে গেল। পরনের কাপড়, চিঠি লেখার খাম পোস্টকার্ড, রেলের ভাড়া কত বেড়ে গেল। কোনো ঢাকঢাক গুড়গুড়ের ব্যাপার না তো এসব। প্রকাশ্যে কাগজে বিজ্ঞাপন, বেতারে ঘোষণা দিয়ে সরকার থেকে বড় ব্যবসায়ী সবাই কেমন দাম বাড়িয়ে দিল! এখন দোকানে দোকানে নতুন দামের

লিস্ট, জিনিষের গায়ে নতুন দামের লেবেল। আমরা দেখছি, রাগ করছি, হাত পা ছুঁড়ছি কিন্তু নিঃশব্দে কিনেও তো আনছি সব। সাজানোগুছানো আলো-ঝলমলে বড় দোকানে দাঁড়িয়ে কখনো কি বলতে পারছি, 'এই দাম না, এই দাম নাও!' কখনো কি বলছি, 'একটা পোস্টকার্ডের দাম পনেরো পয়সা দিতে পারব না গো সরকার মশাই, এই নাও দশ দিলাম, দাও একটা। না হয়ত চারআনায় বাপু ছুটো দাও—'

সরকার থেকে বড় ব্যবসায়ী ঢাকঢোল পিটিয়ে দাম বাড়ায়, পাকা করে দাম বেঁধে দেয়, আমরা সেই দামেই জিনিস কিনি। বাধ্য হই কিনতে। আমাদের যত মেজাজ, যত দর-কষাকষি গাঁ-ঘরের নিরন্ন চাষীবউ আর চাষী-মেয়ের সঙ্গে, ফুটপাতে, রাস্তায় রোদে পুড়ে জলে ভিজে শহরের মানুষদের জন্য যারা বিক্রি করতে আসে সামান্য কিছু ফলমূল, কিছু শাকসব্জি!

এখন ফুটপাতে রাস্তার ধারে কিংবা হাওড়া ব্রীজের উপর বাজার করতে গেলে এইসব গাঁ-ঘরের মানুষগুলোর সঙ্গে বড় একটা দরদাম করি না। এটা আমি পরিষ্কার বুঝে গেছি, মূল্যবৃদ্ধির প্যাঁচে ফেলে আর যারাই আমাকে অনাহারে মারার চক্রান্ত করুক—এরা অন্তত তাদের দলে নেই!

আমি বরং একটু একটু করে এখন সেই শয়তান যাতুকরটার খোঁজ করছি, যার বিশাল শরীরে চুমকি-বসানো আলখাল্লা, মাথায় জরির টুপি, পায়ে বুটিদার নাগরা জুতো, যে কিনা পেছনে এক গাঢ় কালোপর্দা রেখে উজ্জ্বল পাদপ্রদীপের আলোতে দাঁড়িয়ে থাকে, যার চোখের দৃষ্টিতে টাকাগুলো সিকি হয়ে যায় এবং ঘরের শিশু-খাদ্য নিমেষে উধাও করে আবার ফিরিয়ে এনে বিকটহাস্যে বলতে থাকে, 'ফিন্ তো আ গিয়া! আভি পয়সা ফেকো, রূপেয়া ফেকো, হাততালি লাগাও—'

শুক্রবারের স্কুল থেকে একটু আগে ছুটি করে পুরনো নড়বড়ে সাইকেলখানা চেপে সদরের হাটতলায় গিয়েছিলেন মাধবমাস্টার। সেখানে সমবায় সমিতির দোকানে সস্তা দরে সরকারি ধুতিশাড়ি বিক্রি হচ্ছে শুনে বউয়ের জন্য একটা শাড়ি কিনতে গিয়েছিলেন। যাবার সময় অঙ্কের মাস্টার ভুবনের কাছে তিনটাকা, ইতিহাসের নিখিল নন্দীর কাছে পাঁচ টাকা এবং আরো একজনের কাছে আড়াই টাকা ধার করেছিলেন। আমার কাছেও পাঁচ চেয়েছিলেন। আমি দু'টাকা দিয়েছিলাম। মাধব বলেছিলেন, 'আর ক'টা টাকা যোগাড় করতে পারলে একটা ধুতিও কিনতাম। একটাই মোটে কাপড় আমার, এই দেখুন-না তা-ও কত জায়গায় সেলাই করা! কণ্ট্রোলের ধুতিশাড়ি তো সবসময় পাওয়া যায় না!' নিখিলবাবু তখন তাঁকে আরো কয়েকটা টাকা দিয়েছিল।

পরে শোনা গেছে, দোকানে কিছু পাওয়া যায়নি। কয়েক জোড়া বিক্রি করে বাকি মাল সব সরিয়ে ফেলা হয়েছিল। তা নিয়ে গোল-মাল চেঁচামেচি। হাটতলার রাগী মানুষগুলোকে সরানোর জন্য শেষ পর্যন্ত নাকি লাঠি উঁচিয়ে পুলিশকে ছুটে আসতে হয়েছিল। আরো শোনা গেছে, হাত পা ছুঁড়ে মাধবমাস্টারও নাকি চেঁচিয়েছিলেন। পুলিশের উদ্দেশ্যে গালিগালাজও করেছিলেন।

তারপর রাতের দিকে গাঁয়ে ফেরার পথে দুর্গাপুরমুখী রাস্তার উপর ট্রাকের ধাক্কা খেয়ে সাইকেল থেকে ছিটকে পড়লেন। চাকার তলে পিষ্ট হয়ে সাইকেলটা বেঁকেচুমড়ে গেল—সেইসঙ্গে কিছু অংশে মাধবমাস্টারের শরীরটাও! এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী কেউ ছিল না বলে ব্যাপারটা ভাল করে জানা গেল না। অনেক পরে হাটতলা থেকে দু'জন চাষী গাঁয়ে ফেরার মুখে ঘোলাটে জ্যোৎস্নার

মধ্যে কালো পীচের রাস্তার ধারে একটা রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখে ঝুঁকে পড়ে বহু কষ্টে সনাক্ত করে গাঁয়ে খবর দিয়েছিল।

খুনী ট্রাকটা ধরা যায় নি। কিন্তু সেই চাষী দু'জন গভীর সন্দেহ জানিয়ে বলেছিল, বাড়ি ফেরার পথে যে ট্রাকটাকে তারা চোখ-ধাঁধানো আলো ফেলে সবেগে সগর্জনে সদরের মুখে ঢুকতে দেখেছে —এটা তারই কাজ। তাদের আরো সন্দেহ, ওটা ভগবতী রাইস মিলের গাড়ি, যেটা কিনা এর আগে আরো দু'জন মানুষ চাপা দিয়েছে, কয়েকটা গরুছাগল মেরেছে, আর একটা রিক্সা ভেঙেছে। অন্ধকারে গাড়ির রং দেখতে না পেলেও শব্দটা তাদের চেনা। সেবার বাজার থেকে যখন চাল অদৃশ্য হয়েছিল তখন এই ট্রাকটা দুর্গাপুরে চাল পাচার করত। তিন গাঁয়ের চাষাভূষো মানুষ শব্দ শুনে ছুটে এসে এটাকেই চালসমেত বনবিবিতলার বাঁকে আটক করেছিল। একজন খুব জোর দিয়েই বলল, 'ই-ট সেই লালপারা খুনী গাড়িট-ই বটে, আপনারা খোঁজ লেন আজ্ঞে।'

কিন্তু নাবালিকা কিছু পোষ্য আর সদ্য-বিধবা বউ ছাড়া মাধবের জন্য খোঁজখবর করার লোক বিশেষ ছিল না। স্কুলের উঁচুক্লাসের ছেলেরা অবশ্য মৃতদেহ ঘিরে জড়ো হয়েছিল এবং উত্তেজিত ভঙ্গিতে ভগবতী রাইস মিলে যাবার কথা বলেছিল। আর মাস্টারদের মধ্যে কিছুটা উত্তেজিত দেখাচ্ছিল নিখিল নন্দীকে। সে হেড্‌মাস্টার জনার্দনবাবুকে তাড়া দিয়ে বলেছিল, 'যান, আপনি এখুনি একবার সদরের থানায় যান···খোঁজ খবর করুন। জ্যান্ত মানুষ মেরে পালিয়ে যাবে, কোনো প্রতিকার হবে না?'

জনার্দনবাবু অলস এবং ভীতু প্রকৃতির লোক। তবু পরিস্থিতি বুঝে শনিবার স্কুল ছুটি দিয়ে রিক্সা ভাড়া করে থানায় গিয়েছিলেন। ফিরে এসে শুকনো মুখে বললেন, 'গাড়ির নম্বর দিতে না পারলে মুখ্যু চাষীদের কথায় কোর্টে মামলা উঠবে না!'

শুনে নিখিলবাবু গুম্ হয়ে বলেছিল, 'সে তো ঠিকই। নম্বর খুঁজে বের করা তো আমাদেরই ডিউটি! ওরা করলে রাইস মিলের

মালিকপক্ষ গোঁসা করবে যে!'

আজ সোমবার। স্কুলে ক্লাস হবে না. শোকসভা হবে। তার প্রস্তুতি চলছে। সুখে দুঃখে যে মানুষটা দীর্ঘকাল এই বিদ্যায়তনের সঙ্গী ছিলেন তার অপঘাত-মৃত্যুতে সকলেই গম্ভীর, বিষণ্ণ। সারা স্কুল জুড়ে থমথমে শোকের ছায়া। নীচুক্লাসের একটা ছেলে কোথাও চেঁচিয়ে কথা বলছিল, কে একজন তাকে ধমকাল, 'স্টুপিড্! লজ্জা করে না? দাঁত বার করে হাসছিস?'

ক্লাস টেনের হিমাংশু এসে বলল, 'ফুল এনেছি স্যর, কিন্তু ছবি তো কোথাও পাচ্ছি না!'

জনার্দনবাবু বললেন, 'একটা ছবি তো লাগবে!'

হিমাংশু বলল, 'মাধববাবুর বাড়িতেও নেই স্যর!'

টীচার্সরুমের একপাশ থেকে নিখিল নন্দী বলে উঠল, 'মাধবদার বাড়িতে ছবি! যে লোকটা সারা জীবন একবেলাও পেটভরে ভাত খায় নি তার ঘরে ছবি খুঁজতে গেছ তোমরা!'

ইংরেজির সীতেশ বলল, 'এক কাজ করলে হয় না? গতবছর স্কুল ম্যাগাজিনে যে ছবি বেরিয়েছিল...'

সংস্কৃতের বৃদ্ধ শিক্ষক তারকনাথ বাধা দিলেন, 'ওতো গ্রুপ ফটো। আমরা সবাই আছি ওতে। মাল্যভূষিত হবে কি করে?'

সে তো ঠিক কথা। স্কুল-ম্যাগাজিনের পাতা উল্টে দেখা গেল, মাধব বসে আছেন মাঝামাঝি জায়গায়। তাঁর চারপাশ ঘিরে আমরা সবাই দাঁড়িয়ে-বসে। এই ছবির মধ্যে মাধবকে চিহ্নিত করে তো ফুল-মালা দেওয়া যাবে না। মৃতের উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত সবকিছু তাহলে জীবিতদের উপরেও বর্তাবে। সেটা জীবিতের পক্ষে অকল্যাণ-কর। তারকনাথ বার বার ঘাড় নেড়ে বললেন, 'সে হয় না।'

সব শুনে সেই নিখিল নন্দীই ঝাঁঝাল গলায় বলে উঠল, 'ওসব বাদ দিন। ফুললতাপাতাছবিধূপকাঠি কোনোকিছুর দরকার নেই। দাঁড়িয়ে দু-দণ্ড মানুষটার কথা ভাবুন—দু-একটা ভালবাসার কথা বলুন!'

আমি এতক্ষণ চুপ করে ছিলাম, এবার নিখিলদাকে সমর্থন জানিয়ে উঁচুগলায় বললাম, 'হ্যাঁ! সেটাই ভাল!'

তারকনাথ বেশ রুষ্ট হয়ে বললেন, 'সবকিছুর একটা রীতি নিয়ম আছে…'

কেউ তাঁর কথার জবাব দিল না। নিখিলদা উঠে চলে গেল। জনার্দনবাবুও নিজের ঘরে গেলেন। আমি নিঃশব্দে স্কুল ম্যাগাজিনটা নিয়ে পাতা ওল্টালাম। সমবেত ছবির মধ্যে মাধবের শুষ্ক শীর্ণ চোয়াল-ওঠা মুখের ছবি দেখা গেল। মাথার চুল অবিন্যস্ত, এলোমেলো। ক'দিন দাড়ি কামাননি বলে ছবিতে মুখটা কালো আর অপরিচ্ছন্ন দেখাচ্ছে! হাফশার্টের বুকপকেট রাজ্যের কাগজে-কলমে বোঝাই হয়ে বিশ্রীরকমের ঠেলে উঠেছে। শিরদাঁড়া সোজা রেখে আড়ষ্ট ভঙ্গিতে মাধবমাস্টার সামনের দিকে পলকহীন টানটান চোখে তাকিয়ে আছেন। স্কুলের পঁচিশবছরপূর্তি উপলক্ষ্যে এই ছবি, সম্ভবত মাধবমাস্টারের জীবনের প্রথম আর শেষ ছবি। দু'দিন আগেও প্রবলভাবে বেঁচে থেকে 'জীবনের একমাত্র বিকল্প জীবনবীমা' দিয়ে যিনি আমাদের যাবতীয় দুর্ঘটনা ও মৃত্যুর হাত থেকে সুস্থির নিরাপদ রাখতে সচেষ্ট ছিলেন, এখন তিনি ট্রাকের তলায় পিষ্ট হয়ে শুধুই একটা ছবি। অদৃশ্য থেকে কোন্ শক্তি তাঁকে নিয়ে এই নিষ্ঠুর বিদ্রূপের খেলা খেলে গেল!

ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মাধবমাস্টারের প্রতি এক গভীর সহানুভূতি অনুভব করলাম। জীবিত থাকতে তিনি যা পান নি, মৃত্যুর মূল্যে আজ তা অর্জন করলেন। কিংবা এটাই স্বাভাবিক। মৃতের সঙ্গে তো মানুষ শত্রুতা করে না।

মনে পড়ল, ছবি তোলার দিন দুপুরের উজ্জ্বল রৌদ্রে মাধববাবুর ক্লিষ্ট মুখখানা বেশ খুশি-খুশি দেখাচ্ছিল। সামনের সারির একখানা চেয়ার দখল করে আরেকটা চেয়ারে হাত চেপে তিনি আমাকে ডাকাডাকি করছিলেন, 'ও ভাই, আসুন, আসুন……এখানটায় এসে বসুন।'

কিন্তু আমি তাঁর কথা শুনি নি। কেননা তাঁর প্রতি মনটা তখনও প্রসন্ন হয়ে ওঠে নি। হাত নেড়ে বলেছিলাম, 'না, না। পেছনেই বেশ আছি।'

মাধববাবু ঘাড়গলা ঘুরিয়ে কাৎ হয়ে আমার হাত ধরে টেনে বলেছিলেন, 'তা কি হয়? আপনারা হলেন হাইলি কোয়ালিফায়েড্ ছেলে, স্কুলের গৌরব। আপনারাই তো সামনের সারিতে বসবেন।'

আমি মোটেই আমল দিইনি। আসলে তাঁর উচ্ছ্বসিত ডাকাডাকি আর অহেতুক প্রশংসার একটাই অর্থ করেছিলাম। মন দুর্বল করে ফাঁদে ফেলার চেষ্টা! আমার পক্ষে অতিশয় অবান্তর ও অপ্রয়োজনীয় একটা ফাঁদ—যার উপর আমার আস্থা কিংবা আকর্ষণ জন্মানোর কোন কারণই ঘটেনি। কিন্তু মাধবমাস্টারকে সে কথা কে বোঝায়! টিঁকে থাকার একমাত্র উপায় হিসেবে তিনি যে তাকেই শেষ অবলম্বন করেছেন। এখন উপার্জনশীল ব্যক্তিমাত্রই তার কাছে লোভনীয় শিকার। তাকে জালবদ্ধ করার কোনো সুযোগই তিনি যে হাতছাড়া করতে চান না।

মনে পড়ল, বছর কয়েক আগে স্কুলে জয়েন করার প্রথম দিনই একফাঁকে আমার গা-ঘেঁষে বসে রীতিমত জেরার ভঙ্গিতে মাধববাবু রাজ্যের প্রশ্ন শুরু করেছিলেন। কোথায় বাড়ি, পাকা বাড়ি না কাঁচা, নিজের না ভাড়া, বাড়িতে কে কে আছে, জমিজমা কিছু আছে কিনা, বাবা মারা যাবার সময় টাকাকড়ি কিছু রেখে গেছেন কিনা, বোনের বিয়েটা দিতে পারলেই আমি পুরোপুরি দায়মুক্ত হচ্ছি কিনা—এইরকম সব প্রশ্নের দীর্ঘ মিছিল। অপরিচ্ছন্ন বেশভূষার প্রৌঢ় মানুষটার প্রতি আমি তখনই অপ্রসন্ন হয়েছিলাম। আমার গলার স্বর ও বলার ভঙ্গিতে বিরক্তিটুকু গোপন থাকছে না দেখে নিখিলবাবু এগিয়ে এসে ধমকের মত বলেছিল, 'আঃ, মাধবদা কি হচ্ছে! কাঁচা পাকা জ্ঞান নেই, হাতে একটা ফল পড়ল কি কামড়াতে শুরু করলেন!'

মাধববাবু বিন্দুমাত্র লজ্জিত কিংবা বিব্রত হলেন না। তোবড়ানো

মুখে একটা হাসির ভঙ্গি ফুটিয়ে বললেন, 'কি করব রে ভাই! জানই তো, হাঙ্গার নোজ নো ল……'

নিখিলবাবু একটু থমকে গিয়ে বলল, 'ঠিক আছে। উনি তো আর দু'চার মাসে পালিয়ে যাচ্ছেন না!'

মাধববাবু বললেন, 'না, পালাবে কোথায়? আমার হাত থেকে তোমরা কি কেউ পালাতে পেরেছ!'

ও-পাশ থেকে তারকনাথ বলে উঠেছিলেন, 'সে তো ঠিক কথাই। তুমি যে ভাই চিত্রগুপ্তের খাতা খুলে বসে আছ।'

হাসি গুটিয়ে মুখখা-1 গম্ভীর করে মাধব বলেছিলেন, 'হ'ল না পণ্ডিত! বল বিশল্যকরণী! হিতকারী প্রাণদায়িনী—'

তারক ঠোঁট উল্টে বলেছিলেন, 'প্রাণঘাতিনী! কখনও তো দেখলাম না ধড়ে প্রাণ থাকতে ও-টাকা কেউ হাতে পায়!'

শুনে মাধব ঘোষালের যেন ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল। রাগ করেই বলেছিলেন, 'ও সবের মর্ম তুমি কি জানবে পণ্ডিত? যা মাইনেকড়ি পাও আষ্টেপৃষ্ঠে গিলে বসে থাক। চোখ বুজলে বউবাচ্চা যে অকূলে ভাসবে—'

তারকপণ্ডিত মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে ঘড়ঘড়ে গলায় বলেছিলেন, 'আমার বউবাচ্চা তোমাকে দেখতে হবে না মাধব। নিজের বউ মেয়ে সামলাও।'

সেদিন এসব কথার কোনো অর্থ স্পষ্ট করে বুঝতে পারছিলাম না। কিন্তু তারকপণ্ডিতের কথায় মাধববাবুর মুখখানা শুকিয়ে কালি-বর্ণ হয়ে যেতে দেখেছিলাম। তিনি ক্ষণকাল নির্বাক দাঁড়িয়ে থেকে চক্‌ডাস্টার হাতে ক্লাসে চলে গেলেন। অসহায়ভাবে তাঁর পালিয়ে যাবার ভঙ্গি দেখে আমার সহানুভূতিসূচক কোনো প্রতিক্রিয়া হ'ল না। বরং মনে মনে যেন খুশিই হলাম। মানুষটার সভ্যভব্যতার জ্ঞান নেই। থাকলে প্রথম আলাপেই কারো বাড়িঘরজমিজমাভাইবোনের হিসেব কষতে বসে! তারকপণ্ডিত তাকে ঠিক জায়গাতেই ঘা দিয়েছেন।

কিন্তু মাধব চলে যাওয়া মাত্র নিখিলবাবুকে চাপাগলায় বলতে

শুনলাম, 'পণ্ডিতমশাই! কাজটা ভাল করলেন না। আপনিই তো শ্লোক আউড়ে বলেন, অবিত্তং জীবিতং শূন্যং…সর্বশূন্য দরিদ্রতা..'

এবার তারকনাথ যেন যথার্থ লজ্জিত হলেন। অপরাধীর মত বললেন, 'মাধব কেন আমার বউবাচ্চার কথা তুলল!'

টীচার্সরুম ফাঁকা হতে নিখিলবাবু আমার কাছে এসে বলল, 'মাধবদার ওপর রাগ করবেন না ভাই। ওর স্বভাবই এইরকম। আসলে আজ ভূমিকাটুকু করে গেলেন।'

'কিসের ভূমিকা?'

'এতক্ষণ তাহলে কি শুনলেন? ওই বিশল্যকরণীর ভূমিকা। মানে জীবন-বীমার! ওর এজেন্সি আছে কিনা!'

এতক্ষণে সমস্ত রহস্য উন্মোচিত হল! আমি অবজ্ঞা মেশানো হাসির ভঙ্গিতে বললাম, 'ও! টীচার কাম এজেন্ট!'

…স্কুল-সংলগ্ন ছোট কোয়ার্টার্সের একটিতে নিখিলবাবুর সঙ্গে থাকার ব্যবস্থা হয়েছিল। এতে খুশি হয়েছিলাম। কেননা নিখিল বাবুকে শুরু থেকেই আমার বেশ পছন্দ হয়েছিল। কোয়ার্টার্সের অদূরে লম্বা টিনের চালাঘর। ছেলেদের হোস্টেল। জনা ত্রিশেক ছেলে থাকে। নিখিলবাবু ইনচার্জ। আমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা ওদের সঙ্গে। দিন দুই না যেতেই মাধববাবু একদিন কোয়ার্টার্সে চলে এলেন। পরণে ছেঁড়া গেঞ্জী আর রংচটা নীললুঙ্গি—হাতে একটা ছোট থলে। আমাকে দেখতে পেয়ে বললেন, 'এখানে থাকা হচ্ছে বুঝি? নিখিলের সঙ্গে? বেশ, বেশ! সৎসঙ্গে কাশীবাস—অসৎসঙ্গে সর্বনাশ। নিখিলের মত মানুষ হয় না। তা আমার কথাটা মনে রেখেছেন তো ভাই?'

আমি আতঙ্কিত হলাম। সেদিনের ভূমিকার পর আজ কি আসল কাজটি পাকা করে নিতে এসেছেন! বিরসমুখে বললাম, 'কি কথা?

'বলি নি এখনো? আচ্ছা, বলব, বলব। আর দু'দিন যাক, একটু গুছিয়ে বসুন। কই, নিখিলবাবু কই?'

বলতে বলতে ও-পাশের ঘরে ঢুকে পড়লেন, 'এই যে ভাই

হোস্টেলের ঠাকুরটাকে একটু বলে দাও দেখি, কেজি দুই চাল দিক।'

নিখিলেশকে বলতে শুনলাম, 'না মাধবদা, হোস্টেল থেকে আর কিছু দেওয়া যাবে না।'

'কেন, কেন ? গতবারের চাল-আটা ফেরৎ দিই নি বলে ? এবার মাইনে পেয়ে সব দিয়ে দেব ! আচ্ছা, না-হয় এক কেজিই দিতে বল। রাতটা তো কাটুক—'

'না মাধবদা, ছেলেরা রাগারাগি করে।'

'ছেলেরা ? ঠিক আছে, আমি ওদের বুঝিয়ে বলছি। তুমি একবারটি চল দেখি আমার সঙ্গে—'

সেই রাত্রে নিখিলবাবুর কাছে মাধবমাস্টারের জীবনবৃত্তান্ত শুনলাম। পুরনো আমলের আই-এ পাশ। স্কুলটা যখন জুনিয়র ছিল তখন থেকে চাকরি। পরে হাই স্কুল হওয়ায় চাকরি যাবার উপক্রম ঘটে। সেটা কোনোগতিকে রোধ করা গেলেও বেতন পান সামান্যই। সংসারে স্ত্রী ছাড়া ছয়টি কন্যাসন্তান। পর পর তিনটে মেয়ে জন্মাতে পরিবার পরিকল্পনার কথা উঠেছিল। মাধব ঘোষাল ক্রুদ্ধ হয়ে বলেছিলেন, 'মরলে মুখাগ্নি করবে কে ? জগা ডোম ? আর পিণ্ডি ? মাথা খাটিয়ে অনেক অনেক কল তো করেছ বাবারা, কিন্তু চাইলেই যে দুটো ছেলে একটা মেয়ে হবে সেই ওষুধটা হাতে দাও দেখি !'

—ফলে আরো তিনটে মেয়ে ! বড় মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে জমিটুকু বিক্রি করেছেন। তার পরেরটা গাঁয়ের মিস্ত্রিদের এক ছেলের সঙ্গে দুর্গাপুর পালিয়েছে। বাকি চারটে এখনও নাবালিকা। গাঁয়ের মাঝামাঝি জায়গায় একটা দোতলা মাটির ঘরে থাকেন। এই বাস্তুভিটাটুকুও স্কুলের সেক্রেটারি গাঁয়ের ভূস্বামী ভূষণ মল্লিকের কাছে চারশ টাকা দেনার বিনিময়ে বাঁধা। টাকায় মাসিক দশ পয়সা সুদ গুণতে হয়। সেক্রেটারির নির্দেশে স্কুলের বেতন থেকে সুদের টাকা কেটে রাখা হয়। এখন সম্পত্তি বলতে একখানা পুরনো সাইকেল। সেটা যত চলে তার চেয়ে শব্দ করে বেশি। ব্রেক নেই,

বেল নেই, মাডগার্ডদুটোও না থাকার মধ্যে, প্যাডেল্ বলতে দু'খানা লোহার কাঠি। সেই সাইকেলে চড়ে মাধবমাস্টার যখন গাঁয়ের পথ ধরে সদরে যান, তার ক্যাঁচর-কোঁক্ শব্দে ধানমাঠের চাষীরা পর্যন্ত হেসে বলে, 'হুঁই দেখ, মাস্টরের সাইকেল বাঘের পারা ছুইটছে !'

সংসার চালানোর জন্য সারাজীবন অনেক ফন্দিফিকির করেছেন মাধব। ধানচালের দালালি, কয়লা-কাঠের দোকান, হাঁসমুর্গী পালন, পুকুর জমা নিয়ে মাছের চাষ, গরু ছাগলের দুধ বিক্রি, সদরের হাট-তলায় মাছ ডিম কাঁচা আনাজপাতি চালান দেওয়া—কিছুই বাদ রাখেন নি। কিন্তু কোথাও দাঁড়াতে পারেন নি। কেননা ব্যবসা জমে ওঠার আগেই পুঁজিপাটা সব হাঁ-করা সংসারের গর্ভে ঠেলে দিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে বসেছেন। নতুন করে একজোড়া হাঁস কেনার পয়সাও অবশিষ্ট রাখেন নি। এখন গাঁয়ের মানুষ ভরসা করে একটা দেশলাইও তাঁকে ধারে বিক্রি করে না।

শেষপর্যন্ত ইন্সিওরেন্সের দালালি ধরলেন মাধব। পুঁজিপাটার দরকার নেই। ধারেদেনায় জড়িয়ে পড়ারও আশঙ্কা নেই। লোক ধরে কেস দিতে পারলেই নির্দিষ্ট হারে নগদ টাকায় কমিশন। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারের মধ্যে মাধব যেন সামান্য আলো দেখলেন। যেখানে যত পুরনো ছাত্র চাকরি পেয়েছে কি ব্যবসাবাণিজ্য শুরু করেছে খুঁজে খুঁজে তাদের কাছে প্রায় হত্যা দিয়ে পড়লেন। গরীব মাস্টারের মুখ চেয়ে একটা পলিসি নাও বাবা, এক হাজার, পাঁচ হাজার, দশ হাজার —তোমার যেমন সামর্থ্য. তোমার টাকা তোমারই থাকবে, টাকার উপর সুদ হবে, বোনাস হবে, দরকারের সময় ধার পাওয়া যাবে, রোগ ব্যাধি দুর্ঘটনায় অকালে চলে গেলে পরিবার পথে বসবে না। আর আমিও দু'মুঠো খেয়ে বাঁচব। হেড্‌মাস্টার জনার্দনবাবু দশ হাজার টাকার একটা পলিসি নিলেন। প্রথম কিস্তিতে মোটা টাকা কমিশন পেয়ে মাধব আরো উৎসাহিত হলেন। ভাঙ্গা সাইকেলখানা সারিয়ে সুরিয়ে শহর-গ্রাম চষে বেড়াতে লাগলেন। কাজটায় যেন তাঁর নেশা ধরে গেল। 'লাইফ' চাই, আরো 'লাইফ'—যত 'লাইফ' তত কমিশন।

বছরের শেষে কোটা পূরণ করে বাড়তি কেস দিতে পারলে কমিশনের উপরে বোনাস। মাধবমাস্টার মরিয়া হয়ে উঠলেন। এখন মাস্টারি তাঁর গৌণ, ওটাই মুখ্য।

কিন্তু মাধবমাস্টারের দারিদ্র্যগ্রস্ত জীবনের এই করুণবৃত্তান্ত যতটা বিচলিত করা উচিত—মোটেই তা করল না। বরং আমি বিরক্ত হযেই বললাম, 'যে খেতে পায় না তার অতগুলো বাচ্চা হওয়া কেন!'

নিখিলবাবু বলল, 'আর হবে না। বছর দুই আগে জোর করে অপারেশন করিয়ে এনেছি। নগদ একশটাকাও পেয়েছেন।'

বললাম, 'টাকার লোভেই করেছেন নিশ্চয়!'

আমার বলার ভঙ্গিতে ব্যঙ্গ ছিল। নিখিলেশ সেটা বুঝতে পেরে যেন গম্ভীর হ'ল। অল্পকাল চুপ থেকে বলল, 'না, মাধববাবুর দোষ কি। আপনি জানেন না, বাড়তি ছেলেপুলের জন্য মানুষ দরিদ্র হয় না, দারিদ্র্যই বাড়তি ছেলেপুলের জন্ম দেয়।'

......কয়েকদিন পরে মাধববাবু আবার ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করলেন, 'আপনার মত ইয়ংব্রাইট ছেলে গাঁয়ের স্কুলে কি থাকতে পারবে?

'দেখি কতদিন থাকা যায়।'

মাধববাবু আরো কাছে এলেন, 'একটা কথা বলব?'

আমি হঠাৎ বলে ফেললাম, 'বলুন, কিন্তু বীমাটিমা বাদ দিয়ে!'

মাধববাবু কেমন মিইয়ে গেলেন। ভুরু কুঁচকে কপালে ভাঁজ ফেলে একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'ওই চাঁদু মাস্টার কিছু বলেছে বুঝি?'

'কি বলবে?'

'না, মানে, চাঁদুটাও হালে বউয়ের নামে একটা এজেন্সি নিয়েছে শুনেছি—'

'আমি শুনিনি।'

'শোনেন নি? কিছু বলে নি তাহলে? ও, আচ্ছা—'

কথার খেই হারিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন মাধববাবু, তারপর

যেন আপন মনেই বললেন, 'আমার কাছে মশাই ঢাক ঢাক গুড় গুড় নেই। বউ শালার নামে লুকিয়েছাপিয়ে কিছু করি না আমি। গরীব মানুষ, দুবেলা খেতে পাই না, তাই এজেন্সি নিয়েছি। আর ধরুন কাজটা তো ভালই। মানুষকে সঞ্চয় করতে উৎসাহ দিচ্ছি। সকলেরই তো কিছু কিছু সঞ্চয় করা দরকার, কি বলেন? আর এই অভ্যাসটা যত কম বয়স থেকে হয় ততই ভাল। বয়স বেড়ে গেলে খরচ বাড়ে, তখন নুন আনতে পান্তা ফুরায়, লক্ষ্মীর ঝাঁপিতে এক নয়াপয়সাও রাখা যায় না। আপনি ভাই হাইলি কোয়ালিফায়েড্ ছেলে, আমার কথাগুলো একটু ভাববেন ভাল করে—'

সতর্কভঙ্গিতে লক্ষ্যের দিকে এগুচ্ছেন মাধববাবু, বুঝতে পেরে আমি হেসে ফেললাম। মনে পড়ল, একটা ব্যাঙ্ক বিজ্ঞাপন দেয়, 'লক্ষ্মীর ভাণ্ডার স্থাপি প্রতি ঘরে ঘরে, রাখিবে তণ্ডুল তাহে এক মুষ্টি করে।' মাধববাবু সব শিখে গেছেন। দালালি করতে গেলে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা শিখতে হয়!

সেদিন এই পর্যন্তই। কয়েক সপ্তাহ পরে আবার। বারান্দার এককোণে ডেকে নিয়ে মাধববাবু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মুখে ফিস ফিস করে বললেন, 'কাল টিফিনের সময় ওই চাঁদুমাস্টারটা আপনাকে অত কি বোঝাচ্ছিল?'

আমি ইচ্ছে করেই বললাম, 'পলিসি নেবার কথা বলছিলেন...'

মাধবমাস্টারের মুখ-চোখ মুহূর্তে হিংস্র হয়ে উঠল, 'বলছিল? রাস্কেল! সেদিন বলি নি আপনাকে, তলে তলে সিঁধ কাটছে! ভেবেছে ঘুমিয়ে কাটাই, কিছু টের পাই না আমি! পার্টি ভাঙ্গানো! টের পাওয়াচ্ছি মজা। কই, শালো গেল কোথায়...'

আমি ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি মাধবের হাত টেনে ধরলাম, 'ও মাধব বাবু শুনুন, আমি মিথ্যে কথা বলেছি!'

'মিথ্যে কথা? না, না, আমি সব জানি। সেদিন নিমগোড়েতে আমার একটা পার্টি ভাঙ্গিয়ে নিয়েছে ও! মুখের গ্রাস ধরে টানাটানি! ছেড়ে দেব ভেবেছেন? কই, কোথায় চাঁদু...'

হাত ছাড়িয়ে মাধববাবু দ্রুত টীচার্সরুমের দিকে এগুলেন। কিন্তু আমার কপাল ভাল, চাঁছুমাস্টার সেদিন এবসেন্ট ছিলেন।

সব শুনে রাত্রিবেলা নিখিলেশ আমাকে মৃদু ধমক দিল, 'কি বিচ্ছিরি কাণ্ড বাঁধাচ্ছিলে বল দেখি। মাধবদাকে বুঝিয়েসুঝিয়ে ঠাণ্ডা করা যায় না।'

আমি অপ্রস্তুত বিব্রত মুখে বললাম, 'কিন্তু নিখিলদা, চাঁছুবাবু আমাকে সত্যি বলেছিলেন…'

'বললই বা। তুমি চেপে রাখলেই পারতে? মানুষের দারিদ্র্য নিয়ে কি খেলা করতে আছে? সে বড় নিষ্ঠুর কাজ!'

খোঁচা খেয়ে চুপ করে গেলাম। কিন্তু ক্রমে সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ল মাধবেরই উপর। আমি তাকে নিয়ে, না তিনি আমাকে নিয়ে খেলা শুরু করেছেন? দিনরাত কে পেছনে লেগে থাকছে আমার? বীমাপত্রের গুণকীর্তনে কান ঝালাপালা করছে। আমি কি নাবালক! নিজের হিসেব নিজে বুঝি না! এবার আসুক একদিন বলতে—

ক'দিন পরেই এলেন। ভূমিকাও কিছু করলেন না। বিছানার পাশে বসে সোজাসুজি বললেন, 'বামুনের ছেলেকে একটা কথা দিতে হবে ভাই।'

আমি অসহিষ্ণু গলায় বললাম, 'কি বলার আছে, বলুন।'

শির-ওঠা রুগ্ন মলিন হাত দিয়ে মাধবমাস্টার সহসা আমার হাঁটুর কাছটা খামচে ধরলেন, 'এখন না, আপনার যখন সুযোগ হবে পলিসি করবেন, কিন্তু করলে আমার কাছেই করবেন—এই কথাটুকু আজ দিন ভাই।'

আমি তাঁর হাত সরিয়ে দিয়ে বললাম, 'ভবিষ্যতের কথা ভবিষ্যতে হবে।'

মাধবমাস্টার মুখখানা করুণ করে বললেন, 'রাগ করছেন? কিন্তু আমি তো আপনাকে ছাড়ব না ভাই। যমের পেছনে সাবিত্রী যেমন লেগেছিলেন আমিও লেগেই থাকব। লাইফ্ আদায় করে তবে মুক্তি!' বলে নিজের উপমা-প্রয়োগে নিজেই খুশি হয়ে হেসে উঠলেন।

তারপর অনেকদিন এ বিষয়ে আর কোনো কথা বললেন না। শুধু টীচার্সরুমে চাঁদুমাস্টারকে আমার কাছাকাছি বসতে দেখলেই সন্দিগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে নিঃশব্দে ঘাড়ের কাছে এসে দাঁড়াতে শুরু করলেন।

বছর খানেক পরে বিয়ে করে ফিরে আসতেই মাধবমাস্টার উৎসাহে আবেগে যেন ছটফটিয়ে উঠলেন, 'বউমা? বউমাকে এনে বাসা করবে না ভাই?'

মনটা খুশি ছিল তাই নরম গলাতেই বললাম, 'আনব। কিছুদিন যাক।'

মাধববাবু আসল কথায় এলেন, 'এবার আর দেরি করো না ভাই। এখনই, কি বলে, ফিটেস্ট টাইম! হাজার পাঁচেকের একটা নিয়ে ফেলো এবার…'

মনটা মুহূর্তে অপ্রসন্ন হয়ে গেল। পলিসির কথা ছাড়া মানুষটা কি আর কিছুই জানে না! এখন নতুন ঘরসংসার নিয়ে আমার নিজেরই কত ঝামেলা, কত খরচ। আমি কিনা হুট্ করে একটা বীমা করে বসব!

মাধবমাস্টার খুঁটিয়ে আমার মুখের ভাব লক্ষ্য করছিলেন। বেশ অভিভাবকসুলভ গলায় বললেন, 'এখন তো শুধু আপনার একলার লাইফ না, দু-দুটো লাইফ! বউমার কথাও ভাবতে হবে না? তারপর ছেলেমেয়ে হবে, তাদের কথা ভাবতে হবে। এখন আপনার মুখ চেয়ে অনেক জীবন—'

তারকনাথের মত আমারও বলতে ইচ্ছে করল, 'আপনি নিজের ঘরসংসার দেখুন মাধবদা।' কিন্তু পারলাম না। রুষ্ট মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলাম।

আরো কিছুদিন পরে একদিন খুব রাগ করেই নিখিলেশকে বললাম, 'মাধববাবুকে সামলান নিখিলদা।'

'কেন, কি হয়েছে?'

'রীতিমত ভয় দেখাতে শুরু করেছেন।'

'কিসের ভয়?'

'জলে ডোবা, আগুনে পোড়া, সাপে কাটা···রকমারি ভয়। মনে হচ্ছে বউটা বুঝি কালই মাথার সিঁদুর মুছে পথে দাঁড়াবে!'

'ও, এই!' নিখিলদা হেসে ফেলল, 'ট্রেনে কাটা পড়া, ইলেকট্রিকের কারেণ্ট খেয়ে ঝলসে যাওয়া, মাথায় বাজ পড়া, পায়ে লোহা ফুটে ধনুষ্টঙ্কার হওয়া···বলেন নি?'

'হুঁ!'

'আর সব দুর্ঘটনার একমাত্র প্রতিকার বীমাপত্র, কেননা বীমাপত্র জীবিতকে আশ্বস্ত করে আর মৃতের পরিবারবর্গকে দেয় নিরাপত্তা?'

'বলেছেন।'

'আর ওই সিম্বলটার কথা? প্রসারিত দুই করতলের মধ্যবর্তী এক দীপশিখা? শিখা হল নাকি জীবন, দুইহাতের আবরণ নাকি অর্থনৈতিক নিরাপত্তার সুদৃঢ় আশ্বাস! ঝড়তুফানভূমিকম্প যা-ই ছুটে আসুক ওই দীপশিখা অনির্বাণ! একটা বীমপত্রের নাকি এমন আশ্চর্য অদ্ভুত শক্তি! বলেন নি এসব?'

পরিহাসের ভঙ্গিতে শুরু করেছিল নিখিলদা, বলতে বলতে গম্ভীর হয়ে গেল। একটু বা উত্তেজিতও। আমি তার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হলাম। মনে হ'ল, উত্তেজনার সঙ্গে চাপা বেদনার আভাসে নিখিলদার সারা মুখ থমথম করছে। আমি না বুঝে তার কোনো গোপন ক্ষতস্থানে কি ঘা দিয়ে ফেললাম! নিখিলদা বালিশের তলা থেকে সিগেরেট-দেশলাই বের করে ধরাল। একগাল ধোঁয়া গিলে বলল, 'মাধবমাস্টার মূর্খ, তাই দিগন্ত-জোড়া বন্যার জলে ভাসতে ভাসতে খড়কুটো ধরে বাঁচতে চাইছে, আবার অন্যকে সেই খড়কুটো ধরেই বাঁচতে বলছে! কি দাম আছে টাকার? দিন দিন হু হু করে জিনিশের দর বাড়ছে, হু হু করে টাকার দর নামছে। আজ একটা পলিসি করে বিশ-পঁচিশ বছর বাদে যখন টাকা হাতে পাব তখন কি হবে তা দিয়ে? কতটুকু বিনিময়-মূল্য থাকবে তার! ওসব তাদেরই ভাল যারা ফাটকাবাজিতে টাকা খাটায়, নিজের মালের গুদাম নিজেই আগুনে পুড়িয়ে বীমাকোম্পানীর কাছ থেকে খেসারৎ আদায় করে—'

এসব অর্থনীতির কথা আমি কখনও ভাবি নি তবু প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতা থেকে বললাম, 'হ্যাঁ, নিখিলদা, এই সঞ্চয়ের কোনো দাম নেই।'

'আর নিরাপত্তা?' নিখিলদার মুখে কঠিন একটা হাসি ফুটল, স্বাধীনতার ত্রিশবছর পরেও ফুটপাথে না খেয়ে মানুষ মরে, শিশুর খাদ্যে রুগীর ওষধে ভেজাল চলে, সরষের তেলে শেয়ালকাঁটা মেশে, প্রতি নিশ্বাসে আমরা বিষ কিনি, বিষ খাই। এই দেশে মানুষের আবার নিরাপত্তা! আর শুধু কি এই, দেখলে না, গত ক'বছর দেশ জুড়ে কি কাণ্ড হ'ল? একদিকে লুটপাট খুন ধর্ষণ রাহাজানি; অন্যদিকে খড়িবাড়ি-নকশালবাড়ি। কথায় কথায় পুলিশ, সি.আর.পি., কথায় কথায় গুলি! আমার যেখানে বাড়ি সেখানে মিলিটারি ক্যাম্প বসেছিল। এলাকার কত ছেলেকে ধরে নিয়ে গেল। তারা আর ফিরল না! কেউ বাইরে গুলি খেয়ে মরল, কেউ জেলখানায়—'

বলতে বলতে নিখিলদা আবার থেমে পড়ল। লণ্ঠনের অস্পষ্ট আলোতে আমি তার সারাশরীর অল্প অল্প কাঁপতে দেখলাম। যেন আরো কি একটা ভয়ঙ্কর সংবাদ প্রাণপণে চেপে রাখার চেষ্টা করছে, পারছে না বলে চোখের দৃষ্টি বিস্ফারিত হচ্ছে, ঠোঁট কামড়ে ধরছে। নিখিলদার অস্থিরতা আমার মধ্যেও সঞ্চারিত হ'ল—কেননা এই ক'বছরে মানুষটাকে সত্যি আমি ভালবেসেছিলাম। ঈষৎ বিচলিত গলায় বললাম, 'নিখিলদা, কি হয়েছে? হঠাৎ অমন চুপ করে গেলেন কেন?'

নিখিলদা সহসা সচকিত হয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। সিগেরেটটা বাইরে ছুঁড়ে দিয়ে বলল, 'না, তেমন কিছু না! ওই দলে আমার একটা ভাই ছিল…এখনও তার খোঁজ পাওয়া যায় নি।…এই আর কি!'

আমি প্রবলভাবে চমকে ওঠে বললাম, 'সে কি। কি করেছিল আপনার ভাই?'

নিখিলদার মুখে আবার সেই কঠিন হাসি ফুটল, 'সে আমাদের জন্য যথার্থ নিরাপত্তা এনে দেবে বলেছিল। কিন্তু তার কথা আজ থাক। আরেক দিন বলব।...যে কথা বলছিলাম, ওই ব্যাঙ্কই বল আর বীমাই বল আসল ব্যাপারটা কি জান? আমাদের সামান্য সঞ্চয় তুলে নিয়ে ধনিকশ্রেণীর পুঁজি বাড়ানো। আমাদের সঞ্চয়ে ওদেরই পুঁজি বাড়ে। আমরা সুদের নামে শুধু ছিটেফোঁটা ভিক্ষের চাল কুড়োই। ভাবছ, মাধবমাস্টার তোমাকে ফাঁদে ফেলার জন্য ঘুরছে? ওর আর কতটুকু ক্ষমতা! আসলে দেশ জোড়া অনেক বড় ফাঁদে তুমি আমি মাধবমাস্টার সবাই আটকা পড়ে আছি। পালাবার পথ নেই। না বুঝেও মাধবমাস্টার কিন্তু ঠিকই বলেছেন। এই দেশে আমাদের জীবনের চারদিকে শুধু মৃত্যুর ফাঁদ পাতা। কখনও ওষুধে ভেজাল নিয়ে, কখনো খাদ্যে বিষ হয়ে, কখনও খাঁকি পোষাকে রাইফেল হাতে নেমে আসে। অথচ এর মাঝেই তিনি মানুষকে কেমন চমৎকার নিরাপত্তার কথা বুঝিয়ে চলেন!'

অনেকক্ষণ পরে আমি বললাম, 'কিন্তু নিখিলদা, আপনিও যে একটা পলিসি নিয়েছেন?'

এবার নিখিলদা সহজ স্বাভাবিকভাবে হেসে ফেলল, 'কি করব, ও-বছর কিছুতেই মাধবদার কোটা পূরণ হচ্ছিল না যে!'

ক'দিন পরে মাধববাবু কাছাকাছি আসার চেষ্টা করতে আমিই আগে জিজ্ঞেস করে বসলাম, 'আপনি তো সকলের লাইফ নিরাপদ করছেন, নিজের নামে কিছু করেছেন কি?'

মাধববাবু প্রথমে বললেন, 'হ্যাঁ, করেছি বই কি!' কিন্তু পরক্ষণেই হেসে উঠলেন, 'না ভাই। ময়রা কি মিষ্টি খায়, না সোনার দোকানে কাজ করলেই গয়না পরা যায়? ওসব ভাই তোমাদের জন্য!...অনেক ঘুরিয়েছ, এবার একটা নাও ভাই। আর ক'বছর পরেই তো ছেলের লেখাপড়া, মেয়ের বিয়ে—'

সেদিনের নিখিলদার মুখ মনে রেখে আমি সহসা বলে উঠলাম, 'কিন্তু মাধবদা, আমার ছেলে যদি গুলি খেয়ে মরে, কিংবা মেয়েকে ঘর

থেকে কেউ যদি টেনে নিয়ে যায়—তার জন্য বীমাপত্রে কি-ব্যবস্থা আছে ?'

মাধববাবু হাঁ করে শ্বাস টানলেন, 'এসব আবার কি কথা ?'

আমি হেসে বললাম, 'ঠিক আছে। এ বছর আপনার কোটা পূরণ না হলে আমি একটা পলিসি নেব। কথা দিলাম।'

কিন্তু তার সুযোগ ঘটল না। ইদানীং যিনি অল্পেঅল্পে মানব-জীবনের নশ্বরতা বিষয়ে আমাকে সজাগ করে তুলছিলেন, আর রকমারি দুর্ঘটনার মধ্যে বেঁচে থাকাটাই এক অত্যাশ্চর্য ঘটনা বলে মহাভারতের বকরূপী-ধর্মের গল্প শোনাচ্ছিলেন, তিনি নিজেই ট্রাকের তলায় চাপা পড়ে ইহলোক ত্যাগ করলেন।

আজ তাঁর শোকসভা।

সংস্কৃতের তারকনাথ শ্লোক আবৃত্তি করে অর্থ ব্যাখ্যা করলেন, 'যেখানে সকল জীবের সকল আত্মা গভীর শান্তিতে বিরাম লাভ করে—মাধবমাস্টার সেই পরমাত্মার চরণাশ্রয়ে আশ্রয় লাভ করুক।'

টাকায় মাসিক দশ পয়সা হারে সুদ আদায় করতেন যে ভূষণ মল্লিক তিনি রুদ্ধআবেগে কম্পিতগলায় বললেন, 'মাধবমাস্টারের ঋণ অপরিশোধ্য !'

কিন্তু চাঁদুমাস্টারের চোখ বেয়ে টপটপ করে জল পড়তে লাগল। আর দোরগোড়ায় মাধবমাস্টারের দুই অবুঝ নাবালিকা কন্যাকে খড়ি-ওঠা শরীর আর রুক্ষ-চুলের ঝাড় নিয়ে বেঁকেদুমড়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমি কি যে বললাম নিজেই জানি না।

সভার শেষে নিখিলদা আমার হাতে মৃদু চাপ দিয়ে বলল, 'এত-দিনে মাধবদার জীবনটা তুমি ঠিক বুঝেছ তপন। ট্রাকের তলে যাওয়ার অনেক আগেই তিনি এই সংসারের চাকার তলে পিষ্ট হয়ে মরেছেন। ট্রাকটা তো নিমিত্ত মাত্র। তুমি ঠিকই বলেছ, মাধব মাস্টারের অদৃশ্য খুনীদেব খুঁজে বের করা চাই-ই…

[শারদীয় [illegible] ১৩[illegible]